সাক্ষী ছিলো শিরস্ত্রাণ

সুহান রিজওয়ান

এই কাহিনি একটি যুদ্ধের। সেই যুদ্ধের দেয়ালে নানা চলকের লুকোচুরি, দেশপ্রেমের ঢেউ আর বিশ্বাসঘাতকতার চোরাস্রোত, দাবার বোর্ডের গুটি হয়ে বহু মানুষের হাঁটা চলা।

এই কাহিনি একটি যুদ্ধোত্তর দেশের। সেখানে বহুমাত্রিক সব জটিল গণিত, আলোকের যত অনন্তধারার সঙ্গী দুর্ভাগ্যের অন্ধকার।

'সাক্ষী ছিলো শিরস্ত্রাণ'- এই দুই সর্পিল সময়ের পটে দাঁড়ানো একজন সরলতম মানুষের গল্প।

সুহান রিজওয়ানের জন্ম চট্টগ্রামে, বেড়ে ওঠা ঢাকায়।
বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যন্ত্রপ্রকৌশলে স্নাতক, বর্তমানে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের অধীন এক সংস্থায় কর্মরত।
আগ্রহের বিষয় ছোটগল্প, ইতিহাস আর ক্রীড়াসাহিত্য। পড়তে পড়তেই অল্পস্বল্প লিখতে চান।

সাক্ষী ছিলো শিরস্ত্রাণ

সুহান রিজওয়ান

ঐতিহ্য

সাক্ষী ছিলো শিরস্ত্রাণ
সুহান রিজওয়ান

প্রকাশক
ঐতিহ্য
রুমী মার্কেট ৬৮-৬৯ প্যারীদাস রোড
বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০

দ্বিতীয় মুদ্রণ
অগ্রহায়ণ ১৪২৪
ডিসেম্বর ২০১৭

প্রকাশকাল
মাঘ ১৪২২
ফেব্রুয়ারি ২০১৬

প্রচ্ছদ
স্যাম

মুদ্রণ
ঐতিহ্য মুদ্রণ শাখা

মূল্য
সাতশত টাকা

SHAKKHI CHILO SHIROSTRAN by Shuhan Rizwan
Published by Oitijjhya
Date of Publication : February 2016
Second Print : December 2017

E-mail: oitijjhya@gmail.com

Price: Taka 700.00 US$ 18.00
ISBN 978-984-776-227-2

উৎসর্গ

বাবা-মা'কে
যারা পড়ার সাথে সাথে লিখতে শিখিয়েছেন

মুখবন্ধ

মুক্তিযুদ্ধ আর তার পরবর্তী সময়ের ইতিহাস যতই পড়ি, বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদকে নিয়ে মুগ্ধতা আমার ততই বাড়ে। মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত প্রতিটি রচনার, প্রতিটি ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণের লেখকেরা যখন এই মানুষটির প্রসঙ্গে কথা বলেন;তখন তাদের উচ্ছ্বাসের মাত্রা দেখে বোঝা যায়– স্বাধীনতার প্রতি তাজউদ্দীনের আত্মমগ্নতার সীমা ছিল না কোনো। যুদ্ধদিনে এই অন্তর্মুখী মানুষটি অসম্ভব দৃঢ়তা দেখিয়ে স্বাধীনতার শত্রুদের হতাশ করেছেন বারবার, তবুও স্বাধীন বাংলাদেশে তাকে ক্রমশ নিঃসঙ্গ হয়ে পড়তে দেখাটা অন্য অনেকের মতোই আমার জন্যেও ছিল তীব্র বেদনার। সেই বেদনাবোধ ছড়িয়ে দিতেই 'সাক্ষী ছিলো শিরস্ত্রাণ' লিখে ফেলা।

বলে রাখা ভালো, ইতিহাসের সাথে হাত ধরাধরি করে হাঁটলেও 'সাক্ষী ছিলো শিরস্ত্রাণ' কোনোভাবেই ইতিহাস গ্রন্থ নয়। আগ্রহী পাঠকদের জন্যে উপন্যাসের শেষে একটি নির্ঘণ্টে জুড়ে দেয়া হয়েছে কাহিনিতে ব্যবহৃত ঐতিহাসিক তথ্যসূত্রগুলো। নানা উৎসের সেই সব টুকরো টুকরো সুতো জোড়া লাগিয়েই আমি একটি কাহিনি বলতে চেয়েছি কেবল। সেই কাহিনি উপন্যাস হয়েছে কি হয়নি, তার বিচার ভার পাঠকের; তবে কাহিনি বর্ণনা করতে গিয়ে আমাদের গৌরবময় ইতিহাসে যেন আঁচড় না পড়ে– সে বিষয়ে আমি ছিলাম সর্বোচ্চ সতর্ক।

যাদের কৃতজ্ঞতা না জানালে এই ভূমিকা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে, তেমন মানুষের সংখ্যা খুব অল্প নয়। বই আর কম্পিউটার স্ক্রিনে সাড়ে তিন বছর ধরে ডুবে থাকায় পরিবারের সদস্যদের তাদের প্রাপ্য সময়টুকু দেইনি, সবচেয়ে বড় কৃতজ্ঞতাটা তাই তাদের কাছেই। পাণ্ডুলিপির বিভিন্ন অংশের ওপর সময় নিয়ে মন্তব্য করে অশেষ কৃতার্থ করেছেন জাহাঙ্গীর মোহাম্মদ আরিফ, তারেক নুরুল হাসান, হিল্লোল দত্ত, ইমতিয়ার শামীম, রিফাত আলম। বিভিন্ন দুষ্প্রাপ্য বই যোগাড় আর নানা তথ্য যাচাই করে ঋণী করেছেন নজরুল ইসলাম, অদিতি কবির খেয়া, অরিন্দম বিশ্বাস। তারেক রহিমের ছোটাছুটি ছাড়া এই পাণ্ডুলিপিটি বই আকারে প্রকাশ হতো না, বানানসহ আরো নানা বিষয়ে বিস্তর সাহায্য করেছেন তিনি। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি প্রচ্ছদ শিল্পী স্যামের কাছে। নবীন লেখক হওয়া সত্ত্বেও ঐতিহ্যের আরিফুর রহমান নাইম ভাই আমার ওপর আস্থা রেখেছেন, তাকেও ধন্যবাদ। প্রভূত কর্মব্যস্ততার মাঝেও একাধিকবার সময় দিয়েছেন তাজউদ্দীন কন্যা সিমিন হোসেন রিমি, কৃতজ্ঞতা তার জন্যেও।

দুটি বিশেষ ধন্যবাদ দেয়ার আছে। প্রথমটি অভ্র সফটওয়্যারের পেছনে কাজ করা 'টিম অভ্র'কে। অনলাইনে আর কম্পিউটারের পর্দায় বাংলা লেখা তারা এতটা সহজ করে

না দিলে, কখনোই লিখতে বসা হতো না আমার। দ্বিতীয় ধন্যবাদটি অনলাইন লেখক সমাবেশ সচলায়তনের পাঠকদের প্রতি, লেখালেখির প্রতি আমার আগ্রহের সূচনা তাদের দেয়া উৎসাহ থেকেই। এই উপন্যাসের বিভিন্ন টুকরো অংশও মাঝে মাঝেই আমি সচলায়তনে দিয়েছি; পাঠকেরা সেখানেও তাদের মন্তব্যে উৎসাহ দিয়েছেন, পথ নির্দেশ করেছেন।

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের সাথে তাজউদ্দীনের যে সম্পর্ক, এই ক্ষুদ্রায়তনের কাহিনিতে তা যথার্থভাবে তুলে আনা সম্ভব হয়নি আমার পক্ষে, সে দায় আমার। কিন্তু এ মানুষটির প্রতি যে তীব্র শ্রদ্ধাবোধ আমি ধারণ করি, এই উপন্যাসের কোনো পাঠক যদি সে আবেগ অনুভব করেন, আগ্রহী হয়ে কেউ যদি ইতিহাসের পাতা আরো উলটে দেখেন তাজউদ্দীনকে আরেকটু ভালোভাবে জানার প্রত্যাশায়– কেবল তখনই আমার মনে হবে এই লেখা সার্থক।

সুহান রিজওয়ান
rizwanshuhan@gmail.com
2015

" Remember, remember
The fifth of November
The gunpowder treason and plot.
I know of no reason
Why the gunpowder treason
Should ever be forgot."
--- A Guy Fawkes night rhyme

পূর্ব খণ্ড

সীমান্তের সন্ধ্যা

সন্ধ্যা নামার মুহূর্তে হঠাৎ করেই মানব জাতি সূর্যের প্রতি এক ধরনের মায়া বোধ করে। যে সূর্য সমস্ত দিন কাটিয়েছে মানুষের প্রশংসামিশ্রিত নিন্দা শুনে, গোধূলিকালে কেন যেন সেই সূর্যই মানুষের প্রিয় পাত্র হয়ে ওঠে।

অথচ তারা দুইজন সূর্যের দিকে বিন্দুমাত্র মনোযোগ দিচ্ছেন না। তারা বসে আছেন। একজন বসেছেন বড় একটা গাছের কাণ্ডে পিঠ ঠেকিয়ে। অন্যজন বসে আছেন কাছেই একটা প্রায় শুকনো খালের ওপরের কালভার্টে।

চারপাশ ঘন সবুজ। বাইরের সূর্যকে ফাঁকি দিয়ে হঠাৎ করে এই সবুজের মাঝে ঢুকে পড়লে সবকিছু কেমন অবাস্তব ঠেকে চোখে। অশ্বত্থ আর দেবদারু গাছের উঁচু বেষ্টনী চারপাশে, সেগুলো ঘিরে আছে পিপুল পাতার জাল, পশ্চিমাকাশের সূর্যের আলো এগুলো ভেদ করে আসতে পারছে না ঠিকমতো। গাছতলায় তাই ছায়া থাকলেও বাতাস বইছে না, বরং অসহ্য গরম। এই তপ্ত আবহাওয়ায় ঘন ছায়ার মাঝে বসে থাকলে অবসন্ন লাগাটা স্বাভাবিক। আমীর-উল ইসলামের সেটি লাগছেও।

জায়গাটা সীমান্তের নো ম্যানস ল্যান্ডের কাছে, জীবননগর, টঙ্গি খাল। সময়টা শেষ বিকাল। দিনটা ৩০ মার্চ, ১৯৭১।

তারা দুইজনে অপেক্ষা করছেন। অপেক্ষা করছেন মাহবুব উদ্দীন আর তৌফিক এলাহির জন্যে। আমীর-উল ইসলাম মনে মনে আরেকবার নিজের সঙ্গীর সিদ্ধান্তের প্রশংসা করেন। ভদ্রলোক প্রথমেই সীমান্তের ওপারে সশরীরে না গিয়ে বার্তা পাঠিয়েছেন মাহবুব আর তৌফিক সাহেবকে দিয়ে। বার্তাটি সংক্ষিপ্ত এবং স্পষ্ট।

স্বাধীন, সার্বভৌম, নবজাতক বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অবিসংবাদিত রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষ থেকে দুইজন শীর্ষস্থানীয় নেতা এসেছেন প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতে। ভারত সরকার তাদের যথাযোগ্য সামরিক মর্যাদা দিয়ে বরণ করতে সম্মত রয়েছেন কি না।

আমীর-উল ইসলাম বয়েসে তরুণ বলেই যেন একটু বেশিই উত্তেজিত, অযথা চঞ্চল। তার থেকে থেকে বোধ হচ্ছে যে এখানে রচিত হচ্ছে একটি স্বাধীন

জাতির ইতিহাস আর হাত দিয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে তার প্রতিটা পাতা অনুভব করছেন তারা দুইজন। বড় বিরল এই সৌভাগ্য। মাহবুব আর তৌফিকের জন্যে অপেক্ষা করতে করতে অভ্যাসবশত আমীর-উল ইসলাম নিজের দাড়িতে হাত বোলান এবং চমকে ওঠেন। পরমুহূর্তেই তার মনে পড়ে যায়, শখের ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি তিনি কেটে ফেলেছেন ঢাকা ত্যাগের সময়েই। নিজের কাছেই নিজে বোকা বনে যাওয়া আমীর-উল ইসলাম হেসে ফেলেন।

ঠিক সে সময় আমীর-উল ইসলাম লক্ষ করেন, তার সঙ্গীও হাসছেন। নিঃশব্দে। বড় অদ্ভুত সে হাসি।

হতচকিত আমীর-উল ইসলাম প্রশ্ন করেন, 'ভাই, আপনি হাসছেন যে?'

'ভাবছি,' হাসি মুখে ঝুলিয়েই তার সঙ্গী বলেন, 'ভাবছি, যে আমি আজ হেরে গেলাম।'

আমীর-উল ইসলাম ঠিক বুঝতে পারেন না কথাটা। 'কিন্তু... আপনি এই কথা বলছেন কেন ভাই? আমরা তো বিজয়ের পথেই যাচ্ছি...'

তার সঙ্গী হেসে ফেলেন এবারো। বলেন, 'ঠিক তা না। ...সাতচল্লিশে যখন পাকিস্তান হলো, তখন থেকেই আমার ক্লাসের অমুসলিম বন্ধুরা আমায় বলত, দেখে নিস, তোদের এই পাকিস্তান টিকবে না। আমি ভেতরে ভেতরে ঠিকই জানতাম সেটা। কিন্তু কী জানেন, তবুও আমি যুক্তির জোরে তাদের সাথে তর্ক লড়তাম তখন। ওদের যুক্তি দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করতাম যে এটা হতে পারে, ওটা হতে পারে, এই এই কারণে পাকিস্তান রাষ্ট্রটা টিকেও যেতে পারে।

অথচ আজকে দেখেন, ওদের কথাটাই কিন্তু ঠিক প্রমাণ হয়ে গেল। আমি তর্কে হেরে গেলাম শেষ পর্যন্ত। ...এজন্যেই বললাম, আমি আসলে আজকে যুক্তিতে হেরে যাওয়া একজন মানুষ।'

আমীর-উল ইসলাম কী বলবেন খুঁজে পান না। ২৫ মার্চের রাতে ঢাকায় কী ঘটেছে, তা তো তারা নিজের চোখেই দেখেছেন। রায়ের বাজারের পেছনের নদী পার হবার সময় হাজারো ঘরহারা মানুষের ঠেলাফেলার দৃশ্য মনে পড়ে যায় আমীর-উল ইসলামের, কী জান্তব মৃত্যুভয় তাঁদের তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে এই ভেবে অসহায় বোধ করেন তিনি। আমীর-উল ইসলামের করোটির ভেতরটা আবার ক্রোধে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। তারুণ্যের আবেগে তাৎক্ষণিক প্রতিশোধের নেশায় টগবগ করতে থাকেন তিনি।

বেশিক্ষণ এই চিন্তা সহ্য হয় না ক্লান্ত শরীরে, অসহনীয় গরমে বসে থাকতে না পেরে একসময় মাটির উপরেই গা এলিয়ে দেন আমীর-উল ইসলাম। পিঠে যেন ছ্যাঁকা পড়ে যায় প্রথমে। সারাদিনের গরমে তেতে আছে জায়গাটা। তবুও অবসন্ন শরীর ওইটুকু সহ্য করে নিয়ে বিশ্রাম চায়।

আমীর-উল ইসলামের চোখে হালকা ঘুম নেমে আসে। কাছেই তার সঙ্গী বসে থাকেন একাকী, গভীর চিন্তায় ডুবে থেকে ধ্যানমগ্ন। অজানা ভবিষ্যতের অপেক্ষা হতেই বোধহয় জন্ম তার একাগ্র চিন্তার।

সন্ধ্যার খানিক পরেই হঠাৎ বুটের শব্দ। পাশের ঝোপ থেকে মার্চ করে এগিয়ে আসে একদল জওয়ান। সবার পেছনে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে মাহবুব আর তৌফিকের পরিচিত মুখ।

জওয়ানদের একদম সামনে সামরিক উর্দি পরা মধ্যবয়স্ক লোকটিকেই হাবেভাবে তাদের নেতা বলে বোঝা যায়। এগিয়ে এসে সে মুখ খুলে ইংরেজিতে। 'স্যার, আই অ্যাম ক্যাপটেন মহাপাত্র। ইউ আর ওয়েলকাম টু আওয়ার ক্যাম্প।'

পেছনের সৈনিকেরা বেয়োনেটসহ বন্দুক উঁচিয়ে ধরে, সশব্দ স্যালুট জানায়। আমীর-উল ইসলাম ক্লান্তি লুকিয়ে দৃঢ় পায়ে সামনে এগিয়ে যান। খেয়াল করলে হয়তো সবাই দেখতে পেত, এই সন্ধ্যা, এই সীমান্ত, এই পুরো দৃশ্যটিই যেন কোনো অলৌকিক পৃথিবীতে ঘটে চলেছে। কেউ দেখেনি, কারণ কোথাও বাধা পায়নি বাতাস, নীরব হয়নি চারপাশের ঝিঁঝি পোকার শব্দ– পৃথিবীতে কোথাও কোনো কিছু থেমে নেই।

কিন্তু ঠিক এমন সময়েই আমীর-উল ইসলাম এবং তার সঙ্গী, স্বাধীন বাংলাদেশের দুই প্রতিনিধি পরিপূর্ণ সামরিক মর্যাদায় প্রবেশ করলেন ভারতে। এই অনন্য সাধারণ মুহূর্তটি ইতিহাসের বুকে চেপে বসল আজ হতে।

অবিলম্বে এসে পৌঁছেন ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের আইজি, গোলোক মজুমদার। প্রথম দর্শনেই তিনি হতভম্ব হয়ে পড়লেন আগত দুই 'রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি'দের দেখে। জীবনে এমনটা দেখেননি তিনি। এরা নাকি রাষ্ট্রদূত! অথচ খোঁচা খোঁচা দাঁড়ি মুখে, পরনে ময়লা গেঞ্জি আর লুঙ্গি; একদম সাধারণ কৃষকদের যেমন থাকে! গোলোক বাবুর অবশ্য জানার কথা নয়, অহেতুক দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাননি বলেই এই দুইজন নিয়েছেন কৃষকের ছদ্মবেশ।

গোলোক মজুমদার কাজের মানুষ। অনাবশ্যক কথা না বাড়িয়ে তিনি দ্রুততার সাথে জিপে তুলে নিলেন এই দুইজনকে। যাত্রা হলো শুরু, গন্তব্য সেই দমদম। দিল্লির সাথে ইতোমধ্যেই যোগাযোগ হয়ে গেছে। অজ্ঞাতনামা এই দুই রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধির প্রাথমিক গন্তব্য হবে কলকাতা।

কিন্তু ভেতরের কৌতূহল কিছুতেই দমাতে পারছিলেন না গোলোক মজুমদার। থাকতে না পেরে অবশেষে আরোহীদের দিকে ফিরে তাদের পরিচয় চেয়েই বসলেন তিনি।

'আমি আমীর-উল ইসলাম।' তরুণটি বলেন।

'আমি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের একজন প্রতিনিধি মাত্র,' তরুণের সাথের ছোটখাটো মানুষটি একটু হাসবার ভঙ্গি করে বলেন। 'আমার নাম তাজউদ্দীন আহমদ।'

জিপ ছুটে চলেছে দমদমের রাস্তায়। ইতিহাস তখনো জানে না, ইতিহাস জানবে আগামী দুইশো বাষট্টি দিনে, এই ছোটখাটো মানুষটিই বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ভেতরের বাইরের অগণিত শত্রুর সাথে লড়াই করে যাবেন প্রতিনিয়ত, বহুবার স্রোতের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে একক নির্ভুল সিদ্ধান্তে হতাশ করবেন স্বাধীনতার শত্রুদের। বঙ্গবন্ধুর প্রবল ব্যক্তিত্বের আড়ালে চিরকাল অনালোকিত থেকে যাওয়া এই মানুষটিই জাতির সবচেয়ে সংকটের সময়ে নেতৃত্ব দেবেন প্রচারের আড়ালে থেকে।

এই তাজউদ্দীন, হয়ে উঠবেন, উনিশশো একাত্তরের নিঃসঙ্গ সেনাপতি।

জয় বাংলা

তারেকুল আলম বাদামের খোসা ছাড়িয়ে মুখে দিল। পাশে বসা মৃণাল রেডিওর নব ঘুরিয়ে সেটাকে আরো স্পষ্ট করবার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে অনেকক্ষণ ধরে। মোশারফ একটা সিগারেট ধরিয়েছে, তার দৃষ্টি সামনের মাঠের দিকে।

'রকিবুল পোলাটা একটা বাঘের বাচ্চা!' তারেকুলের পায়ের কাছে বসা আলাউদ্দীন বলে। 'সাহস আছে।'

তারেক মনে মনে একমত হয়। পুরো পূর্ব পাকিস্তান থেকে মূল পাকিস্তান দলে সুযোগ পাওয়া একমাত্র ক্রিকেটার এই ১৮ বছরের রকিবুল হাসান। গত কয়েক বছর ধরে ঘরোয়া ক্রিকেটে দারুণ ফর্ম ছেলেটার, নিউজিল্যান্ডের সাথে গত বছরের টেস্ট দলেও রাখা হয়েছিল তাকে যদিও মাঠে নামানো হয়নি মূল একাদশে। দ্বাদশ খেলোয়াড় হিসেবে দলে ছিল রকিবুল।

ঢাকা স্টেডিয়ামে এখন চলছে পাকিস্তান একাদশ আর কমনওয়েলথ একাদশের মাঝের চারদিনের ম্যাচ। রকিবুল এবার মূল দলেই সুযোগ পেয়েছে, সে ওপেনার।

মোশারফকে একটু হতাশ শোনায়। 'রান আরেকটু বেশি করলে ভালো হইতো।' রকিবুল দুই ইনিংসেই রান করেছে মাত্র এক।

'বেশি কথা বলিস না।' তারেক একটু রেগে যায় এইবার। 'ব্যাটের মাঝে জয় বাংলা স্টিকার লাগায়া নামসে খেলবার সময়, বুঝোস, জয় বাংলা! পশ্চিম পাকিস্তানের মাউরাগুলা তো নামসিলো ভুট্টোর মার্কা তলোয়ারের স্টিকার নিয়া। নায্য জবাব দিসে পোলাটা।'

মোশারফ কিছু একটা বলবার জন্যে মুখ খুলতেই মৃণাল হাত নেড়ে সবাইকে থামিয়ে দেয়। রেডিওতে থেমে থেমে ঘোষণা দেয়া হচ্ছিলো অনেকক্ষণ ধরে, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বেলা একটায় জাতির উদ্দেশে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেবেন। গ্যালারি ভরিয়ে রাখা দর্শকেরা ভাগ হয়ে আছে ছোট ছোট দলে, অনেকের হাতেই

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বেলা একটায় জাতির উদ্দেশে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেবেন। গ্যালারি ভরিয়ে রাখা দর্শকেরা ভাগ হয়ে আছে ছোট ছোট দলে, অনেকের হাতেই রেডিও। কী বলেন ইয়াহিয়া, জানতে চায় সকলেই। মৃণাল আরেকবার ঠোঁটে আঙুল দিয়ে সকলকে নীরব হতে ইশারা করে রেডিওর আওয়াজটা বাড়িয়ে দেয়।

লন্ডন থেকে বড়ভাইয়ের পাঠানো হাতঘড়ির দিকে তাকায় তারেকুল আলম। বেলা একটা বেজে পাঁচ মিনিট। ১লা মার্চ, ১৯৭১।

ইয়াহিয়া খানের নিরাবেগ ঘোষণা ভেসে আসে রেডিওতে। 'একথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, আমি ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি।'

ঢাকা স্টেডিয়ামে সমবেত বিপুল পরিমাণ বাঙালি দর্শক এক মুহূর্ত হতবুদ্ধি হয়ে থাকে। কী করতে হবে, হঠাৎ যেন বুঝে উঠতে পারে না তারা। ইয়াহিয়া খানের এই ঘোষণার মানে যে বাঙালিদের হাতে ক্ষমতা তুলে দিতে অস্বীকার করা, এটা বুঝতে অবশ্য অসুবিধা হয় না কারুরই।

সর্বপ্রথম প্রতিবাদটা আসে উত্তেজিত আলাউদ্দীনের কাছ থেকেই। লাফিয়ে উঠে সে চিৎকার করে বলে, 'হারামজাদা!'

কিংকর্তব্যবিমূঢ় দর্শকেরা প্রত্যেকেই নিশ্চয়ই ছটফট করছিল কিছু একটা করবার জন্যে, দরকার ছিল শুধু একটি প্রভাবক মাত্র। আলাউদ্দীনের চিৎকারটা সেই প্রভাবকের কাজটিই করে দিল। হঠাৎ যেন বারুদ পড়ল ফুঁসতে থাকা দর্শকদের সারিতে। এক মুহূর্ত পরেই 'ইয়াহিয়ার ঘোষণা, মানি না, মানবো না।' স্লোগান উঠল গ্যালারিতে। 'জ্বালোরে জ্বালো, আগুন জ্বালো' স্লোগানে আকাশ কাঁপিয়ে দর্শকরা ঝাঁপিয়ে পড়ল মাঠের কাঁটাতারের বেষ্টনীর ওপর।

মাঠের খেলা থেমে গেছে ততক্ষণে, বিদেশি খেলোয়াড়েরা ছুটছেন ড্রেসিংরুমের দিকে। কাঁটাতারের জাল ছিঁড়ে মাঠে ঢুকে পড়েছে দর্শকদের একাংশ। আগুন ধরিয়ে দিল তারা মাঠের স্টাম্প, ব্যাট আর পড়ে থাকা প্যাডে।

যতদূর শোনা যায়, পৃথিবীতে যেন কেবল মাত্র দুটি শব্দ রয়েছে এখন।

"জয় বাংলা!!"

ওরা চারজন উত্তেজিত জনতার সাথে স্লোগান দিতে দিতে বেরিয়ে এল স্টেডিয়ামের বাইরে। সে কী দৃশ্য চারদিকে! সমস্ত ঢাকা শহর যেন ফুঁসে উঠেছে এই কয়েক মিনিটের মাঝে।

তারেকের শার্টের হাতা ধরে টান দেয় মৃণাল। 'ইউনিভার্সিটির দিকে চল, বটতলায়। কিছু হইলে ওইখানেই সবার আগে জানা যাবে।'

আলাউদ্দীন এইখানে বিদায় নেয় ওদের কাছ থেকে। সে যাবে পুরানা পল্টনের আওয়ামী লীগের অফিসের দিকে। বাকি তিনজন রওয়ানা হয়ে যায় ভিড় ঠেলে। এই ঢাকা শহর অচেনা ঠেকে ওদের কাছে। দোকানপাট সব বন্ধ হয়ে

যাচ্ছে রাস্তার দুই পাশেই। লোকজন তাড়াহুড়ো করে কেনাকাটা করছে সামনে গণ্ডগোলের আশঙ্কা করে।

বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায়ও উত্তেজনা। ছাত্ররা ইয়াহিয়া খানের ঘোষণা শোনার সাথে সাথে ক্লাস বর্জন করে বাইরে চলে এসেছে। হাজারে হাজারে ছাত্র জড়ো হয়েছে বটতলায়। ভিড় ঠেলে এগোতে গিয়ে রুমীর সাথে দেখা হয়ে যায় ওদের। এই ভার্সিটি ক্যাম্পাসেই ওর সাথে পরিচয় হয়েছে তারেকের।

'এই যে তারেক, আরে কোথায় ছিলা তোমরা এতক্ষণ?' রুমী বলে।

'স্টেডিয়ামে ছিলাম, ' তারেক উত্তর দেয়। 'ওইখানেই রেডিওতে ঘোষণা শুনলাম ইয়াহিয়ার। তুমি কই ছিলা মিয়া? এইদিকের কী অবস্থা এখন?'

'আরে আমিও তো মাঠে ছিলাম। দেখলাম না তো তোমাদের...। যাক, এইদিকে কিন্তু ছাত্ররা ফেটে পড়ছে একেবারে। ছাত্রলীগ আর ডাকসুর নেতারা ঠিক করেছেন তিনটা বাজে পল্টনে মিটিং করবেন, অবশ্যই আসবা। আর আমি অবশ্য এখনই যাচ্ছি। এক বন্ধুর সাথে মোটর সাইকেল আছে, পিছনে চেপে চলে যাবো। পরে দেখা হবে...', এই বলে রুমী ছুটতে ছুটতে চলে যায় কোথায় যেন।

মোশারফ ইতোমধ্যে কোত্থেকে একটা লোহার রড যোগাড় করে এনেছে কে জানে। চারপাশের অনেকের হাতেই অবশ্য বাঁশের লাঠি আর রড। ছাত্ররা পরবর্তী কর্মসূচি শুনতে চায় নেতাদের কাছ থেকে।

পল্টন ময়দানে চলে আসে ওরা। কখন যেন সেখানেও একটা উন্মুক্ত মঞ্চ তৈরি হয়ে গেছে। মঞ্চে শাহজাহান সিরাজ, নূরে আলম সিদ্দিকী, আ স ম আবদুর রবেরা বক্তৃতা দেয়া শুরু করেছেন। সকলের বক্তব্যেই মোটামুটি একই অনুরোধ থাকল, ছাত্র, জনতা যেন শেখ মুজিবের নির্দেশ মেনে চলে।

কোথায় নির্দেশ দেবেন শেখ মুজিব? হাজার হাজার মানুষ হাতের লাঠি রড নিয়ে পল্টন ময়দান থেকে চলল হোটেল পূর্বাণীতে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব প্রেস কনফারেন্স ডেকেছেন সেখানে। রাস্তায় যতদূর চোখ যায় কেবল মানুষের মাথা আর তাদের হাতের লাঠি। থেকে থেকে জয় বাংলা হুংকারে কেঁপে উঠছে আকাশ। পাকিস্তানের পতাকা পোড়ানো হচ্ছে প্রকাশ্য রাস্তায়, সাথে রয়েছে জিন্নাহ্র ছবি!

আলাউদ্দীনের সাথে এখানে আবার দেখা হয়ে গেল ওদের। সে নাকি গুলিস্তানের কামানের ওপর মতিয়া চৌধুরীর ভাষণ শুনে এসেছে। আরো সব চাঞ্চল্যকর ঘটনা শোনা যায় তার কাছে। লোকজন নাজ সিনেমা হলে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। নবাবপুর রেল ক্রসিঙের দুই পাশে যত সাইনবোর্ড লেখা ছিল, শুধুমাত্র বাংলা ভাষারগুলো ছাড়া বাদবাকিগুলো উপড়ে নিয়েছে ক্ষিপ্ত মানুষ।

শেখ মুজিব সাংবাদিকের উদ্দেশে প্রেস কনফারেন্সে বললেন এই ঘোষণা খুবই দুঃখজনক। সবকিছুই শোষিত মানুষের বিরুদ্ধে করা দীর্ঘ ষড়যন্ত্রের

অংশমাত্র। আরো বললেন, সাত তারিখ রেসকোর্সের জনসভায় তিনি পূর্ণ কর্মসূচি ঘোষণা করবেন।

এইভাবে সারাটা দিন মিছিলে স্লোগানে কাটিয়ে দিয়ে তারেক যখন হলে ফিরল, তখন সন্ধ্যা পেরিয়ে গেছে। হলের ছেলেদের মাঝেও উত্তেজনা, চারপাশের লোহার শিক দিয়ে তৈরি প্রাচীর ভেঙে ফেলেছে ছাত্ররা। হলের প্রতিটি ঘরে জমা করা হচ্ছে এইসব রড, পশ্চিমা শত্রুদের বিরুদ্ধে কাজে আসতে পারে হয়তো এগুলো। যদিও সমরাস্ত্রে সজ্জিত পশ্চিমা সেনাদের বিরুদ্ধে কার্যত এগুলো খেলনা ছাড়া আর কিছু নয়, সেটা জানে সকলেই।

সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের ওয়েস্ট হাউজের ১৪২ নম্বর কক্ষের বাসিন্দা অর্থনীতির ছাত্র তারেকুল আলম জানল না, অন্য সকলের মতোই, ১৯৭১ এর উত্তাল মার্চ শুরু হয়ে গেছে।

মিছিলের ঢাকা

বাংলা একাডেমী একদম নীরব, শব্দশূন্য। অনুবাদ বিভাগের পিয়ন আবদুল বাতেন করিডোরের এই প্রান্ত থেকে ওই প্রান্তে চাইল। কেউ নেই। করিডোরে দেখা যাচ্ছে না প্রতিদিনের পরিচিত কর্মব্যস্ত মুখগুলোকে, অন্যান্য দিনের মতো টেবিলের ওপর ফাইল চাপড়ে রাখার শব্দও নেই আজ।

আবদুল বাতেন নিচে নেমে এলো। বুড়ো দারোয়ানটাকেও দেখা যাচ্ছে না আশপাশে। সদর দরজা ভেজানো অবশ্য, কাজেই ভেতরে ঢুকতে বা বাইরে বেরুতে কোনো অসুবিধা হবার কথা নয়। কিন্তু দারোয়ান গেল কোথায়? দুই তিন বার গলা তুলে 'চাচা মিয়া! আছেন নাকি?' বলে ডেকে দেখল আবদুল বাতেন। কেউ সাড়া দিল না।

গতকাল দুপুর থেকে শরীরটা হঠাৎ করেই খারাপ করেছিল বাতেনের। অসুস্থতার কথা বলে দুপুরের পর ছুটি নিয়ে এখানেই থাকার ব্যবস্থা করে নিয়েছিল সে, রাতেও আর ফিরে যায়নি নিজের মেসে, আরামবাগে। একটু পরপরই অবশ্য মিছিলের শব্দে ঘুম ভেঙে যাচ্ছিলো তার। মিছিলের কথা মাথায় আসতেই একাডেমির আজকে লোকসংকটের কারণটা ধরে ফেলল বাতেন। আজ তো হরতাল। শেখ সাহেব হরতাল ডেকেছেন আজ, মনেই ছিল না এই কথা।

আবদুল বাতেন তার সাইকেলটা নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। রাতের হালকা জ্বর ভাবটা কেটে গিয়েছে ইতোমধ্যে, প্রচণ্ড ক্ষুধা পেয়েছে তার এখন। রাস্তার এ-মাথা থেকে ও-মাথা চোখ বুলিয়েও একটা রিকশা পর্যন্ত দেখতে পেল না সে। কড়া হরতাল হচ্ছে আজকে তাহলে। মেসে ফিরে যাবে মনে করে সাইকেলে যখন চড়তে যাবে আবদুল বাতেন, তখনই দেখা গেল মিছিলটাকে। কার্জন হলের ওদিক থেকে আসছে।

মিছিল খুব বেশি বড় নয়। ষাট-সত্তরটা লোক হবে বড়জোর। তবে লোকসংখ্যা বাড়ছে মিছিলে ধীরে ধীরে। সবচেয়ে অবাক করা বিষয়, মিছিলের প্রত্যেকেই সশস্ত্র। চেরা বাঁশ, লোহার রড, বড় আকারের কাঠ, সবাই হাতের যা কিছু পেয়েছে তা নিয়েই যেন বেরিয়ে এসেছে মিছিলে। আর কী সব স্লোগান সবার মুখে!

মিছিলে শিববাড়ি এলাকার এক পরিচিত মুখ চোখে পড়ে বাতেনের। লোকটা এগিয়ে আসে। 'বাতেন ভাই, এখনো দাঁড়ায়া আছেন ক্যান? চলেন, মিছিলের লগে চলেন। বটতলায় চলেন। সাইকেল রাইখ্যা চলেন আমাগো লগে।'

হতবুদ্ধি আবদুল বাতেন সাইকেল রেখে দেয় একাডেমি চত্বরে। 'বটতলায় ক্যান? সেইখানে কী হইবো আইজ?'

'ছাত্ররা মিছিল ডাকছে আইজকা, এগারোটার সুমায়। ক্যান, আপনি জানেন না?'

আবদুল বাতেন দুর্বলভাবে মাথা নাড়ে, তারপর যোগ দেয় ওদের সাথে।

মিছিল এগোয় জয় বাংলা স্লোগানের সাথে সাথে। সামনের মোড়টা ঘুরেই হতবাক হয়ে যায় বাতেন। এত মানুষ আগে আর কখনো দেখেনি সে। অগুণতি। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা পর্যন্ত যতদূর চোখ যায় কেবল মানুষ আর মানুষ। বাতেন মিছিলের সাথে মিলে গিয়ে এগোতে চায় বটতলার দিকে। তবে বটতলায় পৌঁছানো হয়ে ওঠে না আর ওদের মানুষের চাপে। এত এত মানুষের ভিড়ে ওদের মিছিলটা আসতে পারে কলাভবনের পশ্চিমে পর্যন্ত।

মাইকে তখন অবিরাম প্রচার হচ্ছে স্বাধীনতার স্লোগান। ছাত্রনেতারা বক্তৃতা দিচ্ছে, গলায় ওদের আগুন। তারা বলছে, চব্বিশটা বছর ধরে বাঙালিদের খালি শোষণই করে যাচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তানের লোকেরা। বাঙালিদের ওরা মানুষই মনে করে না। আমাদের বন্যা সমস্যার কোনো সমাধান হয় না; ওদিকে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা খরচ হয় পশ্চিমে। ভাষার দাবিতে মিছিলে যে পুলিশ গুলি চালায়, সেও ওদেরই নির্দেশে।

শুনতে শুনতে আর সবার মতোই ফুঁসতে থাকে বাতেন। 'শালা! আমার দেশের মানুষের উপরে গুলি চালাবে উর্দু বলা কিছু আর্মি? আমার দেশের মাটিতে অধিবেশন বসাতে অনুমতি নিতে হবে ওই ইয়াহিয়া খানের?' ক্ষোভে উন্মাদ আবদুল বাতেনের হঠাৎ করেই নিজেকে এই বিশাল মিছিলের একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে মনে হয়। এই যে এতগুলো মানুষ কত রকমের জামাকাপড় পরা, কত বিচিত্র শ্রেণির, কত আলাদা তাদের কথা বলার ধরন; কিন্তু সবাই এখানে এক হয়ে গেছে শোষিত হতে হতে। পশ্চিমাদের সাথে তো তাদের ধর্ম ছাড়া আর কোনো সাদৃশ্য নেই; ওদের অকারণ জুলুম আর কতকাল মুখ বুজে মেনে নিতে হবে আমাদের?

হঠাৎ-ই চারপাশের মানুষগুলো গর্জন করে ওঠে। একটা নতুন পতাকা দেখা যাচ্ছে সামনে কার হাতে যেন। অগণিত মানুষের ভাবনা স্লোগান হয়ে বেরিয়ে আসে মুখ দিয়ে। 'এইটা বাংলাদেশের পতাকা, উড়ায় দাও, উড়ায় দাও।'

নেতারা পতাকা উড়িয়ে দেন। সবুজ একটা জমিনের মাঝে রক্তলাল একটা বৃত্ত। এর মাঝে সোনালি হলুদে একটা মানচিত্র। কী অদ্ভুত সুন্দর! বাতাসের স্পর্শে সগর্বে উড়তে থাকে স্বাধীন বাংলার পতাকা, সবাইকে মুগ্ধ করে। অন্য রকম একটা মাদকে আচ্ছন্ন তখন উপস্থিত হাজার হাজার মানুষ।

পতাকা ওড়ানোর পরে শুরু হয় ছোট ছোট বেশ কিছু শোভাযাত্রা। বায়তুল মোকাররমের দিকে যাচ্ছে, এরকম একটা দলে যোগ দিয়ে দেয় বাতেনও।

এর মাঝে আবদুল বাতেন ভুলে গেছে আর সব। সে ভুলে গেছে আরামবাগের মেস, সে ভুলে গেছে অসুস্থতা, সে ভুলে গেছে ক্ষুধা। মিছিলের সামনে থাকা আবদুল বাতেন আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করে কেবল স্লোগান দিতে থাকে, 'জয় বাংলা!'

মিছিল এগিয়ে যায়। হাইকোর্টের কাছাকাছি এসে শামসুদ্দীন স্যারের সাথে দেখা হয় আবদুল বাতেনের, উনি দাঁড়িয়ে আছেন রাস্তার ধারে। আবু জাফর শামসুদ্দীন স্যার বাংলা একাডেমিতেই কাজ করেন। চোখাচোখি হতেই স্যারের সামনে দৌড়ে যায় বাতেন।

'কী বাতেন, তুমিও মিছিলে বেরিয়েছো?... ভালো ভালো।' আবু জাফর শামসুদ্দীনকে উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে।

'কিছু হইছে স্যার? আপনের শরীর খারাপ করছে নাকি?' ঘর্মাক্ত বাতেন প্রশ্ন করে। তার চোখ মিছিলের দিকে, ওটার সাথে সাথে থাকতে চায় সে।

'আমার কিছু হয়নি। আমার ছেলেটা... ষোল বছর বয়স মাত্র ওর... পারভিজ... কোথায় যে বেরিয়ে গেল সকালে মিছিল করবে বলে। ওর আম্মা খুব দুশ্চিন্তা করছেন।' শামসুদ্দীন সাহেবের গলার স্বরে তার দুশ্চিন্তাটা উঠে আসে। বৃদ্ধ এই মানুষটিকে খুব ভালোভাবেই চেনে আবদুল বাতেন। পড়াশোনা আর লেখালেখি নিয়েই তার যত কাজ। হঠাৎ করে দেশের এই অশান্ত পরিস্থিতি যেন মানুষটা ঠিক বুঝে উঠতে পারছেন না। বয়স তাকে বাধা দিচ্ছে তারুণ্যের সহযাত্রী হয়ে মিছিলে নামতে।

আবদুল বাতেনের এই চিরশান্ত বৃদ্ধটির জন্যে মায়া হয়। কপালের ঘাম মুছে সে বলে, 'স্যার, আপনে বাসায় যান গিয়া। চিন্তা কইরেন না। আপনের পোলা হারাইবো না। পুরা ঢাকা শহরটাই তো এখন একটা মিছিল। মিছিলের ঢাকায় স্যার, কেউ হারাইবো না।'

প্রেসিডেন্ট তার অফিসে নেই, তিনি বসে আছেন পেছনের বারান্দায়, দায়িত্বরত প্রহরীটি জানায়। রাও ফরমান আলী মাথা নাড়ল। 'ঠিক আছে, আমি এখান থেকে চলে যাবো একাই। তোমার আর আসবার প্রয়োজন নেই।'

অপস্রিয়মান প্রহরীর দিকে পেছনে ঘুরে ফরমান আলী বারান্দার দিকে এগোয়। বেশ ক্লান্ত লাগছে তার। ইসলামাবাদে সরাসরি আসবার কোনো বিমান ছিল না। অতএব ঢাকা থেকে শ্রীলঙ্কা হয়ে করাচি, করাচি হতে লাহোর, এরপর ইসলামাবাদ। গত বারোটা ঘণ্টা আকাশেই কেটেছে ফরমানের।

বারান্দায় ঢুকেই ফরমান আলী এক মুহূর্তের জন্যে থমকে যায়। প্রেসিডেন্টকে একলা আশা করেছিল সে। কিন্তু ইয়াহিয়া খান একলা নন, তার সাথে জেনারেল হামিদ আর জুলফি ভুট্টোকেও দেখা যাচ্ছে। ইয়াহিয়া খানের পা খালি, তিনি সে'দুটো টেবিলের ওপরে তুলে রেখেছেন আয়েশি ভঙ্গিমায়। টেবিলে শোভা পাচ্ছে হুইস্কির বোতল, জেনারেদ্বয় আর ভুট্টোর হাতের গ্লাসও খালি নয়। ফরমান আলীর সেই পুরনো প্রবাদ মনে পড়ে গেল রোম যখন পুড়ছিল, নীরো তখন বাঁশি বাজাচ্ছিলেন।

ইয়াহিয়া খান গলা উঁচিয়ে ডাকলেন, 'আরে, ফরমান চলে এসেছে দেখি। বসো বসো। তারপর, খবর-টবর কী সব ওইদিকের বলো।'

ফরমান আলী স্যালুট ঠুকে একটা চেয়ার টেনে বসল। আড়চোখে ভুট্টোর দিকে চেয়ে ইতোস্তত করে সে বলল, 'স্যার, আমি যা বলতে যাচ্ছি তা মিস্টার ভুট্টোর জন্যে অস্বস্তির কারণ হতে পারে। আমি তাকে অনুরোধ করবো...'

ভুট্টো তার হাতের গ্লাসসহ উঠে দাঁড়ালেন। ইয়াহিয়াকে চোখ দিয়ে কিছু একটা ইশারা করে মন্থর পায়ে তিনি চলে গেলেন পাশের ঘরে। ইয়াহিয়া খান চোখে কৌতূহল নিয়ে তাকালেন ফরমানের দিকে। 'হ্যাঁ, বলো এবার। কী ঘটল গতকাল রাতে?'

'আপনি তো জানেন, ' ফরমান শুরু করে। 'গতকাল রাতে বিমানে উঠবার আগে শেষবারের মতো মুজিবের সাথে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলাম আমি, তার ধানমণ্ডির বাড়িতে। দেখতে গিয়েছিলাম এই অবস্থার কোনো সুরাহা করা যায় কি না।'

ইয়াহিয়া মাথা ঝাঁকালেন। গ্লাস নেড়ে ইশারায় জানালেন পুরোটা শেষ করতে।

'আমি একাই ছিলাম। বাড়ির চারপাশে আওয়ামী লীগের নিজস্ব রক্ষীরা ছিল, তবে সবাই আমায় চেনে বলে ভেতরে যেতে সমস্যা হয়নি আমার। আর আসবার কথা মুজিবকে আমি জানিয়েছিলাম আগেই, তিনি অপেক্ষা করছিলেন। শেখের বসবার ঘরে আমরা মুখোমুখি হলাম।...

অপ্রয়োজনীয় কথায় সময় নষ্ট না করে আমি সরাসরিই বললাম, 'বলুন, পাকিস্তানকে কি এখনো রক্ষা করা সম্ভব?'

মুজিব বলল, 'হ্যাঁ, পাকিস্তানকে রক্ষা করা যায় যদি আপনারা আমাদের কথা শোনেন। আপনাদের আর্মিরা আমাদের কথা শোনে না, তারা শোনে ভুট্টোর কথা। এর মাঝেই আর্মি আমার বহু মানুষ হত্যা করেছে।'

...তো আমরা এইরকম কথাবার্তা বলছি। কিন্তু হঠাৎ করে আমি দেখলাম, পর্দার ওপাশে আরো একজন মানুষের ছায়া। সাথে সাথে আমি সতর্ক হয়ে গেলাম, আমি চাইনি এই আলোচনা অন্য কারো কানে যাক।'

'লোকটা কে ছিল?' প্রশ্ন করেন ইয়াহিয়া।

ফরমান আলী থামে এক মুহূর্ত। 'তাজউদ্দীন।'

ইয়াহিয়া মাথা ঝাঁকান খালি একবার। ফরমান আলী শুরু করেন আবার। 'মুজিব অবশ্য আমার অস্বস্তি গ্রাহ্যই করলেন না। ডাক দিলেন, তাজউদ্দীন, ভিতরে আসো।

তাজউদ্দীন ভেতরে আসলেন। মুজিব তাকে বললেন, তাজউদ্দীন, ফরমান সাহেব জানতে চাচ্ছেন পাকিস্তানকে বাঁচানো সম্ভব কি না। তাজউদ্দীন বলল, হ্যাঁ সম্ভব। নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা দিয়ে দিন। ইতোমধ্যেই বহু লোক মারা গেছে। আর এত কিছুর পরেও ভুট্টোর সাথে আলোচনায় বসা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

এই কথার অর্থ বুঝতে আমার সমস্যা হয়নি স্যার। এই জারজ হিন্দুয়ানি বাঙালিরা আমাদের অধীনে আর থাকতে চায় না।' ফরমান আলী বক্তব্যটা শেষ করে অনাবশ্যক জোর দিয়ে, যেন সে অপেক্ষা করে ইয়াহিয়া তাৎক্ষণিক কোনো প্রতিক্রিয়া দেখাবেন।

ইয়াহিয়া হাতের গ্লাস নামিয়ে রাখলেন। জেনারেল হামিদের দিকে চেয়ে হতাশ স্বরে বললেন, ' মুজিব আর তাজউদ্দীন, তাজউদ্দীন আর মুজিব, ভীষণ নাছোড়বান্দা রকমের মানুষ এরা দুইজন। গোটা পূর্ব পাকিস্তানে এই দুইজন মানুষকে নিয়ে খুবই পেরেশানিতে আছি আমরা।... এই মানিকজোড়কে নিয়ে কী করা যায় বলো তো হামিদ?'

এদিকে পাকিস্তানের অন্য প্রান্তে, ইয়াহিয়া খানের অর্ধেক পেরেশানির কারণ তাজউদ্দীন সেই মুহূর্তেই ঢাকা স্টেডিয়াম গেটের এক জনসভায় বক্তৃতা শেষ করলেন। অসহযোগ অভূতপূর্বভাবে সফল করার জন্যে তাজউদ্দীন দেশের সর্বস্তরের মানুষকে ধন্যবাদ জানালেন ভাষণে। তবে ভাষণ শেষ করেও ভাবনার শেষ হয় না তার। দেশ জুড়ে পরিস্থিতি খুবই অস্থিতিশীল, যেকোনো সময় সামান্য কারণেই হয়ে যেতে পারে তুলকালাম। তাজউদ্দীন ভাবছেন, ভবিষ্যতে খারাপ

কিছুর জন্যেই প্রস্তুত থাকতে হবে মানুষকে। সেজন্যেও এখন থেকেই লোকেদের মাঝে প্রস্তুতি গড়ে তোলা দরকার।

মানুষের ভিড়ের মাঝে দিয়ে পথ করে নিয়ে তাজউদ্দীন বেরিয়ে এলেন। ঘেমে-নেয়ে একাকার অবস্থা তাঁর। অথচ গরম শুরু হয়েছে মাত্র। তাজউদ্দীন ধানমণ্ডির ৩২ নম্বরের দিকে এগোলেন।

৩২ নম্বর এখন অবশ্য সবসময়ই মানুষ গিজগিজ করে। দিন নেই, রাত নেই, সাংবাদিকেরা আসছে, নেতারা আসছেন, ছাত্র সংগঠনগুলো আসছে, সাধারণ মানুষ আসছে, আসছে নানা পেশার মানুষ।

তাজউদ্দীন ঢুকতেই শেখ মুজিব ছুটে এলেন যেন কোত্থেকে। চিরআপন পদ্মার তীরের ফরিদপুরের টানে তিনি তাকে বললেন, 'তাজউদ্দীন কই গেছিলা? ... আরে শুনো। বিবৃতি দিমু একটা পত্রিকায়। খসড়া লিইখ্যা রাখসি, এই লও। তুমি একটু দেইখ্যা দিও, সাংবাদিক আইস্যা বইয়্যা রইছে।'

শেখ মুজিব হারিয়ে যান আবারো ভেতরে। তাজউদ্দীন খোঁজ নিয়ে দেখেন পাকিস্তান অবজার্ভারের চিফ রিপোর্টার আতাউস সামাদ এসেছেন। তাড়াতাড়ি বিবৃতিটা খুঁটিয়ে পড়লেন তাজউদ্দীন, টুকটাক কাঁটাছেঁড়া করলেন কিছু।

বিবৃতি তৈরি করে তিনি এসে বসলেন আতাউস সামাদের সাথে। আতাউস সামাদ ঘনঘন ঘড়ি দেখছেন। 'তাজউদ্দীন ভাই, আপনাদের টাইপিস্ট এখনো আসে নাই? দেখেন না, সন্ধের মধ্যে নিয়ে যেতে হবে বঙ্গবন্ধুর বিবৃতিটা।'

তাজউদ্দীন লজ্জা পেলেন। 'ভাই, আমি খুবই দুঃখিত। টাইপিস্ট তো এখনো এসে পৌঁছায় নাই। আপনি একটু বসেন, আমি নিজেই টাইপ করে দিচ্ছি।'

আতাউস সামাদ আঁতকে উঠলেন, ' আরে ভাই কী বলেন, আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হয়ে আপনি এখন টাইপের কাজ করবেন নাকি?'

তাজউদ্দীন হাসলেন। 'সমস্যা কী। কাজের তো আর ছোট বড় নাই। আর এইসব লেখালেখির কাজ তো আমি সবসময়ই করি অল্পবিস্তর।'

সামাদ সাহেবকে আর কথা বলার সুযোগ না দিয়ে তাজউদ্দীন টাইপ করতে বসে গেলেন। ধীরে ধীরে টাইপ করতে লাগলেন। তার স্পিড বেশি নয়।

আতাউস সামাদ কোথা হতে আরেক সাংবাদিক আতিকুর রহমানকে ধরে নিয়ে এলেন। 'তাজউদ্দীন ভাই, উঠেন। আতিক সাহেবের টাইপের স্পিড ভালো, ওনাকে দেন।' দুইজনে মিলে এইবার একত্রে একরকম জোর করেই তুলে দিলেন তাজউদ্দীনকে। তাজউদ্দীন আবারো লজ্জা পেলেন। কোনো কাজ ঠিকমতো করতে না পারলে তার ভারি অস্বস্তি লাগে।

টাইপের ফাঁকে ফাঁকে আতাউস সামাদ আলাপ চালাতে লাগলেন। 'তাজউদ্দীন সাহেব, শুনেছেন নাকি মওলানা ভাসানী কী বলেছেন? বললেন, এত বয়স হয়েছে– কিন্তু উনি জীবনে মানুষের মাঝে এত একতা আর সরকারের

বিরুদ্ধে এমন প্রতিবাদ দেখেন নাই, যেটা এখন দেখছেন। শেখ সাহেবের খুব প্রশংসা করলেন মওলানা।'

তাজউদ্দীন খুশি হলেন। 'হুজুর আসলে মুজিব ভাইকে খুব পছন্দ করেন। আর ঠিকই তো বলেছেন উনি। উনার মতো এতদিন না হলেও পাকিস্তান আমলের শুরু থেকেই তো দেখছি, মানুষের এমন রুখে দাঁড়ানো আগে আর চোখে পড়ে নাই। আপনারা কাজ করেন, আমি খবরটা মুজিব ভাইকে দিয়ে আসি। চা না খেয়ে চলে যাবেন না যেন আবার।'

শেখ মুজিবকে অবশ্য তাজউদ্দীন খবরটা তখনই জানাতে পারলেন না। তিনি ততক্ষণে কারো সাথে বৈঠকে বসেছেন দোতলায়। ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ।

রিমির ভাবনা

মুজিব কাকু এসেছেন, এসেই দরজা আটকে বসে গিয়েছেন আব্বুর সাথে আলোচনায়। দরজা বন্ধ করে কী এমন আলোচনা করতে হয় এদের, কে জানে! এমনিতে মুজিব কাকু নিয়মিতই আসেন, কিন্তু গত দু'তিনদিনে আব্বুর সাথে মুজিব কাকুর প্রয়োজন যেন বেড়ে গিয়েছে বহুগুণ। গতকাল তো দুইবেলায় আসলেন তিনি। আর আব্বুটাও যেন কেমন দৌড়াদৌড়ির মাঝে আছে গত কিছুদিন ধরে। এর মাঝে মুজিব কাকু কোনো কাজ করতে বললে আব্বুর আর মাথার ঠিক থাকে না, খাওয়াদাওয়া ভুলে আব্বু বসে যান সেই কাজ করতে।

রিমি অবশ্য জানে, মুজিব কাকুর জন্যে তার আব্বু তাজউদ্দীন আহমদ খুবই দরকারি একজন মানুষ। এই তো, ইলেকশনের অল্প ক'দিন আগেই একটা গাড়ি দুর্ঘটনায় আব্বুর পা ভেঙে গেল, আর আব্বু তখন ঘরেই বসে রইলেন বেশ কিছুদিন। তখন মুজিব কাকু ঘরে এসে আম্মুকে তো সরাসরিই বললেন, 'তোমরা কিন্তু ওরে দেইখ্যা রাইখো। ওর য্যান কোনো অসুবিধা না হয়। তাজউদ্দীন কিন্তু আমার দলের সব থেইক্যা গুরুত্বপূর্ণ লোক!'

রিমিও বোঝে, তার আব্বু একটা আস্ত কাজপাগল মানুষ। সারাদিন শুধু কাজ, কাজ আর কাজ। একটুও শান্তি নেই। আব্বুকে নিয়ে বাইরে বের হলেও একশোটা ঝামেলা। বই কিনতে যাবার কথাই ধরো। আব্বুকে নিয়ে বই কিনতে যাওয়া মানেই বিপদ। কোনো একটা দোকানে ঢুকে বই দেখতে বসলে, অমনি পাঁচ মিনিটের মাঝে কোথা থেকে হাজির হয়ে যাবে আব্বুর পরিচিত গাদা গাদা মানুষ। আর শুরু করে দেবে আব্বুর সাথে আলাপ। কতরকমের মানুষের সাথেই না খাতির আব্বুর। আর সবাই যেন আব্বুকে পেলেই দেশ নিয়ে তাদের সমস্ত ভাবনার কথা না বলে শান্তি পায় না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যায় এইভাবে, বইকেনা মাথায় ওঠে।

বই কিনতে আব্বু ওদের দুইবোনকে বাংলাবাজারে নিয়েছেন বেশ কয়েকবার। কী চমৎকার জায়গাটা! নতুন বই, পুরনো বই, মোটা বই, চিকন বই, সব রকমের বই আছে ওখানে। মাঝে মাঝে আব্বু নিউমার্কেটে নিয়ে যান বই কিনতে। সেটা বাদে স্টেডিয়ামের দোতলার বইয়ের দোকানটাতেও যাওয়া হয় কখনো কখনো। বই পড়তে রিমি ভারি ভালোবাসে। তার বড় বোন রিপিও বই ভালোবাসে, রিমির চাইতে একটু বেশিই ভালোবাসে বোধহয়। আব্বুর সাথে বই কিনতে তাদের বের হওয়াটা ভারি ঝামেলার মনে হলেও, তাদের দুইজনেরই এই কেনাকাটা পর্বটা খুব পছন্দের। বই পড়তে পড়তে রিমি রিপি কল্পনা করে তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে হিমালয়ের চূড়ায়, ভিজে যাচ্ছে নায়েগ্রা জলপ্রপাতের স্রোতে অথবা সূর্যোদয় দেখছে জাপানে বসে।

রিমি আর রিপির কিন্তু সত্যি সত্যি দুজন জাপানি বন্ধু ছিল! শিয়মি আর নিশিও ওদের নাম। ওরা ছিল দুই বোন। ওদের বাবা জাপানি মিশনের হয়ে কী একটা যেন চাকরি করতেন। আর ওদের বাসা ছিল এই ধানমণ্ডিতেই, ঠিক রিমিদের পেছনের বাড়িটায়। দিনের মাঝে অনেকবার ওরা একে অন্যের বাসায় আসা যাওয়া করত। নিশিওদের বাড়িতে ছিল অনেকগুলো কুকুর। সবগুলো কুকুরের জন্যে বাগানে আলাদা আলাদা ছোট্ট কাঠের তৈরি সুন্দর ঘর ছিল। তবে শিয়মি আর নিশিওদের বিষয়ে সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় যেটা মনে হতো, সেটা হচ্ছে ওরা সাপের মাংস খেত! মানুষ যে কী করে সাপের মাংস খায়, কে জানে!

রিমির চিন্তার ঘোর কেটে যায় দরজা খোলার শব্দে। আলোচনা শেষ হয়েছে নিশ্চয়ই। আব্বু বেরিয়ে এসেছেন বসবার ঘরের দরজা খুলে। মুজিব কাকুও বেরিয়েছেন পেছনে, তার মুখে ভাবনার ছায়া।

রিমিকে দেখতে পেয়েই অবশ্য শেখ মুজিবের চোখে দুষ্টুমির হাসি খেলা করে ওঠে। কাছে এসে রিমির গালটা টিপে দিয়ে তিনি বলেন, 'কী মামনি, ক্যামন আছো? সব ভালো?... মিমি আর সোহেল কই, ক্যামন আছে ওরা?'

রিমি জানায়, মিমি আর সোহেল আম্মার সাথে ভেতরে কোথাও আছে। খেলছে। মুজিব কাকু বলেন, 'ঠিক আছে। ওদের আজকে আর ডাকন লাগবো না। কালকে কিন্তু তুমি মনে কইর‍্যা রেসকোর্সে আসবা। আমার ভাষণ শুইন্যা কী বুঝলা, সেইটা আমারে বুঝায়া দিতে হবে তোমারে। না বুঝাইতে পারলে চিমটি দিমু কিন্তু! হা হা হা।'

হাসতে হাসতে মুজিব কাকু আব্বুকে নিয়ে বেরিয়ে যান। চিমটির কথায় রিমি অবশ্য না হেসে গম্ভীর হয়ে যায়। ভাবতে থাকে আগামীকাল সে রেসকোর্সের ভাষণ কী করে শুনবে।

রিমি বড় বোন রিপিকে খুঁজে বের করে। 'রিপি, বলো তো, কালকের ভাষণ শুনতে আম্মা কি আমাদের নিবে?'

'কেন নিবে না!' রিপি বলে। 'তোর মনে নাই, গতবার যে আমরা পল্টনের পাশে গাড়িতে বসে আম্মা আর আতিয়া কাকির সাথে ভাষণ শুনলাম? দেখবি, কালকেও নিয়ে যাবে। চল, আম্মাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করি।'

আম্মা ভেতরের ঘরে বসে বদরুন খালাম্মার সাথে আলাপ করছিলেন। রিপি গিয়ে সরাসরি আবদার রাখে, আগামীকাল রেসকোর্সে মুজিব কাকুর ভাষণ শোনাতে নিয়ে যেতে হবে তাদের।

আম্মা কিছু বলার আগেই বদরুন খালাম্মা বলে উঠলেন, 'অবশ্যই তোমরা যাবা। আমিই তোমাদের নিয়ে যাবো কালকে। তোমাদের আম্মাকে এতক্ষণ এই কথাই বলতেছিলাম। কালকে দুপুরের আগেই আমি, তোমাদের খালু আমরা গাড়ি নিয়ে তোমাদের বাসায় চলে আসবো। এরপরে আমরা সবাই একসাথে ভাষণ শুনতে যাবো, ঠিক আছে?'

রিপি রিমি আনন্দে একত্রে মুখ দিয়ে একটা উল্লাস ধ্বনি করে আম্মার দিকে তাকায়। জোহরা তাজউদ্দীন ওদের দিকে তাকিয়ে হেসে সম্মতির ভঙ্গিতে মাথা নাড়েন।

রিপি আর রিমি বেরিয়ে আসে ঘর থেকে। রিপি ছুটে যায় বারান্দার দিকে, সেখানে মিমি আর সোহেল খেলছে। ওদেরকেও তো জানাতে হবে এই খবর।

রিমি কিন্তু ভাবতেই থাকে। ৭ মার্চের কথায় কেন যেন গম্ভীর হয়ে যাচ্ছে সবাই। সেদিন কি খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু হবে? ঠিক কী হবে সেদিন রেসকোর্সে?

তর্জনিতে স্বাধীনতা

বন্ধ দরজা খুলে শেখ মুজিবুর রহমান বেরিয়ে এলেন। দেরি হয়ে গেছে। বেলা আড়াইটায় রেসকোর্সের সভা আরম্ভ হবে কথা ছিল। রুদ্ধদ্বার বৈঠকের নানা আলোচনায় এই ৩২ নম্বরেই আড়াইটা বেজে গেল।

বাইরে বেরিয়ে শেখ মুজিব গাড়িতে গিয়ে উঠলেন। হাত ইশারা করে তার সাথে পেছনে ডেকে নিলেন তাজউদ্দীনকে। তাজউদ্দীন উঠতে উঠতে চালকের পাশের আসনে গিয়ে বসলেন গাজী গোলাম মোস্তফা। সাদা রঙের মাজদা গাড়িটি যাত্রা করল রেসকোর্সের দিকে।

রাস্তায় চোখে পড়ছে অগণিত মানুষ। দল বেঁধে, ছোট ছোট মিছিলে ভাগ হয়ে তারা সবাই চলছে রেসকোর্সের দিকে। তারা মুজিবরের মুখের কথা শুনতে চায়, তারা জানতে চায় বঙ্গবন্ধুর চূড়ান্ত নির্দেশ। প্রতিটি মানুষের মুখ খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে শেখ মুজিবের বুকের ভেতরে কেমন করে ওঠে। এত এত মানুষ তার মুখের দিকে চেয়ে কী শুনতে চায় আজ?

অস্বস্তি কাটাতে শেখ মুজিব পাশে বসা তাজউদ্দীনের দিকে তাকান। দেখেন, তাজউদ্দীন দুই হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে তার তর্জনি স্পর্শ করছেন বারবার। পুরনো অভ্যাস এটা, গভীরভাবে কিছু চিন্তা করবার সময় তাজউদ্দীন প্রায়ই করেন। মুজিব বোঝেন, এই অদ্ভুত অনিশ্চিত অনুভূতি ভর করেছে তার পুরনো সাথিকেও। 'খসড়াটা ভালো হইছে তাজউদ্দীন।' জলদগম্ভীর স্বরে তাজউদ্দীনকে বলেন শেখ মুজিব।

তাজউদ্দীন ভাবনা থামিয়ে শেখ মুজিবের দিকে তাকান। মুজিব ভাই কী বলছেন বুঝতেই তার কিছুটা সময় চলে যায়। এরপর তিনি মাথা ঝাঁকান, কোনো কথা বলেন না। গত দুইদিন ধরে তিনি, আবদুস সামাদ আজাদ আর আবদুল মমিন ধানমণ্ডির ৩১ নম্বরে সিএসপি অফিসার ফজলুর রহমানের বাসায় একটা খসড়া প্রস্তুত করেছিলেন মুজিব ভাইয়ের আজকের ভাষণের জন্যে। মুজিব ভাই সেটার কথাই বলেছেন। তাজউদ্দীন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। কোনো খসড়াই আজকে সম্ভবত মুজিব ভাই অনুসরণ করতে পারবেন না।

তাজউদ্দীনের দিক হতে মুখ ফিরিয়ে চলমান গাড়ির জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন শেখ মুজিব। পরিস্থিতি পালটাচ্ছে খুব দ্রুত। গতকাল রাতে ইয়াহিয়া ফোনে সতর্ক করে দিয়েছে তাকে, পাঠিয়েছে একটি টেলিপ্রিন্টার বার্তাও। হঠকারী কোনো সিদ্ধান্ত যেন মুজিব আজ ঘোষণা না করেন, এটাই বক্তব্য ইয়াহিয়ার।

সকালে এসেছিল ছাত্রনেতারাও। রব, রাজ্জাক, মণি, সিরাজুল আলম, ওরা সবাই। তাদের দাবি স্বাধীনতার ঘোষণা, বাংলার মানুষ স্বাধীনতার ডাক আজ শুনতে চায় শেখ মুজিবের কণ্ঠে। কিন্তু এই মুহূর্তে স্বাধীনতার সরাসরি ঘোষণা কী করে দেয়া যায়? বিশ্বজনমত হারাবেন না তিনি এতে? আর এই মুহূর্তে সশস্ত্র সংগ্রামের পরিস্থিতি এলে সেটায় নামার জন্যে প্রস্তুত কি বাঙালিরা? শেখ মুজিব ভাবেন, শেখ মুজিব ভাবতে থাকেন। আজ এতগুলো মানুষকে রক্ষা করা যাবে তো ঠিকঠাক? সামরিক জান্তা যে ট্যাঙ্ক নিয়ে প্রস্তুত, সে খবর তো তারা জানে না, জানেন কেবল শেখ মুজিব।

প্রচণ্ড ভিড়ের কারণে রেসকোর্সে পৌঁছবার আগে গাড়ি বদলে খোলা ট্রাকের উপর উঠতে হলো মুজিবকে। সাথে থাকলেন তরুণ ছাত্রনেতারাও। ময়দানের উত্তর পাশে বসানো হয়েছে বিশাল মঞ্চ। নিশ্চয়ই চাঁন মিয়া মঞ্চ বানিয়েছেন প্রতিবারের মতো, ভাবলেন শেখ মুজিব। সেই মঞ্চে স্লোগান দিতে লাগলেন নূরে আলম সিদ্দিকী, আবদুর রাজ্জাক, আবদুল কুদ্দুস মাখনেরা। স্লোগান ফিরে আসতে লাগল লক্ষ লক্ষ স্বরে প্রতিধ্বনিত হয়ে। 'জয় বাংলা।' 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো।', 'হুলিয়ার ঘোষণা, মানি না, মানবো না।'

গাজী গোলাম মোস্তফার পেছনে মঞ্চে উঠে শেখ মুজিব সামনে চাইলেন। যতদূর চোখ যায় কেবল মানুষ আর মানুষ। এই জীবনে ভাষণ কম দেননি

মুজিব, কিন্তু এখন বুঝলেন 'জনসমুদ্র' শব্দটা এতদিন কেবল বইয়ের পাতায় পড়ে এসেছেন। শেখ মুজিব আজ প্রথম অনুধাবন করলেন মানুষের সমুদ্র কতটা বিশাল হতে পারে আর অবাক বিস্ময়ে শুনলেন সেই সমুদ্রের গর্জন। কত মানুষ এসেছে আজ ময়দানে, সাত লাখ? আট লাখ? দশ কিংবা বারো লাখ? বঙ্গবন্ধু মুজিবরের ভাবনার জাল ছিঁড়ে যায় যান্ত্রিক শব্দে। তিনি আকাশের দিকে চাইলেন। সেখানে চক্কর দিচ্ছে সামরিক হেলিকপ্টার। কী চায় ঐ কপ্টারে বসা সৈন্যেরা? সবদিক আজকে রক্ষা করা যাবে তো?...

মাইকের সামনে প্রথম গিয়ে দাঁড়ালেন তাজউদ্দীনই। ছোট্ট এক ভাষণের শেষে তিনি বললেন, এবার আপনাদের সামনে ও জাতির উদ্দেশে ঐতিহাসিক ভাষণ দেবেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

সেই মুহূর্তে পুরো জনসমুদ্র নীরব হয়ে গেল বড় অলৌকিকভাবে। শ্বাস ফেলতে পর্যন্ত ভুলে গেছে যেন লাখো মানুষ। অধীর, ব্যাকুল এখন সকলে। কী হবে এখন, কী বলবেন নেতা।

শেখ মুজিব একটা লম্বা শ্বাস চেপে রেখে মাইকের সামনে এসে দাঁড়ালেন। অজস্র ভাবনাকে গুছিয়ে নিতে তিনি চোখ বুজলেন এক পলকের জন্যে। কী আশ্চর্য! গতরাতে ৩২ নম্বরের বারান্দায় নীরব পদচারণায় তিনি গুছিয়ে রেখেছিলেন এক একটি লাইন, অথচ এই মুহূর্তে সেগুলোর কিছুই মনে পড়ল না তার। শুধু মনে পড়ল তার স্ত্রীর মুখ। ফজিলাতুন্নেসা তার মাথায় হাত বুলিয়ে বলেছিলেন, 'কারো পরামর্শ শুনার দরকার নাই। তোমার যা মনে আসে, তুমি তাই বলবা।'

চোখ খুললেন শেখ মুজিব। বর্ষা ঝরানো মেঘের স্বরে তিনি শুরু করলেন ভাষণ। *'ভাইয়েরা আমার, আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে এসে হাজির হয়েছি। আপনারা সবই জানেন এবং বোঝেন।...'*

সেই মুহূর্তে ঢাকা শহরের অপরপ্রান্তে রানওয়ে স্পর্শ করবার চেষ্টায় ব্যস্ত একটি বিমান। বিমানের যাত্রী রাও ফরমান আলী এবং পূর্ব পাকিস্তানের নয়ানিযুক্ত সামরিক প্রশাসক টিক্কা খান। রেসকোর্সের অগণিত মানুষের মাথা দেখে টিক্কা খানের কপালে ঘামের ফোঁটা দেখা দিল। ফরমানের চোখের আড়ালে সেই ঘাম মুছে টিক্কা গম্ভীর স্বরে কেবল বলল, 'সো দিস ইজ হোয়াট হ্যাপেনিং ইন ঢাকা। ব্লাডি হেল!'

টিক্কা খান যখন বিমানের জানালায় চোখ রেখে ঘাম মুছে যাচ্ছে প্রাণপণে, তখন রেডিও পাকিস্তানের ঢাকা কেন্দ্রের আঞ্চলিক পরিচালক আশফাকুজ্জামান খান ফোনের রিসিভার তুলছেন। শেখ মুজিবের ভাষণ রেডিওতে প্রচারের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে ফোন করেছেন মেজর সিদ্দিক সালিক। 'বানধ্ কারো ইয়ে সাব। নাথিং অব শেখ মুজিবুর রহমান উইল গো অন এয়ার আনটিল ফার্দার অরডার।'

আশফাকুজ্জামান খান আহত বোধ করলেন। কিন্তু পরক্ষণেই দৃঢ়স্বরে বললেন, 'সাড়ে সাত কোটি মানুষের কণ্ঠ যদি প্রচার করা না হয়, তাহলে অন্য কিছুও আর এই কেন্দ্র থেকে আর প্রচার করা হবে না।' আশফাকুজ্জামানের নেতৃত্বে ঢাকা কেন্দ্রের বাঙালিরা বেরিয়ে এলেন অফিস থেকে রেডিও হয়ে পড়ল অচল।

এলিফ্যান্ট রোডের বাড়ির বারো ব্যান্ডের রেডিওটি তাই চুপ হয়ে গেল 'আমার সোনার বাংলা' গানটি বাজিয়েই। রুমীর মা জাহানারা ইমাম আর চেষ্টা করেও শুনতে পেলেন না মুজিবের ভাষণ।

তবে শুনল আর সবাই। ময়দানের কোণের একটা দোতলা বাড়ির বারান্দা হতে ছোট্ট রিমি দুরবিন দিয়ে দেখছে মানুষের মুখ আর শুনছে শেখ মুজিবের ভাষণ। *'...আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়।'*

ভাষণ শুনছে এসএম হলের তারেকুল আলম, তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরো বহু বহু ছাত্র। শেখ মুজিব বলে চলেছেন, *'...২৫ তারিখ অ্যাসেম্বলি কল করেছেন, রক্তের দাগ শুকায় নাই।'*

পিয়ন আবদুল বাতেন ভাষণ শুনছে। সে রাজনীতি বোঝে না, সে বোঝে না অর্থনৈতিক বৈষম্য। সে কেবল জানে মঞ্চের মানুষটি কথা বলছেন তার মতো আরো সাড়ে সাত কোটির হয়ে। *'... সাত কোটি মানুষকে দাবায়া রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি, তখন কেউ আমাদের দাবায়ে রাখতে পারবে না।'*

ভাষণ শুনছেন সাংবাদিক সারির আবদুল গাফফার চৌধুরী, কামাল লোহানী, আনোয়ার জাহিদ। আন্ডারগ্রাউন্ড থেকে ভাষণ শুনতে এসেছেন রাশেদ খান মেননরাও। চব্বিশ ঘণ্টার পায়ে হাঁটা পথ হেঁটে এসেছে ঘোড়াশালের মানুষ, তাদের গামছায় বাঁধা চিড়ে আর গুড়, তারা ভাষণ শুনছে। মহিলা সমিতির মেয়েরা আর নেত্রীরা শুনছেন ভাষণ। সাদা লাঠিতে ঠুকঠুক করে পথে আঘাত করে যারা চলে, সেই অন্ধ ছেলেরাও এসেছে দল বেঁধে মিছিল করে।

মঞ্চে বসে তাজউদ্দীন অবাক হয়ে শুনছেন মুজিব ভাইয়ের ভাষণ আর ভাবছেন, কী অদ্ভুত, কী অবিশ্বাস্য এই কণ্ঠটি! *'মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো। এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ।...'*

তাজউদ্দীনের হঠাৎ মনে হয় শেখ মুজিব যেন বইয়ের পাতা থেকে উঠে আসা টলোমলো কোনো জাহাজের ক্যাপ্টেন, যিনি ঝড়ের আঘাত, নষ্ট বেতার আর বুলেটবিদ্ধ যাত্রীদের নিয়েও সমস্ত দিক রক্ষা করে নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছেন জাহাজের মাস্তুলের পাশে দাঁড়িয়ে। ক্যাপ্টেন বলছেন তাদের কালে কালে সঞ্চিত ক্ষোভের কথা, ক্যাপ্টেন বলছেন তাদের অধিকারের শব্দ। সহসা আঙুল তুলে রূপকথার

সেই ক্যাপ্টেন বললেন, *'এবারের সংগ্রাম, আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম।'*

সেই মুহূর্তেই ঝড় উঠল সমুদ্রে, আকাশ বাতাস তুচ্ছ হয়ে গেল, উত্তেজনায় উন্মাদ হয়ে উঠল সুস্থিরতম মানুষটিও। তাজউদ্দীন গর্জনরত সামনের সমুদ্রের দিকে চেয়ে অনুধাবন করলেন, এই মাত্রই শেখ মুজিবের তর্জনিতে পদ্মার পলিদ্বীপের অভিধানে যোগ হয়ে গেছে একটি অবিশ্বাস্য শব্দ।

স্বাধীনতা।

জনসমক্ষে মনোভাব প্রকাশে তীব্র আপত্তি তাজউদ্দীনের, তবুও তার চশমার কাচ ঘোলাটে হয়ে যায়। ঘোলা চোখে সমুদ্রের গর্জন শোনা যায় খালি, সমুদ্র দেখা যায় না।

অমলিন এক গোলাপ

শীতলক্ষ্যা নদী তীরের রাত। নিভু নিভু হারিকেনের আলোতে তিনজন মানুষকে ঘিরে বসে থাকে আশপাশের গ্রাম্য ছেলেরা। ছেলেদের নিস্তরঙ্গ জীবনে অচেনা বাতাসের মতো হয়ে এসেছেন এই তিনজন। রাজেন্দ্র নারায়ণ চ্যাটার্জি, বীরেশ্বর ব্যানার্জি আর মণীন্দ্র শ্রীমণি।

তারা তিনজন রাজবন্দি। ভারত জুড়ে ছড়িয়ে থাকা ব্রিটিশ সরকারের কতশত ডিটেইনি ক্যাম্পের একটি কাপাসিয়া পুলিশ স্টেশন। কলকাতা হতে এখানেই পাঠানো হয়েছে এই রাজবন্দীদের। দিনে একবার পুলিশ স্টেশনে হাজিরা দেন এই বন্দীরা, বাকিটা সময় ঘুরে বেড়ান এদিক সেদিক। গ্রামের মানুষের সাথে কথা বলেন, গ্রামের ছোট ছেলেদের নানা বিষয়ে বই পড়তে দেন, সেইসব বই নিয়ে আলোচনা করেন।

কাপাসিয়া থানার দরদরিয়া গ্রামের মৌলবি মোহাম্মদ ইয়াসিন খান ও মেহেরুন্নেসা খানমের ছেলে তাজউদ্দীন আহমদের বয়েস তখন বারো। সে তখন কাপাসিয়া এমই স্কুলের ক্লাস ফোর পড়ুয়া।

তিন রাজবন্দির কথা অবাক হয়ে শোনে তাজউদ্দীন। শিক্ষা নেয়, এই দেশটা তাদের মতো রোদে পোড়া মানুষের আর সেটাকে কেবল অস্ত্রের জোরে শাসন করছে লাল মুখের ওই ইংরেজরা! কিন্তু এরকমটা হবে কেন? গজারির বনের আলোছায়ার মাঝে এমন প্রশ্ন নিয়ত উঁকি মারতে থাকে তাজউদ্দীনের মনে।

রাজেন্দ্র নারায়ণ ছোট্ট তাজউদ্দীনের করোটিতে তখন থেকেই ঢুকিয়ে দিলেন দেশ নিয়ে চিন্তা করার নেশাটা। মনীন্দ্র শ্রীমণি ছেলেদের হাতে বই তুলে দেন। ইতিহাস, ভূগোল, রাজনীতি, মনীষীদের জীবনী। কী অদ্ভুত এক একটা বই। কত বিচিত্র লেখা রয়েছে সেগুলোয়। দেশে বিদেশে মুক্তিকামী মানুষ কত কী করেছে,

কত কী করছে, ভাবতে ভাবতে মগজের ধূসর কোষগুলোতে আলোড়ন ওঠে সেই গ্রাম্য কিশোরদের। সবচেয়ে বেশি আলোড়িত হয়ে ওঠে তাজউদ্দীন।

বীরেশ্বর ব্যানার্জি তাদের পরীক্ষা নেন। একেক রাতে হারিকেনের আলোয় প্রশ্ন ধরা হয় পড়তে দেয়া বইগুলো থেকে। তাজউদ্দীন দেন গোছালো জবাব, প্রশ্ন করেন বিষয়ের আরো অনেকটা গভীর থেকে। রাজবন্দীরা একে অপরের মুখের দিকে তাকান। তারা এই ছেলেটিকে ভালো করে বোঝান ভারতমাতার উপর ব্রিটিশ শোষকদের নিপীড়নের ইতিহাস, তাকে পড়তে দেন তাদের সংগ্রহের সেরা সেরা বইগুলো। তাজউদ্দীন পড়াশোনায় অক্লান্ত। কয়েকমাসেই সে পড়ে ফেলে অনেকগুলো বই।

রাজবন্দীদের বুঝতে বাকি থাকে না, এ ছেলে সাধারণ অন্যান্য দশটা ছেলের মতো নয়। তারা যান তাজউদ্দীনের স্কুলের হেডমাস্টারের কাছে। বলেন, এই বাচ্চাকে আরো ভালো কোনো স্কুলে পাঠান। বনের আলোছায়া ঢাকা ছোট্ট গণ্ডিতে আটকে থাকার জন্যে এই ছেলের জন্ম হয়নি।

একদিন ঘুঘু ডাকা দুপুরে হঠাৎ করেই তাজউদ্দীনের বাড়ির বারান্দায় দেখা যায় তিনজনের মুখ। 'তাজউদ্দীন কই? তাকে একটু ডেকে দেন।' মণীন্দ্র বলেন।

'সে নাই। টানচৌড়াপাড়ায় ফুটবল খেলতে গেছে।' ভেতর বাড়ির কেউ বলে।

সদা হাস্যজ্জ্বল বীরেশ্বর ব্যানার্জির চোখেও বিষণ্নতা নেমে আসে। ব্রিটিশ সরকার তাদের স্থানান্তরিত করেছেন অন্য কোনো থানায়। চলে যেতে হচ্ছে তাদের, যাবার আগে তারা দেখা করতে এসেছিলেন তাজউদ্দীনের সাথে। এই শান্ত, বয়েসের সাথে ভীষণ রকম বেমানান চিন্তাশীল ছেলেটিকে তারা ভালোবেসে ফেলেছিলেন।

রাজেন্দ্র নারায়ণ থানার বাগানের কয়েকটি রক্তগোলাপ নিয়ে এসেছিলেন সাথে করে। তিনি সেগুলো রেখে যান তাজউদ্দীনের জন্যে, উপহার হিসেবে।

ফুটবল খেলে এসে এই খবর শুনে তাজউদ্দীন ছুটে গেলেন থানায়। কাউকে পাননি তিনি সেখানে। সেই রাজবন্দীদের সাথে আর কখনো দেখা হয়নি তাজউদ্দীনের। কিন্তু দেশচিন্তা আর দেশপ্রেমের ভিত্তিটা তখনই তিনি নিজের মনে গেঁথে নিয়েছিলেন।

কিন্তু রাজনীতিমনস্কতার সুযোগ নিয়ে কখনো তো ব্যক্তিগত সুবিধা আদায়ের চেষ্টা করেননি তিনি। বরং মানুষের সেবা করেছেন সবসময়ই, নিঃস্বার্থভাবে। তবে আজ তাজউদ্দীন অসহায় বোধ না করে পারেন না, যখন প্রতিবেশী সেলিম সাহেব তাকে জড়িয়ে ধরে বিদায় নিলেন কান্নাভেজা চোখে।

অসহযোগ আন্দোলনের শুরু থেকেই দেশের সব ধরনের মানুষ সহযোগিতা করে চলেছে অক্লান্তভাবে। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী রাখছে শান্তি রক্ষার ভূমিকা। বলতে গেলে সাধারণ অবস্থার চেয়ে অনেকগুণে নিরাপদ এখন

সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন। প্রতিদিন মিটিং-মিছিলের মাঝেও বাড়তি সতর্কতার প্রয়োজন হচ্ছে না, অপরাধমূলক কাজকর্ম কমে এসেছে অনেকখানি।

তবুও সাম্প্রদায়িকতা ছোবল দেয় মাঝে মাঝে, স্বর্গের সাপের মতোই। তার পাশের বাড়িতেই দীর্ঘদিন ধরে পরিবার নিয়ে আছেন সেলিম সাহেব। তার ছোট দুই ছেলেমেয়ে ফাতেমা আর হোসেনের সাথে রিপি-রিমিদের বন্ধুত্বও গাঢ়। নানা প্রয়োজনে সেলিম সাহেবকে পাশে পেয়েছিলেন তাজউদ্দীন। অথচ আজ সেলিম সাহেবকে অনেক কিছু ফেলেই বিদায় নিতে হচ্ছে ঢাকা থেকে। কারণ, তিনি অবাঙালি। অহিংস এই অসহযোগ সেলিম সাহেবের পরিবার কাটাচ্ছে আতঙ্কে। রাস্তায় বেরোলে তার বড় মেয়ে খাদিজাকে নিয়ে কটূক্তি করছে ছেলের দল। সেলিম সাহেব তাই ঠিক করেছেন ঢাকা ছাড়বেন।

সেলিম সাহেব কান্না চোখে বিদায় নেন, তাজউদ্দীন বসে থাকেন আহত মনে। দেশভাগের কথা মনে পড়ে যায় তাজউদ্দীনের। কত শত মানুষকে নিজের আবাস ছেড়ে পাড়ি জমাতে হয়েছিল অন্যত্র, জিন্না সাহেবের পাকিস্তান উপমহাদেশের মানুষের জন্যে বয়ে এনেছিল অপরিসীম দুর্ভোগ।

তাজউদ্দীন নিজে পবিত্র কুরআনের হাফেজ, তা বলে কখনো ধর্মকে দিয়ে মানুষের প্রতি আচরণে পার্থক্য করেননি তিনি। হ্যাঁ, তিনি খবর পেয়েছেন সৈয়দপুর আর ঢাকার মীরপুরে সেনাবাহিনীর মদদ পেয়ে বিহারিরা স্থানীয় বাঙালিদের ওপর অত্যাচার করছে। কিন্তু তাই বলে নিরাপরাধ মানুষগুলোর উপরে কেন আসবে দাঙ্গার ছায়া? সাম্প্রদায়িক একটা দাঙ্গা শুরু হয়ে গেলে এই অহিংস আন্দোলনের প্রকৃত লক্ষ্য কি অর্জন হবে? এরচেয়ে বড় কথা, সঠিক চেতনাটা গড়ে তুলতে না পারলে, পশ্চিম পাকিস্তানি ক্ষমতালোভী জেনারেলদের সাথে তাহলে আর পার্থক্য রইল কোথায় আমাদের?

তাজউদ্দীন আবদুর রাজ্জাককে ফোন করলেন, সে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর প্রধান এখন। দলীয় নাম ভাঙিয়ে বা স্বেচ্ছাসেবকের পোশাকি আবরণে কেউ যেন জনসাধারণের কোনোরূপ ক্ষতি না করতে পারে, বিশেষভাবে সেদিকটায় নজর রাখতে অনুরোধ করলেন তাজউদ্দীন।

ফাতেমাদের চলে যাওয়ার খবর শুনে ব্যথিত রিপি দাঁড়িয়েছিল পর্দার আড়ালে। মন দিয়ে শুনছিল ফোনালাপ। রিমি দেখে আব্বুর মুখ রাগে লাল, আব্বু রাগারাগি করছেন। বুঝতে কষ্ট হয় না, এই মানুষটি মন থেকেই বলছেন তার আশঙ্কার কথা।

রিমি আব্বুকে খুব বেশি কাছে পায়নি, তবে তার মনে হয়, আব্বু মানুষটা অন্যরকম। ট্রোজান হর্সের মতো ব্যস্ত রাজনীতিকের বর্মের আড়ালে আব্বু ঢেকে রেখেছেন একটি অদ্ভুত হৃদয়। সেটি রাজেন্দ্র নারায়ণের উপহার দেয়া ক্ষণস্থায়ী রক্তগোলাপের মতো সুবাস হারিয়ে ফেলেনি, বরং আজ এত বছর পরেও সৌরভ ছড়াচ্ছে তীব্র ভাবে।

বাতাসে বারুদের গন্ধ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ভবনের সামনের নিচু দেয়ালের পাশে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আবদুল বাতেন, পাশে তার সাইকেল। বাতেনের দৃষ্টি সামনের ছোট্ট দলটার উপরে। একটা নয়, অনেকগুলো ছোট ছোট দল মাঠ জুড়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা এই দলগুলোতে ভাগ হয়ে মাঠজুড়ে মার্চপাস্ট করছে। লেফট-রাইট, লেফট-রাইট, লেফট-রাইট। আওয়াজটা এই ভর দুপুরের গরমে কেমন যেন নেশা ধরায় বাতেনের কানে।

ইয়াহিয়া খান ঢাকায় এসেছে কয়েকদিন আগেই। শেখ মুজিব কালো পতাকা উড়িয়ে প্রেসিডেন্ট ভবনে যাচ্ছেন নিয়মিত, আলোচনা চলছে দফায় দফায়। লাভের লাভ কী হচ্ছে কেউ জানে না। সবাই বরং বলছে এই আলোচনা সময় নষ্ট করার অজুহাত খালি, পশ্চিমের ওরা নাকি সময় নিচ্ছে, ওদের মতলব আলাদা। সেটা কী, তা কে জানে!

এই মাঠে এখন প্রতিদিন মার্চপাস্ট হয়। পল্টন ময়দানেও হয়। পাড়ায় পাড়ায়ও কসরত করে জোয়ান ছেলেরা। আবদুল বাতেন সাইকেলে ঘুরে ঘুরে দেখে এইসব। অফিসের বালাই নাই এখন। সারাদেশ বলতে গেলে থেমে আছে। শেখ সাহেবের ভাষণের পরে সব পালটে গেছে। শেখ তো বলেই দিয়েছেন, যার যা কিছু আছে, তাই নিয়েই সংগ্রাম করতে হবে। এবারের সংগ্রাম, আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম।

আবদুল বাতেন মন দিয়ে সামনের মাঠের ছেলেদের কসরত দেখছে। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ঘুরে ঘুরে ফিরে আসে সে। ছাত্রদের কাছে থাকতে খুব ভালো লাগে তার। কত নতুন নতুন আলোচনা হয় তাদের মাঝে, কত অদ্ভুত রকমের খবর দেয় ওরা। কোনো কিছু না বুঝলে জিজ্ঞেসা করতেও আজকাল আর ভয় লাগে না বাতেনের, 'ইস্টুডেন' ভাইরা সবকিছুই ভালোমতন বুঝিয়ে দেয়। মাঠে এখন ওরা কাঠের ডামি রাইফেল দিয়ে প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। যুদ্ধ লাগলে কাজে লাগবে এই শিক্ষাটা। আসল রাইফেল দিচ্ছে না কেন, খোদাই জানে।

খালি ছেলেরাই যে মাঠে এসে প্রস্তুত হচ্ছে, তা নয় কিন্তু। মাঠের মাঝে অল্প কয়েকজন মেয়েও আছে, ছাত্রী। তারাও আসে মার্চপাস্টে, মিছিলে। আর সব ছাত্রছাত্রীর জন্যে ব্যস্ত হয়ে এদিক থেকে থেকে ওদিকে ছুটে সব দেখছে একজন কালোমতো মানুষ। ছাত্রই বোধহয়, তাকে সকলে ডাকছে আবু ভাই নামে। আবু ভাইয়ের দম ফেলবার সময় নেই। প্রতিটা দলের নেতাকে ছুটে ছুটে সে বুঝিয়ে দিচ্ছে সবকিছু।

বিকালের দিকে হঠাৎ মাঠের পরিস্থিতি বদলে গেল। এলোমেলো চুলের শুকনো করে একটা ছেলে একতাড়া কাগজ নিয়ে ছুটতে ছুটতে আসে কোথা

থেকে। উত্তেজিতভাবে আবু ভাইয়ের কাছে গিয়ে কী যেন বলে সে হাত নেড়ে নেড়ে। আবু ভাইকে প্রথমে একটু অবাক দেখায়, এরপর তিনি হাতের ইশারায় সবগুলো দলকে কাছে আসার নির্দেশ দেন। এদিক ওদিকের ইতস্তত করতে থাকা ছাত্ররা এগিয়ে যায় সেদিকে। খানিক পরেই শ'দুয়েক ছাত্রকে দেখা যায় বৃত্তাবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে, মাঝে সেই এলোমেলো চুলের ছাত্রটা আর আবু ভাই।

আবদুল বাতেন এদিক সেদিক তাকিয়ে শেষ পর্যন্ত কৌতূহল দমাতে পারে না, এগিয়ে আসে ছাত্রদের জটলায়। কী খবর এনেছে ছেলেটা কে জানে। কান পেতে সকলের কথা শুনতে থাকে বাতেন। শুকনো ছেলেটা এখনো কথা বলছে সকলকে উদ্দেশ্য করে।

'... কমান্ডারের নাম জাহানজেব আরবাব। সেই লোক জয়দেবপুরে পৌঁছার পরেই কিন্তু এলাকার লোক খবর পাইলো যে আর্মি আসছে ইপিআরের অস্ত্র জমা নিতে। সাথে সাথে নাকি তুলকালাম। এলাকার লোকে ব্যারিকেড বসাইলো রাস্তায়, তারা আর্মিরে যাইতে দিবে না। কিন্তু হারামজাদা আরবাব নির্দেশ দিল লোকজন কথা না শুনলে গুলি চালাইতে। এরপরে নাকি গুলি চালানো হইছে লোকেদের উপর।'

'মানুষ মরছে নাকি?' ছেলেটার ভাষণের মাঝপথে প্রশ্ন ছোড়ে এক শ্রোতা।

'জানি না আমি। এইটা একঘণ্টা আগের খবর। এরপরে কিছু হইছে নাকি শুনি নাই। আমি ডাকসু অফিসে ছিলাম, জয়দেবপুর থেকে ফোনে নাকি খবর আসছে। আমি শুনেই এইখানে তোমাদের জানাইতে আসলাম। শুনো তোমরা একবার যখন গুলি চালানো শুরু হইছে, এরপরে সশস্ত্র সংগ্রাম তো একরকম নিশ্চিত। আমাদের কিন্তু এইবার একদম রেডি থাকতে হবে। আর বিশ্বাস নাই হারামজাদাদের!'

উত্তেজিত ছাত্রদের মাঝে গুঞ্জন ওঠে। 'শেখ মুজিব... শেখ সাহেব কিছু বলেন নাই?' আরেকজন প্রশ্ন করে।

' এখনো কিছু শুনি নাই। সাংবাদিকেরা শুনলাম দল বেঁধে যাইতেছে ৩২ নম্বরের দিকে। বিবৃতি দিবেন বোধহয় শেখ সাহেব।'

ছাত্ররা এরপরে আলাপ শুরু করে নিজেদের মাঝে। আবদুল বাতেন শুনতে থাকে মনোযোগ দিয়ে। বোঝা যায়, ছাত্ররা নিজেরাও ভাবছে সশস্ত্র সংগ্রামের কথা। সাহসের অভাব না থাকলেও অস্ত্রের অভাব বোধ করছে তারা। এই নিয়ে আবু ভাইয়ের সাথে আলাপও শুরু হয় তাদের।

'আবু ভাই, আমাদের আর কতদিন ডামি রাইফেল দিয়ে প্র্যাকটিস করাবেন? আসল রাইফেল দিবেন কবে?'

'অস্ত্র ছাড়া ট্রেনিং কইরা লাভ কী?'

‘এই ট্রেনিং নিয়া আসলেই কি লাভ হবে? অস্ত্র দিবেন কবে আবু ভাই?’ এইরকম আরো অজস্র প্রশ্ন ছুটে যায় আবু ভাইকে উদ্দেশ করে।

আবু ভাইকে ম্রিয়মাণ দেখায় একটু। সামান্য চিন্তা করে ধীরে ধীরে স্পষ্ট করে সে সবার উদ্দেশে বলে, ‘ছোট ভাইরা, বিষয়টা এত সহজ না মনে হয়। জানো তো, আমারে এইখানে পাঠাইছে ইউওটিসি’র ক্যাডেটদের পক্ষ থিকে। সশস্ত্র যুদ্ধের জন্যে আমাদের রেডি থাকতে বলছে ঠিক আছে, কিন্তু এই মুহূর্তে অস্ত্র খুব সম্ভবত দিতে পারবে না তোমাগো। আমাদের ইপিআর, পুলিশ, বাঙালি আর্মি, এদের কাছেও কিন্তু অস্ত্রশস্ত্র বেশি নাই। ...তবে তোমরা এইগুলা নিয়া ভাইবো না। নেতারা নিশ্চয়ই ভাবতেছেন। আসো, আমরা আমাগো কাম করি। তোমরা ট্রেনিং শেষ করো। এরপর তোমরাই পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে সবাইরে ট্রেনিং দিবা। আমরা আমাদের কাম ঠিক মতো করতে পারলেই চলবো এখন।’

আবু ভাই আর কথা না বাড়িয়ে আবার মাঠের মাঝখানে চলে যান। হাত উঠিয়ে আবার সবাইকে ইশারা করেন আগের অবস্থায় চলে যেতে। ছাত্ররা আবার ভাগ হয়ে যেতে থাকে দলে দলে। তাদের অনেকের চোখেই হতাশা। কেউ কেউ অক্ষম আক্রোশে বিড়বিড় করে। তবে পরিস্থিতি অনুধাবন করে ওদের আর উপায় নেই, এটাও বোঝে ওরা।

আবদুল বাতেনের মন বিষণ্ন হয়ে ওঠে। কতগুলো অমানুষের হাতে কীভাবে জিম্মি হয়ে আছে তার দেশের মানুষেরা। যখন যেখানে খুশি, যেভাবে খুশি পাখির মতো গুলি করে মারছে ওরা বাঙালিদের। আরো মারবে নিশ্চয়ই। যুদ্ধও হবে, বলছে সবাই। কিন্তু এমন নিরস্ত্র অবস্থায় যুদ্ধে গিয়ে কী করবে এইসব ছেলেরা? কতজন বাঁচবে এদের মাঝে অসম যুদ্ধের পর?

হারকিউলিস সাইকেলে উঠে চিন্তিত আবদুল বাতেন প্যাডেল মারে। একটু বাতাসের দরকার তার। প্যাডেল মারার ফাঁকে পেছন থেকে ভেসে আসে আবু ভাইয়ের গলা, ‘লেফট রাইট লেফট। আবার, লেফট রাইট লেফট। ...’

আ নিউ ফ্ল্যাগ ইজ বর্ন

পাকিস্তান দিবসে তারেক আর মোশারফ হল থেকে বের হলো দুপুরের পরে। সকালেই বের হবার ইচ্ছা ছিল আজকে তাদের, ঘুম থেকে উঠতে দেরি করে ফেলেছে দুজনেই। রাত জেগে আলাপ করার ফল আর কি। রাস্তায় বেরিয়ে কোনদিকে যাওয়া যায়, এই নিয়ে আলোচনা করে অবশেষে শহিদ মিনারের দিকেই এগোল দুইজনে। বেশিদূর যেতে হয় না, জগন্নাথ হলের সামনে এসে আলাউদ্দীনকেও পেয়ে যায় ওরা। সেও দেখা যাচ্ছে মৃণালকে মাত্র বের করে নিয়ে এসেছে তার রুম থেকে। তারেকরা দ্রুত এগিয়ে যায় ওদের দুইজনের দিকে।

'এই যে পলিটিশিয়ান, খবর কী? কী হইলো আজকে?' মোশারফ বলে আলাউদ্দীনকে। ওদের মাঝে আলাউদ্দীন নিয়মিত মিটিং মিছিলে যায় অনেকদিন থেকেই, ডাকসুর বড় বড় নেতাদের সাথেও জানাশোনা আছে তার। বন্ধুরা তাই পলিটিশিয়ান বলে ডাকে তাকে মাঝে মধ্যে।

'খবর দারুণ।' আলাউদ্দীনের হাসিটা অনেক বড় দেখায়। 'আজকে তো তুমুল কাণ্ড হইতেছে সারাদিন ধইরা, ইয়াহিয়ার পাকিস্তান শ্যাষ।'

'কী হইছে সকালে? পল্টন ময়দানে না সকালে জয় বাংলা বাহিনীর কুচকাওয়াজের কথা ছিল?' তারেক প্রশ্ন করে।

'আরে সেইটাই তো ঘটনা। জয় বাংলা বাহিনী কুচকাওয়াজ তো করছেই, আমার সোনার বাংলা গানের সাথে সাথে একদম নতুন জাতীয় পতাকাটাই উড়ায়ে দিছে। কোনো পাকিস্তানের পতাকা উড়ে নাই আজকে, নো হাংকি পাংকি। পতাকা উড়ানোর পরে সারা শহর ঘুরছে ওরা মার্চপাস্ট করতে করতে। সবশেষে গেছে বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে।'

'সে কী, শেখ সাহেব কিছু বলেন নাই? এইরকম অবাধ্যতা পাকিস্তানি মাউরাগুলা এমনি এমনি মাইনা নিবে?' মৃণাল বলে।

'মর ব্যাটা। এখন আর ওই সব কেয়ারের টাইম আছে নাকি?... আজকে তো বুঝা গেল শেখ সাহেবেরও এক দাবি, একদফা। উনি তো আজকে নিজেই বাড়িতে স্বাধীন বাংলার নতুন পতাকা উড়াইছেন। জয় বাংলা বাহিনী যখন মিছিল কইরা তার বাসার সামনে গেল, উনি তো হাসিমুখে অগো স্যালুট এক্সেপ্ট করলেন।'

শহিদ মিনারের কাছে পৌঁছে যায় ওরা কথা বলতে বলতে। মিনারের সিঁড়ির ধাপগুলোতে চোখ পড়তেই অবাক হয়ে যায় ওরা। সারি সারি পোস্টার সাঁটানো ধাপগুলোতে। সবগুলো পোস্টারে একটা মুখের ছবি, সেটা দেখতে ইয়াহিয়া খানের মতো। পোস্টারে লেখা রয়েছে, এই দানবদের খতম করো। ওদের মতোই আরো অনেকে অবাক হয়ে দেখতে থাকে পোস্টারগুলো। বিস্ময়ের চেয়ে খুশির ভাবটাই বেশি ধরা পড়ে দর্শকদের মাঝে। লোকমুখে ওরা জানতে পারে পোস্টারগুলো নাকি কামরুল হাসানের আঁকা।

মোশারফ খুশিটা আর চেপে রাখতে পারে না। বলে, 'কাণ্ডটা দেখসোস! করছে কী শালারা!'

শহরের রাস্তায় রাস্তায় হেঁটে বেড়াতে থাকে ওরা। ওদের মতোই ছোটবড় নানা আকারের দলে ভাগ হয়ে ঘুরছে আরো বহু লোক। চারপাশে তাকিয়ে ওদের খুব ভালো লাগছে আসলেই। শহরে প্রচুর বাড়ির ছাদে দেখা যায় কালো পতাকার পাশে উড়ছে সবুজ-লাল-হলুদের একটা নতুন পতাকা। ছবি তুলছে অনেকেই। নতুন কোনো বাড়িতে কেউ পতাকা তুলতে গেলেই তার চারপাশে ভিড় জমে যাচ্ছে, হাততালি দিয়ে লোকজন উল্লাস করছে।

নতুন পতাকা উড়ছে এমনকি ব্রিটিশ হাইকমিশন আর সোভিয়েত কনস্যুলেটেও। অফিস পাড়ার বিল্ডিংগুলোতেও দেখা যাচ্ছে স্বাধীন বাংলার পতাকা, হোটেল ইন্টার কন্টিনেন্টালেও। পাকিস্তানের পতাকা উড়ছে তখন মাত্র দুই জায়গায়। সামরিক আইন সদর দফতরে আর গভর্নমেন্ট হাউজে।

গভর্নমেন্ট হাউজের পশ্চিম পাশের গেটে অবশ্য একটা মজার ব্যাপার ঘটেছে। সেখানে ছোট্ট করে একটা লাল-সবুজের পতাকা লাগানো, কোনো দুষ্টু ছেলের দলের কাজই হবে। প্রধান ভবনের শীর্ষে তখনো উড়ছে তথাকথিত সংযুক্ত পাকিস্তানের প্রতীক, পাকিস্তানি পতাকা। সেটা বড় নিঃসঙ্গ।

তারেকরা বুঝতে পারে, আজকের ঘটনার তাৎপর্য খুব ছোট নয়। শুধু ধর্মের ভিত্তিতে একটা রাষ্ট্র যে টিকে থাকতে পারে না, একত্রিত পাকিস্তানের পতাকাকে প্রত্যাখ্যান করে আজকে তা বাঙালিরা বুঝিয়ে দিয়েছে।

সারাটা দিন রাস্তায় ঘোরাফেরা করে হলের দিকে ফিরতে থাকে ওরা। তবে হলে যাওয়া আর হয় না, মোশারফ ওদেরকে নিয়ে যায় আজিমপুর এস্টেটের দিকে। তার দেশের বাড়ির এক বড় ভাই থাকেন আজিমপুরে, সরকারি চাকুরে নাকি। অনেকদিন খবর নেয়া হয় না ওনার। সে একটু দেখে আসতে চায় তাকে। অগত্যা চারজনে মিলে তাই পলাশীর সামনে দিয়ে চলে যায় আজিমপুরে।

মোশারফের ভাই সারোয়ার হোসেন থাকেন ৭১/ই'তে। তিনতলায় উঠে ওরা বেল বাজায়, খানিক অপেক্ষার পরে সারোয়ার নিজেই দরজা খোলেন। মোশারফকে দেখে খুশি হন তিনি, আরো খুশি হন সে বন্ধুদের নিয়ে এসেছে বলে। ঢাকা শহরের পরিস্থিতি দেখে নাকি উনি বউ আর ছোট দুই ছেলেকে দেশের বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এখন অফিসেও হরতাল বলে সারাটা দিন বাসায়ই শুয়ে বসে কাটান। আলাপ করার মতো মানুষ পেয়েছেন বলেই খুশি মনে হয় তাকে।

আলাপ জমতে অবশ্য সময় লাগে না। তারেকেরা তাকে বলে আজ সারাদিনে রাস্তায় দেখা পতাকার কথা, মানুষের প্রতিক্রিয়ার কথা। আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে সারোয়ার ভাই রান্নাও চড়িয়ে দেন এক সময়, ওদের অনুরোধ করে বলেন, 'খেয়ে যাও তোমরা। রাতও হয়ে গেছে, এত রাতে আর হলে গিয়েই বা কী হবে, আজ রাতটা আমার বাসায়ই থাকলে না হয়।'

ওরা আপত্তির কারণ খুঁজে পায় না কোনো। একথা-সেকথা নিয়ে আলাপের পাশাপাশি টিভি দেখাও চলে। টেলিভিশনেও আজকে বিরাট লম্বা অনুষ্ঠানমালা। সুকান্তের কবিতার ওপরে দুটো অনুষ্ঠান হলো। একটার নাম ছাড়পত্র, নওয়াজেশ আহমেদের ফটোগ্রাফির সাথে কবিতার আবৃত্তি। অন্যটার নাম দেশলাই। সুকান্তের দেশলাই কবিতাটা আবৃত্তির সাথে সাথে দেখা গেল প্রচুর দেশলাইয়ের কাঠি জ্বলে উঠছে, একটার পর একটা। একসময় পুরো টিভি পর্দা জুড়ে জ্বলতে

থাকে অগণিত মশাল। এরপরে শুরু হয় নাটক। আবদুল্লাহ আল মামুনের একটা নাটক দেখায় আজ, আবার আসিব ফিরে। ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের একজন শহিদের স্মৃতি ফিরে আসতে থাকে একাত্তরের চলমান আন্দোলনে। নাটকটা বড় চমৎকার। সেটা দেখবে বলে সকলেই খাওয়ার টেবিলে না বসে হাতেই রাতের খাবার নিয়ে বসে পড়ে টিভির সামনে।

নাটক শেষ হয় রাত বারোটারও পরে এবং এরপরে পর্দায় পাকিস্তানি পতাকার সাথে বেজে ওঠে পাক সার জমিন শাদ বাদের সুর। একে অপরের মুখের দিকে তাকায় তারেকরা। স্পষ্টই বোঝা যায়, ২৩ মার্চের পাকিস্তান দিবসের সারাটা দিন পর্দায় পাকিস্তানি পতাকা আসতে দিল না বাঙালিরা।

সকলে মিলে যখন শোবার আয়োজন করছে, তখন ফোন আসে হঠাৎ। সারোয়ার হোসেন ফোন ধরে কী যেন আলাপ করেন খানিকক্ষণ। ওরা শুনতে পায়, মাঝেমাঝেই ফোনে গলার স্বর উঁচু হয়ে যাচ্ছে তার। ওরা একে অপরের মুখের দিকে তাকায়। সারোয়ার একসময় ফিরে আসেন, মুখে উদ্বেগের ছাপ।

'কোনো সমস্যা হইছে সারোয়ার ভাই?' জানতে চায় মোশারফ।

'আমার এক বন্ধুর ফোন, চট্টগ্রাম থেকে। কিছুদিন আগে নাকি এমভি সোয়াত বলে একটা জাহাজ এসেছে বন্দরে, পশ্চিম পাকিস্তান থেকে। জাহাজভর্তি অস্ত্র আর গোলাবারুদ। বন্দরের শ্রমিকেরা নাকি আপত্তি জানিয়েছে মালামাল খালাস করতে। বন্দর এলাকার পরিস্থিতি এখন বেশ গরম। কী যে হবে, কিছুই বুঝতে পারছি না।' সারোয়ার ভাইয়ের গলা ক্লান্ত শোনায়। 'যুদ্ধটা মনে হয় লেগেই যাবে।'

বিদায় সংকেত

শেখ মুজিবের চোখ দুটো রক্তলাল। গত দুইদিন ধরে খাওয়া ঘুম ঠিকমতো হয়নি তাঁর, ক্লান্তি ভাসছে তার শরীর জুড়ে। 'তোমরা আবার আইছো?'

কামাল হোসেন, নজরুল ইসলাম, মনসুর আলী, তাজউদ্দীন আর কামারুজ্জামান একে অপরের দিকে চাইলেন। শেষ পর্যন্ত সবার পক্ষ থেকে কথা বললেন সৈয়দ নজরুল ইসলামই। 'ইয়ে, লিডার, খবর শুনছেন কিছু? আমরা তো মাত্র শুনে আসছি। তাই আপনারে জানাতে আসছি।'

শেখ মুজিবের কপালে ভাঁজ। 'কোন খবরের কথা কও? অহন তো ঘণ্টায় ঘণ্টায় খবর আইতাছে...। শহরের রাস্তায় নাকি আর্মি নামছে জায়গায় জায়গায়। সৈয়দপুর আর রংপুরে গুলিও চলছে। সারাদিনে পুরা দ্যাশের নেতারা ফোন করতেছে একটু পর পর। আমি তো বইলাই দিছি প্রস্তুত থাকতে।...'

'লিডার, এইসব খবর না।' সদা হাস্যজ্জ্বল মনসুর আলীর গলাটাও আজ যেন অন্যরকম। 'আরেকটা খবর। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া নাকি ঢাকায় নাই। সে নাকি পাকিস্তানে উড়াল দিছে।'

শেখ মুজিব মাথা ঝাঁকান, 'শুনছি। এই খবর কানে আসছে। এয়ারপোর্ট থেইক্যা খন্দকার ফোনে জানাইছে।'

অথচ বেইলি রোডের রাষ্ট্রপতি ভবন হতে বিকালে প্রেসিডেন্টের গাড়িকে টি-পার্টিতে আপ্যায়নের উদ্দেশ্য নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ক্যান্টনমেন্টে। লোকে দেখল, চার তারকার সামরিক পেট শোভিত ইয়াহিয়ার গাড়ি যাচ্ছে রাস্তা কাঁপিয়ে। গাড়ির ভেতরে যে ইয়াহিয়ার বদলে ছিল তার ডামি ব্রিগেডিয়ার রফিক, সেই তথ্য তাই গোপনই থেকে গেছে।

ইয়াহিয়া খানকে ঠিক সন্ধ্যার মুখে একটি ডজ গাড়ি অতি গোপনে পৌঁছে দিল বিমানবন্দরের পিএএফ গেটে। বিমানে উঠবার মুহূর্তে রাও ফরমান আলীর উদ্দেশে হাত নেড়ে একটি ইঙ্গিতও দিয়ে দিলেন পলায়মান ইয়াহিয়া। এই ইঙ্গিতের মাঝে লুকোনো ছিল আজকের রাতটিকে ইতিহাসে কুখ্যাত করে রাখার স্পষ্ট সংকেত। সেই সংকেত বোঝেননি, তবে উইং কমান্ডার খন্দকার দেখে ফেলেছেন ইয়াহিয়ার ঢাকা ত্যাগ। শেখ মুজিবকে তিনিই ফোনে জানিয়েছেন এই নিঃশব্দ পলায়নের কথা।

কামারুজ্জামান এইবার কথা বলেন। 'বঙ্গবন্ধু, শহরের অবস্থা বেশি ভালো না। সবাই আশঙ্কা করতেছে যেকোনো সময় আর্মি নাকি অ্যাটাক করবে। এইদিকে ইয়াহিয়াও কিছুই না বলে পালিয়ে গেলেন। আপনি বরং বাসা থেকে সইরা যান রাতে। আপনাকে অ্যারেস্ট করতে আসতে পারে কিন্তু।... ব্যবস্থা তো করেই রাখছি আমরা। আপনি এখন রেডি হন।'

'সইর‍্যাম গিয়া লাভ হইবো না কামারুজ্জামান। আর পলায়া কয়দিন থাকমু?' শেখ মুজিব অদ্ভুত একটা হাসি দিলেন। 'আমি বরং বাসাতেই থাকমু ঠিক করছি।'

নেতারা একে অপরের মুখের দিকে চাইলেন। এ আবার কী রকম কথা! তারা তো আগেই জানতেন যে জরুরি পরিস্থিতিতে আত্মগোপনের প্রয়োজন পড়তে পারে। সে জন্যে পুরান ঢাকায় একটা বাড়িও দেখে আসা হয়েছে, স্থির হয়েছিল হাইকমান্ডের নেতারা দরকারে সেখানেই লুকাবেন। কিন্তু এখন আবার শেখ মুজিবের মুখে এই কথা কেন!

শেখ মুজিব আবার হাসলেন নেতাদের হতবুদ্ধি দশা দেখে। 'আরে মিঁয়ারা, আমারে না পাইলে আর্মি ঢাকার প্রতিটা বাড়ি জ্বালায়া দিবো, এইটা বুঝো না? ... আল্লাহর রহমতে মারতে তো পারবো না আমারে। কিন্তু আমারে না পাইলে কী পরিমাণ মানুষ মারব ওরা, চিন্তা করছো? আমি ধরা দিলে আর যাই হোক, আমার

জনগণ গুলি খাইবো না। যাক, তোমরা বরং সইরা পড়ো। একসাথে থাকনের দরকার নাই তোমাদের। সবাই ধরা পড়লে কাম করবো কে...'

নেতারা আলাপ শুরু করেন। বঙ্গবন্ধুকে না নিয়ে তারা আত্মগোপন করতে রাজি নন। আর শেখ মুজিবও রাজি নন বাড়ি থেকে অসম্মানজনকভাবে সরে পড়তে। আত্মগোপনের রাজনীতি কখনো করেননি শেখ মুজিব। যতবার সরকার তাকে বন্দী করেছে– তিনি বরং মুক্তি পেয়েছেন ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা নিয়ে। স্রেফ নিরাপত্তার কথা বিবেচনায় আজ রাতে তাই তিনি সরে পড়তে রাজি হন না। অন্য নেতারা তর্ক করতে থাকেন এই নিয়ে।

ছাদের উপরে পায়চারি করছেন তখন ওয়াজেদ মিয়া ও শেখ হাসিনা। পায়চারি নয় আসলে, ছাদের পাঁচিলের ওপর দিয়ে রাস্তার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছেন তারা দুইজন। হাসিনার থেকে থেকে মনে হয়, আজ ধানমণ্ডির পরিবেশ কেমন থমথমে হয়ে আছে। লোকজন আছে রাস্তায়, তবে অন্যদিনের তুলনায় কেমন আড়ষ্ট দেখাচ্ছে সব। সারাদিন তো তাদের ৩২ নম্বরে লোকেদের আনাগোনা লেগেই ছিল। দুপুরে মণি ভাই এসেছিলেন, এসেছিলেন জাকারিয়া চৌধুরীও। আর বাবা তো সারাদিনই নিচের লাইব্রেরি রুমে বসে ছিলেন চার নেতাকে নিয়ে। একটু পরপরই বেজে উঠেছে টেলিফোন। নানা জায়গা থেকে নাকি খবর আসছে সামরিক আক্রমণের আশঙ্কা করে। হাসিনা কার মুখে শুনলেন, শেখ মুজিব নাকি সবাইকেই বলছেন প্রস্তুতি গ্রহণ করতে।

গতকালও ঠিক এমনটাই হয়েছিল। ৩২ নম্বরের সামনে একের পর এক এসেছে নানা আকারের মিছিল। শেখ মুজিব প্রতিটি মিছিলের সামনে দাঁড়িয়েছেন খুব অল্প সময়ের জন্যে হলেও। পরিচিত সেই স্মিত হাসি দিয়ে বলেছেন, 'তোদের পরবর্তী সংগ্রামের নির্দেশ দেয়ার জন্যে আমি বাচব কি না, জানি না। তোরা কিন্তু সংগ্রাম থামাবি না। আমি জানি, আমাদের নতুন প্রজন্ম একটা স্বাধীন দেশ তৈরি কইর‍্যা নিবোই।'

বাবার কথা মনে পড়তে হঠাৎ বুক ভেঙে কান্না আসে হাসিনার। বাবার উপর দিয়ে কী ঝড়টাই না যাচ্ছে গত কয়েক মাস! হাসিনার সেই মুহূর্তে তীব্র ইচ্ছে হয় একটু নিচে গিয়ে বাবাকে দেখে আসতে। সারাদিন বাবা আজ তাদের ভাইবোনদের সঙ্গে আলাপ করবার সময়টুকু পর্যন্ত বের করতে পারেননি।

বাবার আদরের হাসু নিচে নামল। সিঁড়ির গোড়ায় নামতেই সে দেখতে পেল বাবাকে, বাবাও ছুটে এলেন তাকে লক্ষ্য করে।

'মা, কী খবর তোর? সারাদিন তোর মুখ দেখি নাই!' মুজিবের চোখে প্রশান্তি- দীর্ঘক্ষণ অঙ্কের ক্লাস করবার পরে টিফিনের ছুটি পেলে দুষ্টু ছেলের চোখে যেমনটা থাকে।

'তুমি খাইছো বাবা?' বাবাকে পালটা জড়িয়ে ধরে হাসু বলে। প্রশ্নের ফাঁকে তার দৃষ্টি চলে যায় পেছনে। সেখানে চার নেতা দেখা যাচ্ছে। কোন ফাঁকে তারা আবার ফিরে এসেছেন, কে জানে।এ মুহূর্তে তাদের অত্যন্ত উত্তেজিত দেখাচ্ছে, কিছু নিয়ে তর্ক করছিলেন তারা নিশ্চয়ই।

'আমার খাইতে দেরি হইবো আজকে মা। তোরা খায়্যা ল।' মুজিব নরম স্বরে বলেন। মেয়ের সামনে কেমন যেন অপরাধী মনে হয় নিজেকে মুজিবের। সাত তারিখের পর থেকে দুইবেলার খাবারটা পরিবারের সাথেই সারেন তিনি। এইটুকু বাদ দিলে, অনেকদিন হলো ঠিকমতো সময় দিতে পারেন না ছেলেমেয়েদের। গলা খুলে তাদের সাথে ঠাট্টা করতে পারেন না বিকেলের ঘরোয়া চায়ের আসরে।

হাসিনাকে ভেতরে পাঠিয়ে দিয়ে ঘুরে দাঁড়ান শেখ মুজিব। তার একেবারে পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন আবদুল মমিন। পেছনে আবদুল আজিজ বাগমারকেও দেখা যাচ্ছে। মুহূর্তেই স্নেহময় পিতা থেকে আপসহীন নেতায় পরিণত হয়ে গেলেন তিনি।

'কিছু কইবা?' প্রশ্ন করেন মুজিব। পাকিস্তান গণপরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের অবিসংবাদিত নেতার সাথে কী যেন কথা হয় আবদুল মমিনের, এরপর তার ঘাড়ে হাত রেখে তাকে পেছনে ফেলে শেখ মুজিব আবার এগিয়ে যান চার নেতার দিকে। 'এখনো বইসা আছো তোমরা? চইলা যাও, আমি যামু না আজকে ঘর ছাইড়া। যা হইবার, হইবো।'

সৈয়দ নজরুল ইসলাম দুর্বল স্বরে বলবার চেষ্টা করলেন, 'লিডার, আপনার কিছু হলে আন্দোলনের কী অবস্থা হবে একবার ভেবে দেখেছেন...'

মুজিব গলার স্বর ভারী করে বললেন, 'এই বিষয়ে আমি আর একটা কথাও বলবো না। ডিসিশন ফাইনাল। আমি বাইর হবো না আজকে। তোমরা এই মুহূর্তে যে যেইখানে পারো, সইরা পড়। দিস ইজ মাই অর্ডার। আমি তোমাদের নেতা হিসাবে তোমাদের আদেশ দিতেছি, তোমরা এখনি চইল্যা যাবা।'

তাজউদ্দীন এতক্ষণ একটি কথাও বলেননি। চুপচাপ তিনি দেখছিলেন মুজিব আর অন্যদের এই তর্ক। এইবার তিনি উঠে দাঁড়ালেন। এই স্বর তার চেনা। এই মানুষটির পাশে তিনি সাতাশ বছর কাটিয়েছেন সংগ্রামে, রাজপথে, আলোচনার টেবিলে। মুজিব ভাইয়ের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের গলা তার পরিচিত। আর, জানে সবাই, শেখ মুজিবের সিদ্ধান্তের নড়চড় হয় না।

তাজউদ্দীন বললেন, 'তাহলে সময় নষ্ট করে লাভ নেই আর। বেরিয়ে পড়তে হবে আমাদের সবার।... মুজিব ভাই, আমরা তাহলে যাই। এখন ভাগ্যের হাতে থাকল সব।'

বাকি তিন নেতা মাথা নোয়ালেন হতাশায়। তবে একমত হলেন, এই মুহূর্তে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ মান্য করাই উচিত সকলের। সেটা ছাড়া করার মতো আর কিছু অবশ্য নেইও তাদের। করমর্দনের জন্যে হাত বাড়িয়ে দিলেন তারা। বিদায় জানালেন মুজিবকে। প্রথমে নজরুল ইসলাম, এরপরে মনসুর আলী, এরপরে কামারুজ্জামান, সবশেষে তাজউদ্দীন হাত মেলালেন শেখ মুজিবের সাথে।

নিয়তি জানে, এই পাঁচজন আবার এক ছাদের তলায় একত্রিত হবেন দশটি মাসের পর। সেই দশটি মাসে চিরকালের জন্যে পালটে যাবে পৃথিবীর ভূগোল আর ইতিহাস।

শেখ মুজিবের হাতের উষ্ণতা হাতে আর হৃদয়ের শুভ কামনা বুকে নিয়ে তাজউদ্দীন রাস্তায় বেরিয়ে এলেন।

তাজউদ্দীন কিধার হ্যায়?

রিপি-রিমিকে তাঁতিবাজারে তাদের খালার বাসায় পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে দিন দুয়েক আগেই। জোহরা এখন বাসায় আছেন মিমি আর সোহেলকে নিয়ে। আজকে আবার আব্বা এসেছেন মগবাজার থেকে। দিনাজপুর থেকে বেড়াতে আসা রিমিদের ফুপাতো ভাই তোফাজ্জলও রয়েছে বাসায়, আরো আছে বাসার টুকটাক কাজের জন্যে রাখা দিদার নামের ছেলেটা।

জোহরা অস্থিরভাবে দেয়াল ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছেন বারবার। কয়েকদিন আগে হঠাৎ করে পায়ের গোড়ালির একটা হাড় ভেঙেছে তার, পুরোপুরি সারেনি সেটা এখনো। ঘর থেকে বারান্দা করতে করতে সেখানেও ব্যথা করছে। মনে মনে রাগ হয় তার স্বামীর উপর। আজকের দিনেও দেরিটা যেন করতেই হচ্ছিলো তার!

সন্ধ্যা থেকেই জোহরা প্রস্তুত হয়ে আছেন মিমি আর সোহেলকে নিয়ে। তাজউদ্দীনের বন্ধু হামিদ সাহেবের পরিচিত একটা বাসাতেই আগামী কয়েকটা দিন বাচ্চাদের সাথে নিয়ে লুকিয়ে থাকবেন জোহরা, এরকমই কথা ছিল। বুদ্ধিটা দিয়েছিল তাজউদ্দীনই। শহরের এই অবস্থা, কখন কী হয় কে জানে। কয়েকটা দিন জোহরাদের লুকিয়ে থাকাই ভালো, এই ভেবেই সিদ্ধান্তটা নেয়া। কিন্তু তাজউদ্দীনের সাথে দেখা না করে জোহরা কী করে যান। মানুষটার সাথে আবার কখন দেখা হবে, কে জানে!

বাইরের রাস্তা থেকে শোরগোল শোনা যাচ্ছে খানিক পরপরই। জোহরার একটু একটু ভয় করতে থাকে। মানুষটা কোথায় যে গেল! কিছু হলো না তো আবার!

বেশ রাত করেই তাজউদ্দীন বাড়ির সামনের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলেন, পেছনে পেছনে আব্দুল আজিজ বাগমার। বাগমার সাহেব এই বাসার দোতলাটা ভাড়া নিয়েছেন বেশ কিছুদিন। দুজনে একইসাথে কোথাও গিয়েছিলেন নিশ্চয়ই, ভাবলেন জোহরা। মুজিব ভাইয়ের বাড়িতেই বোধহয়।

জোহরা ছুটে গিয়ে দরজা খুললেন। তাজউদ্দীনের মুখ লাল, বোঝা যাচ্ছে কোনো কিছু ঠিক মর্জি মাফিক হয়নি তার। জোহরা মানুষটিকে চেনেন বলেই কোনো প্রশ্ন করলেন না। কিছু বলার থাকলে তাজউদ্দীন নিজে থেকেই বলবেন সময় হলে। জোহরা তাজউদ্দীনকে হাত মুখ ধুয়ে টেবিলের আসতে বললেন মৃদুস্বরে, তিনি নিজে গেলেন তরকারি গরম করতে।

খেতে বসেও তাজউদ্দীন নিঃশব্দ রইলেন, কোনো কথাই বললেন না। জোহরা অপেক্ষা করতে লাগলেন চাপা একটা অস্বস্তি নিয়ে। খাওয়া শেষ হলে তাজউদ্দীন হাত ধুতে ধুতে জোহরাকে শুনিয়ে নিজেকেই যেন উচ্চস্বরে বললেন, 'আমিও কোথাও যেতে টেতে পারবো না। আমিও বাসাতেই থেকে যাবো।'

জোহরা মুখ মোছার গামছা এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'কী হলো আবার?'

তাজউদ্দীন মুখ মুছতে মুছতে বললেন, 'কোনো রকম ঝামেলা দেখা দিলে মুজিব ভাইসহ আমরা সবাই লুকায়ে গিয়ে পরিস্থিতি বিবেচনা করবো, এইরকম কথা ছিল। পালানোর জায়গা পর্যন্ত দেখেটেখে রাখা হইছে। আজকে শোনা যাইতেছে শহরে আর্মি নামবে, কিন্তু এদিকে মুজিব ভাই বেঁকে বসছেন। মুজিব ভাইরে এত করে বুঝানোর চেষ্টা করলাম সরে যাইতে, উনি রাজিই হইলেন না। ...আমিও ভাবতেছি যাবো না কোথাও! মুজিব ভাই বাসায় থাকলে আমিও বাসাতেই থাকবো।'

জোহরা কোনো কথা বললেন না, চুপ করে শুনে গেলেন কেবল। কী মনে পড়তে তাজউদ্দীন এরপরে নিজেই জিজ্ঞেস করলেন, 'এ কী! লিলি, তোমার না মিমি আর সোহেলরে নিয়ে চলে যাওয়ার কথা ছিল? এখনো যাও নাই কেন? আশ্চর্য! শুধু শুধু বসে ছিলা কেন তোমরা? তাড়াতাড়ি যাও। এখনি বের হয়ে যাও গাড়ি নিয়ে।... বাচ্চারা কই ? জলদি ভেতরে গিয়ে ওদের নিয়া আসো। কুইক!'

জোহরাকে প্রস্তুত হবার জন্যে ভেতর ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে তাজউদ্দীন নিজে স্যান্ডো গেঞ্জি আর লুঙ্গি পরে বেরিয়ে এলেন বাড়ির সামনের লনে। দোতলা থেকে আজিজ বাগমারও ততক্ষণে খাওয়ার পাট চুকিয়ে এসে পড়েছেন।

'তাজউদ্দীন ভাই, আপনি বের হবেন না?' আজিজ বাগমারের প্রশ্ন।

'আমি কিছু বুঝতে পারতেছি না। কী হবে বের হয়ে। কই যাবো...', তাজউদ্দীনের আক্ষেপ শেষ হবার আগেই ঘ্যাঁচ করে বাড়ির দরজার সামনে ব্রেক কষে কালো রঙের একটি গাড়ি। আমীর-উল ইসলাম ও কামাল হোসেন বেরিয়ে আসেন সেটা থেকে।

'এ কী, তাজউদ্দীন ভাই, আপনি এখনো বের হন নাই? সময় নাই, একদম সময় নাই। জলদি চলেন আমাদের সাথে।', আমীর-উল ইসলাম উত্তেজিত গলায় বলেন।

'কিন্তু মুজিব ভাই বের হলেন না তো!'।

'আমরা মাত্র বঙ্গবন্ধুর বাড়ি থেকেই আসছি। উনি নিজে আদেশ দিয়েছেন আমাদের সবাইকে আজকে রাতে লুকিয়ে পড়তে।... তাজউদ্দীন ভাই, দেরি হয়ে যাচ্ছে, এইগুলা নিয়ে পরেও আলোচনা করা যাবে। রাস্তায় আর্মি নেমে গেছে। প্রতিটা মিনিট এখন মূল্যবান। আপনি আগে এখন আমাদের সাথে চলেন। আসেন!'

মুহূর্তের মহিমায় মানুষ কখনো অসাধ্য সাধন করে, কখনো যা করবে বলে ভাবেনি, তাই সে করে ফেলে ঝোঁকের বশে। বাংলাদেশের ইতিহাসে চিরকালের জন্যে দাগ রেখে যাওয়া একটি সিদ্ধান্তের জন্ম হলো সেই মুহূর্ত মহিমাতেই। তাজউদ্দীন স্থির করলেন, তিনি যাবেন। আবেগের বশে মিলিটারিদের কাছে ধরা দেয়া কোনো কাজের কথা নয়। এরচেয়েও বড় কথা মুজিব ভাই আদেশ দিয়ে রেখেছেন সরে পড়তে। স্বয়ং শেখ মুজিব যদি না পালিয়ে ধরা দেন, সেইক্ষেত্রে তাকে ছাড়িয়ে আনার জন্যে হলেও কাজ তো করতে হবে কাউকে!

তাজউদ্দীন আর দেরি করেন না। বলেন, 'দাঁড়ান আপনারা, আমি আসছি আপনাদের সাথে।'

এক দৌড়ে ঘরে ঢোকেন তাজউদ্দীন। 'লিলি, ছোট কাপড়ের ব্যাগটাতে আমার শার্ট প্যান্ট ঢোকাও। আমার রাইফেলটা বের করে হাতে দাও। ... এ কী, পিস্তলটা কোথায় গেল? আশ্চর্য তো! এইখানে পিস্তল রেখেছিলাম আমি, সেটা কই গেল'?

কদিন আগেই অস্ত্র চালানোর ট্রেনিং নিয়েছেন তাজউদ্দীন। বন্ধু আরহাম সিদ্দিকীর কাছ থেকে একটা রাইফেল আর পিস্তলও যোগাড় করা হয়েছে। কিন্তু এই তাড়াহুড়োর মাঝে পিস্তলটা খুঁজে না পেয়ে খুব অস্থির হয়ে পড়েন মানুষটি।

আজিজ বাগমারের স্ত্রী আতিয়া এর মাঝে কোন সময় নেমে এসেছে দোতলা থেকে। পিস্তলটা খুঁজে বের করে আতিয়াই সেটা তাজউদ্দীনের হাতে তুলে দেন। 'ভাই সাহেব, এই যে আপনার পিস্তল।'

তাজউদ্দীন তখন প্রস্তুত। জোহরা এগিয়ে দিলেন ব্যাগ। তাজউদ্দীন চোখে প্রশ্ন নিয়ে আজিজ বাগমারের দিকে তাকান। আতিয়া বাগমার শক্ত করে স্বামীর হাত ধরে বললেন, 'না! ও যাবে না! আমি ওকে যেতে দিবো না।'

কোনো কথা না বলে তাজউদ্দীন লনে বেড়িয়ে এলেন। চেক লুঙ্গি আর সাদা ফতুয়ার মতো হাফশার্ট পরা তাজউদ্দীনের কাঁধে কাপড়ের ব্যাগ আর রাইফেল,

কোমরে গোঁজা পিস্তল। এই অবয়বের অগণিত মুক্তিযোদ্ধাই আগামী কয়েকমাস পরে ত্রাস হয়ে দেখা দেবে অস্ত্রশক্তিতে বলীয়ান পাকিস্তানি সেনাদের কাছে!

'আমি আসি লিলি। তোমরা লুকিয়ে পড়ো কোথাও।' মৃদুস্বরে এই কথাগুলো বলে তাজউদ্দীন বেরিয়ে পড়লেন বাড়ি থেকে। কালো গাড়িটার দরজা খোলাই ছিল, তাজউদ্দীন লাফ দিয়ে উঠতেই সেটি চলা শুরু করল। মোড়ের মাথায় বাঁক নিয়ে গাড়িটি অদৃশ্য হয়ে যেতে সময় লাগল না বেশি। আর, প্রায় সাথে সাথেই ফ্লেয়ারের আলোতে আলোকিত হয়ে উঠল পুরো এলাকার আকাশ।

... ফ্লেয়ার? আর্মি তাহলে সত্যিই শহরে নেমেছে?

সব অনিশ্চয়তার অবসান ঘটিয়ে আট মিনিট পরেই বাড়ির সামনে থামে মিলিটারির গাড়ি। জোহরা তখন সবেমাত্র বাচ্চাদের নিয়ে গাড়িতে উঠবার জন্যে নিচে নেমেছেন। নেমেই তিনি বুঝলেন সময় নেই, পালানো যাবে না। মুহূর্তে উপস্থিত বুদ্ধিতে ভর করে জোহরা সোজা চলে গেলেন দোতলায়। আজিজ বাগমারের স্ত্রীকে বললেন, 'আতিয়া, এখুনি দুইতালার দরজা আটকায়া দাও। কোথাও যাবার সময় নাই আর। আমাকেও তোমাদের রুমে নিয়ে চলো। আজিজ ভাইকে যাইতে দাও নাই, এখন আমাদেরও তোমার নিজের কাছেই রাখতে হবে বোন।'

বুদ্ধিমতি আতিয়া বাগমার দ্রুতই একটা রুমে ঢুকিয়ে দিল মিমি, সোহেল আর জোহরাকে। আজিজ বাগমার জানালা দিয়ে দেখলেন ইকবাল স্পোর্টিং-এর মাঠের দিক থেকে ১৫ নম্বরের কাছাকাছি পর্যন্ত সমস্ত বাড়ির আশপাশে দেখা যাচ্ছে পাকসেনাদের। পাশের বাড়ির লন, ছাদ, এই বাড়ির বাউন্ডারি ওয়ালের পাশেও অবস্থান নিয়েছে প্রচুর মিলিটারি।

সজোরে লাথিতে নিচের তলার দরজা ভেঙেই এক সেনা সামনে পেল তাজউদ্দীনের বাসার কাজের ছোট্ট ছেলে, দিদারকে। তার চুলির মুঠ ধরে তাকে শূন্যে ঝুলিয়ে কর্কশ গলায় হানাদারটি বলল, 'বোল, তাজউদ্দীন কিধার হ্যায়?'

তাজউদ্দীন তখন গাড়িতে করে ছুটছেন এক অচেনা ঢাকা শহরের রাস্তায়, যে শহরকে মিনিটে মিনিটে নরকে পালটে দিচ্ছে অপারেশন সার্চলাইটের হোতারা।

অপারেশন সার্চলাইট

কামাল আতাউর রহমান প্রবন্ধ লিখছিল, 'বাংলা সাহিত্যে দেশপ্রেম'। ২৭ তারিখ রেডিওতে প্রোগ্রাম আছে তার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মহসিন হলের ছাত্র কামাল বাংলা বিভাগের ছাত্র, অনার্স দিচ্ছে এইবার। ঘড়ির কাঁটা তখন বারোটা ছুঁইছুঁই।

হঠাৎ প্রচণ্ড শব্দের সাথে আলো জ্বলে উঠল। একটু পরপর আকাশ আলোকিত হচ্ছে, সাথে জোর গোলাগুলির আওয়াজ। হতবুদ্ধি কামাল বেরিয়ে

এল রুমের বাইরে। চারপাশে সবাই ছোটাছুটিতে ব্যস্ত। পরিচিত এক মুখের কাছে কামাল জানতে চাইল, হচ্ছেটা কী এখন।

'পাকিস্তানি আর্মি ক্যাম্পাস অ্যাটাক করছে, পালান। জীবন নিয়ে পালান!' এই বলে ছেলেটা অপেক্ষা করে না জবাবের, দৌড়ে চলে যায় সিঁড়ির দিকে।

কামালের রুম পাঁচতলায়, স্রোতের সাথে মিশে গিয়ে সেও ছুটে নামে নিচতলায়। কিন্তু নিচে নেমেই বা কী হবে! কোথায় পালাবে সে? হাজী মহসিন হলের দক্ষিণে ইকবাল হল। তার পেছনে এস এম হল। আকাশ ফাটানো আওয়াজে বোঝা যাচ্ছে ইকবাল হলে ভারী কিছু আছড়ে পড়ছে। কামানের গোলাই হবে। একটু পরপর শোনা যাচ্ছে গুলির সাথে মানুষের আর্তনাদও।

পাকিস্তানি আর্মি তাহলে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের ওপর গুলি চালাচ্ছে? সত্যিই? বিশ্বাস হতে চায় না।

কামাল আতাউর রহমান একা নয়, চোখের সামনে ধ্বংসযজ্ঞ দেখেও বিশ্বাস হতে চায় না কালীরঞ্জন শীলেরও। সে যা দেখছে, তা কোনো বাস্তব পৃথিবীর দৃশ্য কি? খুব বেশি একশো হাত দূর হবে তার থেকে। টর্চের আলোয় ছাত্রদের খুঁজে বের করে লাইন ধরে দাঁড় করানো হলো হলের মাঠে। কেমন ঘড়ঘড়ে গলায় একজন সৈন্য নির্দেশ দিল, ফায়ার!

সব শেষ হয়ে গেল এরপর। সব। প্রায় পঞ্চাশটা তাজা প্রাণ। তিরিশ সেকেন্ডও লাগল না সব মিলিয়ে।

জগন্নাথ হলের তিনতলার বাথরুমের পাশে উপুড় হয়ে লুকিয়ে থাকা কালীরঞ্জন হড়বড় করে বমি করে দিল। মানুষ মারা এত সহজ? এত সস্তা মানুষের জীবন? কালীরঞ্জন অবিশ্বাসে কাঁপতে থাকে।

এস এম হলের দিক থেকে আওয়াজ শোনা যায় এবার। ডাইনিংরুম থেকে এদিকেই ছুটে আসছে বেশ কিছু ছাত্র, আর চিৎকার করতে করতে তাদের তাড়া করে আসছে কয়েক ডজন মিলিটারি। ছাত্ররা হয়তো প্রাণের দায়ে দৌড়ে পেছনে ফেলে দিত মিলিটারিদের, পারল না ওই খোলা মাঠের জন্যে। সৈন্যদের সহজ টার্গেট প্র্যাকটিস হতে হলো ওদের। নির্বিচারে মরল সবাই গুলি খেয়ে।

কালীরঞ্জন মাথা ঠান্ডা রাখার চেষ্টা করে। বাঁচার তাগিদেই তাকে এখন ভাবতে হবে। টর-টর-টর আর র‍্যাট র‍্যাট র‍্যাট শব্দের মাঝে সে ধীরে ধীরে নিঃশব্দে ঢুকে পড়ে ল্যাট্রিনের ভেতর। ঠিক করে, যত যাই হোক, এখান থেকে আর বের হবে না সে। পরিস্থিতি ঠান্ডা হোক, সকাল হোক।

মহাকাল থেমে থাকে না, আর একসময় তাই সে পরাবাস্তব রাতটি শেষ হবার সংকেত দেয় আজানের ধ্বনি। কালীরঞ্জনের মনে হয়, এমন অদ্ভুত বিষণ্ন আজান কোনোদিন শোনেনি কেউ। ইসলাম ধর্মের চূড়ান্ত অবমাননা করে পাক মিলিটারির বইয়ে দেয়া রক্তস্রোত যেন প্রভাবিত করেছে মুয়াজ্জিনের গলার

কম্পাঙ্ককেও। ভোরের আলো ফুটতে থাকে আস্তে আস্তে। কালীরঞ্জন শীল এরপরেও বাইরে বের হতে সাহস পায় না।

মাইকে ভেসে আসে কারফিউ দেবার ঘোষণা। তারও অনেক পর, বেলা আট কি নয়টার দিকে কালীরঞ্জনের কানে আসে মাটিতে ঘষটে চলার আওয়াজ। কেউ যেন খুব ধীরে ধীরে সাপের মতো এগোচ্ছে সিঁড়ির দিকে। কালীরঞ্জন এবার নিজেই সাবধানে ছিটকিনি খুলে বেরিয়ে আসে ল্যাট্রিন থেকে। ঘষটে চলার শব্দটার উৎস খুঁজতে খুব সন্তর্পণে করিডোরে চোখ রাখতেই সে চিনে ফেলে ছেলেটাকে।

এস এম হলের তারেকুল আলম।

তারেকও দেখেছে কালীরঞ্জনকে। মাটিতে গড়িয়ে গড়িয়েই ওরা একে অন্যের নিকটবর্তী হয়।

'তুমি এইখানে কী করে আসলা?' ফিসফিস করে তারেককে প্রশ্ন করে কালীরঞ্জন।

জানা গেল, গত রাতে মিলিটারিরা হামলা করার সাথে সাথেই তারেক দৌড়েছে জগন্নাথের দিকে। মাঝে বের হয়ে যাবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু মিলিটারিরা এস এম হল থেকে জগন্নাথে ঢুকে গেছে দেখে সেও আর সাহস করেনি বের হবার। ক্রল করে করে তিনতলায় উঠে একটা আলমারির পেছনে সারারাত লুকিয়ে ছিল তারেক।

দুইজন টুকটাক আরো কথা বলে। ভেবে বের করতে চায়, কী করণীয় এখন। আলোচনার ফাঁকেই শোনা যায় আরো কিছু মানুষের গলার আওয়াজ।

তাদের মতো আরো কেউ হয়তো জীবিত উদ্ধার পেয়েছে কাল রাতের ম্যাসাকার থেকে, এই ভেবে ধীরে ধীরে নিচে নামতে থাকে দুইজন। একে অন্যকে দেখে সাহস পেয়েছে ওরা। সিঁড়ি ঘরের নিচে শোনা যাচ্ছে বেশ কিছু গলার আওয়াজ। আশায় ভর করে দ্রুতই নিচে নামে দুইজন এবং একতলায় নেমেই, জমে যায়। মেশিনগান তাক করে বিশ-পঁচিশ জন মিলিটারি দাঁড়িয়ে আছে সিঁড়ির বাইরে। তাদের সামনে দাঁড়ানো রয়েছে আরো কিছু ছাত্র। দেখেই বোঝা যায়, বন্দী সবাই। কালীরঞ্জন আর তারেককে দেখেও ছুটে আসে দুইজন মিলিটারি। গাল দিতে দিতে ওদের ঠেলে নিয়ে যায় ছাত্রদের কাতারে। এরপর ওরা সবাইকে আদেশ দেয়।

প্রত্যেকটা ঘরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে লাশ। হলের বারান্দায়, বাইরের মাঠে সবখানে শুধু রক্ত আর রক্ত। আর লাশ। হানাদারেরা হুকুম করে লাশ ওঠাতে। লাশ জড়ো করতে হবে সামনের মাঠে।

কালীরঞ্জন আর তারেকও অন্য সবার সাথে লাশ বইতে থাকে। এমনকি দশ ঘণ্টা আগেও জীবিত ছিল যে মানুষগুলো, তাদের লাশ। ওরা বুঝে যায়, একই পরিণতি অপেক্ষা করছে ওদের জন্যেও। লাশ তাদেরও হতে হবে। একটু পরে, এই যা পার্থক্য। দুজনেই কেউই জানত না ড. জিসি দেবের মতো ঋষিতুল্য শিক্ষকদের কয়েকজনের লাশও হেলায় পড়ে ছিল আশপাশেই।

তবে তারেকুল আলমদের ভাগ্য ছিল খুবই প্রসন্ন। সারি বেঁধে দাঁড় করানো ছাত্রদের ওপর গুলি করতেই স্তূপকৃত লাশের মাঝে শুয়ে পড়ে জীবন বাঁচিয়েছিল তারা। সূর্য ছাড়া আর কাউকেই ঘটনার সাক্ষী রাখতে চায়নি মিলিটারিরা, তবুও গোপনে সে দৃশ্য আর জগন্নাথ হলের পরিকল্পিত দানবীয় গণহত্যার ছবিটি ভিডিও ক্যামেরায় ধারণ করেছিলেন প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. নুরুল উল্লা। সেলুলয়েডের ফিতায় আটকে গিয়েছিল সেই নারকীয় রাতের ছবি, পাক মিলিটারির 'অপারেশন সার্চলাইট'।

কালীরঞ্জন শীলেরা রক্ষা পেয়েছিলেন। তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজারবাগ পুলিশ লাইন পিলখানার আর ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের অন্তত সাত হাজার বাঙালি সে রাতে হয়েছিলেন অপারেশন সার্চলাইটের শিকার। নিউইয়র্ক টাইমস ক'দিন পরেই ছাপা হয় সেই অবিশ্বাসের হেডলাইন– রক্তই যদি কোনো জাতির স্বাধীনতার অর্জনের দাম বলে বিবেচিত হয়, তবে বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই অনেক বেশি দাম দিয়েছে।

রাজা গেলেন কারাগারে

টাইম মেশিনের উলটোগামী যাত্রায় মহাকাল প্রত্যক্ষ করে, ৩২ নম্বরের বারান্দা থেকে ধানমণ্ডি লেকের স্বচ্ছ পানিতে হঠাৎ আলোড়ন দেখে হতচকিত হয়ে ওঠেন শেখ মুজিব। আকাশের তারাগুলো কেঁপে কেঁপে ওঠে লেকের জলে, দূরে শোনা যায় কামানের গর্জন।

শেখ মুজিব তাঁর করণীয় ঠিক করে ফেললেন।

আধঘণ্টা পর, ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে সেই মানুষটিকেই দেখা গেল তার লাইব্রেরি রুমে। এরিনমোর তামাকের ধোঁয়ায় চারিপাশ আচ্ছন্ন করে যেন বসে আছেন একজন পরিতৃপ্ত মানুষ। ওয়ারলেস বার্তায় মাত্র কিছুক্ষণ আগেই শেখ মুজিব দিয়ে এসেছেন বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা। পাকিস্তানি বাহিনীর সর্বশেষ দখলদার সৈনিকটিকেও হটিয়ে দেবার ডাক দিয়েছেন মুজিব।

ইতিহাস জানবে, পরবর্তী ঘণ্টা দুয়েক ধরে পিলখানায় কর্মরত সুবেদার মেজর শওকত আলী ট্রান্সমিটারে প্রচার করতে থাকবেন সেই ঘোষণা; এরপরে ধরা পড়বেন হানাদারদের হাতে অমানুষিক অত্যাচার সয়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে। দূরদর্শী শেখ মুজিব আবার ইস্টার্ন ওয়ারলেস ডিভিশনের ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার নুরুল হককে দিয়েও প্রস্তুত রেখেছিলেন আরেকটি ট্রান্সমিটার, সেই নুরুল হকও এই লাল রাতে শেখ মুজিবের ওয়ারলেস বার্তা মহাখালি ওয়ারলেস কলোনি থেকে ট্রান্সমিট করে দেবেন ইথারে। প্রতিভাবান এই প্রকৌশলীকেও দিন তিনেক পরে ধরে নিয়ে যাবে পাকিস্তানি আর্মি, চিরদিনের জন্যে।

ওদিকে চট্টগ্রামে জহুর আহমদ চৌধুরীর হাত হয়ে স্থানীয় আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবদুল হান্নান পেয়ে যাবেন শেখ মুজিবের বার্তাটি, আর ২৬ মার্চ দুপুরে তার গলায় আর সন্ধ্যায় আবুল কাশেম সন্দ্বীপের কণ্ঠে রেডিও পুনরাবৃত্তি করবে সেই ঘোষণাই। ২৭ তারিখ সন্ধ্যায় ও ২৮ তারিখের সকালে, দুই দফায় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে শেখ মুজিবের ডাক হরকরা হয়ে বার্তাটি মানুষের কাছে নিয়ে যাবেন আরো একজন, তিনি মেজর জিয়াউর রহমান।

এই মুহূর্তে ইতিহাস শেখ মুজিবের সাথেই। টেবিলের ওপর বহুবার পাঠ করা বার্নাড শ'র সেইন্ট জোয়ান বইটার দিকে চোখ যায় মুজিবের। সেটা তুলে অলস পাতা ওল্টানোর ফাঁকে তিনি নিশ্চিত হন, তাঁর যা করণীয় সে কাজে তিনি কোনো খামতি রাখেননি। বাসায় রয়েছে তার স্ত্রী, দুই ছেলে জামাল আর রাসেল। হাসিনা, রেহানাদের পাঠিয়ে দিয়েছেন অন্যত্র। দীর্ঘদিনের বিশ্বস্ত দুই দেহরক্ষী রাজা ও মহিউদ্দিনকেও আদেশ করেছেন তাকে রেখেই চলে যেতে। তারা বিস্মিত হয়েছে, তর্ক করেছে। কিন্তু যথারীতি শেখ মুজিব থেকে গেছেন নিজের দাবিতে অটল।

শেখ মুজিব জানেন, পাকিস্তানি মিলিটারি রাস্তায় নেমেছে তার দেশের মানুষের নায্য দাবিকে দমিয়ে দিতে। মুজিব আরো জানেন, ৩২ নম্বরের দিকে এ মুহূর্তে ধেয়ে আসছে জান্তাদের কেউ। কিন্তু মুজিব পালাতে পারেন না। তার খোঁজে ঢাকা শহরের প্রতিটা ইটের টুকরা উলটে ফেলতে পারে পশ্চিমারা, হয়তো তাদের ক্ষোভে প্রাণ হারাতে পারে আরো অনেক নিরস্ত্র মানুষ। মুজিব সেটা কী করে হতে দেন? বাংলার বন্ধু হয়ে বাঙালিকে বিপদের মুখে রেখে পালানোটা কাপুরুষের মতোই মনে হয় মুজিবের কাছে। নজরুল তো রইল, তাজউদ্দীন তো থাকল। তার রেখে যাওয়া আওয়ামী লীগ শেষ পর্যন্ত লড়াই করবে, এ সত্য শেখ মুজিবুর রহমান দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন।

চিন্তার জাল ভেদ করে যায় গুলির আওয়াজ। এসে গেছে, তারা নিশ্চয়ই এসে গেছে।

শেখ মুজিব দ্রুত পায়ে হেঁটে যান শোবার ঘরে। ফজিলাতুন্নেসা ঘুমাননি তখনো। মুজিব একটা মুহূর্ত তার সহধর্মিণীর চোখে তাকান। পরম নির্ভরতায় মুজিব দেখেন, সেখানে কোনো অনুযোগ নেই তার প্রতি, রয়েছে নিখাদ আস্থা। জাদুকর শেখ মুজিবে আস্থা রাখেন তার স্ত্রীও।

বাইরে থেকে মেগাফোনের ইথারে উচ্চস্বরে ভেসে এল কারো আদেশ, 'শেখ, ইউ শ্যুড কাম ডাউন!'

প্রায় সাথে সাথেই বাড়ির চারপাশ থেকে হঠাৎ করেই শুরু হয়ে গুলিবর্ষণ। শোবার ঘরের জানালা দিয়েও ভেতরে ঢুকে কয়েকটা গুলি। মুজিব আর দেরি করেন না। স্ত্রী আর ছেলেদের তিনি ঠেলে দেন বাথরুমের ভেতরে।

ক্রমাগত গুলির আওয়াজে মুজিবের ইস্পাত স্নায়ূরও ধৈর্যচ্যুতি ঘটে একসময়। ক্ষিপ্ত পায়ে বেরিয়ে আসেন তিনি, 'থামো তোমরা। থামো। গুলি করার কী দরকার? তোমরা কি উন্মাদ? আমি এখানেই আছি, চাও তো আমাকেই গুলি করো। দয়া করে সাধারণ মানুষকে রেহাই দাও।'

সাথে সাথেই চতুর্দিক থেকে ছুটে আসে কয়েকজন সৈনিক। ধাক্কা দেয় তারা মুজিবকে, তাঁর দীর্ঘদেহকে বিব্রত করতে থাকে রাইফেলের কুঁদো আর হাতের ধাক্কায়। অপেক্ষাকৃত সিনিয়র এক অফিসার আদেশ দেয়, 'থামো তোমরা।'

তামাটে ড্রেসিং গাউন আর পায়জামা শোভিত শেখ মুজিবের সামনে গিয়ে মৃদুস্বরে সেই অফিসার বলে, 'স্যার, আপনাকে গ্রেপ্তার করতে আমাদের পাঠানো হয়েছে। আপনাকে এখনই আমাদের সাথে যেতে হবে।'

মিলিটারির আদেশ কখনোই দমাতে পারেনি তাঁকে। নিরুত্তাপ অভ্যস্ত স্বরে, নিতান্ত অবহেলায় মুজিব জবাব দিলেন, 'বেশ তো, যাবো। তবে এক মিনিট। নিজের পাইপ আর তামাক ছাড়া আমি কোথাও যাইনে। আর স্ত্রীর কাছ থেকেও বিদায় নিতে হবে আমার। তোমরা অপেক্ষা করো, আমি আসছি।'

দোতলায় উঠেই মুজিব দেখলেন ফজিলাতুন্নেসাকে। দুই ছেলেকে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা বেগম মুজিব নিঃশব্দে জামাকাপড়ে ভর্তি একটা ছোট্ট ব্যাগ এগিয়ে দিলেন, নিয়মিত রাজবন্দি শেখ মুজিবের জন্যে এই ব্যাগ সবসময় প্রস্তুত থাকে। একটি বাক্যও মুখ ফুটে বললেন না কেউ। স্ত্রীর কপালে বিদায়ী চুম্বন দিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান তার ব্যাগ আর তামাক নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন।

'আপনি প্রস্তুত, স্যার?' অফিসারের ছোট্ট প্রশ্নের জবাবে হালকা মাথা ঝুঁকিয়ে অপেক্ষমাণ টয়োটা ল্যান্ডক্রুজারে চেপে বসলেন শেখ মুজিব। দোতলায় দাঁড়িয়ে থাকা ফজিলাতুন্নেসার দিকে এক পলকের দৃষ্টি হানতেই মুজিবের চোখে পড়ল তার বসবার ঘরের দেয়ালে ঝোলানো লাল সবুজের ছোট্ট পতাকাটায়। বুলেটের বৃষ্টিতে সেটায় অগণিত ছিদ্র হয়ে গেছে।

ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে সশস্ত্র পুলিশ প্রহরায় চলা শুরু করল টয়োটা ল্যান্ডক্রুজার। চশমা খুলে নিয়ে অস্বচ্ছ দৃষ্টিতে মুজিব তাকালেন ধানমণ্ডি লেকের দিকে। অশান্ত হ্রদের মাছগুলোও। হঠাৎ হাঙরের হানা পড়েছে যেন সেখানে।

জ্বলতে থাকা ঢাকা শহরের রাস্তায় সেই জনপদেরই মুকুটহীন বন্দী রাজাকে নিয়ে ছুটে চলছে ল্যান্ডক্রুজার। কপাল কুঁচকে চশমাহীন মুজিব ভাবছেন ভবিতব্য। কী ঘটবে বাংলাদেশের ভাগ্যে?

স্বাধীনতার বার্তা সাড়ে সাত কোটির কাছে পৌঁছবে তো ঠিক মতো? সদ্যোজাত বাংলাদেশের পাশে এসে দাঁড়াবে তো বিশ্ব?

নীলাভ চোখের যুবক

'কাপড় চোপড় খোলো, আন্ডারওয়ার ছাড়া পরনে আর কিছু থাকবে না।' হাতের অস্ত্রটা নেড়ে নির্দেশ দিল প্রথম সৈনিকটি।

'এর আগেও কিন্তু আমাকে একবার সার্চ করা হয়েছে, কিছু পাওয়া যায়নি।' নীল চোখের যুবকটি ভীত স্বরে বলে।

'দ্বিতীয়বার চেক করলে তোমার কি কোনো অসুবিধে আছে নাকি?' ধমকে উঠল আরেক সৈনিক। 'খোলো, তাড়াতাড়ি খোলো।'

যুবক ধীর হাতে পরনের শার্ট খুলে ফেলল, পায়ের জুতো খুলল, সন্দেহ জাগানো ধীর গতিতে খুলল পায়ের মোজা, এরপরে বেল্ট আর প্যান্টটাও খুলল।

'হুম, কিছুই নাই দেখি,' প্রথম সৈনিকটি হতাশ স্বরে বলে। 'আমি ভেবেছিলাম মোজার নিচে হলেও কিছু থাকবে।'

'ব্যাপার না, এ-ও পরিষ্কার।... যাও, কাপড় পরে লাইনে গিয়ে দাঁড়াও।' শেষ বাক্যটা যুবককে উদ্দেশ করে বলল দুই নম্বর। এরপর প্রথম জনের দিকে তাকিয়ে চওড়া একটা হাসি দিল সে। 'মনে নাই, মেজর বলেছেন স্মৃতি বাদে এদের সাথে বাড়তি কোনো কিছুই যাবে না!'

দ্রুত হাতে কাপড় পরতে থাকা যুবকের কানে যেন ধাক্কা খায় কথাটা। ঠিক এভাবেই, অবিকল এভাবেই এই বাক্যটা সে এর আগেও বলতে শুনেছে কাউকে। সিনেমার মতো এক ঝটকায় যুবকের মনে ভিড় করে আসে অনেক কিছু। আজ থেকে তিনদিন আগের ঘটনা...

২৫ মার্চের সন্ধ্যাতেই হঠাৎ করে অস্থির হয়ে উঠেছিল হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের লবি। ইয়াহিয়া নাকি বিনা ঘোষণায় পশ্চিমে রওয়ানা দিয়েছে আলোচনা বন্ধ করে। শহরের রাস্তায় আর্মি নামবে, শোনা যাচ্ছিলো এমন গুজব। তবে সে গুজবের সত্যতা যাচাই করা গেল না। তার মতো আরো প্রায় চল্লিশজন ছিল। প্রত্যেকেই বের হতে চেয়েছিল হোটেল থেকে, একা কিংবা দল বেঁধে। কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে সবাই। জিপ গাড়িতে করে বেশ কয়েকজন সশস্ত্র সৈনিক বসে ছিল হোটেলের সবগুলো প্রবেশ পথের বাইরে। তাদের মুখপাত্র ছিল অল্প বয়েসি এক ক্যাপ্টেন।

'ভেতরে যান, প্লিজ ভেতরে যান।' কেমন যেন নার্ভাস কণ্ঠে আদেশ দিয়েছিল সেই ক্যাপ্টেন। 'বিদেশি কোনো সাংবাদিক যেন বাইরে বেরুতে না পারে সে বিষয়ে নির্দেশ আছে আমার ওপর।'

এরপরে এসেছিল সেই রাত। যুবকের মনে পড়ে, সে রাতে এতটুকু ঘুম হয়নি তার। দশটা থেকে এগারোটার মাঝে প্রায়ই গুলির শব্দ শোনা যাচ্ছিলো থেমে থেমে। এরপর সেটা হয়ে গেল অমোঘ। মুহুর্মুহু গুলি। স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র, ভারী

অস্ত্রের গুলি। মাঝরাতে ছাদেও উঠে গিয়েছিল কয়েকজন। তারা কেবল দেখেছিল, আকাশ লাল। আগুন জ্বলছে অনেক জায়গায়।

টেলিফোনের লাইন কাটা, রিপোর্ট তাই পাঠানো যায়নি। তবে সকালে শোনা গেল ভুট্টোও নাকি ঢাকা ছাড়ছেন। দল বেঁধে সকলেই তারা গিয়েছিল ভুট্টোর স্যুটের সামনে, লাভ হয়নি। ভুট্টোর চেহারা ফ্যাকাশে, ধূসর কোট আর নীল টাই কুঁচকানো, গালে না কামানো দাড়ি। কোনো এক জেনারেলের নির্দেশে ভুট্টোকেও সৈন্যরা পাহারা দিয়ে নিয়ে গেল হোটেল থেকে। তবে তাদের বের হওয়া হলো না। শহরে কারফিউ চলছে।

বিকালের দিকে হোটেলে ঢুকল এক মেজর। তার কণ্ঠে কোনো আবেগ ছিল না। কেবল ছিল সোজাসাপ্টা নির্দেশ। 'আপনারা হোটেল ছাড়বেন, ঢাকাও ছাড়বেন। এখনি আপনাদের সবাইকে এয়ারপোর্টে নেবো আমরা। পি.আই.এ.-র বিশেষ একটা বিমান আপনাদের এখান থেকে বের করে নিয়ে যাবে। অনুগ্রহ করে কোনো রিপোর্ট, ছবি বা ফিল্মের নেগেটিভ লুকিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করবেন না।'

সাংবাদিককদের মাঝে এই আদেশের প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিকভাবেই ভালো হলো না। নিউজ উইকের লরেন জেনকিন্স উত্তেজিত স্বরে বলেছিল, 'মগের মুল্লুক নাকি! ফ্রিডম অব প্রেস বলে শব্দটা কি তোমাদের অচেনা?'

মেজর, সালিক বোধহয় তার নাম, সাপের মতো শীতল দৃষ্টিতে জেনকিন্সের দিকে তাকিয়েছিল শুধু একবার। তারপর বলেছিল, 'আমি যেহেতু নিজের দেশের মানুষকে গুলি করতে পেরেছি, কাজেই তোমাকে গুলি করতেও আমার হাত কাঁপবে না। ... স্মৃতি ছাড়া আর কিছুই তোমরা এখান থেকে নিয়ে যেতে পারবে না।'

এরপরে সমস্ত সাংবাদিককে লাইন বেঁধে তোলা হলো বিশাল এক ট্রাকে। সে দেখল। সে দেখল সেন্ট্রাল এয়ার কন্ডিশনের ডাক্টের মাঝে লুকিয়ে থেকে, তার সাথে আরো ছিল এপির ফটোজার্নালিস্ট মিশেল লঁরা। তারা সেখানে রইল সাতাশে মার্চ কারফিউ তোলার আগ পর্যন্ত। এরপর হোটেল থেকে বেরোল ঢাকা শহরের রাস্তায়।

তারা সব দেখল।

তারা দেখল ছাত্রদের থাকার জায়গা ইকবাল হল লাশের গন্ধ ছড়াচ্ছে, তারা দেখল রাজারবাগের পুলিশ দপ্তরে মৃতের স্তূপ, তারা দেখল ইংলিশ রোড-নয়াবাজারের রাস্তায় রাস্তায় গলিত শিশু।

মিশেল বিশ তিরিশ রোল ছবি তুলেছিল। কয়েকটা সে এর মাঝেই পাঠিয়ে দিয়েছে দূতাবাসের মাধ্যমে। বাকিগুলো এখনো তার কাছেই আছে। সশস্ত্র সৈনিক দুজন খানিক আগে এরকম কিছুর খোঁজই করছিল।

ঢাকা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের বিমানে ওঠার আগেও তল্লশি হয়েছে। তবে এই করাচি বিমানবন্দরে তল্লাশির ব্যাপকতা আরো বেশি যেন।

...অপেক্ষার দীর্ঘ প্রহর শেষে লাউডস্পিকারে ব্যাংককগামী যাত্রীদের বিমানে ওঠার অনুরোধ জানানো হলো এসময়। আড়মোড়া ভেঙে, অপেক্ষার শেষে স্বস্তিতে দাঁড়িয়ে পড়ল অনেকে। অনেকের সাথে মিশে থেকে সেও হাঁটা শুরু করল দাঁড়িয়ে। হঠাৎ করেই, হ্যাঁ, অনেকটা হঠাৎ করেই, জুতোর ফিতে বাঁধার ছলে উবু হয়ে কার্পেটের নিচে হাত গলিয়ে দিল সে। লুকিয়ে রাখা নোটবই আর ফিল্মরোলগুলো বের করে ঢুকিয়ে নিল মোজায়।

সোজা হয়ে দাঁড়িয়েই সে আবার হাঁটা শুরু করল দ্রুত। নীলাভ চোখের যুবকের বুকে তখন ঢাকের শব্দ। আশা করা যায়, কেউ দেখতে পায়নি। তবে যদি দেখে ফেলে? কী হবে তাহলে? 'হল্ট, থামো!' বলে সজোরে এখনই চেঁচিয়ে উঠবে না তো কোনো সৈনিক?

... বিমানে ওঠার পরেও যুবক ঠিক স্বাভাবিক হতে পারল না। তটস্থ হয়ে রইল পুরো সময়টাই। শ্বাস চেপে বসে রইল টেকঅফের আগ পর্যন্ত।

আকাশে ওড়ার মিনিট দশেক পরেই সে চাইল এক গ্লাস শ্যাম্পেন। মুখ ধুয়ে এল ওয়াশরুমে গিয়ে। এতটা নির্ভার সে আগে কখনো বোধ করেনি।

শ্যাম্পেনের গাস শেষ করার পর যুবক মোজার ভেতর থেকে বের করল তার নোটবই। আর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করতেও সে রাজি নয়। সত্যিকারের সংবাদ দিয়ে স্কুপ করার সুযোগ পেশাদার জীবনে একজন সাংবাদিক খুব বেশি বার পায় না। আর সে নিশ্চিত, এর চেয়ে বেদনাদায়ক চমকপ্রদ সত্য খুব বেশি বার লেখা হয়নি আগে। সামনে রাখা নোটপ্যাড টেনে নিয়ে কাঁপা কাঁপা হাতে লেখা শুরু করল সে, 'ইন দ্য নেইম অব "গড অ্যান্ড আ ইউনাইটেড পাকিস্তান", ঢাকা ইজ টুডে এ ক্রাশড অ্যান্ড ফ্রাইটেনড সিটি... '

নীলাভ চোখের এই যুবকের নাম সায়মন ড্রিং। বাংলাদেশের গণহত্যার ভয়াবহতা বিশ্ববাসী প্রথম জানবে তার কলমের মাধ্যমে, 'ট্যাঙ্কস ক্রাশ রিভোল্ট' প্রতিবেদনে।

বিপ্রতীপ কোণ

তাজউদ্দীন চোখ খুললেন।

বিমান উড়ছে খুব নিচ দিয়ে। সকালের আলো এদিক সেদিক লাফিয়ে লুকোচুরি খেলছে যেন জানালার সাথে। এই মুহূর্তে সেটা এসে পড়েছে তাজউদ্দীনের চোখে।

... চোখ। শব্দটা মনে হতেই তাজউদ্দীনের আবারো মনে পড়ে গেল শেখ মুজিবের চোখ টিপির কথা।

ইন্দিরা গান্ধীর স্টাডি রুমেও এই চোখ টিপির কথা মনে পড়েছিল তাজউদ্দীনের। ভারতের উঁচু পদমর্যাদার অফিসাররা তাকে ঢুকিয়ে দিয়েছিল মিসেস গান্ধীর স্টাডি রুমে। বারান্দায় পায়চারি থামিয়ে ঘরে প্রবেশ করেই ইন্দিরা তাকে প্রশ্ন ছুড়েছিলেন, 'হাউ ইজ শেখ মুজিব? ইজ হি অলরাইট?'

সীমান্ত পাড়ি দেয়ার পরমুহূর্তটি থেকে ভারতীয় কর্মকর্তাদের বিভিন্ন প্রশ্ন থেকে তাজউদ্দীন ইতোমধ্যেই জেনে গেছেন বাংলাদেশে কী ঘটছে এখন, তা নিয়ে অন্ধকারে রয়েছে প্রতিবেশী রাষ্ট্রও। তার সহকর্মীরা কে কোথায় আছেন জানা নাই, সীমান্ত পার হতে পারবেন কি না, উত্তর মেলেনি সে প্রশ্নেরও। তবে প্রতিটি জাতীয়তাবাদী গণতন্ত্রী দলের মতো, তার দলেও তো ভিন্ন চিন্তা থাকতেই পারে অন্যদের। তাজউদ্দীনের চিন্তার তাই শেষ নেই, শেখ মুজিবের প্রতিনিধি বলে তিনি নিজেকে উপস্থাপন করলে বিরূপ কোনো প্রতিক্রিয়া হবে না তো?

ঠিক তখনই বাইশ বছর আগের আরো এক এপ্রিলের স্মৃতি মনে পড়ে তাজউদ্দীনের। তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের দাবি-দাওয়া নিয়ে আন্দোলন করছে, আন্দোলনে সাধারণ ছাত্রদের নিয়ে নেতৃত্ব দিচ্ছেন মুজিব ভাই স্বয়ং। কয়েকজন ছাত্রকে বহিষ্কার করাও হয়েছে। এক বিকালে ভাইস চ্যান্সেলরের বাড়ি দখল করে যখন তাজউদ্দীনেরা বসে আছেন এই শাস্তি রদের দাবি নিয়ে, তখন চলে এলেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, সাথে পুলিশের দলবল নিয়ে এসপি। পাঁচ মিনিটের মাঝে বাড়ি না ছাড়লে সবাইকেই হাজতে পোরা হবে, হুমকি দিলেন ম্যাজিস্ট্রেট।

মুজিব ভাই ঠিক করেছিলেন আরো আটজন নিয়ে ধরা দেবেন, তিনি আটক হলে হয়তো ঝিমিয়ে আসা আন্দোলন আরো তীব্রতর হবে। তাজউদ্দীনের ওপর নির্দেশ ছিল তাকে বাইরে থাকতে হবে। কিন্তু কপাল ভালো ছিল না সেদিন। ভিড়ের চাপে বাইরেই যেতে পারলেন না তাজউদ্দীন, আর ঘরের ভেতর ছাত্রদের গ্রেপ্তার করতে শুরু করল পুলিশ।

সংকটের ঠিক ওই মুহূর্তে ম্যাজিস্ট্রেটের নজর এড়িয়ে তাজউদ্দীনকে চোখ টিপি দিলেন শেখ মুজিব।

উপস্থিত বুদ্ধির কমতি তাজউদ্দীনের ছিল না কখনোই। মুহূর্তে পকেট থেকে কয়েক টুকরো কাগজ বের করে তিনি চ্যাঁচাতে লাগলেন, 'সরেন সবাই। সরেন, সরেন ! আমি প্রেস রিপোর্টার। কে কে গ্রেপ্তার হইছেন, নাম বলেন ভাইরা। আপনাদের নিয়ে প্রতিবেদন যাবে পত্রিকায়।'

শেখ মুজিবের ঐ চোখ টিপিতে ধূর্ততা ছিল, পুলিশ সেদিন বোকা বনে গিয়ে আটক করেনি তাজউদ্দীনকে।

ওই চোখ টিপিতে ছিল বিশ্বাস আর আস্থাও। আর তাই বাইশ বছর পরে, ইন্দিরার আলোকিত স্টাডিতেও কূটনৈতিক উত্তরে গলা এতটুকু কাঁপেনি তাজউদ্দীনের। হ্যাঁ, শেখ মুজিব তাদের দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছেন, মুক্তিযুদ্ধ শুরু করে দিয়েছে বাংলাদেশ। ২৫ মার্চের পর থেকে সুপ্রিম লিডার মুজিবের সাথে তাদের যোগাযোগ হয়নি অবশ্য। তবে তাদের ধারণা গোপন কোনো স্থানে নিরাপদেই আছেন মুজিব।

নিচু স্বরে বলা উত্তরটি শুনে ইন্দিরা আরো একবার খুঁটিয়ে দেখলেন মানুষটিকে। চশমার আড়ালের ঐ চোখজোড়া দেখে ইন্দিরার মনে হয়, যায়, এই লোকটাকে বিশ্বাস করা যায়। এই চোখজোড়াকে বিশ্বাস করে ঠকবে না কেউ।

এরপরে আলোচনা চলে। শরণার্থী প্রবেশ নিয়ে, মুক্তি যুদ্ধে ভারতীয় ভূখণ্ড ব্যবহার নিয়ে, অস্ত্র আর বারুদ দিয়ে সাহায্য নিয়ে। তবে হ্যাঁ, ভারত কেবল সাহায্যই করবে, যুদ্ধটা কিন্তু বাংলাদেশেরই– মনে করিয়ে দেন তাজউদ্দীন। দিল্লি থেকে আমীর-উল ইসলামকে সাথে নিয়ে এরপর তিনি ফিরে আসেন কলকাতায়। তারপরেও গড়িয়ে গেছে অনেকটা সময়, ঘটেছে বিস্তর। তার মাঝে কিছু ঘটনা একেবারেই মনে করতে চান না তাজউদ্দীন। আপাতত রাশিয়ান এই বিমানে করে কদিন থেকে সীমান্ত আকাশে ওড়াওড়ি করে যাচ্ছেন তারা কয়েকজন। মালদহ, শিলিগুড়ি, রুপসা, আসাম।

তাজউদ্দীনের হঠাৎ করেই বাচ্চাদের কথা মনে পড়ে যায়। আকাশে আকাশে উড়ে বেড়াতে পারলে রিমি-রিপিরা খুশি হতো নিশ্চয়ই! মনটা কেমন যেন খারাপ হয়ে যায় তাজউদ্দীনের। সেই ভাব কাটাতে অযথাই পাশে বসা আমীর-উল ইসলাম সাহেবকে খোঁচা দেন তিনি।

'আমীর-উল ইসলাম সাহেব, কী ব্যাপার? কথা বলেন না কেন, বাসার কথা মনে পড়ে নাকি?'

নিজ চিন্তায় ডুবে থাকা আমীর-উল ইসলাম আবার বিমানে ফিরে আসেন। অস্ফুট স্বরে কী যেন একটা জবাব দেন তিনি। তাজউদ্দীন আর তাকে বিরক্ত করেন না। আবার জানালা দিয়ে বাইরে তাকান।

আমীর-উল ইসলামও ব্যস্ত ছিলেন স্মৃতির সাথে। গত দুই সপ্তাহ কেমন নাগরদোলার মতো কেটেছে সেটাই ভাবছিলেন তিনি। মনে হচ্ছিলো, মানুষের জীবনটা ভারি অদ্ভুত।

তাজউদ্দীন ভাই, কামাল হোসেন আর তিনি একই সাথে যাত্রা শুরু করেছিলেন ২৫ তারিখের কালো রাতটিতে। কামাল হোসেন পথে জোর করে তার এক আত্মীয়ের বাড়িতে নেমে যাওয়ায়, তারা দুইজনই লালমাটিয়ার পরিচিত এক ইঞ্জিনিয়ার আবদুল গফুরের বাড়িতে ঢুকে পড়েন। খানিক পরেই শুরু হয়ে যায় ব্রাশফায়ারের শব্দ। পরিস্থিতি দেখার জন্যে তিনি আর তাজউদ্দীন ভাই চলে যান ছাদে। সে দৃশ্য কখনো ভুলবেন না তারা। সারারাত চলেছে বোমাবর্ষণ আর শোনা গেছে মানুষের কান্নার আওয়াজ। মাঝেই মাঝেই যুদ্ধাস্ত্রের নীলাভ ঝলকানি আকাশকে আলো দিয়েছে। মাঝরাতের দিকে ধানমণ্ডির ৩২ নম্বরের দিক থেকে গোলাগুলির আওয়াজ শোনার পর তাজউদ্দীন ভাই তো কেঁদেই দিলেন, তার ধারণা হামলা হয়েছে মুজিব ভাইয়ের বাড়িতেই।

সে রাতটা ওই বাড়িতেই কাটল। কারফিউর কারণে পরের রাতটাও কাটাতে হলো সেখানে। ইতোমধ্যে দুইজনে স্থির করেছেন কর্তব্য। চেষ্টা চালাতে হবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সংগঠিত করার। ২৭ তারিখে কিছুক্ষণের জন্যে কারফিউ তোলার ঘোষণা শুনতেই দুইজনে বেরিয়ে পড়েন। যথাসম্ভব ছদ্মবেশ নিয়েছেন তারা, দুইজনের হাতে বাজারের থলি। তাজউদ্দীন ভাই লুঙ্গি, পাঞ্জাবি আর সাদা টুপি মাথায় বেরিয়েছিলেন। নামটাও পালটে ফেলেছিলেন তারা। তাজউদ্দীন নাম নিলেন মোহাম্মদ আলী, চাঁদপুরের এক ঠিকাদার, আর আমীর-উল ইসলাম হলেন তার আত্মীয়, নাম নিলেন রহমত আলী।

সাত মসজিদ রোড পার হতে গিয়ে তাজউদ্দীন ভাইয়ের মাথায় বোধহয় এক মুহূর্তের জন্যে ঠাঁই পেয়েছিল তাঁর পরিবার। রাস্তার পাশ থেকে এক টুকরো কাগজ কুড়িয়ে নিয়ে তিনি একটা ছোট্ট চিরকুট লিখেছিলেন তাদের।

'লিলি, আমি চলে গেলাম। যাবার মুহূর্তে কিছু বলে আসতে পারি নাই, মাফ করে দিও। পরিবার নিয়ে তুমি সাড়ে সাত কোটি মানুষের মাঝে মিশে যেও। কবে দেখা হবে জানি না...মুক্তির পর।'

চিরকুটের কথাটা মনে হতে আমীর-উল ইসলাম আড়চোখে একটু তাজউদ্দীন ভাইকে দেখে নেন। অমন ভাষায়, অমন আশ্চর্য আদর্শে, অমন অদ্রি দৃঢ়তায় কী করে ঐ চিরকুট লিখেছিলেন মানুষটি?

...আমীর-উল ইসলাম একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন। তিনি নিজেও একই কাজ করেছিলেন, চিন্তা করতে মানা করে স্ত্রী লীলার কাছে পাঠিয়েছিলেন একটা চিরকুট। রায়ের বাজার আওয়ামী লীগের এক কর্মীর হাতে সেগুলো পৌঁছে দেবার দায়িত্ব দিয়েছিলেন তারা। ঢাকা ছাড়ার আগেই এইরকম কর্মী আর

সাধারণ যুবক বয়েসের ছেলেদের কাছ থেকে ভাসাভাসা কিছু খবর নেন তারা। শেখ মুজিব বন্দী হয়েছেন না আত্মগোপন করেছেন, তা কেউ জানে না; তবে অন্য নেতারা নাকি সীমান্তের দিকেই যাবেন।

এরপরে শুরু হয়েছিল তাদের যাত্রা। কখনো হেঁটে, কখনো রিক্সায়, কখনো নৌকায়, কখনো ঘোড়ায় চড়ে চলে সেই অভিযান। কখনো কোনো স্থানীয় নেতা, কখনো কোনো যুবক কর্মী, কখনো নিতান্ত সাধারণ মানুষের সাহায্য আশ্রয় করে তারা সীমান্তের কাছে চলে আসেন। তারপর তো সেই ইন্দিরা পর্ব।

তবে সব কিছু এই বিমান যাত্রার মতো মসৃণ ছিল না, আমীর-উল ইসলাম ভাবেন। নানা ফ্রন্ট থেকে সরকার গঠনের চাপ এসেছে, আর তাজউদ্দীন ভাই বারবার তার কাছে মাথা নেড়ে বলেছেন, 'দেখলেন আমীর-উল ইসলাম, মুজিব ভাই আমাকে কী বিপদেই না ফেলেছেন। আপনি তো ভেতরের রাজনীতি জানেন না। সরকার গঠন করা হলে সেটার হাই কমান্ড কীভাবে তৈরি হবে? প্রধানমন্ত্রীই বা হবে কে?'

আমীর-উল ইসলাম বলেছিলেন, 'কেন, বঙ্গবন্ধু যে হাই কমান্ড দিয়ে গিয়েছিলেন, সেটাই হবে এই নতুন বাংলাদেশ সরকার। আর প্রধানমন্ত্রী হবেন আপনি। ২৫ তারিখের পর থেকে হাইকমান্ডে আপনিই তো সবচেয়ে প্রধান দায়িত্বগুলো পালন করে আসতেছেন।'

তাজউদ্দীন ভাই সহজে রাজি হননি। তিনি মুজিব ভাইকেই বানাতে চেয়েছিলেন সরকার প্রধান। তবে এতে স্বয়ং মুজিবের নিরাপত্তায় ঝামেলা হতে পারে ভেবে সে পথে আর যাওয়া হয়নি তাদের। আবার, যেহেতু অন্য কোনো নেতা সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারতে আসার খবর তাজউদ্দীন ভাইয়ের কাছে ছিল না, আর ভারতের সরকারি সাহায্যের জন্যে একটা আইনি কাঠামোও অবশ্যই দরকার ছিল, রাজি না হয়ে উপায় ছিল না তাঁর।

দিল্লি থেকে কলকাতার ফেরার আগে ইন্দিরা তাদের জানান, শেখ মুজিব গ্রেপ্তার হয়েছেন, সরকারিভাবে অবশ্য এখনো সে তথ্য প্রকাশ করেনি পাকিস্তান সরকার। অন্যদিকে একই সময় আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এসে পৌঁছায় তাদের হাতে, সিলেটের ছায়া ঢাকা এক চা-বাগানে ইতোমধ্যে একত্রিত হয়েছিলেন ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বিদ্রোহী কমান্ডারেরা। তেলিয়াপাড়ার ঐ বৈঠকে সম্মিলিত এক মুক্তিফৌজ গঠন করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন মেজর খালেদ মোশাররফ, মেজর জিয়াউর রহমান, মেজর শফিউল্লাহ, মেজর নুরুজ্জামানেরা; আর সেই মুক্তিফৌজের মাধ্যমে যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব কাঁধে নিতে সামরিক অফিসারেরা অনুরোধ করেছেন কর্নেল আতাউল গণি ওসমানীকে। ভবিষ্যৎ স্বাধীনতা যুদ্ধের অন্যতম দরকারি উপাদান সামরিক বাহিনী সংগঠনের কাজ তাই এগিয়ে গেছে অনেকটা।

কলকাতা এসেও পাওয়া গেল বেশ কিছু ভালো খবর। মনসুর ভাই, কামারুজ্জামান ভাই কলকাতা এসে গেছেন। শেখ মনিও আছেন কামারুজ্জামান ভাইয়ের সাথে গাজা পার্কের বাড়িতে।

কেন আর কোন পরিস্থিতিতে দিল্লি গেছেন, কেন ইন্দিরার সাহায্য চেয়েছেন, কীভাবে হাইকমান্ড গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল, লর্ড সিনহা রোডের বাড়ির এক বৈঠকে দলের উপস্থিত নেতা আর যুব নেতাদের সেটা বোঝাতে চাচ্ছিলেন আমীর উল-ইসলাম আর তাজউদ্দীন।

কিন্তু কেমন যেন খেপে গিয়েছিলেন শেখ মনি, বিমানের জানালায় চোখ রেখে মনে পড়ে যায় আমীর-উল ইসলামের।

'সরকার গঠন মানে?' বলেছিলেন উত্তেজিত শেখ মনি। 'এটা কি মন্ত্রিসভা বানানোর সময় নাকি? আর আপনি প্রধানমন্ত্রীর পরিচয় দিলেন কী মনে করে? ড্রেস অ্যাজ ইউ লাইক খেলা পেয়েছেন নাকি এটাকে, অ্যাঁ? যেমন ইচ্ছে, তেমনি মন্ত্রী সেজে যাবেন?'

... তাজউদ্দীন ভাইয়ের ওপর চোখ গিয়েছিল আমীর-উল ইসলামের। মনে হচ্ছিলো, সে সময় পারলে যেন লজ্জায় মাটিতে মিশে যান তিনি।

শেখ মনি আরো বলেছিলেন, 'এসব খেলাধুলা বাদ দিন। বঙ্গবন্ধু শত্রুদের হাতে বন্দী, বাংলার যুবকেরা অকাতরে রক্ত দিচ্ছে। এখন যুদ্ধের মাঠেই আসল নেতৃত্ব গড়ে উঠবে। মন্ত্রিসভাটভা সব বাদ। আমাদের দরকার এখন বিপ্লবী কাউন্সিল।'

শেখ মনির কথায় সাড়া দিয়েছিলেন উপস্থিত প্রায় সব নেতাই। আর ঠিক তখনি মুখ খুলেছিলেন আমীর-উল ইসলাম। খুলতে আসলে বাধ্য হয়েছিলেন, কারণ এসবের জবাব তো তাজউদ্দীন দিতে পারেন না।

আমীর-উল ইসলাম বলেছিলেন, 'দিল্লি যাওয়ার আগে তো আর তাজউদ্দীন ভাইয়ের জানা ছিল না যে কারা কারা বেঁচে আছেন। কাজেই তাকে দোষ দিয়ে লাভ কী! আর হাই কমান্ড তো মুজিব ভাই নিজেই গঠন করে গেছেন। তাজউদ্দীন সাহেব দলের সাধারণ সম্পাদক, তার তো ইন্দিরা গান্ধীর কাছে প্রতিনিধি হয়ে যাওয়াটা ভুল কিছু না। ... বিপ্লবী কাউন্সিল যদি গঠন করেন, তখন দেখা যাবে অন্য মতের অন্য কেউ আরেকটা কাউন্সিল বানিয়েছে, তখন সাধারণ মানুষ কোন কাউন্সিলের কথা শুনবে? একটা বিশ্রী ঝামেলা লাগবে না তখন?'

পরিস্থিতি ঠান্ডা হয়েছিল তার কথায়, আমীর-উল ইসলামের মনে পড়ে। কেবল শেখ মনি অসন্তুষ্ট রয়ে গেলেন। শেখ মুজিবের ভাগ্নে বলে এই যুবনেতার প্রতিপত্তিটাও আলাদা, জানেন আমীর-উল ইসলাম। পরের দিন সকালে, গতকাল কিন্তু ঠান্ডা মাথায় কামারুজ্জামান হেনা ভাই আর মনসুর ভাইও সায় দিয়েছেন তাজউদ্দীন ভাইয়ের মন্ত্রিত্বে। তবে শেখ মনির রাগ মনে হয় এখনো পড়েনি।

সামনের আসনে বসা শেখ মনির দিকে এক পলক আড়চোখে তাকালেন আমীর-উল ইসলাম । গত রাতের ঘটনার পরে শেখ মনির রাগ আরো বেড়েছে বলে মনে হয়। শিলিগুড়ির এক ডাক বাংলোতে গত রাতটা কাটিয়েছেন তারা সবাই। শেখ মনি আড়ালে ডেকে নিয়ে তাজউদ্দীন ভাইকে কিছু একটা বলার পর তাজউদ্দীন ভাই তাকে বলেছিলেন, প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতা রেকর্ড করা ক্যাসেটটি যেন প্রচার করা না হয় তা গোলোক মজুমদারকে জানিয়ে দিতে।

'কিন্তু ক্যাসেট যে চলে গেছে তাজউদ্দীন ভাই, এখন সেটা ফিরিয়ে নিলে সন্দেহ হবে না ভারতীয় সরকারের? তাদের কি মনে হবে না যে স্বাধীনতা যুদ্ধ না, আমরা আসলে দলাদলিতে ব্যস্ত?' আমীর-উল ইসলাম সরোষে বলেছিলেন।

তাজউদ্দীন ভাই নিস্পৃহ ছিলেন, 'তারপরেও মনি যখন বলছে, তখন ক্যাসেটটা আপাতত প্রচার হতে দিয়েন না। পরে দেখা যাবে।'

ক্ষুব্ধ হয়ে গোলোকবাবুকে ক্যাসেটটি ফিরিয়ে দিতে বলেছিলেন আমীর-উল ইসলাম। কিন্তু তাকে অবাক করে গোলোকবাবু জানিয়েছিলেন, ক্যাসেট ফিরিয়ে আনার উপায় নেই আর, ওটা প্রচারকেন্দ্রে পৌঁছে গেছে।

এরপর ডাকবাংলোর খাবার টেবিলে তারা সকলে চুপ হয়ে গেলেন আচমকা। রেডিওতে হঠাৎ বেজে উঠেছে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের প্রথম প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ। শেখ মুজিবের ডেপুটি তাজউদ্দীনের কণ্ঠে 'জয় বাংলা' শুনল বিশ্ববাসী। সেই থেকে শেখ মনির মুখের অন্ধকার কাটেনি, খেয়াল করেছেন আমীর-উল ইসলাম। সোভিয়েতে তৈরি করা বিমানটির জানালা পথে প্রবেশ করা সূর্যালোকও পারেনি এই যুবনেতার মুখে আলো ফেরাতে।

হঠাৎ করেই আকাশ-পাতাল চিন্তা শেষ করে বাস্তবে ফিরতে হয় আমীর-উল ইসলামকে। নিচে নামছেন তারা, কারণ বিমানকে সংকেত দিয়ে কিছু বলতে চাইছে বিএসএফ জওয়ানরা। বিমান নিচে নামতেই বোঝা গেল কারণটা। ময়মনসিংহ সীমান্তে অপেক্ষা করছেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম আর আবদুল মান্নান। আগের নির্দেশ অনুসারে তাদের সেখানেই অপেক্ষা করতে বলেছে বিএসএফের ছেলেরা।

বিমানে ওঠার আগেই তাজউদ্দীন গত কয়েকদিনের সমস্ত ঘটনা জানালেন নজরুল ইসলামকে। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীনকে অভিনন্দন জানালেন ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি নজরুল ইসলাম। কোলাকুলির পরে রাশিয়ান ডাকোটা বিমানটি আবার আকাশে উড়ল। নজরুল ইসলাম এবার জানালেন তার গল্পটা। আত্মীয় আলীম চৌধুরীর ছোট ভাইয়ের বাসায় পালিয়ে ছিলেন তিনি, ঢাকা থেকে পালিয়েছেন পরচুলা ও মেয়েদের কাপড় পরে।

খাপখোলা তলোয়ারের মতো ধারালো রসিকতা করেন বলে খ্যাতি আছে ক্যাপ্টেন মনসুর আলীর। সেই সুনাম বজায় রাখতেই যেন ঢাকাইয়া টানে হঠাৎ

রসিকতায় মাতেন তিনি, 'কন কী নজরুল সাব! হুদা বোরখা দেইখাই ছাইড়া দিল আপনেরে? ...তাইলে তো আপনেরে বোরখায় ঢাইকা ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট ভি আমরা জিতা নিবার পারুম!'

রাশিয়ান বিমানের ভেতরের জমাট গুমোটকে কাটিয়ে সশব্দে হেসে উঠল সবাই। আকাশে উড়তে উড়তে ধীরে ধীরে সংগঠিত হচ্ছে বাংলাদেশের প্রথম স্বাধীন সরকার।

হাসতে হাসতেই শেখ মনির দিকে আবারো চোখ যায় আমীর-উল ইসলামের। শেখ মনির হাসিতে কোথায় যেন মিশে আছে আড়ষ্টতা।

নানা আকারের জ্যামিতিক মেঘে ঢাকা আকাশের দিকে চেয়ে আমীর-উল ইসলামের মনে হয়, ইতিহাসের সাদা পাতায় তৈরি হয়েছে একটি দুর্বোধ্য বিপ্রতীপ কোণ। তাজউদ্দীন নামের সরলরেখাটির গতিপথে আড়াআড়ি চলে গেছে শেখ মনির রেখাটি। মুক্তিযুদ্ধের সমীকরণ, হয়ে উঠেছে আরো একটু জটিল।

অরণ্যের ডাক

রমনা পুলিশ স্টেশনটা দেখা যাচ্ছিলো ইরতেজাদের বাড়ির ছাদ থেকে। এপ্রিলের বিকালে সেদিন রোদের তীব্রতা ছিল কম, শহরটাও ধুঁকছিল অক্সিজেনের জন্যে। ইস্কাটনের পাক-মোটর রাস্তা থেকে মাঝে মাঝে গাড়ির শব্দ ভেসে আসছিল, সে শব্দও কেমন বহু বহু মাইল দূরের এক অরণ্যকে মনে করিয়ে দিচ্ছিলো হাবিবুল আলমদের। আলী আহমেদ জিয়াউদ্দিন ফিসফিস স্বরে প্রশ্ন করেছিল, 'যুদ্ধে যাবি তোরা? মুক্তিযুদ্ধে?'

'তোরা' মানে তারা তিনজন। হাবিবুল আলম, আবদুল কাইয়ুম, ইরতেজা রেজা। ঢাকা ভার্সিটি পড়ুয়া বন্ধু সবাই। লাফিয়ে উঠেছিল হাবিবুল আলমেরা। যুদ্ধ শুরু হয়েছে তাহলে? সত্যিই?

জিয়াউদ্দিন জানায়, মুক্তিযুদ্ধ এখন আর গুজব নয়। নানা জায়গায় লড়াই হচ্ছে। ক্যাপ্টেন হায়দার নামের কে একজন দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছে জিয়াউদ্দিনকে। প্রচুর তরুণ যোদ্ধা দরকার সেক্টর টু-এর জন্যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র যোগাড় করতেই এসেছে জিয়াউদ্দিন। দুই নম্বর সেক্টরের কমান্ডার মেজর খালেদ মোশাররফ। তিনি ঐ ক্যাপ্টেন হায়দারকে দায়িত্ব দিয়েছেন ছাত্রদের দিয়েই গেরিলা বাহিনী বানাতে।

'দেখা মাত্র ক্যাপ্টেন হায়দারকে তোদের ভালো লেগে যাবে, দেখিস!' বলেছিল জিয়াউদ্দিন। 'মানুষটা না কেমন যেন। কয়েকদিন আগে ব্যথা পাওয়ায় একটা হাত স্লিংয়ে ঝুলছে, তারপরেও কী যে অদ্ভুত প্রাণশক্তি তার!'

যাবে, অবশ্যই তারা যাবে যুদ্ধে। ঠিক করেছিল হাবিবুল আলমেরা। সবার নজর এড়িয়ে কীভাবে মতিনগর পৌঁছবে সেটাও আলোচনা করেছিল তারা পরদিন।

পাকিস্তান বয়েজ স্কাউটের হয়ে সিডনির অস্ট্রেলিয়ান স্কাউট জাম্বুরিতে যাবার সময় পিআইএ'র একটা শক্তপোক্ত ট্রাভেল ব্যাগ পেয়েছিল হাবিবুল আলম। হালকা অথচ টেকসই, ঠিক যেমনটা দরকার। পরিবারের একমাত্র ছেলে সে, তাই যুদ্ধে যেতে হলে তাকে যেতে হবে সবার অলক্ষে, জানত হাবিবুল আলম। বাসায় এমনিতেই দুই বোন আছে, খুলনা থেকে বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে আসা বড় বোন পালানোর কাজটা কঠিন করে তুলেছিল আরো।

হাবিবুল আলম তাই ঘুম থেকে উঠেছিল চারদিক অন্ধকার থাকতেই। বিছানায় চাদরে ঢেকে দিয়েছিল একটা বড়সড় কোলবালিশ, পানির গ্লাসের নিচে রেখেছিল চিঠিটা। টিনের ছাদের ওপর পা টিপে টিপে হেঁটে, লাফ দিয়েই দোতলা থেকে দিলু রোডের রাস্তায় নেমেছিল হাবিবুল আলম। প্রায় নির্জন রাস্তায় জোরকদমে হেঁটে, মগবাজার মোড়ের কাছে পেয়ে গিয়েছিল একটা রিকশা। কাকরাইল হয়ে চলে এসেছিল বায়তুল মোকাররমে। সেখানে স্কাউট হেডকোয়ার্টারের পিয়ন নিজাম তার পরিচিত, ওর কাছেই কিছু টাকা রাখবে বলে কথা দিয়েছিল জিয়াউদ্দিন। ঘুম থেকে নিজামকে তুলে এক কাপ চা'ও খেয়েছিল হাবিবুল আলম।

'এত সকালে বিরক্ত করলাম দেখে কিছু মনে কইরো না বুঝলা', টাকা নিতে নিতে পিয়নকে বলেছিল হাবিবুল আলম। 'গ্রামের বাড়ি যাইতেছি আসলে। সকালের আগে রওয়ানা দিলে যাইতে সুবিধা।'

সেখান থেকেই রিকশা নিয়ে হাটখোলা, প্ল্যান মোতাবেক ওখানেই জড়ো হয়েছিল জিয়া-কাইয়ুমেরা। এরপরেই মুড়ির টিন মার্কা এক লক্কর-ঝক্কর লোকাল বাসে করে কুমিল্লা। প্রচুর মানুষ উঠেছিল সে বাসটায়। হাবিবুল আলমেরা বুঝতে পেরেছিল, প্রাণের ভয়ে ঢাকা ছাড়ছে মানুষগুলো। প্রচণ্ড এপ্রিলের গরমটা হঠাৎ-ই উবে গিয়েছিল দাউদকান্দি ফেরি ঘাটের কাছে আসতেই। কী বাতাস! ফেরি পাহারা দিতে থাকা পাক মিলিটারিগুলোর দিকে তাকিয়ে রাতজাগার ক্লান্তি নিয়ে হাবিবুল আলমের ইচ্ছে হয়, সব কিছুই উড়ে যাক এ বাতাসে। মিলিটারি উড়ে যাক, ফেরি ঘাট উড়ে যাক, উড়ে যাক সে নিজেও। থেকে যাক শুধু উতল হাওয়া।

এলিয়টগঞ্জ ব্রিজের কাছাকাছি আসতেই ঝুম বৃষ্টি নামল। বাসের ছাদে বসা হাবিবুল আলম ভিজে একেবারে চুপচুপে। যাত্রার তখনও অনেক বাকি।

বাস থেকে নেমে খানিক হেঁটে শ্যামপুর বাজারে পৌঁছেছিল ওরা, সেখান থেকেই কিছুটা পথ গিয়েছিল রিকশায়। এরপর আবার পায়ে হেঁটে গ্রাম পেরুল, পেরিয়ে এল অনেকগুলো ফসলের খেত, অনেকটা কাদামাটির রাস্তা।

সবচেয়ে দীর্ঘ পথটাকেও শেষ হতে হয়। একসময় তাই কুমিল্লা দিয়ে বর্ডার পেরিয়ে গেল ছোট্ট দলটা। মতিনগর বাজারের কাছে ভারতের মাটিতে প্রথমবারের মতো নাস্তা করল ওরা। হাবিবুল আলমের প্রচণ্ড ক্ষুধা লেগেছিল। মিষ্টি, ডিম আর হাতে বানানো রুটি দিয়ে আপাতত মিটল সে জ্বালা। নাস্তা করবার সময়েই সেক্টর টুয়ের সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট ফজলুল কবিরের জিপ গাড়ি থেমেছিল দোকানটার সামনে। জিয়াউদ্দিন পরিচয় করিয়ে দিল দুই পক্ষকেই। ঢাকা থেকে আসা ছাত্রদের কাছে রাজধানীর খবর জানতে অনেকগুলো প্রশ্ন করল লেফটেন্যান্ট, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। সেক্টর টুয়ের হেডকোয়ার্টারে পৌঁছতে পৌঁছতে রাত হয়ে গেল।

ওদের পাঠানো হলো সেকেন্ড প্লাটুনের তাঁবুতে, সবুজ রঙের বিশাল একখানা তাঁবু। তারেকুল আলমের সাথে এখানেই দেখা হয়ে গেল হাবিবুল আলমের। এর আগে এস এম হলের ছেলেটিকে হাবিবুল আলম কয়েকবার দেখেছে, তবে পরিচয় জানা হলো এই ক্যাম্পেই। তারেকের কাছ থেকেই হাবিবুল আলম শুনল পঁচিশে মার্চের রাতের বিশ্ববিদ্যালয় হলগুলোর অবস্থাটা।

'এই জায়গার খোঁজ পাইলা ক্যামনে?' জানতে চেয়েছে হাবিবুল আলম।

'ঢাকা থেকে সইরে যাচ্ছিলাম। মেজর জিয়াউর রহমান নামের একজন শুনলাম রেডিওতে শেখ সাহেবের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ডাক দিল। সাথে সাথে ঠিক করলাম যোগ দিবো।' তারেক বলে যায়। 'কুমিল্লা আসার পরে আরেক বন্ধুরে দেখলাম এইখানে আসতে, মতিনগরে। আর কী, চিটাগাং যাবার বদলে এইখানেই চইলে আসলাম।'

...সে রাতে মরার মতো ঘুমাল ওরা সবাই।

আজ সকালে ঘুম ভেঙেছে হাবিলদার কাশেম নামের এক জওয়ানের ডাক শুনে। লাইন ধরে তাঁবু থেকে বেরিয়ে এসেছে সবাই। নাস্তায় রুটি খেয়ে খানিক হালকা দৌড়ঝাঁপ করেছে, এরপর ওদের সবাইকে দাঁড় করিয়ে দেয়া হয়েছে একটা মাঝারি টিলার পাশে।

'আসছেন, উনি আসছেন।' চারপাশের জওয়ানেরা মনে করিয়ে দিচ্ছে একটু পরপরই। 'খালেদ মোশাররফ আসছেন। খুব খুঁতখুঁতে মানুষ কিন্তু উনি, একটু এদিক-ওদিক হলেই বাদ দিয়ে দেবে আপনাদের।'

অপেক্ষা করতে করতে হাবিবুল আলমের মনে তাই খেলে যায় গত কয়েকদিনের ঘটনাবলি। এত কিছু করে, এত দূরে এসে শেষ পর্যন্ত কি হওয়া যাবে মুক্তিযোদ্ধা? যা শুনছে, তাতে সে একটু ভীত না হয়ে পারে না। যে রকম মানুষ খালেদ মোশাররফ, তাতে করে হাবিবুল আলমের মতো সাধারণ ছাত্ররা কি পাবে শুধু দেশপ্রেমকে আশ্রয় করে পাক মিলিটারির সাথে লড়বার সুযোগ?

... ধুলোর ঝড় তুলে হঠাৎ করেই মাটি ফুঁড়ে যেন উদয় হলো তিনটি টয়োটা জিপ। হাবিবুল আলম এর জন্যে একদমই প্রস্তুত ছিল না। সামনের জিপটা ওদের সামনে থামল ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষে থামার পরেও সে অবস্থা কাটল না তার।

দৌড়ে গিয়ে জিপের দরজা খুলে একটা স্যালুট ঠুকে দিল ক্যাপ্টেন মাহবুব। ভেতর থেকে যে মানুষটা বেরিয়ে এলেন, তার উপস্থিতিটাই কেমন বদলে দিল পরিবেশ। তার ব্যক্তিত্বের ভারে হঠাৎ করেই বোকাসোকা দেখাতে থাকল চটপটে ক্যাপ্টেন মাহবুবকেও।

অরণ্যের মতোই রহস্যে ঘেরা দেখাল নীল ট্রাউজার পরনের ফুলহাতা শার্ট গায়ে জড়ানো থাকা মানুষটাকে। 'ইনিই তাহলে খালেদ মোশাররফ!' অবাক বিস্ময়ে ভাবে হাবিবুল আলম।

তাদের সামনে দাঁড়িয়ে কয়েক মুহূর্ত নীরবে সবাইকে মেপে নিলেন আধুনিক অরণ্যদেব। এরপর, অদ্ভুত ভারিক্কী স্বরে গমগম করে তিনি হঠাৎ বললেন, 'মনে রাখবা, স্বাধীন দেশ জীবিত গেরিলা চায় না। স্বাধীন দেশ চায় রক্তস্নাত শহিদ!'

পথ না ভোলা বৃদ্ধ

জিপ গাড়িটার ছোটা হচ্ছিলো না টানা। পথের মাঝে একটু পরপরই ভিড় করেছে মানুষ, জটলা করেছে বুড়োকে দেখতে। আর বুড়োটাও পারে বাবা! হাতে থাকা বড় হাঁড়িটা থেকে ফুঁ দিয়ে দিয়ে পানি বিলিয়ে দিয়েছে জটলা দেখলেই। অথচ নিজেই আবার বলেন, 'এই পানিতে যে কিচ্ছু লাভ হইবো না, সিটা আমিও জানি। সরল মানুষগুলার চিকিৎসা নেয়ার পয়সা না থাকলে কী হইবো, বিমার আছে হাজারে হাজারে। বিশ্বাসে যদি অসুখ সারে, ক্ষতি কী সিটায়!'

বুড়ো বিশ্বাসে মুসলমান, বিজ্ঞানে সমাজতন্ত্রী—কথাটা আরো একবার মনে হয় সাইফুল ইসলামের।

কীভাবে যেন পাঁচ-ছয়দিন কেটে গেছে এর-মাঝেই, অবাক হয়ে খেয়াল করে সাইফুল। সেদিন সিরাজগঞ্জে মিটিং চলছিল ন্যাপের কর্মীদের। বলা যায় একরকম আতঙ্কিত তর্কই চলছিল আসলে। আলোচনার বিষয়বস্তু, পাক মিলিটারি শহরে ঢুকতে চাইলে তাদের কী করে ঠেকানো যায়। স্বাধীনতা চায় অনেক রাজনৈতিক দলই, তবে তাদের মাঝে মতের মিল নেই এটাও সত্য। ন্যাপ কর্মীদের হাতে তাই অস্ত্র নেই। থানা লুট করে সামান্য কিছু অস্ত্র হাতে পেয়েছে তারা।

নানারকম হট্টগোলের মাঝে হঠাৎ করেই আধা চেনা একটা লোক ইশারায় তাকে সরিয়ে নিয়েছিল একপাশে, মনে পড়ে সাইফুলের। বুড়োর কথা জানিয়ে বলেছিল, 'উনি এসেছেন। যমুনার ঘাটে এক নৌকায় আপনার জন্যে বসে আছেন।'

অবাক হয়েছিল সাইফুল, তবে ছুটতে ছুটতেই গিয়েছিল লোকটার নির্দেশিত যমুনা ঘাটের দিকে। কোশা নৌকায় বসা বুড়োর দিকে তাকিয়ে বলেছিল, 'হুজুর, আপনি এইখানে?'

'হ, পলায়া আয়লাম।' বুড়ো বলেছিল। 'আমার বাড়ি তো পুড়ায়া দিছে মিলিটারি...। যাক, অহন সেই নিয়া কথা বলমু না। আমি ভারত যাইতেছি, তুমি সাথে চল আমার।'

'এইটা কী বললেন হুজুর, ' এই প্রস্তাবে ভীষণ অবাক হয়েছিল মোজাফফর ন্যাপের সিরাজগঞ্জ মহকুমার সেক্রেটারি সাইফুল ইসলাম। 'আপনি করেন এক দল, আমি আরেক পার্টি। আমি কী কইরে আপনার সাথে যাবো?'

'খামোশ!' বুড়ো হুংকার দিয়ে ওঠে। 'কী বইলা? অন্যদল? আমার লগে তাই সম্পর্ক মুইছা গেছে? আর অন্যদলের সওয়ালই বা কী? প্রোগ্রাম তো এখন বাংলাদেশের স্বাধীনতাই, মানো তো? তাইলে আর অন্যদলের সওয়াল আইসে কেন?'

বুড়োর কথার জবাব দিতে পারেনি সাইফুল। আসন্ন প্রসবা স্ত্রী, মাকে জানিয়ে এক ঘণ্টা পরেই ফিরে এসেছে যাত্রার প্রস্তুতি নিয়ে। কোশা নৌকা থেকে বড় একটা নৌকায় সরে গেছে তাদের বাহন, সাথে যোগ হয়েছে আরো এক যাত্রী। ন্যাপ কর্মী মুরাদুজ্জামান।

যাত্রাপথে প্রায়ই বিড়বিড় করে নিজের প্ল্যান বাতিয়েছে বুড়ো। 'সায়ফল, বড় দুরূহ একটা দায়িত্ব নিয়া হিন্দুস্তান যাইতেছি। সরকার গঠন কইরা লড়াই করন লাগবো। দুনিয়ারে জানান লাগবো, বাংলাদেশে কী ঘইটাছে, বাঙালিরা কী চায়। যুদ্ধের বাহিনী বানান লাগবো। বিপক্ষের অপপ্রচার ঠেকানো লাগবো। অনেক কাম আছে সায়ফল, তোমাদের মতো কর্মঠ, শিক্ষিত লোকের দরকার।'

এইরকম আলোচনায় কেটে গেছে কয়েকটা দিন। শেষে তিস্তা নদীর নামাজ চরে পৌঁছেছে তারা গতকাল। বুড়োর স্মৃতিশক্তি বড় ভয়ানক। আসামের শিশুমারি এখন তাদের সামনে, নদীপথের খুঁটিনাটি সমস্ত পথ নির্দেশ দিয়েছে বুড়ো নিজে।

শিশুমারি গ্রামে বুড়োর এক শিষ্যকে খবর দিয়েছে তারা, তবে লাভ হয়নি। ন্যাপ কর্মী বলে পঞ্চায়েত প্রধান চায়নি তারা সীমান্ত পার হোক। একটা দিন অপেক্ষা করেছে তারা এরপর, কারণ শোনা গেছে ভারতীয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মইনুল হক আসবেন শিশুমারি হাইস্কুল পরিদর্শনে। পরদিন মন্ত্রী এসেছেন, সেইসব কাজ শেষ করেছেন, এমন সময় সাইফুলরা গিয়ে তাকে দিয়েছে সীমান্তের অপর পাশে বুড়োর অপেক্ষা করার খবর।

'সে কী, উনি এখানে?' মন্ত্রী লাফিয়ে উঠেছেন শুনে। 'এ পথ চিনে আসলেন কী করে?'

সাইফুল উত্তর দিয়েছিল, 'মওলানা ভাসানী তো পথ ভুল করেন না!'

... এরপর দিল্লির আদেশেই ভারত প্রবেশের ব্যবস্থা হয়েছে আবদুল হামিদ খান ভাসানীর। জিপ আনা হয়েছে, ফুলবাড়িয়া রেস্টহাউজে মওলানাকে নিয়ে যেতে। খবর ছড়িয়েছে, লোকজন রাস্তায় জটলা করেছে হুজুরকে একনজর দেখতে। স্যার সাদুল্লাহ যে মানুষটাকে 'একাই তিন পাকিস্তানকে ধ্বংস করতে সক্ষম' বলেছিলেন, সেই ভাসানীর মওলানাকে একবার দেখতে চায় তারা।

এই মুহূর্তে, এই মোরগ-ডাকা ভোরে, ফুলবাড়িয়াগামী এবড়ো খেবড়ো রাস্তায় লাফাতে থাকা জিপের মাঝে আধো ঘুম আধো জাগরণেও সাইফুল ইসলাম বোঝে, বুড়ো ঘুমায়নি। মাত্র কিছুক্ষণ আগেই স্থানীয় লোকের কাছে মওলানা ভাসানী শুনেছেন, ১০ তারিখ রেডিওতে তাজউদ্দীনের ভাষণের কথা। ১১ তারিখ দিনজুড়ে বারবার প্রচার হওয়া সে ভাষণে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার ঘোষণার কথাও শুনেছেন বুড়ো মানুষটি।

বুড়োর চোখে ঘুম নেই। সে জেগে আছে।

একটি নড়বড়ে মঞ্চ, একটি স্বাধীন রাষ্ট্র

ভোরের আলো জেগে উঠছে মাত্র। ঠং ঠং শব্দে ট্রাম চলছে অবিরত। আধো জাগরণ-আধো স্বপ্নে ডুবে থাকা কলকাতার রাস্তায় কোনো কাজে বের হয়েছেন যারা, তারা সবিস্ময়ে দেখলেন বিরাট এক গাড়ির কনভয়কে। চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, শ্যামবাজারের পাঁচ মাথা, যশোর রোড ধরে এগিয়ে যাচ্ছে সেই কাফেলা।

মোট একশোটা জিপ, মনে মনে ভাবেন আমীর-উল ইসলাম। অর্ধেকটা আওয়ামী লীগের নেতাদের সীমান্তে পৌঁছে দেবে, বাকিগুলো সাংবাদিককের জন্যে।

গতকাল কলকাতা প্রেসক্লাবে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে তিনি আর আবদুল মান্নান দাঁড়িয়ে গেছিলেন বিদেশি সাংবাদিকদের সামনে। আগামীকাল ১৭ এপ্রিল, মানে আজকে, কাকডাকা ভোরে প্রেসক্লাবের সামনে সাংবাদিকদের হাজির থাকতে অনুরোধ করেছিলেন তারা দুইজন। নির্দিষ্ট একটি স্থানে নিয়ে তাদের মাধ্যমে দুনিয়াকে বিশেষ একটা বার্তা দেবে বাংলাদেশ সরকার, সেটাও জানিয়েছিলেন তারা। বিস্মিত সাংবাদিকেরা স্কুপের লোভে প্রশ্ন করেছে বারবার; কিন্তু কোথায় নিয়ে যাওয়া হবে তাদের, সেই প্রশ্নের জবাব দেননি আমীর-উল ইসলামরা। এমনকি, দলের নেতাকর্মীদের অনেককেই রাখা হয়েছে অন্ধকারে। পাকিস্তানিদের বিমান হামলার ভয় আছে, নিরাপত্তার কারণে আগে থেকে বলা হবে না কিছু।

ভীষণ ক্লান্ত লাগে আমীর-উল ইসলামের। গতরাতে উত্তেজনা আর দুশ্চিন্তায় সামান্যতম ঘুমও হয়নি তার, আর শেষ কয়েকদিনে খাটনিও গেছে অনেক।

বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার আবেদনপত্রটা লিখতে হয়েছে বাংলা ইংরেজি দুই ভাষাতেই। সবচেয়ে বড় ব্যাপার, লিখতে হয়েছে নতুন রাষ্ট্রটির স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রও।

কী ঝক্কিটাই না গেছে, মনে পড়ে তার। যে ঘরে তিনি আর তাজউদ্দীন ভাই থাকেন, সেখানে অন্য কোনো দেশের স্বাধীনতা ঘোষণার কপি নেই। ছোট্ট একটা টেবিল ল্যাম্পের আলোতে বসে শুধু স্মৃতি থেকে একটা খসড়া লিখেছিলেন আমীর-উল ইসলাম। আমেরিকার ইন্ডিপেন্ডেন্স বিল পড়েছিলেন অনেক আগে, সেটারই যা মনে আছে, তাই সম্বল করে লিখে ফেলেছিলেন ঘোষণাপত্রটা।

তাজউদ্দীন ভাই খসড়া দেখে খুশি হয়েছিলেন, তবে বলেছিলেন আইনজ্ঞ কাউকে দেখিয়ে নিতে একবার। অতএব বালিগঞ্জে ছুটতে হয়েছিল আমীর-উল ইসলামকে, সেখানে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে ইতোমধ্যেই সমর্থন দেয়া জাস্টিস সুব্রত রায়চৌধুরীর সাথে দেখা করেছিলেন তিনি। জাস্টিস রায়চৌধুরী লাফিয়ে উঠেছেন সেই খসড়া দেখে, 'মি.আমীর-উল ইসলাম, দারুণ কাজ করেছেন একটা। একটা কমা বা সেমিকোলন পর্যন্ত বদলানোর দরকার আছে বলে মনে হয় না!'

ভাবনা থেকে কৃষ্ণনগরের রাস্তায় আমীর-উল ইসলামকে ফেরাল জিপে থাকা এক কলকাতার সাংবাদিক। 'ও আমীর-উল ইসলাম সাহেব, কোতায় যাচ্চি সেটা না হয় না-ই বললেন। গভীর রাতে কাল দর্জি ডেকেচিলেন কেন আপনারা, সেইটে তো অন্তত বলুন?... আমার এক সোর্স খবর দিল যে। কী এমন হঠাৎ প্রয়োজন পড়েচিলো বলুন তো?'

আমীর-উল ইসলাম হেসে ফেললেন। অদ্ভুত এই প্রশ্নের উত্তরটিও দিলেন তিনি অদ্ভুতভাবে। 'দর্জি তো পোশাক তৈরি করতেই লাগে ভাই সাহেব, আমাদের পোশাকের দরকার ছিল যে!'

আসল কথা শেষ মুহূর্তে গতকাল আবিষ্কার হয় যে, প্রধান সেনাপতি ওসমানীর শপথ অনুষ্ঠানের জন্যে কোনো সামরিক ইউনিফর্ম নেই। বিএসএফের কাছে সাহায্য চেয়েও লাভ হলো না। অতএব নতুন দেশের নতুন সেনাপতির জন্যে নতুন কাপড় কিনে রাতেই বানানো হলো ইউনিফর্ম, দর্জি ডাকা হয়েছিল সে কারণেই। এ মুহূর্তে প্রশ্নকর্তা সাংবাদিক তার উত্তর শুনে খুশি হয়নি, সেটা বেশ বোঝা যাচ্ছে। আমীর-উল ইসলাম মনে মনে আরেকটু হেসে জানালা দিয়ে বাইরে মাথা গলিয়ে পেছনের জিপের দিকে চাইলেন। আবদুল মান্নান ভাই সেটায় আরো ক'জন সাংবাদিক নিয়ে আসছেন।

অবশেষে সাংবাদিকদের অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে বিশাল সেই কনভয় পৌঁছে গেল এক ছায়াঘেরা আমের বাগানে। গ্রামটি বৈদ্যনাথতলা, জেলা কুষ্টিয়া, মহকুমার নাম মেহেরপুর। ম্যাপ দেখে ঠিক করা হয়েছে এই মুক্তাঞ্চলটিকে।

ভারত থেকে সহজেই আসা যায়, আবার গাছপালায় ঘেরা বলে শত্রু বিমানের পক্ষেও টার্গেট করা শক্ত এই এলাকাকে।

মেহেরপুর ততক্ষণে ভরে গেছে প্রাণচাঞ্চল্যে। আশপাশের বাড়ি থেকে চেয়ার-টেয়ার এনে গ্রামের লোকজনই সাজাচ্ছে জায়গাটাকে। একটা খুবই নড়বড়ে মঞ্চও তৈরি করে ফেলেছে তারা। এই লোকেদের দলে ভিড়ে গেছে ঢাকা থেকে পালিয়ে আসা আবদুল বাতেনও।

আবদুল বাতেন ২৫ তারিখ রাত্রি থেকেই ছিল আবু জাফর শামসুদ্দীন স্যারের রাজারবাগের বাসায়। টানা তিনদিন ঘর থেকে বেরোয়নি কেউই। এরপর আস্তে আস্তে পরিবারের অন্যান্যদের বুঝিয়ে শুনিয়ে দেশের বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন শামসুদ্দীন স্যার। বাসায় রয়ে গেলেন কেবল তিনি আর বাতেন। মার্চের শেষে দুইজনেই গিয়েছিলেন বাংলা একাডেমি। সেটার নিচের তলা প্রায় ধ্বসিয়ে দিয়েছে মিলিটারি। শামসুদ্দীন স্যার তখন কবীর চৌধুরী স্যারকে বলে একটা অসুস্থতার সার্টিফিকেট দিয়ে লম্বা ছুটি নিয়ে নিলেন।

এপ্রিলের প্রথমেই ঢাকা ছেড়েছিল তারা দুইজন, তবে আলাদা গন্তব্যে। শামসুদ্দীন স্যার চলে গেলেন তার গ্রামের দিকে আর বাতেন মানিকগঞ্জ হয়ে চলে এসেছে কুষ্টিয়ার দিকে। আজ সকাল থেকেই এলাকায় মাইকিং করা হয়েছে, বৈদ্যনাথতলায় কী একটা গুরুত্বপূর্ণ মিটিং হবে। দলে দলে সবাই চলে এসেছে তাই আমবাগানে।

এদিকে ভারতীয় সীমান্তরক্ষীদের মহাপরিচালক কে এফ রুস্তমজির নির্দেশে গোলোক মজুমদার, শেখ মুজিবের একটা বিশাল ছবি ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন গাছ থেকে। তাজউদ্দীন আবার জিপ থেকে নেমে সেটা দেখেই খেপে গেছেন। 'মানে কী এইসবের? শেখ সাহেব কি মরে গেছেন নাকি? সাংবাদিকদের সামনে এইরকম বোকার মতো ফটো ঝোলানোর মানে কী?' ধমক খেয়ে গোলোক মজুমদার বিব্রত হয়ে দ্রুতই ছবিটা সরিয়ে নিলেন।

মূল অনুষ্ঠান আরম্ভ হলো বেলা এগারোটার দিকে। মাহবুব উদ্দীন আর তৌফিক এলাহি তাজউদ্দীন, নজরুল ইসলাম, কামারুজ্জামান, মনসুর আলী, এমএ জি ওসমানীসহ সবাইকে গার্ড অব অনার দিল।

...আমীর-উল ইসলামের হঠাৎ চোখ যায় মঞ্চে দাঁড়ানো খন্দকার মোশতাকের দিকে। সাথে সাথেই মনটা বিরক্তিতে ভরে ওঠে তার। প্রধানমন্ত্রীর পদে বসতে পারবেন না জেনে ১১ তারিখ আগরতলার বৈঠকে এক নাটকের জন্ম দিয়েছিলেন খন্দকার মোশতাক। মিটিং ছেড়ে উঠে গিয়েছিলেন দরজার কাছে। বলেছিলেন, 'আমারে তোমরা মক্কায় পাঠায়ে দাও। আমার আর এইখানে কী কাজ? শরীরও ভালো না। আমি হজে যাবো। আমি মরলে আমার লাশটা বাংলাদেশে নিয়া আইসো বরং, সেইটাই ভালো।'

পরে ড. টি হোসেনের সাথে আলাপে আমীর-উল ইসলাম জানতে পারেন যে সিনিয়রিটির হিসাব কষে প্রধানমন্ত্রীই হতে চাইছিলেন মোশতাক। এ কারণেই অমন নাটকের অবতারণা। শেষ পর্যন্ত অবশ্য মন্ত্রিসভায় থাকতে রাজি হয়েছেন মোশতাক। তবে শর্ত দিয়ে, পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পদটা তার চাই। সমঝোতাও হয়েছে সেভাবেই। স্বাধীনতার যুদ্ধ আরম্ভ হতেই আরো একটি বিপ্রতীপ কোণ সৃষ্টি হলো কি?

... বাজে ভাবনা মাথা থেকে দূর করে আমীর-উল ইসলাম আবার মন দেন অনুষ্ঠানে। কুরআন তেলাওয়াত হলো। ইউসুফ আলী পড়লেন স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র। সদ্যোজাত দেশটির নাম রাখা হলো, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ। চারটি ছেলে খুব আবেগ দিয়ে গাইল, 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।'

গান শুনে চোখ মুছতে মুছতে গোলোক মজুমদার পাশে দাঁড়ানো সাংবাদিকটিকে বললেন, 'কেমন একটা অদ্ভুত ব্যাপার, না? একটা দেশের জন্ম হচ্ছে এরকম একটা আমবাগানে! পলাশীতে ঠিক এরকম একটা বাগানেই তো সিরাজের হারের সাথে স্বাধীনতা হারিয়েছিলাম আমরা। ইতিহাস কীভাবে যে ফিরে ফিরে আসে!'

...সাংবাদিকদের তখন আবেগে ভাসার সময় নেই। ঝড়ের গতিতে তারা নোট নিচ্ছেন তখন। উপস্থিত শ খানেক সাংবাদিকের সাথে থাকা প্রায় চল্লিশজন ফটোগ্রাফারও তখন ভারি ব্যস্ত। প্রতিদিন তো আর পৃথিবীর মানচিত্রে নতুন একটা জাতির জন্ম হয় না! শেখ মুজিব উপস্থিত নেই, তবে তিনিই এই রাষ্ট্রের প্রধান। শেখের ডেপুটি সৈয়দ নজরুল ইসলাম পালন করবেন ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব। তাজউদ্দীন প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হলেন কামারুজ্জামান। মনসুর আলী পেলেন অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব, আতাউল গণি ওসমানী হলেন সেনাপ্রধান। একটি নড়বড়ে মঞ্চে দাঁড়ানো এই মানুষগুলো হয়ে গেলেন একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রথম সরকার।

অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি আর প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে রইল একই সুর। স্বাধীনতা বাংলাদেশে আসবেই, তাকে আসতেই হবে। সৈয়দ নজরুল ইসলাম তো বলেই দিলেন, 'আজ এই আম্রকাননে নতুন একটি জাতি জন্ম নিল।'

সবকিছু চুকে গেল বেশ ভালোভাবেই। কোথা থেকে গ্রামের লোকেরা মিষ্টিও নিয়ে আসল। দেশি-বিদেশি সাংবাদিকেরা সেগুলো খেয়ে ঘিরে ধরলেন প্রধানমন্ত্রী আর ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতিকে। 'রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের নামানুসারে আজ থেকে বৈদ্যনাথতলার নতুন নাম হবে মুজিবনগর, এটাই হবে প্রবাসী সরকারের আনুষ্ঠানিক রাজধানী।' তাজউদ্দীন বললেন।

এরপর জিপ গাড়ির কনভয় রওয়ানা দিল কলকাতার দিকে। কলকাতাগামী একটা জিপে উঠে বসেছে আবদুল বাতেনও। ডাকসুতে নিয়মিত যাতায়াত করায়

আলাউদ্দীন ভাইয়ের সাথে খাতির জমে গিয়েছিল তার। সেই আলাউদ্দীন ভাইকে এখানে নেতাকর্মীদের মাঝে দেখে, তাকে অনুরোধ করে নিজেও কলকাতা যাবার অনুমতি নিয়ে নিয়েছে বাতেন। কানে তার এখনো বাজছে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ, 'বিশ্বের আর কোনো জাতি আমাদের চেয়ে স্বীকৃতির বেশি দাবিদার হতে পারে না। কেননা আর কোনো জাতি আমাদের চেয়ে কঠোরতর সংগ্রাম করেনি। অধিকতর ত্যাগ স্বীকার করেনি।'

আবদুল বাতেনের বুকের ভেতরটা কেমন যেন করতে থাকে।

বুকের ভেতর কেমনটা করতে থাকে তাজউদ্দীনেরও। কাপাসিয়ার ছোট্ট যে ছেলেটা গজারি বনের মাঝে দিয়ে হেঁটে যেত স্কুলে, মুজিবনগরের আম্রকানন দিয়ে ছুটতে থাকা জিপ গাড়িতে বসে সে এই মুহূর্তে ভাবে, পথের শুরু হলো মাত্র, যেতে হবে আরো বহু দূর। যে ছেলেটি এতদিন ভুলেশ্বর প্রাইমারি স্কুলের ক্লাস ওয়ান থেকে টুতে ওঠার সময় ফার্স্ট প্রাইজ দেড় পয়সার কালির দোয়াত আর সাড়ে আট পয়সার কলমকেই ভেবে রেখেছে তার জীবনের শ্রেষ্ঠ অর্জন, বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হয়ে সে অনুভব করে, স্বাধীনতা অর্জনের সাথে আর কোনো প্রাপ্তিই তুলনীয় নয়।

তারা শেখ মুজিবের হয়ে স্বাধীনতা আনবার দায়িত্ব নিয়েছেন, আত্মতৃপ্তিতে ভুগলে তাদের চলবে না।

ভুট্টোর ভয়

শেষ পর্যন্ত তাজউদ্দীন?

সাড়ে সাত কোটি বাঙালির প্রাণের নেতা হিসেবে এতদিন শেখ মুজিবের নামই তো শুনে এসেছে সবাই, আর শুধু আঙুল উঁচিয়েই পূর্ব পাকিস্তান অচল করে দিয়ে সেই মুজিবও প্রমাণ করে দিয়েছে তার প্রবাদতুল্য জনপ্রিয়তা। ক্র্যাকডাউনের প্রথম প্রহরেই মুজিবকে গ্রেপ্তার করবার পরেই তো মেরুদণ্ডহীন, কালোরঙা বাঙালির মনোবল ভেঙে যাবার কথা। এই এখানেও, প্রতিবারের মতোই, ঝামেলা পাকাতে এসে উদয় হয়েছে ঐ তাজউদ্দীন?

ফরমান আলী ভেবে পায় না, এই লোকটা আসলে কোন ধাতুতে তৈরি। অস্ত্র নেই, সেনাবাহিনী নেই, নিজের মাটি পর্যন্ত নেই। পূর্ব পাকিস্তানের বেহেনচোত বাঙালিগুলোর এই অর্থহীন সংগ্রাম কতদিন টিকিয়ে রাখতে পারবে কোনো নেতা? কতদিন ধরে বাঙালিদের স্বাধীনতার মিথ্যা স্বপ্ন দেখাতে পারবে এই নাছোড়বান্দা তাজউদ্দীন?

রাও ফরমান আলীর মনে পড়ে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের কথা।

গত মাসের ঘটনা, মুজিব-ইয়াহিয়া আলোচনা চলছে। বৈঠক তো অজুহাত আসলে। তলে তলে আসলে ফরমান আলীরা একত্রিত করছিল সৈন্যদের। লোক দেখানো আলোচনায় জুলফিকার আলী ভুট্টোও এসেছিলেন ঢাকায়। গোপন এক বৈঠকে তাকে আর ইয়াহিয়াকে নিয়ে বসেছিলেন ভুট্টো। নিজের হোটেলে, ইন্টারকন্টিনেন্টালে।

ইয়াহিয়ার মুজিবকে বড় ভয়। বাঙালি জাতটা হুজুগে। এই ব্যাটার ভাষণে যেকোনো সময় খেপে গিয়ে কিছু একটা করে বসতে পারে লোকে। মুজিবকে তাই গ্রেপ্তার করাই উচিত, মত রেখেছিলেন ইয়াহিয়া।

ঢকঢক করে গলায় প্রিয় পানীয় ব্ল্যাক ডগ ঢেলেছিলেন ভুট্টো। এরপরে, মনে পড়ে ফরমান আলীর, তাদের দুজনকে চমকে দিয়ে সজোরে চাপড় মেরেছিলেন টেবিলে। 'আর এতেই সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে? তাই মনে হয় আপনাদের?'

'লিসেন। আই ডোন্ট গিভ আ ড্যাম এবাউট শেখ মুজিব, ' রক্তলাল চোখে চিবিয়ে চিবিয়ে বলেছিলেন ভুট্টো। 'ইমোশনাল এপ্রোচে তাকে দমিয়ে ফেলা যায়। বাট, দ্যাট লিটল ম্যান বিহাইন্ড হিম, দ্যাট লিটল নটোরিয়াস ম্যান, ফাইল হাতের ওই তাজউদ্দীন, তাকে আটকানো বড় শক্ত। দিস গাই ইজ ভেরি থরো। দিস তাজউদ্দীন, আই টেল ইউ, উইল বিকাম ইউর মেইন প্রবলেম!'

... ভুট্টোর অবশ্য তাজউদ্দীনকে ভয় করাটা যৌক্তিক। এই ভয়ের সূত্রপাত সম্ভবত ছয় দফা ইস্যুতে, এক দমকে সেই ঘটনাও ফরমান আলীর মাথায় উঁকি দিয়ে যায়।

১৯৬৬ এর মার্চের ঘটনা। মুজিব-তাজউদ্দীন জুড়ি পল্টন ময়দান কাঁপিয়ে দিচ্ছে ছয় দফার দাবিতে। পূর্ব পাকিস্তানে তখন আইয়ুব খান ছিলেন, আর জুলফি ভুট্টো তখন আইয়ুবের বিদেশমন্ত্রী।

ছয় দফা নেহাতই বাঙালিদের বালখিল্য দাবি, বলেছিলেন ভুট্টো। প্রয়োজনে তর্কে নেমে তিনি প্রমাণ করে দেবেন এই ইস্যুর অসারতা, ভুট্টো চ্যালেঞ্জ দিলেন মুজিবকে। আশ্চর্য, পিছু না হটে মুজিবের হয়ে বরং পালটা চ্যালেঞ্জ ছুড়লেন তাজউদ্দীন। ভুট্টোর সুবিধামতো যেকোনো স্থানেই নাকি তিনি লড়বেন যুক্তি দিয়ে। ঠিক হলো, ২১ মার্চ পল্টন ময়দানেই হবে যুক্তিযুদ্ধ।

যুক্তির লড়াইয়ে প্রতিপক্ষকে বাজিয়ে দেখতে চাইলেন ভুট্টো। আর তাই রুদ্ধদ্বার এক প্র্যাকটিস ম্যাচে তাজউদ্দীনের সাথে বসলেন তিনি। শোনা যায়, তর্কের ডুয়েলে ঐ তাজউদ্দীন নাকাল করে ছেড়েছিলেন ভুট্টোকে। গল্পের পরের অংশ ভুট্টোর জন্যে খুব সম্মানজনক নয়। ২১ মার্চ আস্তে আস্তে ভিড় জমতে থাকে পল্টনে। কিন্তু খবর পাওয়া যায়, ভুট্টো ইতোমধ্যেই নীরবে সরে গেছেন ঢাকা

থেকে। সন্দেহ থাকে না, মান বাঁচাতেই সে গা ঢাকা দেয়া। অতএব, তাজউদ্দীনের প্রতি ভুট্টো একটু বেশিই অনুভূতিপ্রবণ হবেন, সেটাই স্বাভাবিক!

বর্তমানে ফিরে এসে হাতে ধরা বিশেষ বার্তাটি ফরমান আলী আরেকবার পড়ে। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে গতকাল মুক্ত মেহেরপুরের মাটিতে স্বাধীন বাংলাদেশের সরকার গঠনের অনুষ্ঠানটির কথা। তাজউদ্দীন অসাধ্য সাধন করেছেন। ইন্দিরা গান্ধীর সাথে আলোচনা করেছেন, সীমান্ত এলাকায় নিরন্তর ছোটাছুটিতে একত্রিত করেছেন আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের, গঠন করেছেন প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার।

রাও ফরমান আলীর মনে হয়, ভুট্টো ঠিকই বলেছিলেন। তাজউদ্দীন, ইতোমধ্যেই তাদের প্রধানতম সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছেন।

ফরমান আলী ঠিক করে, অচিরেই একটি প্রচারপত্র বিলি করতে হবে। তাজউদ্দীনকে ভারতের দালাল বলে প্রচার করা দরকার। অবশ্য, এজন্যে হারামজাদার একটা হিন্দুয়ানি নামও দেয়া উচিত। কী দেয়া যায় সেটা?... ত্যাজারাম, হ্যাঁ, ত্যাজারাম নামটা বেশ শোনাচ্ছে। এই নামটাই থাক।

সেই সাথে আরো একটা ঘোষণা দেয়া দরকার। কূটনৈতিক স্টাফ ছাড়া অন্য সকল ঢাকাবাসীকে বলা হবে তাদের কাছে কোনো অস্ত্র থাকলে তা নিকটস্থ পুলিশ স্টেশনে জমা দিতে। অস্ত্র ছাড়া কতক্ষণ আর টিকে থাকবে এই হিন্দুয়ানি বাঙালিরা?

...জানত না ফরমান আলী, সে সময় বুকপকেটের আড়ালে আরো একটি মারাত্মক অস্ত্র ঢেকে রেখেছিল প্রত্যেক স্বাধীনতাকামী বাঙালিই। ঢাকা থেকে জিঞ্জিরা পালানোর পথে এক অবিন্যস্ত বেশের যুবক; যার নাম নির্মলেন্দু গুণ; সেই অদ্বিতীয় অস্ত্রটি নিয়ে একসময় লিখে ফেলবেন একটি কবিতা।

> 'পুলিশ স্টেশনে ভিড়, আগ্নেয়াস্ত্র জমা নিচ্ছে শহরের
> সন্দিগ্ধ সৈনিক।...
> আমি শুধু সামরিক আদেশ অমান্য করে হয়ে গেছি
> কোমল বিদ্রোহী, প্রকাশ্যে ফিরেছি ঘরে,
> অথচ আমার সঙ্গে হৃদয়ের মতো মারাত্মক
> একটি আগ্নেয়াস্ত্র, , আমি জমা দিইনি।'

ফাইলের আড়ালে থাকা তাজউদ্দীনের এই অস্ত্রটিকেই, ভুট্টোরা সবচেয়ে বেশি ভয় করেন।

কলকাতার আনন্দবাজারে মওলানা ভাসানীর একটা লম্বা বিবৃতি এসেছে। খুব নাকি সাড়া ফেলে দিয়েছে সেটা। বিশেষ করে সমাজতন্ত্রী চীন আর মুসলিম বিশ্বের দিকে মওলানা জ্বলন্ত প্রশ্ন রেখেছেন, নীরব থেকে ইয়াহিয়ার অনৈসলামিক মানবতাবিরোধী জঘন্য কাজকর্মে কি তারা এখনো সমর্থন দিয়ে যাবেন?

আবু সাঈদ চৌধুরী অবশ্য আনন্দবাজার পড়েননি। তবে বিবৃতিটার কথা ফোন করে তাকে জানিয়েছে অনেকে। পত্রিকাটা হাতের কাছে পেলে কাজ হতো, মনে হয় আবু সাঈদ চৌধুরীর। এইসব প্রতিবেদন, বক্তব্য বা বিবৃতি জনমত তৈরি করতে ভালো প্রভাব ফেলে। যেমন সায়মন ড্রিংয়ের রিপোর্টটা। ৩০ মার্চ ডেইলি টেলিগ্রাফে সেটা প্রকাশিত হবার পরে কেমন যেন বিহ্বল হয়ে গিয়েছিল প্রবাসী বাঙালিরা। প্রায় প্রত্যেকেই সেদিনের পত্রিকাটির একাধিক কপি কিনেছে, সংগ্রহে রেখেছে, সুযোগ পেলেই দেখিয়ে বেড়াচ্ছে বিদেশিদের।

আবার বিবিসির কাছে দেয়া আবু সাঈদ চৌধুরীর নিজের সাক্ষাৎকারটাও ভালো আলোড়ন তুলেছে। ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে দেখা করার পরেই তিনি বিবিসিকে জানিয়েছিলেন, যে পাকিস্তান সরকারের সাথে সমস্ত সম্পর্ক ছেড়ে তিনি কাজ করছেন বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্যে। সাক্ষাৎকার তিনি দিয়েছেন ডেইলি টেলিগ্রাফের কাছেও।

'... অনেক সাক্ষাৎকারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার ছাত্র-ছাত্রীদের আমি হীরের টুকরো ছেলে আর লক্ষ্মী মেয়ে বলে ডেকেছি। কসম খোদার, এই সম্বোধন আমি মন থেকে করেছি। এই দুঃসময়ে তারা নিশ্চয়ই ভাবছে যে, আমাদের ভাইস চ্যান্সেলর আজ ঢাকায় থাকলে অবশ্যই আমাদের পাশে এসে দাঁড়াতেন। আমি অনুভব করি, এখন আমার দায়িত্ব তাই একটাই। দেশকে স্বাধীন করতে হবে। করতে হবেই।' ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে কথা বলতে গিয়ে খুব আবেগপ্রবণ হয়ে গিয়েছিলেন তিনি, সপ্তাহ দুয়েক আগের কথা এখনো ভোলেননি আবু সাঈদ চৌধুরী।

কাগজের সেই বিবৃতি পড়েই নাকি খুব খুশি হয়েছেন মুজিবনগর সরকার। আমীর-উল ইসলাম প্রথমে ফোন করে তাকে ধন্যবাদ দিয়েছিলেন। এরপর বহির্বিশ্বে স্বাধীনতা আন্দোলনের পক্ষে জনমত তৈরির গুরুদায়িত্বও তার কাছে ফোনে পৌঁছে দিয়েছেন ওই আমীর-উল ইসলামই। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি নজরুল ইসলামের সাক্ষর করা আনুষ্ঠানিক নিয়োগপত্র তার হাতে এসেছে গতকাল। এমনিতেই গত কয়েকদিন ধরে বিভিন্ন সমাবেশে স্বাধীনতার পক্ষে জনমত সৃষ্টি করছিলেন তিনি, তারপরেও নিয়োগপত্রের কারণে আজকের সভাটা বিশেষ কিছু মনে হচ্ছে আবু সাঈদ চৌধুরীর। গ্রাউন্ড ট্রেনে চেপে কভেন্ট্রি যেতে যেতে তাঁর কেবল মনে হচ্ছে, পুরাণের অ্যাটলাসের গুরুভার কাঁধে চেপেছে।

কভেন্ট্রির মিলনায়তনের সভাটিতেও তাঁকে সব দলের পক্ষ থেকে সভাপতি হতে বলা হলো। আবু সাঈদ চৌধুরী ভেবে দেখলেন, কোনো কারণে এই সভা কেন্দ্রীয় কমিটি করতে ব্যর্থ হলে ভিনদেশিদের কাছে বাঙালিদের হয়ে কথা বলবার অধিকার কিছুটা হলেও খর্ব হবে।

'আপনারা বরং বেগম লুলু বিলকিস বানুকেই সভানেত্রী করুন।' আবু সাঈদ চৌধুরী বলেন। 'উনি তো লন্ডনেই থাকেন, স্কুলে পড়ান। ২৫ মার্চ থেকেই তো উনি কাজ করছেন আমাদের সাথে। উনিই সভানেত্রী হোন। আমি বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় কমিটি করার আনুষ্ঠানিক অনুরোধ জানাচ্ছি মাত্র।'

তবে কমিটির সদস্য নির্বাচনে হট্টগোল হলো অনেক। ব্যাকব্রাশ করা চুলের একটা অল্পবয়েসি ছেলে লাফিয়ে উঠে বলল, 'একটা স্টিয়ারিং কমিটি করেন বরং, ঘরোয়াভাবেই করেন।' শেষ পর্যন্ত হলো সেটাই। কেন্দ্রীয় অ্যাকশন কমিটির জন্যে পাঁচ সদস্যের একটা স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা হলো।

সভার কাজটাজ শেষ করে আবু সাঈদ চৌধুরী মিলনায়তন থেকে বেরিয়ে এলেন। ভীষণ ক্লান্ত লাগছে তার, একটু বাইরের বাতাস দরকার। কমিটি গঠনের প্রস্তাব দেয়া ব্যাকব্রাশ করা ছেলেটি রাস্তার ওপারে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছিল। তাকে দেখেই সিগারেট ফেলে দিয়ে এগিয়ে এল।

'কী খবর?...কমিটি তো হয়েই গেল। এখন কাজটাজ কী হবে এসব কিন্তু আপনাদেরই দেখতে হবে।' বললেন আবু সাঈদ চৌধুরী।

'অলরেডি ফার্স্ট প্রোগ্রাম ঠিক করে ফেলেছি স্যার।' ছেলেটা একগাল হেসে বলে। 'আটাশ তারিখ পাকিস্তানের টেস্ট দল আসতেছে এইখানে। দলে তো সব পশ্চিম পাকিস্তানি স্যার। ব্যাটাদের খেলার আগেই মিছিল নিয়ে দাঁড়ায়ে যাবো।'

'বাহ্, ভালো বুদ্ধি বের করেছেন তো।' আবু সাঈদ চৌধুরী প্রশংসার সুরে বললেন।

'আমারে স্যার তুমি করেই বইলেন, ' ছেলেটি বলে। 'আমার নাম নুরুল আলম, কভেন্ট্রির একটা দোকানের ক্যাশ দেখি। আমারে আপনি চিনবেন না, তবে আমার ছোট ভাই স্যার আপনার ছাত্র। তারেকুল আলম ওর নাম, এস এম হলে থাকে। ২৫ তারিখ থেকে অবশ্য স্যার তার কোনো খবর পাই না।'

আবু সাঈদ চৌধুরী কী বলবেন বুঝতে পারেন না, টেলিগ্রাফের বর্ণনা পড়ার পর থেকে কাউকে সান্ত্বনা দিতেও ভয় করে তাঁর।

ছেলেটার কথা মনে হয় এখনো শেষ হয়নি। একটু পর খানিক ইতস্তত করে গলা বাড়িয়ে ফিসফিস করে সে বলল, 'স্যার, একটু সাবধানে থাইকেন। কয়েকজন সাদা চামড়ার লোকে আপনারে ফলো করতেসে মনে হইলো।'

আবু সাঈদ চৌধুরী হেসে ফেললেন। 'আপনার... মানে, তোমার চোখেও ওরা ধরা পড়েছে তাহলে? ...ভয় নেই। এরা পাকিস্তানের কেউ না। বরং

উল্টোটা। ওদের কাছ থেকে আমাকে বাঁচাতেই স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের কয়েকজন অফিসার আমাকে পাহারা দিয়ে যাচ্ছে। ...যাই হোক, এত ভয় পেলে চলে না ইয়াং ম্যান। কাজ করে যাও। দেশকে স্বাধীন করতে হলে তোমাদের মতো ছেলেদের অনেক দরকার আমাদের।'

আবু সাঈদ চৌধুরী ঘুরে দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে হাঁটতে থাকেন। নুরুল আলমের সামনে তার অবয়বটা ঝাপসা হতে থাকে। নুরুল আলম সতর্ক চোখে তাকিয়ে দেখে, আবু সাঈদ চৌধুরীকে কেউ অনুসরণ করছে কি না।

নিশ্চিত হয় সে, গোয়েন্দারা ছাড়া লোকটার পেছনে তাড়া করছে না কেউই। পৃথিবীর পথে ঘুরে ঘুরে জনমত তৈরির সুকঠিন দায়িত্ব কাঁধে নেয়া আবু সাঈদ চৌধুরী তখনো জানেন না, নুরুল আলমের মতোই, দশমাস পরেই অমঙ্গলের ধূসর দাগ লাগা বাংলাদেশ নামের রাষ্ট্রটির দায়িত্ব পাবেন তিনি।

লাল হিলম্যান গাড়ি থেকে ডেমরার লঞ্চ

নৌকায় করে তারা যখন যাত্রা শুরু করেছিল, তখন সেটাকে কেমন একটা অ্যাডভেঞ্চার গল্প বলে মনে হচ্ছিলো। মাঝিরা কুপি আর হারিকেন হাতে কেমন যেন আলো অন্ধকারের লুকোচুরি খেলা বানিয়ে দিচ্ছিলো আশপাশে, ঘড়িতেও ছিল রাত আড়াইটা ছুঁই ছুঁই। বইয়ের পোকা রিমির কাছে সেটা তো অ্যাডভেঞ্চার গল্পের মতো লাগবেই!

তবে জীবনটা অ্যাডভেঞ্চার না, রিমি সেটা বেশ বুঝে গেছে এই এক মাসে। মানে ২৫ মার্চের রাত থেকেই।

সেই রাতটার কথা জীবনেও ভুলবে না রিমি। মানুষের অমন চিৎকারও আর কক্ষনো শুনতে চায় না সে। বিশেষ করে, নাগরমহল সিনেমা হল পোড়ানোর দৃশ্যটা থেকে থেকে মনে পড়ে তার। জীবন বাঁচাতে বস্তির বহু মানুষ ঢুকেছিল নাগরমহলে, আর তাদের ভেতরে রেখে আগুন দেয়া হলো হলটায়। মানুষকেও যে পোড়ানো যায়, এই কথা সেদিনই জেনেছিল সে। সে কথা মনে পড়ায় এখন এই নৌকায় বসেও কেমন থরথর করে কেঁপে ওঠে রিমি।

তারপরে থেকেই রিমিরা ছুটে পালাচ্ছে এখান থেকে ওখানে। তাঁতিবাজারের বাসা থেকে বড় মামার লাল হিলম্যান গাড়িতে করে ওরা প্রথমে যায় ছোটমামার বাসায়। ছোটমামিরা আবার চলে যাবেন বরিশালে, তাই ছোটমামার মগবাজারের বাসার কাছেই আনার আপার যে বাসা, এরপর সেখানে চলে এল রিমিরা, মানে রিমি আর রিপি। আম্মা, মিমি আর সোহেলের কোনো খবর ওরা তখনো জানত না। তাদের সাথে আবার দেখা হলো ৩০ তারিখে। বড় মামা সেই লাল হিলম্যানে করেই আম্মা, মিমি আর সোহেলকে নিয়ে এলেন।

নৌকায় বসা রিমি একবার সাবধানে ছুঁয়ে দেখে পাশে বসা আম্মাকে। আবার যদি হারিয়ে যায় তারা!

জোহরা তাজউদ্দীন ঘুমাননি, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন নদীর দিকে। রিমির স্পর্শে একবার তার দিকে চেয়ে আবারো পানির দিকে চোখ ফেরান তিনি। অন্যমনস্ক গলায় বলেন, 'কিছু বলবা রিমি? খিদে লাগছে তোমার, বিস্কুট দিবো?'

রিমি আম্মাকে আঁকড়ে ধরে মাথা নাড়ে দুই দিকে। তাকিয়ে দেখে রিপি আর মিমি ফিসফিস স্বরে কী যেন গল্প করছে। নৌকার মাঝিরা ব্যস্ত। সোহেল ঘুম থেকে জেগে না যায়, সাবধানে রিমি তাই মায়ের কানের কাছে গিয়ে ইতোমধ্যে বহুবার শোনা গল্পটাই শুনতে চায় আবার। 'আম্মু, ২৫ তারিখ বাসায় আর্মি ঢুকে আব্বুকে খোঁজার পর তোমরা কী করছিলা, আরেকবার বলবা?'

জোহরা তাজউদ্দীনকে এই গল্প এরই মাঝে বলতে হয়েছে বহুবার। মিলিটারির হাত থেকে তার পালিয়ে আসার খবরটা গ্রামে ছড়িয়েছে বাতাসের গতিতে। কীভাবে পালিয়েছেন, সেই আখ্যান শোনাতে হয়েছে প্রায় সবাইকে। বিক্ষিপ্ত মনকে গেঁথে ফেলতেই যেন একটানা একঘেয়ে গলায় এই মাঝরাতে মাঝ নদীতে গল্পটা আবার রিমিকে শোনাতে শুরু করেন জোহরা।

সে গল্পে উর্দুভাষী আতিয়া বাগমার উপস্থিত বুদ্ধিতে মিলিটারির কাছে জোহরাদের পরিচয় দেন ভাড়াটিয়া বলে, সে গল্পে তাজউদ্দীনের মিসেসকে ধরতে না পেরে নিরাশ মিলিটারি যাওয়ার আগে কোনো অদ্ভুত কারণে ঘুম ভেঙে জেগে ওঠা মিমিকে বলে, 'বেবি, ভয়ের কিছু নেই। তুমি শুয়ে থাকো।' সে গল্পে মানুষের হাত বাড়ানো থাকে, দেয়াল টপকে পাশের বাড়িতে পালানোর সময় ঝুঁকি নিয়ে সাহায্যের হাত বাড়ায় ও বাড়ির ভাড়াটের ছেলেটি। সে গল্পে বিশ্বাসঘাতকতাও থাকে, যখন ধানমণ্ডির এক গৃহকর্তা অন্য বাড়িতে নিয়ে যাবার কথা বলে তাদের মাঝ রাস্তায় ফেলে দিয়ে আর ফিরে আসেন না। এক বছর তিন মাসের সোহেল আর পাঁচ বছরের মিমিকে বুকে নিয়ে সে রাতে জোহরা আশ্রয় নিয়েছিলেন রাস্তার পাশের এক ইটের স্তূপের আড়ালে।...

গল্প শোনার সাথে স্রোতের টান দেখতে দেখতে কখন চোখ বুজে গেছে তার, রিমি তা বলতে পারে না। চোখ খুলে সে দেখে চারপাশের দৃশ্য পালটে গেছে। নিকষ কালো স্রোতের খেলা নেই পানিতে, বরং কমলা সূর্য, রুপালি পানি আর নীলচে আকাশ মিলে কেমন সুন্দর একটা বর্ণময় দুনিয়ায় নিয়ে এসেছে ওদের। সবচেয়ে বড় কথা, নৌকার বদলে ওরা কখন যেন উঠে গেছে একটা লঞ্চে। নৌকার সহযাত্রীদের মাঝে হাসান ভাই, রুহুল আমিন ভাইরা ওদের সাথেই লঞ্চে আছেন; কিন্তু মফিজ কাকুর স্ত্রী নাকি বাচ্চাদের নিয়ে আলাদা হয়ে গেছেন পথে।

লঞ্চের রেলিং ধরে দুলতে দুলতে রিমি ভাবে ফেলে আসা দরদরিয়ার কথা। মহিষের গাড়ি, দোতলা কাঠের বারান্দা আর লাল ঝুঁটির সাদা মোরগটার কথাও মনে পড়ে তার।

আম্মা, মিমি, সোহেলের সাথে আবার একত্রিত হবার পর প্রথমে ওরা গিয়েছিল পরিচিত আফতাবউদ্দিন সাহেবের গ্রামের বাড়ি কালিগঞ্জে। তবে সেখানে যাওয়ার পরেই জানাজানি হয়ে যায় তাজউদ্দীনের পরিবার এই গ্রামে আশ্রয় নিয়েছে বলে। একরকম বাধ্য হয়েই তাই রিমিরা চলে গিয়েছিল ওদের গ্রামের বাড়ি দরদরিয়ায়।

সেই বাড়িতেই চৌকির উপর বসে ওদের ১৭ এপ্রিলের সরকার গঠনের অনুষ্ঠান শোনা, বাংলাঘরের সামনের উঠান ভরিয়ে রাখা মানুষেরা সেদিন কী যে খুশি!

তবু দরদরিয়া থেকে সরে পড়তে হলো। ঢাকা থেকে খবর এসেছে, নাম-বয়স-ছবিসহ নাকি ওদের খোঁজা হচ্ছে। গতকালই দুপুরে শোনা গেল কামান দাগার শব্দ। নদীর ওপারে শ্রীপুর বাজারে চলে এসেছে পাক আর্মি। কাজেই আর দেরি করা চলে না, রাতেই ওরা রওয়ানা হয়ে গেল ঢাকার দিকে।

এইসব চিন্তা করতেই করতেই রিমির দুপুর হয়ে যায়। আজানের অল্প পরেই লঞ্চ থামে ডেমরা ঘাটে। তাড়াতাড়ি দুটো ট্যাক্সি ডেকে রিমিরা সবাই উঠে বসে সেখানে। ফাঁকা রাস্তায় জোরসে ছোটা ট্যাক্সি থেকে আকাশে তাকিয়ে রিমি দেখে, আকাশভর্তি শকুন। ঢাকার আকাশ কালো হয়ে আছে শকুনে।

কারণ অনুসন্ধানে এদিক ওদিক তাকাতেই চোখে পড়ে দৃশ্যটা। বাঁ-দিকের খাল ভর্তি মানুষের লাশ। বিহ্বল রিমি অবাক হয়ে দেখে, সেই লাশগুলোর আশপাশে মানুষের মতো হেঁটে বেড়াচ্ছে কয়েকটা শকুন।

শকুন যে মানুষের মতো হাঁটতে পারে, এই কথা রিমির জানা ছিল না।

জননী

জাহানারা ইমাম রাঁধতে বসেছেন, আজ তার জন্মদিন।

অন্য বছরগুলোতে জন্মদিনে ভালো রান্নাবান্না করা হয়, রুমী-জামী দুই ভাই হাত পেছনে নিয়ে হাসিমুখে তার জন্যে 'সারপ্রাইজ প্রেজেন্ট' নিয়ে আসে, সেই উপহার দেখে তাকে আকাশ থেকে পড়ার মা-সুলভ অভিনয় করতে হয়। এবারে অবশ্য বিশেষ কিছু রান্না করা হচ্ছে না।

এবার মনটা অসাড়। অনেক চেনা পরিচিত মুখ গত কয়েকদিনে প্রাণ দিয়েছে আর্মির গুলিতে। রুমী-জামীর বাবা শরীফের ইঞ্জিনিয়ার বন্ধু নুরুর রহমান, ভিখু

চৌধুরী, ভিখুর স্ত্রী মিলি। এদের কেউই সক্রিয় রাজনীতিতে ছিল না, কী অপরাধে প্রাণ গেল ওদের সেটা কেউ বলতে পারবে বলে বোধহয় না।

কয়েকদিন আগে জাহানারা ইমাম শাঁখারি পট্টিতে গিয়েছিলেন। প্রচুর ফিনাইল দেয়া হয়েছে, কিন্তু রক্তের গন্ধ এখনো পুরো মুছে ফেলা যায়নি। বিহারিদের মাঝে মিলিটারিরা ওই বাড়িগুলো ভাগ করে দিয়েছে। বিহারিরাও প্রতিদানে কম দিচ্ছে না আর্মিকে। মিরপুরের দিকে নাকি কোনো বাস যেতে পারছে না, বিহারিরা ধরে কেটে সাফ করে দিচ্ছে ওদিক দিয়ে পালাতে চাওয়া বাঙালি যাত্রীদের। শান্তি কমিটি নামে আরেকটা নখরা বানিয়েছে জান্তারা। আবদুল জব্বার খদ্দর, গোলাম আজম, মাহমুদ আলীরা এই নাগরিক কমিটির সদস্য। এদের নিয়ে রঞ্জু একটা মজার খবর শুনাল সেদিন। গ্রিন রোডের মাথায় এই কমিটির অন্যতম সদস্য আবদুল জব্বার খদ্দর বক্তৃতা করছিল। শ্রোতা ছিল তিন ট্রাফিক, এক মিলিটারি আর এক আর্মি জওয়ান! শুনে রুমীরা হেসেই খুন।

রুমী কিন্তু আজকাল বড় একটা হাসে না। মাঝখানে সে প্রায়ই তর্ক করত যুদ্ধে যাবার যৌক্তিকতা নিয়ে। 'মা, ছাত্রজীবন পড়ালেখার সময়, জানি আমি, চিরকালীন সত্যি। কিন্তু দেখো, এই ১৯৭১ কি চিরকালের সমস্তটা মিথ্যা করে দেয়নি? আমেরিকার আইআইটি'তে তুমি আমায় ক্লাস করতে পাঠাতে চাও। বেশ, বিশাল ডিগ্রি নিয়ে ইঞ্জিনিয়ার হয়ে হয়তো আমি ফিরবো, কিন্তু মনে রেখো মা—বিবেকের কাছে তোমার রুমীকে চিরকাল ছোটই থেকে যেতে হবে।'

নাসিরের বাড়িতে চলা এই কথোপকথনের পরের মুহূর্তটার কথা জাহানারা ইমাম জীবনেও ভুলবেন না। কীভাবে যেন চোখ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তার, মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল, 'যা, তুই যুদ্ধেই যা। দিলাম তোকে দেশের জন্যে কোরবানি করে।'

দৃশ্যটা মনে পড়তেই জাহানারা ইমাম আবার কেঁপে ওঠেন। এইটুকু ছেলে তার, সেও নাকি যুদ্ধ করবে!

গত কয়েকদিনে আরেকটা অসম্ভব রকমের গুজব শোনা যাচ্ছে, মনে পড়ে তার। পাকিস্তানি আর্মি যুবক বা বয়স্ক লোকদের যাকে ধরছে, আগের মতো তাকে আর গুলি করে মেরে ফেলছে না। বরং সিরিঞ্জ দিয়ে তাদের শরীরের যতটা রক্ত পারা যায়, বের করে নিয়ে ফেলে দিচ্ছে লাশটা। দেশের বিভিন্ন জায়গায় যে যুদ্ধ হচ্ছে মুক্তিবাহিনীর সাথে, তাতে নাকি জখম হয়ে অনেক রক্ত লাগছে মিলিটারিদের। এজন্যেই নাকি জন্ম এই আধুনিক ভ্যাম্পায়ারদের। যদি যুদ্ধে জখম হয়ে রুমী ধরা পড়ে মিলিটারির হাতে, তখন তার রক্ত বের করে নিয়ে...

জাহানারা ইমাম আর ভাবতে চান না, চাইলেও অবশ্য পারতেন না, দুই ছেলে ততক্ষণে তাকে পেছন থেকে ধরে বের করে নিয়ে এসেছে বাইরের ঘরে। 'এইখানে আসো আম্মা, কথা আছে কিছু।'

রুমী-জামী দুজনেই হাতে করে ধরে আছে কিছু একটা, জাহানারা ইমাম আড়চোখে দেখেন। জন্মদিনের গিফট নাকি? ...জামী হাতে ধরা একটা আধফোটা কালো গোলাপ এগিয়ে দেয় তার দিকে। বলে, 'হ্যাপী বার্থ ডে আম্মা। এই নাও, আমাদের স্বাধীনতার প্রতীক। স্বাধীনতার ফুল ফুটতে আরো কিছু দেরি আছে।'

এই গোলাপের নাম বনি প্রিন্স, জাহানারা ইমাম জানেন। কালচে ঘন মেরুন রঙের পাপড়িগুলোর দিকে তাকিয়ে গোলাপটার হাতবদল দেখতে দেখতে রুমী কেমন এক স্বরে বলে, 'এই রকম রক্ত না ঝরিয়ে আমাদের স্বাধীনতার রাজপুত্র আসবে না।'

জাহানারা ইমাম সতর্ক হয়ে ছেলের দিকে তাকান। তার সন্দেহ হয়, এই জড়ানো স্বরে রুমী তাকে কিছু শোনাতে চায়। কী শোনাতে চায় তার ছেলে?

রুমী ততক্ষণে মায়ের হাতে ধরিয়ে দিয়েছে একটা বই। লিয়ন উরিস এর 'মাইলা-১৮'। জানালার পাশে দাঁড়িয়ে রাস্তা দেখতে দেখতে রুমী বলে, 'আম্মা, এই বইটা পড়ো। সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারে পোলিশ ইহুদিদের উপরে জার্মানরা যে কী দানবীয় অত্যাচার করেছিল, সেটা এই বই পড়লে বোঝা যায়। নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার আগ পর্যন্ত পোলিশরা একটুও মাথা নোয়ায়নি, বীরের মতোই লড়ে গেছে। ইহুদিদের জার্মানরা মানুষ বলে মনেই করত না আম্মা। ঠিক যেমন পাকিস্তানিরা আমাদের মানুষ বলে ভাবে না।'

বইটার দিকে চেয়ে জাহানারা ইমামের বুক ধড়ফড় করতে থাকে, লোহার সাঁড়াশি দিয়ে কেউ যেন চেপে ধরেছে পাঁজরের সবগুলো হাড়। রুমী এসব বলছে কেন!

জানালার দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্ক স্বরে রুমী বলে, 'তোমার জন্মদিনে আমি একটা সুখবর দেই আম্মা। কেবল আজ বলবো বলে এতদিন চেপে রেখেছিলাম কথাটা। আমার তারেক নামের বন্ধুটাকে তুমি দেখেছো না আম্মা? সে যুদ্ধে গেছে, মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিয়েছে। ওর মাধ্যমেই ওদের সাথে যোগাযোগ হয়েছে আমার। আমিও সব ঠিকঠাক করে ফেলেছি, আমারও যুদ্ধে যাওয়া ফাইনাল। যেকোনো দিন চলে যাবো।'

কিছু বলতে গিয়েও গলা থেকে স্বর বেরোয় না মার। কী বলবেন তিনি? রুমী তো আর এখন শুধু তার ছেলে নেই। সে এখন জীবনের সন্তান। রুমীর সেই একান্ত জীবনে তার মায়েরও কোনো প্রবেশাধিকার নেই।

মা জননী নিঃসঙ্গ।

প্রথমজন যেন এক জ্বলন্ত মশাল। স্বভাবজাত নেতা বলেই মনে হয়েছে তাকে এবং শেখ মুজিবের জন্যে সম্ভব অসম্ভব যেকোনো কিছুই সে করতে পারে। সবচেয়ে ভালো লেগেছে তার হাসি। শেখ মনির হাসিটা একদম বুকের ভেতর থেকে বেরোয়!

দ্বিতীয় ছেলেটা কাজের মানুষ, কথা খুব কমই বলে, তবে সে অল্প কথাতেই কাজ হয় অনেক বেশি। এমন কি কাছের মানুষের সাথেও কথা বলতেও কেমন যেন মারমুখী ভাব তার। সব মিলিয়ে তার মনে হয়েছে সিরাজুল আলম খান এমন এক লোক, যার চিন্তাভাবনা র‍্যাডিক্যাল।

তোফায়েল আহমেদ আবার দুর্দান্ত কথা বলতে পারে। কালোরঙা গাট্টাগোট্টা টাইপ চেহারা, বাংলাদেশের ছাত্রদের কাছে তার জনপ্রিয়তা নাকি আকাশচুম্বী। সন্দেহ নেই তার, শেখ মুজিবের কাছের এই ছেলেটাও গড়ে উঠছে তুখোড় এক রাজনীতিক হয়ে।

চার নম্বরের নামটা যেন কী? ওই যে, ধীর স্থির ছেলেটা, যার আবেগ অন্যদের চেয়ে কিছুটা কম বলে মনে হয়? ...রাজ্জাক, রাজ্জাক। নামটা আবদুর রাজ্জাক, মনে পড়ে মেজর জেনারেল সুজন সিং ওবানের।

মণিবাবু-সরোজ বাবু-তপু বাবু-রাজু বাবু! চারজনের ছদ্মনামগুলো মনে করে ঠোঁটের কোণে একটা হালকা হাসি খেলে যায় মেজর ওবানের। কলকাতার ভবানীপুর পার্কের পাশে সানি ভিলা নামের দোতলা বাড়িটায় এই ছদ্মনামেই ছিল ওরা চারজন। গোলাপি রঙের সানি ভিলা নামের বাড়িটা চিত্তরঞ্জন সুতারের। বলতে গেলে সুতারের সানি ভিলা থেকেই তো জন্ম হলো মুজিব বাহিনীর।

তরুণ নেতাদের মতে, যুদ্ধ হবে বিপ্লবী কাউন্সিল দিয়ে। ওখানে আবার মন্ত্রিসভার দরকারটা কী? তার ওপর, মন্ত্রিসভা মানে তো ওই তাজউদ্দীন নামের লোকটা, তাকে নিয়ে অভিযোগের শেষ নেই ছেলেদের। 'তোমাদের ঐ কমিউনিস্ট মন্ত্রী ডি.পি. ধরের সাথে আঁতাত আছে তাজউদ্দীনের। ওরা ভাবে বঙ্গবন্ধু আর ফিরে আসবেন না। নিজেরাই ক্ষমতার দখল রাখতে চায় ওরা, ওদের তাই এতটুকু বিশ্বাস করি না আমরা!' ছেলেদের মাঝে কেউ কেউ রাখঢাক না করেই বলেছিল ও-কথা, মেজরের স্পষ্ট মনে পড়ে।

কিন্তু মুক্তিবাহিনী থাকতে আবার মুজিব বাহিনী কেন?

গেরিলা বিশেষজ্ঞ মেজর ওবানকে ডেকে পাঠানো হয়েছিল এই মাসের শুরুতে। এখন যেন কোন মাস চলছে এটা?...হ্যাঁ, মে মাস। সানি ভিলার সেই বৈঠকেই তরুণ নেতারা বলেছিল বিশেষ একটা বাহিনী গঠনের পরিকল্পনার কথা। শেখ মুজিব নাকি বহু আগেই যুবনেতাদের কর্তৃত্ব দিয়ে রেখেছেন এই বিষয়ে, তাজউদ্দীন তা জানেন। আর তাজউদ্দীন এখন যেভাবে মওলানা ভাসানীসহ

বামদলগুলোকে গুরুত্ব দিচ্ছে, তাতে সামনে যুদ্ধটা লম্বা হলে সম্ভাব্য বামপন্থি প্রভাবটাও ঠেকানো দরকার, এটাই মত ছিল ছেলেদের। তার জন্যে এরকম একটা নিজস্ব খাঁটি রাজনৈতিক আদর্শের, যে আদর্শকে মুজিববাদ নামে ডাকছে ছেলেরা, বিশ্বাসী বাহিনীর তো দরকার আছেই!

...খুব সম্ভব, ভারতীয় সরকারও বাংলাদেশের যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হলে সেটার লাগাম যাতে বামদের হাতে চলে না যায়, ঠিক এই ভেবেই মুজিব বাহিনীর প্রস্তাবটা অনুমোদন করেছে, নীতিনির্ধারক না হয়েও মনে হয় মেজর ওবানের। আবার বুড়ো মন্ত্রীগুলো যুদ্ধ চালাতে ব্যর্থ হলে একটা বিকল্প নেতৃত্বও তৈরি রাখতে হবে কে জানে, এটাই আবার মুজিব বাহিনী তৈরির কারণ কি না। সব ডিম এক ঝুড়িতে না রাখা আরকি। তবে হ্যাঁ, একটা বিষয়ে একদম নিশ্চিত মেজর জেনারেল। রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালাইসিস উইং অর্থাৎ র-এর পৃষ্ঠপোষকতায় তৈরি হতে যাওয়া এই মুজিব বাহিনীর ওপরে মুজিবনগর সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। ভারতীয় সেনাপ্রধান স্যাম মানেকশ আছেন এর চার্জে।

জানালা খুলতেই মেজর ওবানের মনটা হঠাৎ ভালো হয়ে গেল। কয়েক টুকরো মেঘ ঘোরাঘুরি করছে হাতের নাগালেই। ইচ্ছে হলেই ছুঁয়ে দেয়া যায়। আর ওই দেখা যায় হিমালয়! হিমালয়ের কাছাকাছি নাম না জানা এক উঁচু পাহাড়ের ওপরের সেনা ছাউনিতে আছেন এখন তিনি। জানালা খুললে মাঝে মাঝেই ঘরে ঢুকে পড়ে মেঘ।

দেরাদুনের অদূরে এইসব পাহাড়ের কোলেই, অচিরেই শুরু হতে যাচ্ছে মুজিব বাহিনীর প্রশিক্ষণ।

কলকাতার বুকে

আবদুল বাতেনের জায়গা হয়েছে বউবাজারের কাছে একটা ছাত্র হোস্টেলে। আলাউদ্দীন ভাইসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার পরিচিত অনেকেই উঠেছে এখানে, তাদের সাথে শরণার্থী জীবন শুরু হয়েছে আবদুল বাতেনেরও। দিনে সে টুকটাক রান্না করে, ছাত্রদের ফাইফরমাশ খাটে। রাতের বেলা তাকে সিঁড়ির গোড়ায় ঘুমোতে হয় দারোয়ান পাঁড়েজির সাথে। পাঁড়েজির টিকিতে প্রায়ই বাঁধা থাকে একখানা লালরঙা জবা ফুল, সময়ে সময়ে তাকে সুর করে তুলসীদাস রামায়ণ পড়তে শুনেছে আবদুল বাতেন। ভাষাটা হিন্দি বলে সে বোঝেনি, পাঁড়েজীকে প্রশ্ন করে জেনে নিয়েছে।

কলকাতায় ইতোমধ্যেই মনে হয় বেশ নাম ফেটে গেছে এই হোস্টেলের। ছাত্ররাই সংখ্যায় বেশি, তবে হোস্টেলে গায়ক, অভিনেতা, ভবঘুরে বেকারদেরও অভাব নেই একদম। এখানে জায়গা নেয়া 'ইস্টুডেন' ভাইদের মাঝে বলতে গেলে

প্রতিদিনই ভীষণ রকম তর্কাতর্কি চলে। কী নিয়ে সেই তর্ক, তার অনেকটাই আবদুল বাতেনের কাছে অপরিষ্কার। সেখানে ব্যবহৃত কিছু শব্দ তো এর আগে কখনো শোনাই হয়নি তার।

তর্কে মাসুদ ভাইয়ের গলাটাই সবচেয়ে জোরালো শোনায়। 'হুঁহ, ওই ইয়াহিয়া আর ইন্দিরার মাঝে কী এমন পার্থক্য! সব সমান। ইয়াহিয়ার সৈন্যরা সরাসরি খুন করছে, আর ইন্দিরা এই বাংলাদেশ ইস্যুটাকে লেজে খেলাচ্ছে। আরে বাবা, বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়ে ফেললেই তো কাজ হয়ে গেল। ...আসলে কী জানেন, বাংলাদেশের মানুষের দিকে পশ্চিমবাংলার মানুষের যে টান, সেই সুযোগে ইন্দিরা নিজের দলের আখের গুছিয়ে নিচ্ছে। আমাদেরও দিন শেষে অবস্থা হবে ঐ তিব্বতি রিফিউজিদের মতোই, ঘরে আর ফেরা হবে না দেখবেন, এই আমি বলে রাখলাম।'

হাতে হাতে চায়ের কাপ তুলে দেয়ার ফাঁকে মাসুদ ভাইয়ের কথার সুরটা কেমন যেন লেগেছিল আবদুল বাতেনের। কই, ইন্দিরা গান্ধী মহিলাটিকে তার তো বেশ ভালোই লেগেছে। কেমন সোজা সাপটা কথা বলেছিলেন ওই দিন!

হ্যাঁ, শরণার্থীদের উদ্দেশে ইন্দিরার ভাষণ অনেকের সাথে টিভিতে দলবেঁধে দেখেছে আবদুল বাতেন নিজেও। ইন্দিরা সেদিন নিজেই খিচুড়ি তুলে দিয়েছিল কয়েকজন শরণার্থীর পাতে। বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়া নিয়ে অবশ্য মাসুদ ভাই যেরকম বলল, কোনো কথাই সেদিন বলে নাই ইন্দিরা। কিন্তু কী সুন্দর ব্যবহার! বয়েসের ভারে একদম বাঁকা হয়ে যাওয়া একটা বুড়িকে ইন্দিরা নিজেই টেনে তুলেছিল সেদিন, বাতেনের মনে আছে।

শনের মতো চুল বুড়ির, শাড়িতে অজস্র জোড়াতালি। কিন্তু সব ছাপিয়ে বাতেনের মনে পড়ে ইন্দিরার স্পর্শে বুড়ির কান্নায় ভেঙে পড়াটা। 'ওরা আমার পোলাডারে মাইরা ফেলাইছে! রাইক্ষসেরা আমার পোলাডারে মাইরা ফেলাইছে! আমগো গেরামে আগুন ধরায়া দিছে! মাগো, নাতিপুতি নিয়া পলায়া আইছি। আমাগো তুমি রক্ষা কইরো আম্মা, আমাগোরে চাইয়ো, সাহাইয্য কইরো!'

ডাকসাইটে ইন্দিরার মাঝেও কি সেই মুহূর্তে সংক্রামিত হয়েছিল কয়েক ফোঁটা আবেগ? কে জানে, তবে মুখ খোলার পর সেই চিরকালীন কূটনৈতিক আচারের বাইরে কিছু খুঁজে পাওয়া যায়নি তাঁর ভেতর।

ইন্দিরা মাইক্রোফোনের সামনে কথা বলেছিলেন প্রথমে বাংলায়। কে যেন পাশ থেকে মনে করিয়ে দিয়েছিল, ঈষৎ লম্বা নাকের এই মহিলা বাংলা শিখেছিলেন কৈশোরেই। শান্তিনিকেতনে, রবীন্দ্রনাথের কাছে।

'আপনারা সবাই আমাদের অতিথি। ২৫ মার্চের পর থেকে এই দেড় মাসের মাঝেই পূর্ব পাকিস্তান থেকে উদ্বাস্তু এসেছে প্রায় ২০ লক্ষ, সেটা বাড়ছেই দিনে দিনে। যারা নির্যাতিত, যারা অত্যাচারিত, ভারতের মাটি তাদের সবার জন্যে

উন্মুক্ত। আমাদের ভারত গরিব দেশ, তবু একজন অতিথিও ফিরে যাবেন না আমাদের সাহায্য চেয়ে। তবে সারা বিশ্বকেই বুঝতে হবে, ভারতের পক্ষে একা মানবতার হয়ে লড়াই করা সম্ভব নয়। পৃথিবীর বৃহৎ শক্তিগুলোকেও এদিকে নজর দিতে হবে।'

বউ বাজারের ঘরে এখন ইন্দিরার হয়ে জবাব দেন মেসবাহ ভাই। কথা তিনি কম বলেন, তবে যখন বলেন, সেটা যে তার মনের কথাই হয়, এই বিষয়ে অন্য অনেকের মতো আবদুল বাতেনেরও সন্দেহ থাকে না। মাসুদ ভাইয়ের জবাব দিতে গিয়ে মেসবাহ ভাই শব্দ খরচ করেন ধীরে ধীরে।

'দেখো, স্বীকৃতি জিনিসটা আমরা বললাম, আর ভারত সরকার দুম করে দিয়ে দিল, এমনটাই হবে ভাবছো কেন। দুনিয়ার নানা দেশের পত্রিকায় তো আস্তে ধীরে আসছে আমাদের যুদ্ধের প্রকৃত অবস্থাটা। পাকিস্তানি মিলিটারি যেভাবে প্রথমে সব অস্ত্রের জোরে ঠান্ডা করতে চেয়েছিল, এখন তো সেটা আর করা যাচ্ছে না। বিদেশি সাংবাদিকেরা রিপোর্ট করছে। পৃথিবীজুড়ে আস্তে আস্তে একটা জনমত গড়ে উঠছে আমাদের পক্ষে।

আর, আমাদের ব্যর্থতাও কি কিছু নাই? সেদিন বনগাঁ থেকে ফিরলাম। বনগাঁ থেকে শিয়ালদার মাঝের প্রতিটা রেলস্টেশনেই এখন বাংলাদেশের হাজার হাজার শরণার্থী। প্রতিদিনই শুনলাম কয়েকজন করে মারা যাচ্ছে। বাচ্চা আর বুড়োরাই বেশি। দাফনেরও ব্যবস্থা নাই। আর আমরা এইখানে নিরাপদে বসে আছি। অথচ দেখো, দেশের জন্যে কিছু করার ইচ্ছা তো আমার-তোমার কারো চাইতে কম না। কিন্তু এখন খালি জনমত তৈরি করেই সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে। প্রবাসী সরকারের নিজেদের মাঝেও শুনি দলাদলি। মার্চ জুড়ে পুরো দেশের মানুষ যেরকম এক আবেগে চলেছে, এখন কিন্তু সেই সুরটা কেটে গেছে অনেক জায়গাতেই। আফসোস তো এখানেই রে...

তবে হ্যাঁ, যুদ্ধ একটা শুরু হয়েছে। আস্তে আস্তে সেটা সংগঠিতও হচ্ছে। একদিন না একদিন আমরা জিতবোই। এই কথাটা নিশ্চিতভাবেই বিশ্বাস করি আমি।'

একদমে অনেকগুলো কথা বলে মেসবাহ ভাই কেমন চুপ হয়ে গেলেন।

'ওরে বাপরে, ছোট্টু তো বিশাল বক্তৃতা দিয়ে দিলি রে!' দরজার কাছ থেকে হাসিহাসি গলায় কে যেন কথা বলে ওঠে। ঘাড় ঘুরিয়ে অন্য সবার সাথে আবদুল বাতেনও তাকায় সেদিকে।

মাসুদ ভাই সবার আগে সামলে ওঠেন। 'আরে, জহির ভাই, আপনি!'

ফিসফিস করে সবার মুখেই ঘুরতে থাকে নামটা। জহির রায়হান, জহির রায়হান!

'হ্যাঁ আমি, ' মানুষটার হাসি যেন আর থামে না। 'চলে আসলাম। অনেক কাজ কর্ম নিয়ে এসেছি। বুঝায়ে দিতে হবে তোদের সবাইকে। আরে খালিমুখেই রাখবি নাকি রে, চা-টা কিছু দিতে বল!'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, অবশ্যই! অবশ্যই!'

মাসুদ ভাই উঠে দ্রুতগতিতে আবদুল বাতেনের হাত ধরে তাকে বাইরের ঘরে নিয়ে আসেন। পকেট থেকে কয়েকটা নোট বের করে বাতেনের হাতে ধরিয়ে দেন তিনি। 'শোন, সোজা ভীমনাগের দোকানে চলে যাবি। এক কেজি সন্দেশ, বুঝলি? ভীমনাগের দোকান চিনিস তো আবার, না কি?'

আবদুল বাতেনের দাঁত বেরিয়ে যায়। ভীমনাগের দোকানের সামনে আশুতোষ মুখার্জির ইয়া বড় গোঁফওয়ালা এক ছবি আছে। ওই দোকান চিনতে তার ভুল হবে না।

ইতিহাসের দায়

দেশের ভেতরের খবর নিয়ে নানা রকম চিঠি আসে তাজউদ্দীনের কাছে। অবস্থা খুব আশা জাগানিয়া না। সরকার থেকে যেসব আদেশ জারি করা হয়, সেগুলো লোকজনের কাছে ঠিকমতো পৌঁছাচ্ছে না। লোকজন আগ্রহ নিয়ে খবর শুনতে বসেও কোনো সংবাদ পায় না। যে ট্রান্সমিটারটা আছে তা দিয়ে কাজ চলছে না, আরেকটু বেশি পাওয়ারের একটা যন্ত্র দরকার। এই বিষয়ে যে কী করা যায়...

তাজউদ্দীনকে ভাবনার মাঝে রেখেই মইদুল হাসান প্রশ্ন করেন, 'দিল্লির অবস্থা কীরকম দেখলেন? ওসমানী সাহেবদের তো বেশ হতাশ দেখাচ্ছে। স্বীকৃতির বিষয়ে নাকি তেমন কোনো আশা নাই?'

হঠাৎ প্রশ্নে সম্বিত ফিরে পেতে কিছু সময় লেগে যায় তাজউদ্দীনের। খানিক পরে বলেন, 'বাংলাদেশকে সাহায্য করার বিষয়ে ইন্দিরাকে পার্সোনালি খুবই আগ্রহী মনে হয়েছে আমার। তার আন্তরিকতা নিয়ে সন্দেহ করার মতো কিছু নাই।'

'তা বুঝলাম।' মইদুল আবার বলেন। 'কিন্তু ইন্ডিয়ান গভমেন্ট যেকোনো কিছু খোলাসা করে বলছে না সেটাই তো হতাশা আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে আমাদের মধ্যে। অবশ্য ক্লিয়ার কোনো স্টেটমেন্ট দেয়ার মতো স্টেবল কন্ডিশন এখন নাই...'

তাজউদ্দীন মাথা ঝাঁকান। পুরো মন্ত্রিসভা নিয়েই দিল্লি গেছিলেন তারা ইন্দিরার সাথে দেখা করতে, ফিরেছেন গতকাল। কর্নেল ওসমানীসহ বাংলাদেশের বেশ কিছু প্রতিনিধিই সভায় প্রশ্ন তুলেছিলেন ভারতীয় নীতির অস্পষ্টতাগুলো নিয়ে। কথোপকথনের এক পর্যায়ে মেজাজ হারিয়ে ভারতের একজন তো বলেই দিলেন, 'বাংলাদেশ যদি মনে করে ভারত এখনই স্বীকৃতি দেবে আর কালকেই

ভারতের দেয়া অস্ত্র নিয়ে বাংলাদেশের অসংগঠিত যোদ্ধারা ঢাকা দখল করে ফেলবে, তাহলে সেটা ভুল!'

বলাই বাহুল্য, নিরাশা আর ক্ষোভ বাড়ানো ছাড়া কিছুতেই কাজে লাগেনি ওই আলাপচারিতা।

'বাদ দেন ওসব কথা।' তাজউদ্দীন হাতের সমস্যার দিকে নজর ফেরাতে চান। 'আপনার কী খবর বলেন। অনেকদিন পরে দেখা হইলো...'

মইদুল হাসেন, 'হ্যাঁ, প্রায় দুই মাস পরে। সেই মার্চের ঢাকার পরে এই কলকাতা। খবর হচ্ছে দেশের ভেতরের অবস্থা ভালো না। মধুপুর, গোপালগঞ্জের মতো দুই একটা জায়গা বাদে প্রায় পুরাটাই পাকিস্তানি আর্মির আন্ডারে। সাথে আছে শান্তি কমিটির উৎপাত। স্বাধীনতার পক্ষের লোকেদের প্রত্যেক পাড়া মহল্লার ভেতরে মার্ক করা হচ্ছে। অনেকেই এর মধ্যে ঝুঁকি নিয়ে যুদ্ধ করতে বর্ডার ক্রস করে এদিকে আসতেছে, কিন্তু অস্ত্রশস্ত্রের অভাবে তারাও খুব ডিমোরালাইজড। অন্তত আর্মসের একটা দ্রুত সুরাহা করতে হবে আমাদের...'

'এই নিয়ে আমার নিজস্ব কিছু চিন্তা ভাবনা আছে।' তাজউদ্দীন বলেন। 'আর্মস সাপ্লাই দিতে ভারতীয় সরকারের একটা অংশ বেশ বিরোধিতা করতেছে। তাদের আপত্তির জায়গাটা হচ্ছে আশঙ্কা। তাদের কথা হচ্ছে নকশালাইট, নাগা বা মিজো বিদ্রোহীদের কাছে এই অস্ত্র যাবে না; সেইটার গ্যারান্টি কী? অথচ পাকিস্তান কিন্তু প্রায় এক যুগ ধরে ইন্ডিয়ার নাগা-মিজোরামের বিদ্রোহীদের গেরিলা ট্রেনিং আর অস্ত্র দিয়ে আসতেছে।

অন্যদিকে, আমার ধারণা, ভারতের সরকারের কেউ কেউ এখনো রাজনৈতিক সমাধানের পক্ষপাতী। মুজিব ভাইকে মুক্তি দিয়ে পাকিস্তানের সাথে আলোচনার মাধ্যমেই যাতে সমাধান করা যায়, সেটাও নাকি বিশ্বাস করে কয়েকজন। মুজিব ভাইকে আমি চিনি, পাকিস্তানিরা যেভাবে জবাই করে মানুষ মারছে, এরপরে উনি কিছুতেই আর আলোচনার মাধ্যমে সমাধান চাইবেন না। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, ভারতের হয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার দায়ভারটা এখন কেবল ইন্দিরার উপরেই। এমনিতেই শরণার্থীদের জন্যে সীমান্ত খুলে দেয়ায় বেচারি চাপের মুখে আছেন, ওনাকে আর কীভাবে বুঝানো যায় সেইটা আমার মাথায় আসতেছে না...'

মইদুল বলেন, 'সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকাটা খুব সম্ভব আমাদের যুদ্ধের জন্যে খুব গুরুত্বপূর্ণ হবে। চীন আর আমেরিকা এখন পাকিস্তানের পক্ষে বেশ শক্ত স্টান্সই নিছে। এর বিপরীতে ভারত যদি সরাসরি আমাদের সাহায্য করতে চায়, তাহলে সোভিয়েতের মতো একটা পরাশক্তিকে পাশে পাওয়া তার খুবই দরকার।'

'গুড পয়েন্ট।' তাজউদ্দীন বলেন আঙুল নাড়িয়ে নাড়িয়ে। 'সোভিয়েতের মতটা জানা খুব ইম্পর্ট্যান্ট আমাদের জন্যে। মইদুল, আপনি এক কাজ করেন। আপনি বরং দিল্লি যান।'

'আপনারা না মাত্র আসলেন দিল্লি থেকে? আমি গিয়ে কী করবো?' অবাক মইদুল বলেন।

'বললাম না, ইন্ডিয়া গভমেন্টের ভেতরে নানা মুনি নানা মত? আপনি গিয়ে দেখেন কেন্দ্রের ডান বাম কোন পক্ষ কীরকম চিন্তা ভাবনা করতেছে। লোকজনের সাথে কথাবার্তা বলেন। সম্ভব হইলে সোভিয়েতের প্রসঙ্গেও তাদের মতামত নেন। খোঁজ খবর নিয়ে আমারে সপ্তাহ খানেক পরে রিপোর্ট করেন।'

নির্দেশ মেনে নিয়ে মইদুল হাসান চলে যান।

তাজউদ্দীন আবারো ফাইলপত্র নিয়ে বসেন, কিন্তু মনোযোগ বসাতে পারেন না। মইদুল তার কাছের মানুষ। তবুও, এমনকি মইদুলের কাছেও তার দুশ্চিন্তার সমস্ত বিষয়ই খোলাসা করেননি তিনি। চেপে গেছেন অনেক কিছুই। তাজউদ্দীন মইদুলকে আর বলেননি যে তার বিপক্ষে জোর প্রচারণা শুরু হয়েছে।

শেখ মনি নাকি তার বিপক্ষে আজকাল অনেক কিছুই বলে বেড়াচ্ছে। শেখ মুজিবের গ্রেফতার হবার কারণ নাকি তাজউদ্দীন। বাংলাদেশের সরকারকে স্বীকৃতি দিতে ভারত যে গড়িমসি করছে, তার কারণও নাকি তাজউদ্দীন। কেবল শেখ মনির প্রচারণাতেই শেষ নয়, বুড়োদের কেউ কেউ স্বাধীনতা ঘোষণা আদেশ অনুযায়ী কীভাবে অ্যাকটিং প্রেসিডেন্ট কর্তৃক প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের ক্ষমতা প্রয়োগ করে তাজউদ্দীনকে সরাতে পারেন, সেই চিন্তায় ব্যস্ত। নতুন সরকারের প্রতি আনুগত্য দেখা যাচ্ছে না অনেক নেতার অধীনস্ত কর্মীদের। কলকাতা ঘুরে আসলে পার্টির বহু নেতারই সন্ধান পাওয়া যাবে যারা নিজস্ব উপদল গঠন আর প্রতিপত্তি বাড়ানো নিয়ে আছে। দামি গাড়িতে চড়ে টাকাও উড়াচ্ছে দেদারসে।

তাজউদ্দীনের মাঝে মাঝে মনে হয়, তিনি ইতিহাসের গতিপথের একটা চলমান গোলকধাঁধার মাঝে আটকা পড়ে গেছেন। মুজিব ভাইয়ের অভাব তাকে সময়ে সময়ে বড্ড বেশি তাড়িয়ে বেড়ায়। শেখ মুজিবের চওড়া কাঁধের অভাবে তার উপরেই চেপে বসেছে ইতিহাসের দায়। তাজউদ্দীন কিন্তু এই নতুন দায়িত্ব নিয়ে গর্ব করার ফুরসত পান না। তাজউদ্দীন প্রতি মুহূর্তে হিসাব মিলিয়ে গুনতে থাকেন মুজিব ভাইয়ের ফিরে আসার ক্ষণ।

জাগরণের গান

মরিস অক্সফোর্ডের জানালা দিয়ে ঢুকছে ফুরফুরে বাতাস। রাস্তা মোটামুটি ফাঁকাই। চিত্রপরিচালক নুরুল হক বাচ্চু আর জাকারিয়া হাবীব বসেছেন পেছনের সিটে। চালকের আসনে বসা আলতাফ মাহমুদ গুনগুন করে গাইছেন নিজেরই সুর দেয়া গান, আমি মানুষেরই ভাই স্পার্টাকাস।

'স্বাধীন বাংলা বেতারের অনুষ্ঠান শুনছো তো তোমরা?' আলতাফ মাহমুদ প্রশ্ন করেন আরোহীদের। 'দারুণ কাজ করছে কিন্তু লোকগুলা।'

'শুনবো না মানে', জাকারিয়া হাবীব বলেন। 'শুধু প্রথম দিনটাই শোনা হয় নাই, এরপর থেকে সকাল আর সন্ধ্যায় বাসার লোকজনে বলতে গেলে রেডিও কানে লাগায়ে বসে থাকে। অনুষ্ঠান শেষ না হওয়া পর্যন্ত কান থেকে রেডিও নামায় না। এইটুকু অনুষ্ঠান, তবুও কী যে ভালো লাগে ঝিলু ভাই বুঝলেন, একদম আপন মনে হয় সেইটাকে।'

আলতাফ মাহমুদ স্মিত হাসি দিলেন। ২৫ মে থেকে চালু হয়ে গেছে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র। পঞ্চাশ কিলোওয়াটের একটা ট্রান্সমিটার বসেছে বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে, আপাতত দিনে দুইটা করে অধিবেশন প্রচার করা হচ্ছে সেখান থেকে।

'আলতাফ ভাই নাকি দিনরাত দরজা-জানালা বন্ধ করে গানে সুর দিচ্ছেন শুনলাম? ভাবিকেও নাকি ঢুকতে দিতে চান না ঘরে?' নুরুল হক বাচ্চু প্রশ্ন রাখেন।

'এই আরকি!' আলতাফ মাহমুদ যথারীতি বিনয়ী। 'কী জানো, আমাদের গেরিলা বাহিনী কিন্তু অলরেডি ঢাকায় চলে আসছে। আমার সাথে যোগাযোগও হচ্ছে ওদের বুঝলা। তোমরা যদি খালি ওদের ছদ্মবেশগুলা দেখতা! এইটুকু এইটুকু ছেলে, কিন্তু বাঘের বাচ্চা একেবারে। ফকির মিসকিন, ফেরিওয়ালা, পেপারের হকার–এইসব সাজে বাড়ির চারপাশে চলে আসতেসে ওরা। আমি তো থ একেবারে। ওদের কাছে কয়েকটা গণসংগীতের স্পুল দিতে হবে আমাকে। গোপনীয়, বুঝোই তো। এইজন্যেই দরজা জানালা আটকায়া কাজ করি।'

'তাই বলেন!' জাকারিয়া হাবীব মাথা নাড়েন। 'এইজন্যেই ভাবি বলতেসিলো আপনার নাকি মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আপনি নাকি আজকাল রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে ফকিরদের সাথে গল্প শুরু করেন!'

আলতাফ মাহমুদ সশব্দে হেসে ফেলেন। 'আরে ধুর, ও জানে নাকি কিছু! ফকির কোথায়, ওদের বেশিরভাগই ঢাকা ভার্সিটির ছেলে। শহর রেকি করতে আসছে। সেক্টর টু, খালেদ মোশাররফের রিক্রুট এইগুলা। খুব শীগগিরই আসল অপারেশন শুরু হবে ঢাকায়। তার আগে এরা আপাতত নতুন ছেলে যোগাড় করছে আর খোঁজখবর নিয়ে বেড়াচ্ছে। সোর্স এস্টাবলিশমেন্ট আরকি!'

'বুঝলাম, জহির ভাইয়ের খবর কী জ্যাক? কলকাতা যাওয়ার পরে কী হইলো কোনো খবর তো শুনলাম না।' নুরুল হক বাচ্চু প্রসঙ্গ পাল্টান।

'জহির ভাই তো যা শুনলাম ঐপারে গিয়ে শিল্পী আর বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে কাজ শুরু করছেন। বাংলাদেশ লিবারেশন কাউন্সিল, না ওইরকম কী একটা

সংগঠনও চালু করে দিয়েছেন। ফয়েজ আহমেদ, ওয়াহিদুল হক এরাও নাকি সাথে আছেন ভাইয়ার।' জাকারিয়া হাবীব বলেন।

'ভালো, ভালো খবর।' মরিস অক্সফোর্ডের রিভারভিউ মিররে এক পলক চোখ রেখে মাথা দোলান আলতাফ মাহমুদ। 'যুদ্ধ তো সব সেক্টরেই করা উচিত আসলে। যে যেইভাবে পারে।'

ছুটন্ত গাড়ির গতি কমাতে হলো ফার্মগেটের কাছে এসে। বাইরে একপলক তাকিয়েই নুরুল হক বাচ্চু আর জাকারিয়া হাবীব আঁতকে উঠলেন মনে মনে। জনা বিশেক পাকিস্তানি সৈন্যকে দেখা যাচ্ছে, গাড়ি থামাতে ইশারা করে তারা অস্ত্র উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে গেছে অর্ধবৃত্তাকার হয়ে। সাথে পেছনে কয়েকজন বাঙালিকেও দেখা যাচ্ছে। রাজাকারের দল! মনে মনে ওদের একটা শক্ত গালি দেন জাকারিয়া হাবীব।

নুরুল হক বাচ্চু আড়চোখে একবার তাদের ড্রাইভারের দিকে তাকান। আলতাফ মাহমুদের চশমার আড়ালের চোখজোড়ায় কোনো বিকার নেই। তিনি নিশ্চিন্ত।

মরিস অক্সফোর্ড থামল। ফার্মগেটের মোড় এখান থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে। এগিয়ে আসা সৈনিকটির ইঙ্গিতে গাড়ির কাচ নামালেন আলতাফ মাহমুদ।

সতর্ক চোখে গাড়ির ভেতরটা কয়েক সেকেন্ড দেখল লোকটা। জাকারিয়া হাবীব চেষ্টা করে মুখে একটা হাসি ঝুলিয়ে রেখেছেন। নুরুল হক বাচ্চু বোঝার চেষ্টা করছেন কেন এই হঠাৎ সার্চ। একটু আধটু ভয়ও পাচ্ছেন, গেরিলাদের সাথে আলতাফ ভাইয়ের যোগাযোগ আছে, এমন কোনো খবর আবার ফাঁস হয়ে গেল না কি!

'তুমলোগ কৌন হ্যায়?' একযুগ পরে যেন প্রশ্নটা করল মিলিটারি।

আলতাফ মাহমুদ নিষ্কম্প। 'হাম লোগ বাঙালি হ্যায়। আমরা বাঙালি।'

সৈনিকটি এরকম সরাসরি উত্তর পেতে অভ্যস্ত নয় বোঝা গেল। একটু অবাক হলো বোধহয় আলতাফ মাহমুদের গলার দৃঢ়তায়। এরপর বলল, 'ঠিক হ্যায়। সালাম আলাইকুম।'

লোকটা হাত তুলে ইশারা করতে পথ ছেড়ে দিল অন্যান্য মিলিটারিরা। আলতাফ মাহমুদের হাতের স্টিয়ারিঙে আবার সচল হয়ে উঠল যন্ত্রশকট।

নুরুল হক বাচ্চু মুখ খুললেন মিনিট দেড়েক পর, ফার্মগেট পেরিয়ে গেলে। কাঁপা গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'আলতাফ ভাই, কী বলেছিলেন এইটা! শালারা যদি আমাদের ধরে রাখতো?'

আলতাফ মাহমুদ ঘাড় ঘুরিয়ে ঠান্ডা চোখে একবার দেখলেন প্রশ্নকর্তাকে। বোঝাই গেল, রেগে গেছেন। 'তাহলে কী হতো? মিলিটারি ধরবে, এই ভয়ে বলবো হামলোগ পাকিস্তানি হ্যায়?'

অদ্ভুত সেই চোখজোড়া প্রত্যক্ষ করে একটা গল্প মনে পড়ে গেল জ্যাক ওরফে জাকারিয়া হাবীবের। বরিশাল জিলা স্কুলের ছাত্র আলতাফ মাহমুদ, যার ডাকনাম ঝিলু, ক্লাস সিক্সে পড়ার সময়ই উঠোনের একটা কাঁঠাল গাছের গায় ছুরি দিয়ে খোদাই করে রেখেছিলেন তিনটি শব্দ। " ঝিলু, দ্য গ্রেট।"

১৯৭১ এর এই বিহবল গ্রীষ্মে জাকারিয়া হাবীবের মনে হয়, ঝিলু ভাইয়ের সেই ছেলেমানুষি ভুল ছিল না। দেশপ্রেমের লিস্টি করলে আলতাফ মাহমুদ সেখানে গ্রেটদের কাতারেই থাকবেন।

মরিস অক্সফোর্ড মৃদু গর্জনে ছুটছে গুলশান। ইঞ্জিনের শব্দ ছাপিয়ে মাঝে মাঝে ভেসে আসছে আলতাফ মাহমুদের গলা, আমি মানুষেরই ভাই স্পার্টাকাস...।

মানুষটা শিশুর মতো, রাগ পুষে রাখতে জানেন না।

'হে নাবিক, জীবন অপরিমেয় নাকি!'

জোহরা তাজউদ্দীন উদ্ভ্রান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। কানে রিসিভারটা ঠেকানোই রইল। ওপাশের মানুষটি এক দমে তিনটি বাক্য বলেই ফোনটা নামিয়ে রেখেছেন।

'তোমরা এসে গেছো? ... গুড, থাকো। রাতে দেখা হবে।'

অথচ জোহরা ভিন্নরকম আশা করেছিলেন।

পুরনো এক মালবাহী চার চেয়ারের কার্গো প্লেনে আজ কলকাতায় পৌঁছেছিলেন তারা। দারুণ ভিড়ের মাঝ দিয়ে ট্যাক্সি ভ্রমণটাও ছিল কান্তিকর। পার্ক সার্কাসে লালরঙা বাংলাদেশ মিশনের একপাশেই হোসেন আলি সাহেবের বাসা।

মাসখানেক আগ এই হোসেন আলিই হয়ে উঠেছিলেন কলকাতার যাবতীয় আলোচনার কেন্দ্র। পাকিস্তানের কলকাতা দূতাবাসের ডেপুটি হাইকমিশনার হোসেন আলি আনুগত্য স্বীকার করে বসলেন বাংলাদেশের প্রতি। কলকাতা দূতাবাস হয়ে গেল বাংলাদেশ মিশন। প্রেস, মাইক্রোফোন, ফটোগ্রাফার। কলকাতার বুকে অগণিত টিভি ক্যামেরার সামনে উড়ল লাল-সবুজ-সোনালি রঙের পতাকাটা। আমার সোনার বাংলা, গানের সুরে কলকাতাকে অথৈ আবেগে দোলালেন হেমন্ত মুখার্জি আর সুচিত্রা মিত্ররা।

জোহরা বাচ্চাদের নিয়ে উঠলেন সেই হোসেন আলির বাসাতেই। তাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে গেস্টরুমে। জানালায় ঝোলা পর্দা থেকে শুরু করে ওয়াশরুম, কেমন পরিপাটি সবকিছু! বাচ্চারা অবাক হয়ে দেখতে থাকে।

জোহরার অবশ্য খেয়াল নেই এসবের দিকে। হাতমুখ ধুয়েই তিনি বরং খোঁজ নেন মানুষটার। সেই কবে দেখা হয়েছে তার সঙ্গে! মুসা সাহেবের হাত দিয়ে তাজউদ্দীনের পাঠানো চিরকুট তিনি পেয়েছেন আজ থেকে দুই মাস আগে।

'তাজউদ্দীন সাহেব কোথায়, ওনার সাথে কথা বলা যাবে না একটু?'

জবাব আসে, স্যার তো এখন ব্যস্ত খুব। দিনরাত ফাইল আর মিটিং নিয়েই আছেন। তবে ফোন করে দেখা যেতে পারে!

এরপর ফোন ঘোরানো। রিং পড়তেই ওপাশের মানুষটার 'হ্যালো' উচ্চারণ শুনেই দুনিয়াটা থেমে যায় জোহরার। কতশত জমে থাকা কথার স্তূপের ফাঁক থেকে কেন জানি কাঁপা গলায় হ্যালোর বেশি বলতে পারেন না তিনিও। মানুষটা ততক্ষণাৎ ওই তিনটা বাক্য বলে ফোনটা রেখে দিয়েছে প্রত্যুত্তরে।

কেমন মানুষ এই তাজউদ্দীন? কাছের মানুষদের জন্যেও কি সামান্য সময় নাই তাঁর?

অথচ জোহরা জানেন, জোহরার ভুল হবার অবকাশ নেই। তাজউদ্দীনকে জোহরা চেনেন।

সৈয়দা জোহরার প্রথম বিয়েটার পরিসমাপ্তি ছিল অনাকাঙ্ক্ষিত। জোহরা ভেঙে পড়েননি। প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে নিজেকে তিনি কেবল সমাজের কাজেই ব্যস্ত রাখবেন। ঠিক করেছিলেন, আবারো যদি কখনো বিয়ে করবার মতো সিদ্ধান্ত নিতেই হয় তাকে, তবে কোনো ব্যাচেলরকে তিনি বিয়ে করবেন না।

তাজউদ্দীন জোহরাকে নিজের চোখে দেখেননি তখনো। জোহরার ঘনিষ্ঠ বান্ধবী অনু আর তার স্বামী ইসলাম সাহেবের মুখে তাজউদ্দীন সব শুনলেন। দেখলেন কেবল জোহরার খোঁপা করা পাশ থেকে তোলা একটি ছবি। জানলেন, সমাজ নিয়ে জোহরার চিন্তাভাবনার কথা, অতীতকে পেছনে রেখে এগিয়ে যাবার মানসিকতা। জানলেন সেই সিদ্ধান্তের কথাও, ব্যাচেলর কাউকে জোহরা গ্রহণ করবেন না। তাজউদ্দীনের কী মনে হয়েছিল জোহরা জানেন না, তবে মানুষটা দেখা করতে চাইল জোহরার সাথে।

সেই দিনটা জোহরা ভুলতে পারেন না। হাতের কাজ করা সাদা সুতির শাড়িটা জোহরার নিজের খুব পছন্দ ছিল, সাথে তিনি পরেছিলেন থ্রি কোয়ার্টার ব্লাউজ। উপলক্ষটাও তো বিশেষ। পহেলা বৈশাখের কথা কোনো বাঙালি মেয়ে ভোলে নাকি? প্রথম দেখার সময় বংশালে ইসলাম সাহেবের বাসার বাইরের উঠানে বসে তাজউদ্দীন ছোট মাছের চচ্চড়ি দিয়ে ভাত খাচ্ছিলো, এটাও মনে আছে জোহরার। সবই মনে আছে, কিন্তু কী আশ্চর্য দেখো, তাজউদ্দীন কী পরেছিল সেদিন সেটা জোহরার একেবারেই মনে নেই। হাওয়াই শার্ট? হ্যাঁ, শার্টই মনে হয় গায় ছিল মানুষটার। আবার মনে হয়, নাহ্, শার্ট না। তাজউদ্দীন তো পরেছিল পাঞ্জাবি। ধুত্তুরি ছাই, কী যন্ত্রণা!

তাজউদ্দীন দ্রুতই নিজের সিদ্ধান্ত জানালেন। তিনি জোহরাকে বিয়ে করতে চান। জোহরা অবাক হয়েছিলেন, প্রশ্ন রেখেছিলেন সাথেসাথেই। কেন? নিজে ব্যাচেলর হবার পরেও একদা বিয়ে হওয়া কাউকে কেন পেতে চাইছেন তিনি? তাজউদ্দীন কি জোহরাকে মহত্ত্ব দেখাতে চাইছেন, করুণা করছেন?

চশমার আড়াল থেকে তাজউদ্দীন একটা কেমন দৃষ্টি দিয়েছিলেন জোহরাকে। সেই দৃষ্টি, যা বুঝিয়ে দিয়েছিল জোহরার আশঙ্কা অর্থহীন, প্রশ্নটাও অপ্রয়োজনীয়। জোহরা সেই মুহূর্তেই বুঝে যান, ওই বিষয়টির কোনো তাৎপর্য নেই তার সামনে বসা মানুষটির কাছে। এ সাধারণ কেউ নয়, অতীতের যেই দৈবের জন্যে কোনো মানুষকে দায়ী করা চলে না সেই ঘটনাকে আঁকড়ে বসে থাকার মানুষ ইনি নন। এই মানুষটি তো জানে কেবল সামনে এগিয়ে যেতে।

মাত্র কদিন পরেই তাজউদ্দীন আর জোহরা, দুজনে হয়ে গেলেন দুজনার। এক যুগ আগের স্মৃতি, অথচ জোহরার মনে হয় এই তো সেদিনের ঘটনা ওগুলো!

ঘুমন্ত বাচ্চাদের পাশে নিয়ে জোহরা বিছানায় নির্ঘুম এপাশ ওপাশ করেন কেবল।

হঠাৎ দরজায় ঠক-ঠক আওয়াজ। জোহরা চকিত গতিতে উঠে পড়েন বিছানা ছেড়ে। ঘড়িতে তখন রাত একটা। ওপাশ থেকে গৃহস্বামী হোসেন আলির গলার আওয়াজ পাওয়া যায়। 'ভাবি, ঘুমায়ে গেলেন নাকি? স্যার এসে গেছেন। দরজা খুলেন।'

জোহরা দরজা খুলে পেছনে সরে আসতেই মানুষটা ঘরে ঢুকল। আর নির্নিমেষে চাইল জোহরার চোখে।

সেই তিরিশটি নীরব সেকেন্ডে তাজউদ্দীন আর জোহরার নীরবতায় বিশ্বচরাচর থেমে রইল। এত অজস্র কাহিনি, কতো বেদনার কাব্য, শত রোমাঞ্চের আখ্যান দুইজনের বলার আছে দুইজনকে। কিন্তু নীরবতা হিরণ্ময়।

অবশেষে তাজউদ্দীনই মুখ খুললেন। এগিয়ে এসে জোহরার হাত ধরে বললেন, 'কই, বাচ্চারা কোথায়? চলো চলো, ওদের একটু দেখে আসি।'

আধো ঘুম আধো স্বপ্নের মাঝে থাকা বাচ্চারা আব্বুকে দেখল অল্পক্ষণ। তাজউদ্দীন প্রত্যেকের কপালেই আলতো চুমু লেপে দিলেন। অস্ফুটে কেবল বললেন, 'ভালোভাবে থেকো।'

এরপর একটু সরে এলেন জোহরাকে নিয়ে। 'শোন, এটা তো অফিসারের বাসা। কাজেই খুব বেশি দিন এখানে থাকতে পারবা না তোমরা, তাড়াতাড়িই অন্য জায়গায় ব্যবস্থা করা হবে। সরে যেতে পারবা তোমরা...

আর শোন, তোমাদের সাথে কিন্তু আমার থাকা হবে না। আমরা মন্ত্রিসভার সবাই মিলে শপথ নিয়েছি দেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত পরিবারের সাথে থাকবো

না। আমাদের কত মুক্তিযোদ্ধা ঘর ফেলে বনেজঙ্গলে গিয়ে ট্রেনিং নিচ্ছে, ওরা যদি পরিবারকে ফেলে থাকতে পারে, তাহলে মন্ত্রী হয়ে আমরা পারবো না কেন?

ঠিক আছে তাহলে, তোমরা থাকো। আমি গেলাম।'

মানুষটা বেরিয়ে গেল এরপর। জোহরাকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই। একবারও পেছনে ফিরে তাকাল না, তাজউদ্দীনদের বোধহয় পেছন ফেরা বারণ।

জোহরা তাজউদ্দীন ঘড়ি দেখলেন। চৌদ্দশো একান্ন ঘণ্টা অদর্শনের পরের সাক্ষাতে বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাঁর পরিবারকে সময় দিয়েছেন সাত মিনিট।

"হে নাবিক, হে নাবিক, জীবন অপরিমেয় নাকি!" কবিতাটা যেন কার? রবীন্দ্রনাথ, না কি জীবনানন্দ? জোহরা কান্না আটকে প্রাণপণে মনে করবার চেষ্টা করেন।

ক্যানভাসের এপাশে

কেমন মানুষ তাজউদ্দীন? এই যে দিনে রাতে কাজ কাজ করে হন্য হয়ে যাচ্ছে লোকটা, সে নিজের গণ্ডির বাইরে কেমন? বিবৃতি, জনসভা, দাবি আদায়ের দফা, রাজপথ; এগুলো ছাড়া তাজউদ্দীনের ভেতরে কী আছে?

জোহরা কেবল ভাবেন। এসব প্রশ্ন তো আজকের নয়। সেই যখন বিয়ে হলো, জোহরা তারপর থেকেই ভেবে গেছেন এ প্রশ্নের উত্তর। যেদিন হতে আঁচলে জোহরা বাঁধলেন তাজউদ্দীনের সংসারের চাবি, সেদিন থেকেই জোহরা খুঁজেছেন মানুষটার পরিচয়।

তিন রাজবন্দি যে তাজউদ্দীনের রাজনৈতিক চিন্তার শুরু করিয়ে গেছেন, নববধূ জোহরা সে গল্প শোনেন। তার তেষ্টা মেটে না, জোহরা অন্যদের কাছে জানতে চান আরো। তাজউদ্দীনের ছোট ভাই মফিজ অগত্য একটা একটা করে গল্প শোনায় জোহরাকে।

'বুঝলা না ভাবি, ভাইজান তো ছোটবেলা থেকেই মানুষজনের চিন্তা করতে করতে অস্থির। একবার কী হইলো শুনো, গ্রামে লাগল কলেরা। আমাগো দিকে আসতে পারল না, গ্রামের এক্কেবারে মাথার বাড়িটাতে সবটির মরার দশা। লোকে তো নিজের জীবন নিয়াই অস্থির, কাজেই ভুইলাও কেউ আর গ্রামের কোনায় যায় না। কিন্তু আমার ভাই তো আর অন্যদের মতন না!

একদিন তাজউদ্দীন ভাইজান আম্মারে আইসা বলে, 'আম্মা, আপনি রান্না করেন। নদীর কোনার ওইদিকে কলেরা লাগছে। ওষুধ তো ওষুষ, বাড়ির লোকে

ভাত পর্যন্ত খাইতে পারে না। নড়াচড়ার শক্তি নাই। আপনি আম্মা ভাত রান্ধেন, আমি গিয়া ওদের ভাত খাওয়াইয়া আসবো।'

খাবার টেবিলে হাত ছড়িয়ে নতুন চুড়ির টুং টাং শব্দের সাথে এই কাহিনিও জোহরার খুব ভালো লাগে শুনতে। 'গেলেন তোমার ভাইজান?'

'যাইবো না আবার?' মফিজ হাসতে হাসতে বলে। 'ভাইজান নিজে গিয়া ওই বাড়ির লোকেদের ভাত খাওয়াইলো, ওষুধ খাওয়াইলো। বয়স? এই ধরো ভাইজান তখন সেভেন এইটে পড়ে। ভাইজানের ম্যালা সাহস ছিল। দরদরিয়ার আশপাশের জঙ্গলে তো বাঘ আসতো প্রায়ই। মজিদ ব্যাপারির মুখে শোনা, বাঘ তাড়া করলে সবাই পালাইয়া যাইতো। খালি ভাইজান পালাইতো না। বলতো, সবাই মিলে লাঠি ধইরা থাকলে বাঘই উলটা পালায়ে যাবে... '

সেই প্রাইমারি স্কুল থেকে তাজউদ্দীনের বন্ধু হয়ে থাকা নাসের আলী চা খেতে খেতে সায় দেন মফিজের কথায়। 'সাহস থাকলে কী হবে, ওর কথাবার্তা শুনে তো সেইটা বুঝার উপায় ছিল না। তাজউদ্দীন তো ওই বয়স থেকেই কথা কম বলতো খুব! কবিরাজদের ঘটনাটা শুনছেন ভাবি?

যখন নতুন নতুন টিকা আবিষ্কার হইলো, গ্রামের লোকে তো তখন খুব ভয়ের চোখে দেখতো ওইসব। তারপর আবার অশিক্ষিত যেই কবিরাজগুলা ছিল, ব্যাটারা গভীর রাতে মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়া তাদের টিকা নিতে মানা করত। মা শীতলা দেবীর কথা বইলে গ্রামের মানুষদের ভয় দেখাইতো। তাজউদ্দীন করল কী, নিজেই রাতে পাহারা দিতে নাইমে গেল। তারপর কবিরাজগুলারে হাতেনাতে ধইরে ওদেরও টীকা দেওয়ায়ে দিল। ব্যাস, লোকজন আর টিকা নিতে ভয় পায় না!'

পরোপকারী ছেলেকে নিয়ে আলোচনায় যোগ দেন জোহরার শাশুড়িও। 'মানুষের উপকার করতে পারলে তাজউদ্দীনের আর কিছু লাগতো না, বুঝলা লিলি।' ডাকনাম ধরে পুত্রবধূকে বলেন মেহেরুন্নেসা। 'আমগো গ্রামে তো বেশিরভাগ মাইনষে খুব গরিব। গ্রামের চাষিগো মইধ্যে যারার একটু অবস্থা ভালো, তাজউদ্দীন করল কী, একদিন তাদের নিয়া একটা বিরাট গোলা বানাইলো, নাম দিল ধর্মগোলা। কেউ অভাবে পড়লে তারে সে ওই গোলা থেইকা সাহায্য করত...'

মফিজ বলে, 'ভাইজানের এইসব কথা বইলে কি আপনি শেষ করতে পারবেন আম্মা? ঢাকায় আসার পরেও তো উনি একটুও বদলান নাই। একবার রেলের বগিতে এক মিসকিন মহিলারে দেখলেন, সে অসুস্থ হইয়া পইড়া ছিল। ভাইজান সারাদিন দৌড়ায়ে তারে হসপিটালে ভর্তি করায়ে দিল। মিছিলে নাইমা কেউ হয়তো গুলি খাইলো, ভাইজান গেল তারে রক্ত দিতে। উনি এইরকম!'

সহপাঠী নাসের আলী বলেন, 'দুইটা জিনিস তাজউদ্দীনের খুব পছন্দের ছিল ছোটবেলায়। মাছ ধরতে সে খুব ভালোবাসতো। আর একটা হইলো পড়ালেখা। নতুন বই পাইলেই তার আর কিছু লাগতো না। কিন্তু ঐ বইও তারে বেশিক্ষণ পড়তে হইতো না। বড় ভাইয়ের ক্লাসের পড়ার বই তাজউদ্দীন ভাইয়ে আগেই পইড়ে রাখতো। পরে দেখা যাইতো, সেইখান থেকেও সে পুরাটাই মনে রাখতে পারতেছে! তাজউদ্দীনের স্মরণশক্তি খুব ভালো, ও যে কোরানে হাফেজ সেইটা তো আপনি মনে হয় জানেনই।'

'ভাইজান কিন্তু এক্সট্রা অর্ডিনারি ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট ছিল লিলি ভাবি! ম্যাট্রিকে ভাইজান বোর্ডে বারোতম হইছিল! আবার ইন্টার পরীক্ষায় ফোর্থ স্ট্যান্ড!' মফিজ উজ্জ্বল মুখে বলে।

হাসতে হাসতে জোহরা বলেন, 'সেইটা আর জানি না? তোমার ভাইজানের ক্লাসমেটেরা বারবার এই কথা মনে করায়ে দেয়।'

অদ্ভুত রকম মেধাবী তাজউদ্দীনকে নিয়ে তার সহপাঠীরাও তাই সর্বদা উচ্ছ্বসিত জোহরার সামনে। তাদের মুখেও শোনা হয় অনেক ঘটনা। ক্লাস এইটে পড়াকালীন সময়ে তাজউদ্দীনদের স্কুল থেকে নিয়ে যাওয়া হলো আহসানউল্লাহ স্কুল অফ ইঞ্জিনিয়ারিং দেখাতে। ঘুরে আসার পরে শিক্ষকেরা আদেশ দিলেন, যা দেখে এসেছো ইংরেজিতে লিখে তা জমা দিয়ো।

তাজউদ্দীনের বর্ণনা পড়ে হতবাক স্কুলের শিক্ষকেরা, সেই লেখা পড়তে দেয়া হয় উঁচু ক্লাসের ছেলেদেরকেও। স্যার বলেন, এম এ পাস করা অনেক লোকের চাইতেও আমাদের তাজউদ্দীনের ইংরেজি পরিণত।

পড়াশোনায় আসলেই সহজাত একটা দক্ষতা ছিল তাজউদ্দীনের। ক্লাস নাইন টেনে পড়বার সময় অন্য ছেলেরা যখন মাথা ঘামাচ্ছে অঙ্কের সমস্যা নিয়ে, ভূগোল নিয়ে পড়েছে গোলমালে, প্রখর ধীশক্তির তাজউদ্দীন তখন ঘুরে বেড়াচ্ছে কাঁচাবাজারের এমাথা ওমাথা। চাষিরা কেন পণ্যের নায্য দাম পাচ্ছে না, সেই নিয়ে ভাবনার শেষ নেই তার। ছেলেরা যখন ম্যাট্রিকের জন্যে মুখস্ত করছে ইংরেজি প্যারাগ্রাফ, তাজউদ্দীন তখন ছুটে যাচ্ছে জজ কোর্টে; মন দিয়ে শুনছে দুই পক্ষের আর্গুমেন্ট। জজ সাহেবের ডেপোজিশন শুনে সে সহপাঠীদের বলছে, 'জজ সাহেব যদি এই শব্দটা না বলে অমুক শব্দটা ব্যবহার করতেন, তাহলে মনে হয় আরেকটু যথার্থ হতো!'

জোহরা এইসব শুনেন, আর ভাবেন, বড় অদ্ভুত এক মানুষের সাথে জীবন বাঁধা পড়েছে তার! শুনে শুনে শুদ্ধতম মানুষটির প্রতি প্রেম আরো একটু গাঢ়তর হয় জোহরার। যে প্রেম তার উদ্দিষ্ট প্রেমিকের মতোই। সেটা অচঞ্চল, গভীর মৃদু ঊর্মিমুখরতায় ক্ষয় করে শৈলকে; সে প্রেম ঝড়ো বা লোক দেখানো উদ্দাম সিনেম্যাটিক নয়।

স্কুলের সহপাঠী ওয়াহিদুজ্জামান ঘরোয়া আসরে বলেন, 'লিলি ভাবি, তাজউদ্দীন কিন্তু আমাদের চাইতেও বেশি সিনেমা দেখছে! ...বুঝলেন না, আরে আমাদের হোস্টেল সুপার ছিলেন দারুণ কড়া মানুষ। কিন্তু তাজউদ্দীনের উনি এত মুগ্ধ ছিলেন যে হলে ভালো ইংরেজি সিনেমা আসলে উনি নিজে তারে সেই ছবি দেখতে পাঠাইতেন! আমাদের সবার জন্যে হোস্টেলে নিয়মের কড়াকড়ি ছিল, খালি তাজউদ্দীনের জন্যে সব মাফ। সে সবসময় দেশ-রাজনীতি ভাবতো তো, দিনে রাতে যেকোনো সময় তারে স্যার হোস্টেলের বাইরে যাবার অনুমতি দিছিলেন।'

দেশ রাজনীতি নিয়ে ভাবিত তাজউদ্দীন দিনে রাতে পড়ে থাকেন বাসার বাইরেই। জোহরা ভালো ছবি তোলেন, সাথে গিটারও বাজান চমৎকার। জোহরা অবসরে সেই গিটারে মাঝে মাঝে সুর তোলেন বাচ্চাদের জন্যে, কিন্তু নিরিবিলি সন্ধ্যায় একলা গিটারে হয়তো তিনি কখনো সখনো বাঁধতে চান আনন্দের সুর। কিন্তু বাঁধা পড়ে না তাজউদ্দীনের সময়।

তাজউদ্দীনের সময় কাটে রাজপথে, পার্টি অফিসে। তাজউদ্দীনের সময় কাটে জেলখানায়।

অন্যদের মুখে জোহরা শুনেছেন, বন বিভাগের লোভী কর্মচারীদের ঘুষ গ্রহণের প্রতিবাদ করায় জীবনে প্রথম হাজতবাস পর্যন্ত করতে হয়েছিল তাজউদ্দীনকে। সেই যে শুরু, এরপরে তাজউদ্দীনের জীবনের অনেকটা কেটে গেছে সেই জেলখানাতেই। জোহরা কিন্তু নিজে দশভুজা হয়ে বাচ্চাদের সামলে রেখেছেন, আত্মীয়দের দেখাশোনা খোঁজখবর করেছেন। হোমিওপ্যাথির উপর ডিপ্লোমা ছিল তার, বিনামূল্যে চিকিৎসা দিয়েছেন অনেককেই। কিন্তু ভোলেননি নিজেও সক্রিয় মিছিলে নামতে।

তাজউদ্দীনকে একলা পাওয়ার মুহূর্ত তার এসেছে তার হাতে গোনা।

এই মুহূর্তে জানালার পাশে ঠায় দাঁড়িয়ে ঘুমোতে থাকা কলকাতাকে দেখতে দেখতে পূর্বকথা স্মরণ করে জোহরা ভাবেন, তাজউদ্দীনদের একলা করে পাওয়া যায় না আসলে।

প্রতিটি মানুষ তার সামনে একটা ক্যানভাস ঝুলিয়ে রাখে। নিজেকে সে যেভাবে দেখাতে চায় অন্যদের সামনে, ক্যানভাসে সেরকম ফরমায়েশি একটা ছবি আবরণ হয় তার।

পৃথিবীতে অল্প কিছু মানুষের ক্যানভাসটা হয় আয়নার মতন স্বচ্ছ। এদের ক্ষেত্রে ভেতরে আর বাইরের ছবিতে কোনো তফাৎ থাকে না। নির্ঘুম লিলির মনে হয়, তাজউদ্দীন সেই অল্প কিছু মানুষের একজন।

জোহরা তাজউদ্দীনদের জায়গা করে দিতে মওলানা ভাসানী আর সাইফুল ইসলামকে সরে যেতে হয়েছে। আপাতত কোনার ছোট ঘরটাতেই তাদের আস্তানা। সাইফুল ইসলামের অবশ্য তাতে আপত্তি নেই কিছুমাত্র, যুদ্ধেই তো যেতে চেয়েছিলেন, হুজুরের পাল্লায় পড়ে চলে আসতে হয়েছে এই কোহিনূর প্যালেস নামের ফ্ল্যাটবাড়িতে।

সাইফুল ইসলামের কাজ বলতে আজকাল তেমন কিছু নেই। মওলানা ভাসানীর বিবৃতিগুলো দেখেন, কলকাতা ঘুরে ঘুরে কোনো খবর থাকলে সেটা হুজুরের কানে তুলে দেন। মাঝে একবার সাংবাদিক সম্মেলনে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে মওলানা ভাসানীর অবস্থানও তুলে ধরেছেন তিনি। তবে আজকে একটা দেয়ার মতো খবর আছে বটে। সার্কুলার রোডের সিপিএম দফতর থেকে ফিরে এসে সাইফুল ইসলাম সেই কথাটাই তুললেন বুড়োর কানে।

'হুজুর, আপনার সেক্রেটারি মশিউর রহমান যাদু মিয়া শুনলাম কলকাতায় আসছেন। টাওয়ার লজে আছেন এখন। আপনার সাথে দেখা করতে চান। এখন তাইলে আমারে বিদায় দেন, আমি চইলে যাই।'

মওলানার মুখে মৃদু হাসি। 'যাদু দলের সেক্রেটারি, তুমি আমার সেক্রেটারি। ওর লগে এখন দেখা যাইবো না।'

'কী যে বলেন হুজুর, আপনার নিজের দলের সেক্রেটারি। তার সাথে দেখা করবেন না কেন?'

'যাদু মিয়া জাদু জানে সায়ফল, তেলেসমাতি জাদু।' মওলানা ভাসানী গম্ভীর। 'ও আইছে আমারে ফিরাইয়া নিবার জন্যে। এহন ওর সাথে দেখা করলে যাদু নানা রকম গুজব ছড়াইবো, আমারে বেচতে কসুর করবো না। দলের কাউরেই তো আমি সাথে আনি নাই, নাকি? তোমার উপর বিশ্বাস আছে যে তুমি অন্তত আমারে বেইচা খাইবা না।... তুমি তো জানো না সায়ফল, চীনা দূতাবাসের লোকজন তিনবার দেখা কইরছে আমার লগে। তাদের কথা হইলো পাকিস্তান সাপোর্ট দাও। না পারলে চুপচাপ বয়া থাকো।'

সাইফুল ইসলাম কথা না বাড়িয়ে চুপচাপ রাতের খাবার শেষ করলেন। হুজুরের আশঙ্কা সত্যি। কলকাতার রাস্তায় নানারকম কথা শোনা যাচ্ছে আজকাল মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে। হঠাৎ করেই নাকি মার্কিন সাংবাদিক আর পশ্চিমা এজেন্সির নানা কর্তাদের আনাগোনা বেড়েছে শহরে। জোর গুজব, আমেরিকানদের কাছে চলে যাচ্ছে প্রবাসী সরকারের গোপন সভার খবর। এরকম নানা জায়গা থেকে গুজব ছড়িয়ে বিভ্রান্ত করে তোলা হচ্ছে সব মহলকেই। মন্ত্রিসভার ভেতরেও নাকি দলাদলি।

মন্ত্রিসভার প্রধান তাজউদ্দীন সাহেব নিজেও মাঝে মাঝে জরুরি সভা করতে আসেন মওলানা ভাসানীর সাথে। যাওয়ার আগে সাইফুল ইসলামের সাথেও দুয়েক কথা বলতে ছাড়েন না তাজউদ্দীন। 'সাইফুল সাহেব, আমি জানি আপনি মওলানা সাহেবের সাথে আছেন। হুজুরকে নিয়ে আমরা নিশ্চিন্ত, কিন্তু তার দলের অনেকেই কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামে আমাদের সাথে একমত না। তারাও কলকাতাতেই ঘুরঘুর করতেছেন। আপনাকে তাই একটু নজর খোলা রেখে চলতে হবে ভাই।'

তাজউদ্দীন সাহেব চলে যাবার পরে মওলানাকেও সেদিন বেশ চিন্তিত বলে মনে হয়েছিল সাইফুল ইসলামের। 'আওয়ামী লীগের ভেতরে কোন্দল আছে, বুঝলা সায়ফল। তাজউদ্দীন প্রধানমন্ত্রী, অনেকেই খুশি না। মজিবর থাকলে এই সমস্যা হইতো না। তাজউদ্দীন আপসহীন, তার চিন্তা ভাবনা সাফ। কিন্তু যেই চক্রান্ত চইলতাছে, তা সামাল দেয়া কঠিন।'

দিন দুয়েক পরে কোহিনূর প্যালেসে আরেকবার পা পড়েছিল তাজউদ্দীনের। বিদায় নেবার সময় যেন বুড়োর কথারই পুনরাবৃত্তি করেছিল লোকটা। 'সাইফুল সাহেব, আমার চেয়ারের পায়া নড়বড়ে। এর বেশি কিছু বলতেও পারি না। আপনি মওলানা সাহেবকে বোঝাবেন।'

মুক্তিযুদ্ধের মতো এমন বিপদাপন্ন সময়েও যে দলাদলি চলতে পারে, সাইফুল ইসলাম সেটা ভাবতেও পারেন না। তবে কলকাতা নাটকের আরেকজন কুশীলবকে দেখে, বলা ভালো কুশীলবের স্টেজ পারফরম্যান্সে, সন্দেহের অবকাশ ছিল না সাইফুলের। এক দুপুরে বিগলিত হাসি দিয়ে কোহিনূর প্রাসাদে হিরের মতোই ঝকঝকে হাসি দিয়ে পা রেখেছিলেন খন্দকার মোশতাক। এসেই মওলানাকে করলেন লম্বা কদমবুচি।

'হুজুর, বহুদিন পর আপনাকে দেখলাম। আপনার তবিয়ত সব ঠিক তো?'

'কেমন আছি পুছ কইরতাছো, মোশতাক?' বুড়োকে সতর্ক দেখাচ্ছিলো বেশ। 'ভালো থাকবার আর দিতাছো কই তোমরা?'

'হেহেহে, হুজুর এখনো আগের মতো রসিকই আছেন দেখি! দেখছো সাইফুল?' একগাল হাসি দিয়ে বলেছিলেন মোশতাক।

মোশতাক সাহেবের সাথে পূর্বেই পাবনা জেলে পরিচয় হয়েছিল সাইফুল ইসলামের। পাকিস্তান প্রতিরক্ষা আইনে সেবার তারা দুইজনেই আটক ছিলেন সেখানে। অত্যন্ত আশ্চর্য একটা ব্যাপার সেই বন্দিজীবনে লক্ষ করেছিলেন সাইফুল। একই দলের সদস্য হয়েও শেখ সাহেবের প্রতি ভয়ানক নাখোশ ছিলেন মোশতাক। অনেক সময় ভাষার শালীনতা না রেখেই শেখ মুজিবের বিষোদ্‌গার করতেন।

সেই মোশতাকের তৈলাক্ত হাসিতে এ মুহূর্তে কোহিনূর প্যালেসে টলেন না ভাসানী। একথা সেকথার পর জানতে চান মোশতাকের আগমনের হেতু।

'এই তো হুজুর, দেখতে আসলাম আপনার কোনো অসুবিধে হচ্ছে কি না। থাকা-খাওয়া নিয়ে কোনো সমস্যা হচ্ছে না তো হুজুর? কোনো কিছুর দরকার আছে আপনার?'

'না, কোনো সমস্যা নাই। ভারত সরকার সবরকম সাহায্যই দিতেছে।'

'তারপরেও হুজুর, একদম কিছুরই কি দরকার নাই আপনার? আপনার খেদমতে নিজেকে লাগাতে পারলে ধন্য হয়ে যেতাম হুজুর! যা চান আপনি, বান্দা হাজির করবো!'

মোশতাকের থেকে দ্রুত নিষ্কৃতি চাইছিল বুড়ো, মনে হয়েছিল সাইফুল ইসলামের। 'আইচ্ছা। টুপিটা ছিঁড়া গ্যাছে। পার তো, একটা তালের টুপি কিনা দিও মোশতাক।'

'হেহেহে, দ্যাখলে সাইফুল, হুজুরের চাহিদার বহর? কলকাতায় এখন তালের টুপি কই পাই বলতো! ... আচ্ছা, সাইফুল তুমি চলো আমার সাথে। হুজুরের টুপি জোগাড় করে দিচ্ছি।'

মোশতাককে এড়াতে নিজে না গিয়ে তার সাথে মুরাদকে পাঠিয়েছিল সাইফুল ইসলাম। লোকটা বেরিয়ে যাবার পরই সে বুড়োকে বলেছিল, 'হুজুর, ফেল মেরে গেলাম তো! বাচ্চাকাল থেকে চিনলেও মোশতাক সাহেবের মতো অমন ঘটা করে তো জীবনে আপনাকে কদমবুচি করা হলো না!'

মওলানা ভাসানী এরপর অট্টহাসিতে ফেটে পড়েছিলেন। 'কদমবুচিটাই দেখলা? লোকটারে দেখলা না? শুনো সায়ফল, লোকটা একের নম্বরের ভক্ত বিটল। দেখ না, একদল কইরাও মজিবর-তাজউদ্দীনকে সহ্য করবার পারে না? প্রগতি আর প্রতিক্রিয়াশীলতা কি একসাথে কাজ করবার পারে?'

সেদিন ঘণ্টা দুয়েক পরে হুজুরের জন্যে মোশতাকের দেয়া গুরুদক্ষিণা নিয়ে ফিরেছিল মুরাদ। বিরাটাকার স্যুটকেসটা খুলে দেখা গেল নামীদামি দক্ষিণার চাপে আসল উপহার তালের টুপিটাই সেখানে চ্যাপ্টা হয়ে গেছে। ভেলভেটের জায়নামাজ, পাথরের তসবি, খদ্দরের পাঞ্জাবি, কী নেই সেই স্যুটকেসে!

মোশতাকের নজরানা দেখে চুপসে গেছিলেন সেদিন সাইফুল ইসলাম। মনে আবার ফিরে এসেছিল সেই সন্দেহ। মার্কিনরা যে দুই হাতে অবাধে টাকা ঢালছে বাংলাদেশের কিছু লোকের পেছনে, সেই গুজব কি আদৌ মিথ্যা নয় তাহলে? স্বাধীনতার শেকড়ের গোড়ায় কি তবে আসলেই দাঁত বসেছে ইঁদুরের?

প্রধানমন্ত্রীকে দেয়া মওলানা ভাসানীর সতর্কবাণীটা মনে পড়ে যায় সাইফুল ইসলামের। 'তাজউদ্দীন, সময়টা মিটিং-মিছিল আর হরতালের না। এই সময় অস্ত্র

হাতে লড়াই, রক্ত, জীবন বাজি আর কূটনীতির। ভিতরে বাইরে হাঙ্গরের হামলা। দোস্তের লেবাসের তলায় শাণিত ছুরি। তুমি পারবা?'

কোহিনূর প্যালেসের পাঁচতলার বারান্দা থেকে রাতের কলকাতার দিকে তাকিয়ে থাকা সাইফুল ইসলাম এর কোনো উত্তর খুঁজে পায় না।

সিআইটি রোডের দিনরাত্রি

যাদু মিয়া নামের কে একজন নাকি কলকাতা থেকে ফিরে গিয়ে পাকিস্তানিদের সাথে হাত মিলিয়েছে। এই ব্যাপারটা নিয়ে আজকাল বেশ আলোচনা হচ্ছে সবখানে। যাদু মিয়া লোকটা কে, তা নিয়ে রিমির খুব স্পষ্ট কোনো ধারণা ছিল না। তবে সাইফুল ইসলাম নামের লোকটার সাথে মওলানা ভাসানীর কথাবার্তা থেকে কিছুটা সে আঁচ করতে পেরেছিল লোকটা ভাসানী দাদুর পরিচিত কেউই হবে। 'হুজুর, আপনি দেখি আসলেই বিপদের গন্ধ পান! যাদু মিয়া তো সত্যিই পলটি মারলো!'

মওলানা ভাসানী সত্যিই বিপদের গন্ধ পান কি না সেটা রিমি জানে না, তবে তাঁর একটা ব্যাপার আসলেই অবাক করার মতো। দুপুরবেলা ভাতের সাথে তিনি খচমচ করে একগাদা শুকনো কাঁচামরিচ খান! এক সাথে এতগুলা কাঁচামরিচ কীভাবে একজন মানুষ খেতে পারে, রিমি একদমই বোঝে না!

মওলানা ভাসানীকে দাদু বলেই ডাকে রিমিরা, উনি আবার আম্মার হাতের রান্না খেতে খুবই পছন্দ করেন। এর মাঝেই দুয়েকবার আম্মা তাঁর জন্যে রান্না করে দিয়েছেন। আর, কোহিনূর ম্যানশন নামের ফ্ল্যাট বাড়িটায় মওলানা ভাসানী তো রিমিদের সাথেই ছিলেন এতদিন! পার্ক সার্কাসের কাছের সিআইটি রোডে, রিমিরা ওদের নতুন থাকার জায়গাতে ওঠার দিনই দাদু প্লেনে করে শিলং চলে গেলেন।

দাদুর সাথে ওই কয়েকটা দিন ভালোই গেছে রিমির। ভারতে আসার পর থেকেই মিমির প্রচণ্ড শরীর খারাপ, সে বিছানা ছেড়ে উঠতেই পারে না। এর মাঝে আবার রিপির এসেছে জ্বর। কাজেই সঙ্গীর অভাবে মওলানা ভাসানীর কাছ থেকে গল্প শুনেই কয়েকটা দিন কাটিয়ে দিয়েছে রিমি। আর দাদু কত গল্পই না জানেন। রিমিদের যে দাদাবাড়ি, কাপাসিয়া, সেখানেও নাকি গেছেন মওলানা ভাসানী। '৫৪-এর ইলেকশনের সময় নাকি আবার একেবারে হাতির পিঠে চড়েই গিয়েছিলেন কাপাসিয়ার গজারি বনের মাঝ দিয়ে!

গল্প হয়েছে রিমির আব্বুকে নিয়েও। 'তাজউদ্দীন তো আমার যোগ্য পোলা!' একগাল হেসে বলেছিলেন বুড়ো মানুষটা।

আব্বুর সাথে অবশ্য রিমির অনেকদিন দেখা হয় না। ঐ যে একদিন মাঝরাতে আব্বু এসেছিল, ঘুম থেকে উঠে দেখা করার সেই স্মৃতি কেমন যেন স্বপ্ন স্বপ্ন মনে হয় এখন রিমির। আব্বু, সাথে নাকি মন্ত্রিসভার অনান্য মেম্বাররাও, নজরুল চাচা-মনসুর চাচা, এরা সবাই নাকি প্রমিস করেছেন যে দেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত মুক্তিযোদ্ধাদের মতো ওরাও পরিবার ছাড়াই থাকবেন। তবে সবাই কি আর সমানভাবে প্রমিস মানে, বলো? কয়েকদিন আগে এটা নিয়ে তো একটা মজার ঘটনাই হয়ে গেল।

সিআইটি রোডের ফ্ল্যাটবাড়িটায়, ওদের ঠিক পাশের ফ্ল্যাটেই একটা ভারতীয় বাঙালি পরিবার থাকে। আর উল্টোপাশের ফ্ল্যাটগুলোয় পাশাপাশি থাকেন নজরুল চাচা আর মোশতাক চাচার পরিবার। ওদের ওপরেই মনসুর আলি চাচা আর কামারুজ্জামান চাচার বাসা।

রিমিরা এই বাসায় আসার পরদিনের ঘটনা ওটা। তখনো রান্নার তেল যোগাড় হয়নি রিমিদের, মোশতাক চাচি তাই আম্মাকে বললেন দুপুরে ওনাদের সাথেই খেতে। রিমিরা গিয়ে দেখল শুধু ওরাই না, মোশতাক চাচা নিজেও এসেছেন ভাত খেতে। রিমি তখন বোকার মতো প্রশ্ন করেই ফেলেছিল যে মোশতাক চাচা এখানে ভাত খাচ্ছেন কেন।

মানুষটা এমন লজ্জা পেয়েছিল না! মোশতাক চাচাকে দেখে তখন রিমি নিজেই লজ্জা পেয়ে গিয়েছিল। 'না মানে, ইয়ে ...হইছে কি বেটি, আসলে, আমার না, জ্বর এসেছে কয়েকদিন আগে। বুঝছো, এই জন্যেই আসলে...।'

এখন অবশ্য রিমিদের বাসায়ও অনেক লোকজন আসে। প্রায় প্রতিদিনই কেউ না কেউ আসছে, কেউ কয়েক দিন থাকছে, কেউ আবার একবেলা খেয়েই চলে যাচ্ছে। সবার কাছ থেকে পাওয়া যাচ্ছে নানারকম খবর। যুদ্ধের খবর, বীরত্বের খবর, মুক্তিযোদ্ধারা কীভাবে নানা জায়গায় মিলিটারিদের পর্যুদস্ত করছে সেই খবর। শোকের খবরও আসে মাঝে মধ্যে। ভারতে আসার পথে কুমিল্লার রামচন্দ্রপুর বলে একটা গ্রামে কয়েক ঘণ্টা ছিল রিমিরা। সেখানে ওদের আশ্রয় দিয়েছিলেন অল্পবয়েসি একজন ওয়্যারলেস অফিসার। কয়েকদিন আগে খবর পাওয়া গেল, মিলিটারিরা সেই মানুষটিকে মেরে ফেলেছে। এমন মন খারাপ হয়েছিল শুনে। একদম অজানা অচেনা এক একজন মানুষও কীভাবে যেন স্মৃতির অংশ হয়ে যায়।

মন ভালো করার এইখানে দুইটা রাস্তা। এক হচ্ছে বই কিনতে যাওয়া। রতন ভাইয়ের সাথে এখানেও মাঝে মাঝে কলেজ স্ট্রিটে বই কিনতে যায় রিমি। ঢাকার বইয়ের দোকানগুলোর চেয়ে একদমই অন্যরকম এখানকার বইয়ের দোকানগুলো।

বইয়ের বাইরে রেডিও শুনতে আজকাল খুব ভালো লাগে রিমির। ঢাকা থাকতেও এখানকার মতো নিয়ম করে রেডিও শুনত না সে। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের একটা গান ইদানীং খুব ঘোরে মানুষের মুখে শোনো একটি মুজিবরের থেকে, লক্ষ মুজিবরের স্বরের কণ্ঠস্বরের ধ্বনি প্রতিধ্বনি আকাশে বাতাসে ওঠে রণি...

রিমির খুব পছন্দ এই গানটা। গানটা যিনি গেয়েছেন, সেই অংশুমান রায়কে তো রিমি সামনে থেকেই দেখেছে কয়েকদিন আগে এজন্যেই বোধহয় গানটা আরো বেশি ভালো লাগে আজকাল।

তবে এই গানের চেয়েও রেডিওতে রিমির বেশি পছন্দ চরমপত্র অনুষ্ঠানটা। বলা ভালো সবচেয়ে পছন্দের অনুষ্ঠান। কথক শুদ্ধ ভাষায় বলতে বলতে হঠাৎ কয়েক লাইন এক্কেবারে ঢাকাইয়া ভাষায় বলে ফেলেন, *হানাদার বাহিনী এখন অক্করে হুইত্যা পড়ছে। হ্যাতাইনরা অহন থেইক্যা নাক্কি হুইত্যা হুইত্যা ফাইট করবো! জেনারেল টিক্কার শরীলডা ম্যাজম্যাজ করতাছে। বড় বড় গোঁফওয়ালা জেনারেলরা সব বাংলাদেশের আঠাল মাডিতে আটকা পড়ছে। তারা বুঝবার পারছেন, আইতে শাল যাইতে শাল, হ্যার নাম বরিশাল। এহন হেই বরিশালের পানিতে হব্বাই নাকানি-চুবানি খাইতাছেন! সবটির মুখেই এক কথা। গিয়া গিয়া, সব তাবা হো গিয়া!*

...রিমি এই চরমপত্র খুব মন দিয়ে শোনে, আর হাসতে হাসতে কুটিপাটি হয়!

দলের নাম ক্র্যাক প্লাটুন

আর একটু এগোলেই সোভিয়েত ইউনিয়নের কনসাল জেনারেলের অফিস। বাদল ভাইয়ের মাজদা গাড়ি পেরিয়ে গেছে ঝাঁ চকচকে নীলরঙা ডাটসানটাকে, আর এদিকে হাবিবুল আলমও এক্সিলারেটরে পায়ের চাপ বাড়িয়ে মুহূর্তের মাঝেই চলে এল ডাটসানের পেছনে। হলিউডি সিনেমায় দেখা দৃশ্যের মতোই বাদল ভাই নীল ডাটসানের রাস্তা আটকে দাঁড়ালেন তার মাজদা নিয়ে। ফাঁদে পড়ে গেছে বুঝতে পেরে ডাটসানের ড্রাইভার চেষ্টা করল গাড়ি ঘুরিয়ে ফেলার, লাভ হলো না। হাবিবুল আলম তো পেছনে আটকেই রেখেছে শিকারকে!

দানে দানে তিন দান! হাবিবুল আলম নিজের মনেই একচোট হেসে নিল কথাটা মনে করে!

আগে আরো দুইদিন গুলশান এসেছিল তারা গাড়ি হাইজ্যাক করতে, কাজ হয়নি। কুফাটা লাগিয়ে ফেলেছিল ব্যাটা ভাষণ। গত পরশু তারা যখন গাড়ি বাছাই করতে ব্যস্ত গুলশান এক নম্বরের গোল চক্করের খানিক সামনে, আট নয়টা

গাড়ি পাশ কেটে বেরিয়ে গেলেও কাজের কাজ হলো না। ভাষণ শালার দাবি, প্রতিটা গাড়িরই কাউকে না কাউকে সে চেনে। এই গাড়ির আরোহী হলো তার বন্ধুর বাবা, ঐ গাড়িটা তার ছোট চাচার কী রকম নাকি বন্ধুর, আর ওই গাড়িতে বসে আছে তার কাজিনের শ্বশুরবাড়ির কে যেন! হারামজাদা যেন পুরো গুলশানকেই চিনে বসে আছে!!

এরপরেই প্ল্যান করা হলো যে ভাষণ বাদ। গতকালও হালকা চেষ্টা করা হয়েছে পছন্দসই গাড়ি যোগাড়ের, কিন্তু সফল হয়নি ওরা। তারপর দলে অনেক কাটছাঁটের পরে ঠিক হয়েছে আজকের অপারেশনের সদস্যদের। ফলাফল তো দেখাই যাচ্ছে, খুব দ্রুতই একটা ডাটসান হাইজ্যাক করা শেষ!

... হাইজ্যাক করা ডাটসানটাকে সিদ্ধেশ্বরীর এক বাড়িতে রেখে হাবিবুল আলম প্রথমে গেল দিলু রোডের বাসায় নিজের গাড়িটা রেখে আসতে। যখন মাত্র সন্ধ্যা নামছে, আস্তে আস্তে জ্বলে উঠছে স্ট্রিট ল্যাম্পগুলো, সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার মতো বাজে, ঠিক তখন ওরা আসল যাত্রা শুরু করল। গন্তব্য, সেই হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল।

নীলরঙা ডাটসান ওয়ান থাউজ্যান্ডের চালকের আসনে বসেছেন বাদল ভাই। সামনে আরো আছে পিস্তলসহ স্বপন। হাবিবুল আলম নিল পেছনে ডান পাশের সিটটা, তার পাশে বসল জিয়া আর সবার বামে রইল মায়া। এই অপারেশনে ওদের সম্বল নয়টা হ্যান্ড গ্রেনেড। আদর করে এগুলোকে আনারস বলে ডাকে ওরা। গাঢ় বাদামি রঙের গ্রেনেডগুলো সাইজে একটা আনারসের চারভাগের এক ভাগ হবে।

ঢাকার বুকে সেক্টর টুয়ের গেরিলা বাহিনীর প্রথম অপারেশন মঞ্চস্থ হবে একটু পরেই।

ইতিহাসের ব্যারিকেডে বাংলাদেশের গেরিলা কমান্ডোদের প্রথম হামলা এটা। ঠিকঠাক সমস্তটা শেষ করতে পারবে তো তারা? যদি অপারেশন ব্যর্থ হয় কোনোভাবে? হাবিবুল আলম কেঁপে ওঠে একটু মনে মনে। দূর কল্পনাতেও ব্যর্থতাকে স্মরণ করতে চায় না সে।

তবে স্মৃতিতে তার একেবারে সেঁটে গেছে সেই সকালটা, যেদিন শুটিং প্র্যাকটিসের শেষে খালেদ মোশাররফ ডেকে পাঠালেন হাবিবুল আলমকে। সকাল তখন সাড়ে দশ কি এগারোটা।

সেক্টর কমান্ডারের বাম হাতে জ্বলন্ত সিগারেট, তার বাম পাশে ক্যাপ্টেন হায়দার আর ডানে টেবিলে রাখা ছাইদানি মানে, একটা হাতলছাড়া চায়ের কাপ। কমান্ডার ফাইভ ফিফটি ফাইভ সিগারেটে খুব জোরে একটা টান দিয়েছিলেন সেই মুহূর্তে, তারপর আড়চোখে তার দিকে তাকিয়ে উদাস গলায় বলেছিলেন, 'কাজটা জরুরি। ঢাকায় পাঠাচ্ছি তোমাদের। মনে রাখবা, তোমরাই প্রথম। এর আগে

নির্দিষ্ট কোনো অপারেশনে সেক্টর টু থেকে কোনো গেরিলা দলকেই পাঠানো হয় নাই ঢাকায়।'

মিশন সফল হলে সেটার প্রভাব হবে সুদূরপ্রসারী, খালেদ মোশাররফ ভেঙে বলেছিলেন ওদের সবটা। ঢাকায় আসছে বিশ্বব্যাংকের এইড মিশন আর ইউএনএইচসিআর'এর প্রধান প্রিন্স সদরুদ্দীন আগা খান। পাকিস্তানি সরকারের এখন দরকার আর্থিক সাহায্য, কাজেই প্রচারমধ্যমে তারা ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে আওয়ামী লীগ কর্মীরা পালানোর সময় বাড়িঘর পুড়িয়ে দিয়ে গেছে। তবে দেশের সবকিছু এখন ঠিকঠাক চলছে, কোথাও কোনো গণ্ডগোল নেই। কাজেই ঢাকার আশপাশে হামলা করে বিদেশি প্রতিনিধিদের যদি বোঝানো যায় যে দেশের অবস্থা স্বাভাবিক নয়, তাহলেই পাকিস্তানের আর্থিক দুরবস্থাটা দীর্ঘতর হবার সম্ভাবনা বাড়ে।

'তবে আর্মির সাথে সরাসরি যুদ্ধে যাওয়া চলবে না।' খালেদ মোশাররফ মানা করেছিলেন স্পষ্টভাবে। 'কোনো ভাবেই না। কারণ এক, আমাদের হাতে এখনো ওইরকম ভারী অস্ত্র আসে নাই। দ্বিতীয়ত, তোমাদের নিয়ে আরো প্ল্যান আছে আমার। এই অবস্থায় তোমাদের একজনকেও হারানোর মানে পুরা শিডিউল তিন থেকে চার মাস পিছায়ে যাওয়া।'

সতেরো জন যোদ্ধার নাম চেয়েছিলেন কমান্ডার তার কাছে। অপারেশনে যারা সরাসরি অংশ নিচ্ছে, কাজ শেষেই তারা ফিরে যাবে ক্যাম্পে। আর অন্যরা থাকবে ঢাকাতেই। যোগাযোগ বাড়াবে, ইমার্জেন্সির সময় দরকারী ওষুধপত্রের মজুদ আগেই ঠিক করে রাখবে।

অপারেশন হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল, হিট অ্যান্ড রান, এই নামেই ডাকা হচ্ছে আজকের মিশনকে। মিশন সামনে রেখে সতেরো জন গেরিলা ঢুকেছে ঢাকায়। হাবিবুল আলম মনে মনে ভাবে, তারেকুল আলমকেও দলে নেয়া যেত। ছেলেটা যথেষ্টই মোটিভেটেড। এর মাঝে ঢাকায় কয়েকবার এসে আলতাফ মাহমুদসহ বেশ কয়েকজনের সাথে লিঙ্ক এস্টাবলিশ করে গেছে নাকি। কপাল খারাপ তারেকের। ট্রেনিং এর সময় গোড়ালি মচকে অকেজো হয়ে আছে পনেরো দিনের জন্যে।

'রেডি হইয়া বয়!' বাদল ভাইয়ের চাপা স্বরের ডাকে সচকিত হতেই সন্ধ্যার আলোতে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের আলোবহুল কাঠামোটা দেখতে পায় হাবিবুল আলম। গ্রেনেডগুলোকে একবার হাত দিয়ে স্পর্শ করে সোজা হয়ে বসে সে। দম নেয় একটা বড়সড়।

হোটেলকে পাশে রেখে ওরা যখন আস্তে আস্তে সাকুরা থেকে মিন্টু রোডের দিকে এগোচ্ছে, তখনই শোনা যায় সাইরেনের আওয়াজ। দেখা যায় ময়মনসিংহ রোড ধরে পুলিশ প্রহরায় এগিয়ে আসছে সাদারঙা একটা শেভ্রোলে, ঠিক

মাঝামাঝি চকোলেট রঙের একটা স্ট্রাইপ দেয়া গাড়িটায়। হাবিবুল আলম বুঝে নেয়, এটাই বিশ্বব্যাংকের প্রতিনিধি মিস্টার কারগিল আর সদরুদ্দীন আগা খানের কাফেলা। এদেরই কড়কে দিতে মতিনগরের অরণ্য থেকে ঢাকায় আসা গেরিলাদের। পারফেক্ট টাইমিং!

মিন্টু রোডের দিক থেকে ইউ টার্ন করে একবার গাড়ি ঘুরিয়ে আনতে ড্রাইভার বাদল ভাইয়ের সময় লাগল তিন মিনিটের মতো। পাকিস্তান সরকারের বিশেষ অতিথিরা যখন হোটেল চত্বরে ঢুকে পড়েছে গাড়ি নিয়ে, বাদল ভাই ডাটসানকে এনে দাঁড় করালেন হোটেলের ছোট গেটটার সামনে। এক ঝটকায় সেটার ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো তরুণ মুক্তিযোদ্ধারা।

মহাকালের সাথে উপস্থিত পথচারীরাও সাক্ষী হয়ে রইল ঢাকার প্রথম গেরিলা অপারেশনের। ছায়াছবির স্লো মোশানের গতিতে যেন, একই সাথে ঘটতে শুরু করল কয়েকটা ঘটনা।

হাবিবুল আলম তার গ্রেনেডের পিনটা খুলতে খুলতে দেখল, জিয়া ইতোমধ্যেই ছুড়ে দিয়েছে হাতের গ্রেনেড। সাদা শেভ্রোলের ভেতর থেকে গাড়ি বারান্দায় বের হয়ে আসছিল দুইজন, এই সময় হাবিবুল আলম ছুড়ে মারল তার গ্রেনেডটাও। মায়াও ছুড়ে দিল তার আনারস, সাদা আলোতে কালো রঙের একটা রংধনু তৈরি করে হোটেলের প্রবেশপথের দিকে উড়ে গেল সেটাও। জিয়ার ছোঁড়া দুই নম্বর গ্রেনেডটা একেবারে বুলস আই। শেভ্রোলের জানালা দিয়ে ভেতরে ঢুকল সেটা।

শুরু হলো একের পর এক বিস্ফোরণ।

ঢাকার রাস্তায় নানা গন্তব্যের মানুষ চমকে উঠল শব্দে, কেঁপে উঠল আশঙ্কায়। ডাটসানে ওঠার জন্যে ঘুরে দৌড় দেবার আগ মুহূর্তে হাবিবুল আলমের চোখে পড়েছিল, শেভ্রোলের পেছনের অংশটা উঠে যাচ্ছে শূন্যে।

বাদল ভাই চোখের নিমেষেই যেন গাড়ি ছুটিয়ে নিলেন মতিঝিলের দিকে। মিশন এখনো শেষ হয়নি গেরিলাদের। আর্মিদের পোষা সংবাদপত্র মর্নিং নিউজ। সেটার উঁচু বাউন্ডারির ভেতরে চলন্ত গাড়ি থেকে গোটা দুই গ্রেনেড ছুড়ে দিল হাবিবুল আলমেরা।

এলিফ্যান্ট রোডের বাড়িতে জাহানারা ইমাম পর্যন্ত যখন হতচকিত হয়ে ভাবছেন, কী হলো শহরে সেই মুহূর্তে দিলু রোডমুখী নীলরঙা ডাটসানে মুষ্টিবদ্ধ চোয়াল আর সতর্ক চোখের একদল তরুণের মাথায় খেলা করছে খালেদ মোশাররফের পক্ষ থেকে ঢাকাবাসী জান্তাকে সতর্কবার্তা পৌঁছে দেবার সন্তুষ্টি। এই ছেলেদের তখনো জানা হয়নি, বিবিসি থেকে এই গেরিলা আক্রমণের খবর পেয়ে খালেদ মোশাররফ অবাক স্বরে বলবেন, 'বললাম ঢাকার বাইরে বিস্ফোরণ

ঘটাতে আর ওরা কি না একেবারে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালেই বোমা মেরে এসেছে! দিজ অল আর ক্র্যাক পিপল!'

ছেলেদের জানা হয়নি, এই মুহূর্ত থেকেই ইতিহাস তাদের চিনবে 'ক্র্যাক প্লাটুন' বলে।

বিভ্রান্তি

তাজউদ্দীন তাকে বলেছিলেন, 'সাইকোলজিক্যাল ওয়ারফেয়ার জিনিসটা হেলাফেলা করার মতো নয় নজরুল সাহেব। সর্বোচ্চ গোপনীয়তা অবলম্বন করতে হবে আপনাকে। ব্রিটিশ বিরোধী বিপ্লবীদের কথা তো আপনার জানা আছেই। শত্রুর হাতে তথ্য দেবার চাইতে বরং সুইসাইড করাই অনেক ভালো।'

কর্নেল ওসমানী আবার ভীতিটাকে আর একটু বাড়িয়ে দিলেন। 'অনেক গোপন তথ্য নিয়ে ডিলিং করতে হবে কিন্তু। মনে রাখবেন, যুদ্ধের সময় শত্রুর কাছে তথ্য পাচার করলে কোর্ট মার্শালও দেয়া হয়। কাজেই সাবধান!'

কী বিপদেই না পড়লাম, মনে মনে ভেবেছিলেন নজরুল ইসলাম। আমি যাকে বলে, একেবারে সেই অজ পাড়াগাঁয়ের এক আনস্মার্ট সিভিলিয়ান, এইসব সাইকোলজিক্যাল ওয়ারফেয়ারের মতো জটিল জায়গায় আমাকেই কেন টানতে হলো কর্তাদের!

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে জনসংযোগ কর্মকর্তা হিসেবে নজরুল ইসলাম নিযুক্ত হয়েছেন মুক্তিবাহিনীর সদর দফতরে, কর্নেল ওসমানীর অফিসে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হবার ঠিক আগে দৈনিক ইত্তেফাকের সিনিয়র রিপোর্টার পদে প্রমোশন হয়েছিল নজরুল ইসলামের। সেই সুবাদেই হয়তো, তার ওপর এই আস্থা রেখেছেন প্রবাসী সরকার, অনেক ভেবে মনে হয়েছে তার।

আজকাল তাকে ঐ সাইকোলজিক্যাল ওয়ারফেয়ারের ওপরে কোর্সও করতে হচ্ছে। কর্নেল রিখী নামের একজন (ব্যাটা আবার দেখতে অবিকল খান সেনাদের মতো) তাকে হাতে ধরে শেখাচ্ছেন সব কিছু। বোঝাচ্ছেন, মুক্তিযুদ্ধের খবর প্রচারের সময় অবলম্বন করতে হবে কী ধরনের কৌশল। উর্দু-হিন্দি মেশানো সামরিক ইংরেজিতে কথা বলেন কর্নেল রিখী। 'শোনো নজরুল, তোমরা তো ইসলাম বিরোধী নও! শুধু নিজের অধিকার চাচ্ছো বলেই তোমাদের ওপর এরকম দানবীয় অত্যাচার তো কাউকে চালাতে দেয়া যায় না, তাই না? তোমাকে এসবই লিখতে হবে। জানোই তো, অসির চেয়ে মসির ক্ষমতাই বেশি। এমন করে খবর লিখতে হবে, প্রচার করতে হবে যাতে খান সেনাদের মনোবল ভেঙে যায়। তোমাদের মসজিদগুলোতেও ওরা মানুষ মেরেছে। এসব খবরই তোমাদের

প্রয়োজনে ছবিসহ প্রচার করতে হবে, যাতে বাইরের দুনিয়া থেকে ওদের ওপর চাপ আসে।'

তা সেই কথাগুলো মেনে নিয়েই ওয়ার বুলেটিনের কাজ শুরু করেছেন নজরুল ইসলাম। ওসমানী সাহেবের দফতরে দেশের ভেতর থেকে যুদ্ধ নিয়ে নানা তথ্য আর খবর আসে। সেগুলো সাজিয়ে গুছিয়ে একটা বুলেটিনের আকার দিয়ে প্রচার মাধ্যমগুলোকে সরবরাহ করতে হয়। জয়বাংলা, বাংলার বাণী, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, আকাশবাণী, আনন্দবাজারসহ সব জায়গায় এই বুলেটিনের সাইক্লোস্টাইল যায়।

মাঝে মাঝে জয়বাংলা পত্রিকায়ও লেখা দেন নজরুল ইসলাম। এর আগে অবশ্য আবদুল মান্নান ভাইয়ের নির্দেশে তিনি প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে জয়বাংলা পত্রিকার জন্যেই লেখার মসলা যোগাড় করতেন।

জয়বাংলা ছাড়া অন্য যে পত্রিকাটা বেশ প্রচার পাচ্ছে, সেটা হলো বাংলার বাণী। সুন্দর, ছিমছাম এই পত্রিকাটা কলকাতার প্রেস জগতে ইতোমধ্যেই বেশ আলোড়ন তুলেছে। সেটা সম্পাদনার দায়িত্বে আছেন নজরুল ইসলামেরই ইত্তেফাকের সহকর্মী, আমির হোসেন সাহেব। শেখ ফজলুল হক মনি বের করছেন পত্রিকাটি। নর্দান পার্ক এলাকার রাজেন্দ্র স্ট্রিটে এক বাড়ির নিচ তলায় অফিস বাংলার বাণী পত্রিকার। গোলমাল লেগেছে এই বাংলার বাণীর এক রিপোর্ট নিয়েই।

দিন দুই আগে ঐ বাংলার বাণীতেই রণাঙ্গনে মুক্তিযোদ্ধাদের সাফল্যের খবর এসেছে। তা এসেছে ভালো কথা। কিন্তু সমস্যা হলো সেখানে মুক্তিবাহিনী বা মুক্তিযোদ্ধা লেখা হয়নি, লেখা হয়েছে মুজিব বাহিনী। প্রতিবেদনটা চোখ এড়ায়নি ওসমানী সাহেবের।

নজরুল ইসলামকে ডেকে নিয়ে ওসমানী বলেছিলেন, 'নজরুল সাহেব, এগুলার মানে কী? মুজিব বাহিনী আবার কী? এগুলো কে লিখছে, কেন লিখছে? ...ঐ পত্রিকা সম্পর্কে আপনি আমাকে তদন্ত করে সব জানান। এইভাবে খবর ছাপলে তো আমাদের নিয়মিত বাহিনীর মাঝে ভুল বোঝাবুঝি হবে!'

একটা ঢোঁক গিলে সেদিন ওসমানীর অফিস থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন নজরুল ইসলাম। একরাশ দুশ্চিন্তা মাথায় নিয়ে ভেবেছিলেন, বস্‌কে কী করে বলবেন যে তিনি নিজেও মাঝে মাঝে ঐ পত্রিকাতেই লেখেন! দুই দিন সময় নিয়ে আপাতত নিজের করণীয় স্থির করেছেন তিনি, করলেন সেটাই।

ওসমানী সাহেবের অফিসে ঢুকে মৃদু গলায় নজরুল ইসলাম বললেন, 'স্যার, ওই যে বাংলার বাণী পত্রিকার কথা বলেছিলেন না? ওই পত্রিকা স্যার শেখ ফজলুল হক মনি সাহেবের।'

কর্ণেলের উন্নত গোঁফটা নেমে গেল যেন। দুই চোখও একটু জ্বলে উঠল কী?... নজরুল ইসলাম মনে মনে প্রমাদ গুনলেন। বস এখন তাকে মানে মানে বেরিয়ে যেতে বললেই বাঁচেন তিনি!

কিন্তু না, তাকে বেরিয়ে যেতে বললেন না মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক। কয়েক মিনিট পরে মুখ খুললেন তিনি। কথা বললেন নিচু স্বরে। উচ্চারিত প্রতিটা শব্দই হলো যথাযথ, মাপা। বুঝিয়ে দিলেন, এই ঘটনায় কতটা রেগেছেন তিনি।

'সব কিছুতে একটা ডিসিপ্লিন আছে। এখানে আমরা রং-তামাশা করতে আসিনি। বিদেশের মাটিতে বসে আমরা যেরকম অনৈক্য দেখাচ্ছি, সেটা জাতির জন্যে মঙ্গলকর না নজরুল সাহেব। আপনি আমি এখানে বসে খালি নানারকম বাহিনী গঠন করতেছি, আর যেই ছেলেটা বাংলাদেশের পথের ধারে-জঙ্গলের মাঝে-নদীর পানিতে শরীর রেখে ট্রিগারে আঙুল বসিয়ে নিজের জীবন বাজি রেখে লড়তেছে শত্রুকে আঘাত হানতে, তার কথা কি আমরা একবারও ভাবতেছি?

আপনি এখন আসুন নজরুল ইসলাম সাহেব। কী করা যায় সেটা আমিই দেখতেছি।'

দরজাটা আলতো করে টেনে দিয়ে নজরুল ইসলাম চুপিসারে বাইরে বেরিয়ে এলেন। তার একরাশ প্রশ্ন থেকে গেল দরজার এপাশেই। ওপাশে রইল গাঢ় নীরবতা আর একজন ক্রুদ্ধ কর্নেল।

সমীকরণের নানা চলক

বউবাজারের হোস্টেলে আজ আড্ডা হচ্ছে জমাট।

মতিনগরের ক্যাম্প ঘুরে ফিরে এসেছে আলাউদ্দীন। বন্ধু তারেকুল আলমের সাথে সেখানে দেখা হয়েছিল তার। মচকানো গোড়ালি মাত্র সেরে উঠেছে তারেকুল আলমের, অচিরেই খালেদ মোশাররফের আদেশে তাকে আবার ঢাকা যেতে হবে খোঁজ খবর নিয়ে আসতে। সেক্টর টু কমান্ডারের ওপর আলাউদ্দীন যাকে বলে বেশ ইমপ্রেসড। আরবান গেরিলাদের কাজে লাগানোর বুদ্ধিটার তারিফ করছে সে সমানে।

'হ্যাঁ, খালেদ মোশাররফ লোকটা বেশ ডিটারমাইন্ড বলে শুনেছি।' মাথা দোলায় কে একজন। 'ইয়ে, মওলানা ভাসানীর খবর জানেন কেউ? বুড়ো তো শুনেছিলাম ইন্ডিয়া এসেছিল বর্ডার পাড়ি দিয়ে; কিন্তু এরপরে নাকি তার কোনো খবরই পাওয়া যাচ্ছে না কোথাও। আপনারা কিছু শুনেছেন নাকি?'

'মওলানাকে ইন্ডিয়ান গভরমেন্ট অ্যারেস্ট করে রেখেছে শুনলাম।' চশমাওয়ালা একটা ছেলে বলে, আলাউদ্দীন প্রশ্নকর্তার মতো একেও চিনতে পারে না। গত কয়দিনে হোস্টেলে প্রচুর নতুন মুখ এসে উঠেছে মনে হচ্ছে।

'আরে না, অ্যারেস্ট করে নাই।' জবাব দেয় মাসুদ। 'তবে বলতে পারেন গৃহবন্দি করে রাখছে। পার্ক সার্কাসের কাছাকাছি একটা বাড়িতে ছিলেন শুনছিলাম। আর বুঝেনই তো, ইন্ডিয়ান সরকার মওলানাকে নিয়ে কোনো রিস্কই নিতে চায় না। চীনের সাথে হুজুরের খাতিরের কথা তো জানেন আপনারা সবাই। মওলানা নিজে অবশ্য চৌ এন লাই আর মাও সেতুং এর কাছে টেলিগ্রাম পাঠাইছেন শুনছি...'

আওয়ামী লীগের কর্মী আলাউদ্দীন মওলানা-ভক্ত মাসুদের ওপর খাপ্পা হয়ে ওঠে হঠাৎ। 'আরে রাখ তোর চৌ এন লাই। মওলানার টেলিগ্রাম খুলে দেখার সময় হইছে তার মনে করিস? তোদের মওলানার দুই পয়সা দাম নাই চীনের কাছে। হারামজাদারা এখনো পাকিস্তানকেই সাপোর্ট দিয়ে যাচ্ছে।'

'কিন্তু মওলানা ন্যাপ আর মোজাফফরের ন্যাপ, দুই পক্ষই কিন্তু মুক্তিযুদ্ধে আমাদের পক্ষই নিছে, এইটা নিয়া তো আর সন্দেহ নাই। অলরেডি পরিষ্কার এইটা। কমিউনিস্ট মণি সিংহও তো আমাগো সাইডে আছেন।'

যুদ্ধে যোগদানের প্রশ্নে কয়েকভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে বামেরা। মস্কোপন্থিরা যুদ্ধে মুজিবনগর সরকারের পক্ষে যোগ দিয়েছে। কিন্তু পিকিংপন্থি দলগুলোর অবস্থানের প্রবল তারতম্য আছে।

খোরশেদ নামের একটা ছেলেও সরব হয়ে ওঠে। 'আরেক কাণ্ড শুনছেন? মওলানার ন্যাপ বাদ দিলে পিকিংপন্থি বাকি ১৪ দল নাকি একটা সমন্বয় কমিটি খুলছে, সভাপতি ঠিক করেছে বরদা চক্রবর্তীরে। উনি নাকি তারপর মুজিবনগর সরকারের কাছে গিয়ে অ্যাপ্লিকেশন দিছেন যে উনাদের যুদ্ধে অংশ নেয়ার অনুমতি আর অস্ত্র দিতে হবে। দাবি শুনে তাজউদ্দীন সাহেব নাকি হেসে দিছেন। বলছেন, স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ নিতে কোনো দলের আবার অনুমতির দরকার হয় নাকি? কাদেরিয়া বাহিনী, হেমায়েত বাহিনী এরা দেশের ভেতরে থেকে যুদ্ধ করতেছে না পাকিস্তানিদের সাথে? যুদ্ধে অংশ নেয়াটা তো পুরোপুরি আপনাদের ওপরেই নির্ভর করতেছে।'

'হ্যাঁ, আমিও শুনছি সমন্বয় কমিটির ওই স্মারকলিপির কথা।' আলাউদ্দীন মাথা নাড়ে। 'অস্ত্র চাইলে তাজউদ্দীন বলছিলেন, দেখেন কমরেড, মার্কসিজম নিয়ে আমরাও তো টুকটাক পড়াশোনা করছি। আমি তো জানি যে, শত্রুর অস্ত্রই মার্ক্সিস্ট গেরিলাদের অস্ত্র। সাচ্চা কমিউনিস্ট গেরিলারা শত্রুর অস্ত্র কেড়েই যুদ্ধে নামে। এখন দেখি দুনিয়ার ইতিহাসে আপনারাই প্রথম, যারা মার্কসিস্ট হয়ে বুর্জোয়া আওয়ামী লীগ সরকারের কাছে অস্ত্র চাচ্ছেন। বাংলাদেশের যুদ্ধ নিয়ে আপনাদের থিসিস কিছু আমি অলরেডি পড়ে দেখেছি। আমি আওয়ামী লীগের এমন আহাম্মক প্রধানমন্ত্রী না যে, আজ আপনাদের অস্ত্র দেবো, কাল আপনারা ঐ অস্ত্র হয় আমাদেরই উপর চালাবেন না হলে নকশালদের সরবরাহ করবেন।'

'দারুণ বলছেন তো তাজউদ্দীন।' চশমাওয়ালা ছেলেটা মৃদু হাতে তালি দিয়ে উঠে। 'আর কথা আসলেই ঠিক। চীনরে বাপ-মা মানা গ্রুপগুলা তো এখনো আছে অন্যগ্রুপের থিসিসে কী ভুল, সেইটা নিয়া থিওরি কপচাইতে! আর অগোরে অস্ত্র দেয়ায় আসলেই ভরসা কী? তোয়াহার দল আর আবদুল হকের দল তো যুদ্ধরে বলতেছে সোভিয়েতের মদদ দেয়া ভারতীয় সম্প্রসারণ। তারা যুদ্ধ করে মিলিটারি আর মুক্তিবাহিনী দুই দলের লগেই। ম্যাস পিপলের পালস এইরকম অগ্রাহ্য কইরা গেলে হয়?'

'তাজউদ্দীন লোকটা খাঁটি।' মেসবাহ ভাই মাথা নাড়েন। 'মন্ত্রীদের মাঝে প্রচুর ল্যাং মারামারি চলে শুনতে পাই, কিন্তু এই লোকটার দেশপ্রেম নিয়া প্রশ্ন নেই আমার। তবে দলের লোক না হলে অনেক জায়গায় মুক্তিযুদ্ধে রিক্রুট করতে নাকি নিতে চায় না, এটা আমিও শুনেছি। ... ফয়েজ আহমদ সাহেবকে চিনেন তো? আরে ওই যে সাংবাদিক? উনাকেও নাকি সরাসরি নিতে চায়নি প্রথমে। পরে তাজউদ্দীন সাহেব তাকে বললেন, অস্ত্র ছাড়াও যে লোকে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিচ্ছে সেও মুক্তিযোদ্ধা। কাজেই আপনি আপনার লেখা দিয়েই যুদ্ধকে সাহায্য করুন। ফয়েজ সাহেব এখন কলাম লিখছেন স্বাধীন বাংলা বেতারের জন্যে।'

'যেইটাই বলেন, এইসব বুর্জোয়া নীতির দলের জন্যেই আমাদের আজকে এই অবস্থা।' মাসুদ কিছুতেই আস্থা আনতে পারে না প্রবাসী সরকারের ওপর।'কলকাতায় নতুন গুজব শুনলাম যে আওয়ামী লীগ নাকি শেষ পর্যন্ত রফায় আসবে পাকিস্তানের সাথে। স্বায়ত্তশাসন নিয়েই নাকি দেশে ফিরে যাইতে হবে আমাদের।'

আলাউদ্দীন আবারো ফুঁসে উঠে এ কথায়। 'আরে ভাই, নিজেই তো বললেন কথাটা গুজব! সব কিছুতে সরকারের দোষ ধরার জন্যে রেডি হয়ে থাকেন কেন আপনারা? কেন, রেডিও শুনেন না রেগুলার? এই তো, সৈয়দ নজরুল ইসলাম সেদিন যে বললেন পাকিস্তান কাঠামোতে ফিইর‍্যা যাওয়া আর সম্ভব না সেই কথা মনে নাই আপনাদের?'

মাসুদ আর আলাউদ্দীনের মাঝে একটা ঝগড়া দানা বেধে উঠতে গিয়েও থেমে গেল এরপর। আলোচনার মোড় অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিল খোরশেদ। 'আজকে পেপার দেখছেন? বীরভূমের এক গ্রামে আগুন দিয়ে একই ফ্যামিলির পাঁচজনকে মেরে ফেলেছে, খবরটা পড়েছেন কেউ? পুলিশ ধরে নিচ্ছে নকশালিদের কাজ।'

'বাঞ্চ অব স্কাউন্ড্রেলস!' আনন্দবাজারে টুকটাক কলাম লেখেন সত্যব্রত বাবু, আজকের আড্ডায় কীভাবে এসে জুটেছেন যেন তিনিও। 'পারে তো কেবল ওগুলোই। কেবল গ্রামের জোতদারদের শ্রেণিশত্রু ঘোষণা দিয়েই খালাস। ধরে

বেঁধে কেবল ওদেরই গলা কাটছে। কই, আজ পর্যন্ত এই কলকাতার মাটিতে তো কোনো বড় পুঁজিবাদীর গলা কাটতে দেখলাম না ওদের!'

চশমা পরিহিত ছেলেটা বলে, 'আমাদের যুদ্ধের প্রতি ওদের সেন্টিমেন্টটা কেমন, জানেন নাকি সত্যব্রত বাবু?'

'ছেড়ে দিন মশাই আপনাদের যুদ্ধ। ওসব নিয়ে সেন্টিমেন্ট খরচ করতে ওদের বয়ে গেছে। ওরা আছে বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙার খেলা নিয়ে। সেয়ানা সেয়ানা ছেলেগুলো সব লজ্জার মাথা খেয়েছে। আপানাদের ছেলেরা না খেয়ে-না দেয়ে যুদ্ধের ট্রেনিং নিচ্ছে আর এদিকের মালগুলো গায়ের জোরে নকল করছে মশাই। কলকাতা ইউনিভার্সিটি তো নকল ঠেকাতে পরীক্ষাই স্থগিত করে দিয়েছে। বুঝুন!'

এতক্ষণ নীরবেই সিগারেট পুড়িয়ে যাওয়া সুনীলদা মুখ খুললেন এবার। 'আপনাদের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ায় আপাতত নকশাল ইস্যুটা থেকে সবার চোখ সরিয়ে দিতে পেরেছে ইন্ডিয়ান গভর্মেন্ট। পুলিশের জায়গায় খুব শির্গগিরই বিএসএফ মাঠে নামবে শুনতে পাচ্ছি, বুঝলেন। আমার ধারণা, নকশালদেরও সামনে দুর্দিন আসছে।

... কী জানেন, আমার কেন জানি মনে হচ্ছে আপনাদের যুদ্ধটা একটা ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস হয়ে গেছে এখন। সাথে সাথে এটা একটা ইন্টারন্যাশনাল ইস্যু জেনারেটরও বলতে পারেন। যে যেভাবে পারছে ইস্যুটা কাজে লাগাচ্ছে, আর মাঝখান দিয়ে আপনারা চ্যাপটা হয়ে যাচ্ছেন চাপে।'

সমীকরণের নানা চলক নিয়ে এভাবেই আলোচনা চলে। বারান্দায় দাঁড়ানো আবদুল বাতেনের সাথে গভীর আগ্রহে এইসব দেখতে থাকে ঘরের কোনায় বসে থাকা তীক্ষ্ণ চোখের আটাশ বছর বয়েসি এক যুবক। আরো বাইশ বছর পর এই পটভূমিকে আশ্রয় করেই আহমদ ছফা নামের যুবকটি অলাতচক্র নামের একটা উপন্যাস লিখে ফেলবেন।

কাঁটার মুকুট

থিয়েটার রোডের দোতলা বাড়ির আঙ্গিনায় ঢুকতে আনিসুজ্জামানের তেমন বেগ পেতে হলো না। বিএসএফের সদস্যদের কাছে তার মুখ বেশ পরিচিত। মাঝে মধ্যেই প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতা-বিবৃতি লেখায় সাহায্যের জন্যে তাকে এখানে ডেকে আনা হয়।

পানিতে পিচ্ছিল হয়ে থাকা আঙিনা দিয়ে ধীর পায়ে হাঁটতে থাকেন আনিসুজ্জামান। গত রাতে প্রবল বৃষ্টি হয়েছে। ট্রামে করে আসতে গিয়ে তার মনে

হয়েছে জাহাজে চড়ছেন, রাস্তায় এমনই পানি জমেছে। এখন যেমন বৃষ্টি নেই, তবুও পাজামা গুটিয়ে রাখা ছাড়া উপায় নেই।

রেহমান সোবহান পরিকল্পনা কমিশন গঠনের একটা প্রস্তাব দিয়েছেন। তাজউদ্দীন নাকি ঠিক করেছেন যে প্রথমেই কমিশন না বানিয়ে আগে একটা পরিকল্পনা সেল বানানো হোক, দরকারে পরে সেটাকে কমিশন করে তোলা যাবে। তা নিয়েই আলোচনা করতে এই সাত সকালে আনিসুজ্জামানের আসা।

বেশ বাতাস দিচ্ছে চারদিকে। এমন বাদলা দিনে খিচুড়ি-ইলিশের সাথে ঘুমের ব্যবস্থা হলে আর কিছু চাওয়ার থাকে না!

খিচুড়ি-ইলিশের কথা মাথায় আসতেই আনিসুজ্জামান লজ্জা পেলেন। কলকাতার আবহাওয়া মনোরম হলেও তার আড়ালের পরিস্থিতি যে যথেষ্টই ঘোলাটে সেটা ভুলে যাওয়া তার উচিত হয়নি। গতকাল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের বালিগঞ্জের অফিসে তার সাথে হঠাৎ দেখা হয়ে গিয়েছে আলাউদ্দীনের। আওয়ামী লীগের সক্রিয় কর্মী আলাউদ্দীন তার প্রাক্তন ছাত্র, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সুবাদে সে আনিসুজ্জামানের যথেষ্ট পরিচিত মুখ। সেই আলাউদ্দীন তাকে শোনাল কিছু খবর।

সীমান্ত অতিক্রমের পর থেকেই স্বাধীনতার হয়ে লড়তে থাকা মানুষদের মাঝে একটা অনৈক্যের সূত্রপাত হয়েছে, কমবেশি সকলেই এর মাঝে জেনে গেছে সেটা। এই কয়েক মাসে সেই কলহ প্রশমন হয়েছে সামান্যই। সরকারের বয়েসও বেশি নয়, যেসব কমিটি গঠন করা হয়েছে এর মাঝে রোপণ করা হয়েছে যে সব উদ্যোগের গাছ সেগুলো এখনো ফল দেয়া শুরু করেনি। কাজেই অসন্তোষ ক্রমে বেড়েই উঠেছে, তরুণদেরই যেন একটু বেশি অসহিষ্ণু দেখাচ্ছে। বিশেষ করে তাজউদ্দীনের ওপর প্রসন্ন নয় বেশ কয়েকজন। ভারত সরকারের কাছেও নাকি তাজউদ্দীনের নামে অনাস্থা জ্ঞাপন করা হয়েছে।

ভারতের পররাষ্ট্র দপ্তরও তাই নাকি চাপ দিয়েছে প্রবাসী সরকারকে, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে সম্মেলন করতে। কাজেই বিষয় দাঁড়িয়েছে, এই সভা আসলে দাবার বোর্ডে চেক খাওয়ার অপেক্ষায় থাকা মন্ত্রী তাজউদ্দীনের জন্যে আস্থা ভোট পরিমাপের একটা রাস্তা মাত্র।

তাজউদ্দীন নিজেও নাকি খুব দুশ্চিন্তায় আছেন আসন্ন সভা নিয়ে, আনিসুজ্জামানকে আরো বলেছিল আলাউদ্দীন। পরিষদ সদস্য ময়েজউদ্দীন নাকি সেই মেঘালয় থেকে তাজউদ্দীনের নামে অপপ্রচার শুনে চলে এসেছেন কলকাতায়। নিজে তাজউদ্দীনের সাথে দেখা করে জানতে চেয়েছেন, ব্যাপারটা কী। তাজউদ্দীন নাকি কথোপকথনের এক পর্যায়ে ময়েজউদ্দিনের হাত চেপে অসহায়ের মতো বলেছেন, 'ময়েজউদ্দীন সাহেব, কিছু একটা করুন! যদি দেশ

স্বাধীন করতে না পারি, তবে কোনোদিন আর বাংলাদেশের মাটিতে ফেরা হবে না আমাদের।'

উপদলীয় কোন্দলের কথায় চট করে আনিসুজ্জামানের আরো একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল।

শীর্ষ এক যুবনেতা তাকে বলেছিল কথাটা। আলাউদ্দীনের মতো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আনিসুজ্জামানের প্রাক্তন ছাত্র ছিল সেই নেতাও, যার সাথে পুনরায় দেখা হয়েছে কলকাতায়। সাইকেল-রিকশার সেই ফুরফুরে বাতাস লাগা বিকেলে সে ছাত্রটিই তাকে নিশ্চিত করেছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের গ্রেপ্তারের ঘটনা। সাথে আরো কিছু বলেছিল।

ইয়াহিয়া গোপনে ঢাকা ত্যাগ করেছে জেনে মুজিব নাকি প্রস্তুত হচ্ছিলেন জীবনে প্রথমবারের মতো আত্মগোপন করতে। তবুও গভীর রাতে নাকি কোনো এক বিশ্বস্ত ব্যক্তির ফোন পেয়েই শেখ মুজিব মত বদলে থেকে যান ৩২ নম্বরে আর পাকিস্তানিরা গ্রেপ্তার করে তাকে। ইঙ্গিতটি স্পষ্ট, সেই বিশ্বস্ত ব্যক্তিই ধরিয়ে দিয়েছেন শেখ মুজিবকে।

আনিসুজ্জামান স্বভাবতই জানতে চেয়েছিলেন সেই জুডাসের নাম। তার ছাত্রটি, যে নিজেও শেখ মুজিবের খুব কাছের মানুষ, কারো নাম বলেনি সেদিন, তবে আরো ইঙ্গিত দিয়েছে যে শেখ মুজিব না থাকলে সেই বিশ্বস্ত ব্যক্তিটির নেতৃত্ব নিরঙ্কুশ হয়। আনিসুজ্জামানের বুঝতে দেরি হয় নি, তার প্রাক্তন ছাত্র সরাসরি নাম না বললেও ইশারা করছে তাজউদ্দীনের দিকেই।

তাজউদ্দীনকে চেনেন বলেই আনিসুজ্জামানের এতটুকু প্রত্যয় হয়নি সেই যুবনেতার কথায়। শেখ মুজিবের সাথে তাজউদ্দীনের বোঝাপড়ার বালতিতে কখনোই সন্দেহ জলের ফোঁটামাত্র অনুভব করেননি তিনি। আনিসুজ্জামান ঠিক জানেন, অনুভব করেননি অন্য কেউই। তবে সেদিন গভীর অস্বস্তি নিয়ে ঘরে ফিরেছিলেন তিনি। মুক্তিযুদ্ধের তখন সূচনাকাল কেবল। সেই সময়েই যদি একজন প্রভাবশালী শীর্ষ যুবনেতা সরকারের উচ্চতম ব্যক্তিটি সম্পর্কে এমন রটনা করতে পারে, তবে ভবিষ্যতের ওপর আস্থা রাখা যায় না মোটেও।

তাজউদ্দীনের ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আনিসুজ্জামান একটা বড় শ্বাস নিলেন। প্রধানমন্ত্রী প্রায়ই রাত জেগে কাজ করেন, জানেন তিনি। এত সকালে এসেছেন বলে তাজউদ্দীন আবার বিরক্ত বোধ করেন কি না, কে জানে!

ঘরে ঢুকে আনিসুজ্জামান চমকে গেলেন। তাজউদ্দীন দাঁড়িয়ে আছেন জানালার পাশে। তাঁর দৃষ্টি বাইরে নিবদ্ধ ছিল, আনিসুজ্জামানের প্রবেশের শব্দে তিনি ফিরে তাকালেন। আনিসুজ্জামান দেখেন, সদা পরিপাটি তাজউদ্দীনের চুলগুলো কেমন উশকোখুশকো, চোখ দুটো ভীষণ লাল।

'স্যার, আপনি ঠিক আছেন তো?' আনিসুজ্জামান উৎকণ্ঠা নিয়ে বলেন। 'শরীর ভালো তো আপনার?'

আবারো জানালার দিকে চেয়ে তাজউদ্দীন মৃদুস্বরে বললেন, 'আমি ঠিক আছি আনিসুজ্জামান সাহেব। সমস্যা নেই কোনো।'

খানিক নীরবতায় কাটল কিছু সময়। এরপর আনিসুজ্জামান কিছু একটা বলতে গিয়েও থেমে গেলেন, কারণ অন্যমনস্ক স্বরে তখন আবারো কথা বলে উঠেছেন তাজউদ্দীন।

'গতকাল রাতে, বুঝলেন... প্রচ-অ-অ-ণ্ড বৃষ্টি হয়েছে এখানটায়। মাঝরাতের দিকে যখন বৃষ্টির বেগটা বাড়লা, তখন দমকা বাতাসে হঠাৎ শব্দ করে খুলে গিয়েছিল এই জানালাটা। মাত্র শুয়েছিলাম, ঘুমটা তাই ভেঙে গিয়েছিল আমার। জানালাটা বন্ধ করতে এসে দাঁড়ালাম এইখানে, কিন্তু এরপর আর ঘুমাতে যেতে পারলাম না। কেন জানেন?

...আনিসুজ্জামান সাহেব, কখনো চিন্তা করেছেন, আমরা এখানে বসে, এই যুদ্ধের সময়েও কত আরামে দিন কাটাচ্ছি? গুলি খাওয়ার ভয় নাই, খাবারের চিন্তা নাই, শীত লাগলে কম্বল আছে, গরমে ফ্যানের বাতাস খাচ্ছি। অথচ দেশ থেকে, রিফিউজি ক্যাম্পগুলো থেকে, প্রতিদিনই কিন্তু মন খারাপ করা সব রিপোর্ট আসছে। শরণার্থীদের মাঝে কলেরার মড়ক লেগেছে। বাচ্চারা অপুষ্টিতে ভুগছে, বৃদ্ধরা মারা যাচ্ছে অসুখ বাঁধিয়ে। কলকাতার বুকে জানালা বন্ধ করেই ঘুমিয়ে যাচ্ছি আমরা, অথচ এই বৃষ্টিতে শরণার্থী শিবিরের মানুষেরা, আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা কোথায় ঘুমাচ্ছে, কীভাবে ঘুমাচ্ছে চিন্তা করতে পারেন আনিসুজ্জামান সাহেব? আমরা কি তাদের কথা এতটুকু মনে রেখেছি?

ওদের কথা চিন্তা করে আমার আর সারারাত ঘুম আসল না, বুঝলেন। পারলাম না। নিজেকে খুব ছোট বলে মনে হলো। যে জীবন তারা দেশে ফেলে এসেছেন, আমরা কি পারবো ওদের সেই জীবনটা আবার ফিরিয়ে আনতে? বলেন, পারবো?'

আনিসুজ্জামান মাথা নিচু করে রাখলেন কিছুক্ষণ। প্রধানমন্ত্রীর দীর্ঘ এই বক্তব্যের পর কী বলবেন, কিছুতেই গুছিয়ে উঠতে পারলেন না তিনি। অবশেষে বললেন, 'আমি তাহলে বিকালের দিকে আসি স্যার? আপনি সারারাত ঘুমান নাই, একটু রেস্ট নিয়ে নেন?'

তাজউদ্দীন জানালার দিকে তাকিয়ে রইলেন আরো এক মুহূর্ত। এরপর যেন সমস্ত চিন্তা একবারে ঝেড়ে ফেলে বললেন, 'না, সেটা হয় না। আমরা এখন বাংলাদেশের ইতিহাস লিখছি। নষ্ট করার মতো সময় আমাদের হাতে একটুও নাই আনিসুজ্জামান সাহেব। বসেন, টেবিলে বসেন। চলেন কাজ শুরু করি...'

আনিসুজ্জামান একদৃষ্টিতে দাবার বোর্ডে নড়বড়ে এই অদ্ভুত মন্ত্রীটির চোখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তাজউদ্দীনও তীব্র লাল চোখে তাকিয়ে আছেন আনিসুজ্জামানের চোখে। দুজনের কেউই চোখ সরিয়ে নিচ্ছেন না।

শিলিগুড়ির সভা

সম্মেলনে উপস্থিত থাকবেন কেবল নির্বাচনে জয়ী গণপ্রতিনিধিরা, স্থির ছিল এটাই। অথচ বক্তা শেখ আবদুল আজিজ সভাপতির আহ্বানে মাইক্রোফোনে দাঁড়িয়ে দেখতে পেলেন এমন অনেক ছাত্রনেতার মুখ, যাদের এখানে আদৌ থাকবার কথা নয়।

গতকাল আগরতলার মুখ্যমন্ত্রী সচীন সিংহের বাড়িতেও এমনটাই ঘটেছিল। মূল অধিবেশনের আগে প্রস্তুতিমূলক অধিবেশনেই চলে এসেছিলেন এই ছাত্রনেতারা। এক পর্যায়ে মাইক দখল করে নিয়ে তারা চ্যালেঞ্জ করেছিলেন নেতাদের এই মিটিং ডাকার অধিকার নিয়ে। উচ্চারণের অযোগ্য ভাষায় গালিগালাজ শুরু করেছিলেন মুজিবনগর সরকারকে। মাইকের সাথে লাগানো লাউডস্পিকারে সেসব কুৎসিত মন্তব্য শুনে রীতিমতো ভিড় জমে গিয়েছিল বাইরে। পাইওনিয়ার প্রিন্টিং প্রেসের মালিক মোহাইমেন সাহেব, যিনি নির্বাচিত হয়েছেন নোয়াখালীর লক্ষীপুর থেকে, তিনি তো বলেই ফেললেন, এরকম লজ্জা আর জীবনে পাননি।

শিলিগুড়ির এই গহিন অরণ্যের সাথে খুব মানিয়ে গেছে আজকের কনফারেন্সের সভাপতির কালো আচকান আর মাথার কালো টুপি। খন্দকার মোশতাক ভেতরে তীব্র উল্লসিত এইসব অনাহূত ছাত্রনেতাদের দেখে।

মাথাগরম এইসব যুবনেতারা কাজ খুব সহজ করে দিয়েছে তার, মনে মনে একগাল হেসে নেন খন্দকার মোশতাক। প্রবাসী সরকারের প্রতি নির্বাচিত প্রতিনিধিদের আস্থা যাচাইয়ের জন্যেই যে এই মিটিং, সেটি ভালোই জানেন তিনি। উড়োকথায় মোশতাক শুনেছেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরার কাছেও নাকি তাজউদ্দীনের নামে নালিশ জানিয়েছেন এই নেতাদের কেউ কেউ।

গত কয়েকদিন প্রচুর গুজব শোনা গেছে কলকাতায়, মুজিবনগর সরকারের দফতরকে কেন্দ্র করে। চলেছে লবিং-পালটা লবিং, প্রকাশ্য ও গোপন মিটিং। কেউ বলেছে, শিলিগুড়ির সভার পরেই পর্যাপ্ত অস্ত্র দেবে ভারত সরকার, ফিরে যাওয়া যাবে স্বাধীন দেশে। উল্টোটাও বলেছে কেউ কেউ, সভার পরে সরকারে নাকি প্রচুর রদবদল হবে।

খন্দকার মোশতাক দ্বিতীয় দলের লোক।

'স্বাধীনতা চাও, না বঙ্গবন্ধুকে চাও?'– এই আবেগী প্রশ্নের মাধ্যমে গত কিছুদিন ধরেই শেখ মুজিবের কাছের ছাত্রনেতাদের উসকে দিয়েছেন মোশতাক। পরামর্শ ছাড়াই প্রবাসী সরকার গঠন করে ফেলায় প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীনের উপরে ক্ষুব্ধ তারা এখনও। তদুপরি ধুরন্ধর মোশতাক তাদের কানে তুলেছেন বিষমন্ত্র, এখনো যদি যুদ্ধ বন্ধ করে পাকিস্তানের সাথে কনফেডারেশন ব্যবস্থায় ফিরে যাওয়া যায়, তবেই হয়তো বেঁচে যাবেন শেখ মুজিব। আর নইলে...

তবে ওই পক্ষও নাকি মিটিং করেছে, শুনেছেন খন্দকার মোশতাক। শিয়ালদার কাছাকাছি কোনো এক হোটেলে নাকি শামসুল হক, ময়েজউদ্দীনেরা সভা ডেকেছিল। ব্যাটারা নাকি সরকারবিরোধী 'ষড়যন্ত্র' ভেস্তে দেবে। আহাম্মকের দল!

সব হারামজাদাই ভারতের দালাল! তাজউদ্দীনকে মনে মনে একটা শক্ত গালি দিয়ে দাঁতে দাঁত চাপলেন খন্দকার মোশতাক। সিনিয়রিটির সুবাদে এখন দলের প্রধান তো তারই হবার কথা, তারমানে প্রধানমন্ত্রী; মাঝখান দিয়ে কোত্থেকে উড়ে এল এই তাজউদ্দীন? যাক, এর শোধ তিনি পরে আদায় করে নেবেন ঠিক। খন্দকার মোশতাক জাত রাজনীতিবিদ, শত্রুকে ভোলেন না। এই মুহূর্তে মাইকের সামনে দাঁড়ানো আবদুল আজিজকেও উসকানি দেয়া হয়েছে। তার বক্তব্যে এখন সে ধুয়ে দিচ্ছে প্রবাসী সরকারকে।

উপস্থিত প্রায় শ'তিনেক এমপি আর এমএনএ-রা অনুভব করতে থাকে, একটা কেমন যেন পরিস্থিতি জমাট বাঁধছে এই সভাকক্ষে। আবদুল আজিজের প্রবল আক্রমণের শিকার হচ্ছেন তাজউদ্দীন সরকার।

হঠাৎ ঘটল এক নাটকীয় ঘটনা। বিচক্ষণ পরিষদ সদস্য ময়েজউদ্দীন বুঝতে পারলেন বক্তার প্রকৃত উদ্দেশ্য। আবদুল আজিজ বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে উপস্থিত সকলকে খেপিয়ে তুলছেন। মঞ্চে লাফিয়ে উঠে ময়েজউদ্দীন শার্টের কলার ধরে সরিয়ে দিলেন সেই আবদুল আজিজকে।

বারুদে আগুন পড়ল যেন। সেই মুহূর্তেই প্রবল আলোড়নের ঢেউ কাঁপিয়ে দিল সবাইকেই। প্রায় প্রত্যেকেই চিৎকার করে জানাতে লাগলেন নিজের বক্তব্য। ভিন্ন মতের বক্রতার ব্যাসার্ধে আর সকলকেই ছাড়িয়ে গেলেন উপস্থিত যুবনেতারা। তাদের গলাই শোনাল সবচেয়ে জোরালো। কেউ কেউ ক্রমাগত স্লো-গান উড়াতে লাগলেন, 'এই সরকার মানি না, মানি না! বঙ্গবন্ধুকে ফিরিয়ে আনো।' জোর গলায় তারা জানাচ্ছিলেন মুজিবনগর সরকারের প্রতি তাদের অনাস্থার কথা।

ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম হতভম্ব হয়ে পড়লেন। দাঁড়িয়ে মুখ খুলতে গিয়েও পারলেন না তিনি। ছাত্রনেতাদের অকথ্য, অশালীন আক্রমণে বসে পড়তে হলো তাকে। সেনাপতি ওসমানীরও একই দশা। মুখ খুলবার চেষ্টা করে

ব্যর্থ হলেন তিনিও। মাথাটা হেঁট হয়ে যাচ্ছে প্রবাসী সরকারের সদস্যদের। তাদের প্রতি এমন অবিশ্বাস প্রদর্শন করছেন নবীন, উত্তেজিত ছাত্রনেতারা এমন নগ্নভাবে উন্মোচন করছেন তাদের অন্তর্দ্বন্দ্ব ভারত সরকারের কাছে তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা আর রইবে কি আজকের পর?

সকলের অলক্ষে মিটিমিটি হাসছেন খন্দকার মোশতাক। আর অন্যদিকে, সকলের চোখের সামনে উঠেই দাঁড়ালেন অন্তর্মুখী একজন মানুষ।

সরকার গঠনের মুহূর্তটি হতে আশঙ্কা তাড়িয়ে বেড়াচ্ছিলো তাকে, ইতিহাসের সবচাইতে অস্থির সময়ে নেতৃত্ব নিয়ে টানাপোড়েনের আগুনে ঝলসে যাওয়া লোকটি, ভুট্টো যাকে আখ্যা দিয়েছিলেন 'শেখের যোগ্য লেফটেন্যান্ট' বলে, সেই কথা কম কাজ বেশি মানুষটি হৃদয়ে আর মস্তিষ্কে ঝড় নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন কথা বলবেন বলে। মাইক্রোফোন হাতে নিলেন তাজউদ্দীন।

'আমরা স্বাধীনতা চাই। স্বাধীনতা পেলেই বঙ্গবন্ধুকে আমাদের মাঝে পাবো।'

কোলাহল স্পর্শ করতে চাইল ছাদ, কিন্তু তাজউদ্দীন স্পষ্ট করে উচ্চারণ করতে লাগলেন এক একটি বাক্য, আর থেমে যেতে লাগল সমস্ত আক্রমণ।

'আজ যদি বঙ্গবন্ধু মুজিবের জীবনের বিনিময়ে আমরা স্বাধীন বাংলাদেশ পাই, তাহলে সেই স্বাধীন বাংলাদেশের মধ্যেই আমরা পাব বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে।...

বাংলাদেশ যদি আজ এত রক্তের বিনিময়েও স্বাধীন না হয়, তাহলে বাংলাদেশ চিরদিনের জন্য পাকিস্তানি দখলদারদের দাস হয়ে থাকবে।...আর এই অধিকৃত পূর্ব পাকিস্তানে যদি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হয়েও আসেন, তবু তিনি হবেন পাকিস্তানের গোলামীর জিঞ্জির পরান এক গোলাম মুজিব। বাংলাদেশের জনগণ কোনোদিন সেই গোলাম শেখ মুজিবকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বলে গ্রহণ করবে না, মেনে নেবে না।

...স্বাধীনতা ছাড়া বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আর কোনো অস্তিত্ব নেই, আর কোনো পরিচয় নেই। স্বাধীন বাংলাদেশ মানেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। পরাধীন বাংলায় বঙ্গবন্ধু ফিরে আসবেন না। আমরা যদি ভুল করে থাকি, তবে দেশ স্বাধীন হলে আপনারা আমাদের বিচার করবেন এবং আপনাদের রায় আমরা মাথা পেতে নেবো।

...মুজিব স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে ফিরে আসবেন এবং তাকে আমরা জীবিত অবস্থায় ফিরিয়ে আনব ইনশাল্লাহ।'

তাজউদ্দীনের ভাষণ শেষ হওয়া মাত্র আবেগে দাঁড়িয়ে গেল শিলিগুড়ির সভাকক্ষ। যে মতিভ্রমে তারা নড়ে গিয়েছিলেন বিশ্বাস থেকে, সেই ভুল ছুড়ে ফেলে নির্দ্বিধায় তারা আবার আস্থা রাখলেন প্রবাসী সরকারের ওপর। 'জয়

বাংলা!! জয় বঙ্গবন্ধু!!' স্লোগানে কেঁপে কেঁপে উঠছিল শিলিগুড়ি। ওদিকে পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন ছাত্রনেতারা। বুঝে গেছেন, এই মুহূর্তে জনমত তাদের পক্ষে নেই।

ছোট্ট একটি পাথরখণ্ডও কখনো কখনো পারে বিশালাকার কোনো নদীর গতি বদলে দিতে। তেমনই, বক্তা হিসেবে দারুণ কোনো সুখ্যাতি যার কখনোই ছিল না, সেই তাজউদ্দীনই এই ছোট্ট ভাষণটা দিয়ে দ্বিমুখী স্রোতে টলায়মান স্বাধীনতাযুদ্ধ নামের জাহাজটাকে আনলেন নিয়ন্ত্রণে। ইতিহাসের জাদুকরি নয়টি মিনিটে তাজউদ্দীন দূর করলেন সকল অনাস্থা আর অবিশ্বাস, নিশ্চিত করলেন লাল-সবুজের একটি জাতির জন্ম।

তুমুল হাততালির সাথে সাথে নিজের চেয়ারে ফিরে গেলেন তাজউদ্দীন। পাশে বসা ওসমানীও মাথা ঝোঁকালেন তার দিকে। মৃদুস্বরে বললেন, 'ভালো বলছো তাজউদ্দীন। আজকে লক্ষণ বেশি সুবিধার দেখতেছিলাম না...'

এরপরেও সভার কাজ চলে। সবার শেষে ভাষণটা দেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম। আবেগে কাঁপতে থাকা স্বরে বলেন, *'বন্ধুগণ, আজও আপনাদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, যদি বিশ্বাসঘাতকতা করি, যদি সংকল্পে কোনোরকম মলিনতা দেখেন, যদি আপনাদের নীতি ও আদর্শ থেকে বিচ্যুত দেখেন আমাদের, তবে আমাকে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করবেন। বন্ধুগণ, আজ তাই আস্থা স্থাপন করুন। বাংলার এই সংকটময় মুহূর্তে, জাতির স্বাধীনতার এ ক্রান্তিলগ্নে, যেখানে শত শহিদের রক্তে আজ ইতিহাস লেখা হচ্ছে, যেখানে হাজার হাজার সৈনিক আজ বনে প্রান্তরে ইতিহাস লিখে চলেছে, সেই মুহূর্তে বন্ধুগণ, আপনারা আরেকবার আস্থা স্থাপন করুন!'*

আস্থা নেমে আসে সান্তা ক্লজের স্লেজগাড়ির উপহারের মতোই। হাততালিতে আরেকবার আকাশ ছুঁতে চায় শব্দেরা, হাওয়ায় ভেসে দূরে চলে যায় প্রবাসী সরকারের প্রতি অনাস্থা। শিলিগুড়ির অরণ্যের আঁধারেও আলো দেখে বিহ্বল এক জাতির মুক্তির সংগ্রাম।

বুক থেকে হিমালয়ের বোঝা নেমে গেছে তাদের, সৈয়দ নজরুল ইসলামের ভাষণে তাই মন খুলে হাসেন প্রবাসী সরকারের সদস্যরা। হাস্যোজ্জ্বল প্রবাসী সরকারকে মঞ্চে খুব চমৎকার দেখায়।

সে মুহূর্তে খেয়াল করেনি কেউ, করলে ঠিকই দেখতে পেত, খন্দকার মোশতাক কিন্তু হাসছিলেন না। তার মুখ অরণ্যের মতোই ছায়াছন্ন, কূটনীতিকের মতোই প্রহেলিকাময়।

ডেমোক্লিসেরা

তিনটি মাত্র বাক্য।

'আমি ভালো। মণি ভাইদের সঙ্গে আছি। এদের যা যা দরকার, সব দিয়ো। রুমী।'

জাহানারা ইমাম বারবার চিরকুটটা খুলে দেখেন, হাত দিয়ে স্পর্শ করেন। কয়েকটা অক্ষর মাত্র। কিন্তু কেমন যেন সাহস দেয় ওই কাগজটা। মাকে বোঝায়, রুমীর কিছু হয়নি, রুমী ভালো আছে। মন অবশ্য পুরোপুরি মানতে চায় না। তখন জাহানারা ইমাম রুমীর ঘরে গিয়ে বসে থাকেন, রুমীর বিছানায় শুয়ে চিরকুটটা আবার পড়েন।

গত কয়েকদিন ধরে শরীফের, মানে রুমীর বাবার, রুটিনের কিছু ঠিক ছিল না। হাজার কয়েক ব্রিজ আর কালভার্টের তালিকা করা তো খুব সহজ কাজ না! তবে কাজটা যেহেতু রুমীদের ফরমায়েশ, আরেকটু স্পষ্ট করে বললে– খালেদ মোশাররফের কাছ থেকে আসা অনুরোধ, সেটা তো আর ফেরানো যায় না।

রুমীর চিরকুট যারা সাথে করে এনেছে, খালেদের অনুরোধটাও বয়ে এনেছে সেই ছেলে দুটোই। শাহাদত আর আলম নাম না ওদের?... জাহানারা ইমাম মনে মনে লজ্জা পেয়ে যান। কী অবস্থা দেখো, ছেলে দুটো তার রুমীর খবর নিয়ে এল, অথচ তাদের নামটাই ঠিকমতো মনে রাখতে পারছেন না তিনি।

ছেলে দুটো এসেছিল শরীফের অফিসে। সারাক্ষণ নাকি ভিড় লেগে থাকে সেখানে। এর মাঝেই চিরকুট দেয়ার ফাঁকে ছেলেগুলো নিয়ে এসেছিল একটা অনুরোধ, খালেদ মোশাররফ বাংলাদেশের সব কয়টা ব্রিজ আর কালভার্টের তালিকা চেয়ে পাঠিয়েছে শরীফের কাছে। এই শেষ নয়। ঠিক কোন পয়েন্টে এক্সপ্লোসিভ মারলে ব্রিজ ভেঙে যাবে, মিলিটারিদের যোগাযোগ বিঘ্নিত হবে, অথচ দেশ স্বাধীন হবার পর আবার স্বল্পতম সময়ে মেরামত করা যাবে, এসব তথ্যও দরকার খালেদের।

রোডস অ্যান্ড হাইওয়েজ ডিভিশনের ইঞ্জিনিয়ার শরীফের অনেক জানাশোনা। কাজেই তালিকা বানাতে শরীফকেই অনুরোধ করা খুব অযৌক্তিক নয়।

শরীফের কাছেই খালেদের সাহায্য চাওয়াটা কিন্তু একদম কাকতালীয় নয়, জাহানারা ইমাম ভেবে দেখেন। দুজনের মাঝে একটা ছোট্ট যোগসূত্রও তো আছে। শরীফের বন্ধু ইঞ্জিনিয়ার এস আর খান, মানে বাঁকা নামেই যাকে চেনে বন্ধুমহলের সবাই, সেই বাঁকা তো খালেদের মামা!

বাঁকার ভাগনে সেই খালেদ মোশাররফ, যার ডাক নাম আবার মণি, এখন নাকি সেক্টর টুয়ের কমান্ডার। সেক্টর টু জায়গাটা, শরীফ বলেছিল আগরতলার কাছাকাছি। ঢাকা থেকে ওই দিকটাই সবচেয়ে কাছে, রুমীর মতো ইউনিভার্সিটি

এলাকার ছেলেরা তাই প্রায় সবাই ওদিক দিয়েই বর্ডার ক্রস করছে। গেরিলা ট্রেনিং নিচ্ছে। রুমীও নাকি এখন ট্রেনিং ক্যাম্পে।

বাঁকার ভাগনে খালেদের অনুরোধ রাখতে গিয়েই শরীফের খাওয়া ঘুম হারাম হয়ে গেছে গত কয়েকদিন। ঝামেলা হয়েছিল ফাইলগুলো সরকারি অফিস থেকে বের করে আসা নিয়ে। রোডস অ্যান্ড হাইওয়েজের ডিজাইন সেকশনের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার সামাদের সাথে পরিচয়টা বেশ গাঢ়ই শরীফের, বলতে গেলে সামাদকে একরকম হাতে করে কাজ শিখিয়েছিল রুমীর বাবাই। কিন্তু এরপরেও ফাইল বের করাটা সহজ ছিল না; সামাদের সাথে কাদের খানও ছিল যে! অবাঙালি এই এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের সাথে আর্মির নাকি আজকাল খুব মাখামাখি। তার যাতে কোনোভাবেই সন্দেহের উদ্রেক না ঘটে, সেজন্যে বহু মাথা খাটাতে হয়েছে শরীফ আর বাঁকাকে। শেষ পর্যন্ত গভীর রাতের আঁধারে চিফ ইঞ্জিনিয়ার মশিউর রহমান সাহেবের সাহায্যে ফাইলগুলো গেল সামাদের বাসায়।

সাড়ে তিন হাজার ব্রিজ আর কালভার্টের লিস্টি করতে গিয়ে তাই শরীফ আর বাঁকা নাজেহাল হয়ে পড়েছিল একেবারে। বাঁকা ফাইল দেখে দেখে তালিকা কপি করেছে, শরীফ ড্রয়িং এঁকে ব্রিজের স্পেসিফিকেশন লিখেছে। গোল করে সেগুলো গুটিয়ে শরীফ বাড়িতে নিয়ে এসেছে গতকাল।

ছেলে দুটো এসেছে আজকে। আধঘণ্টা আগে, ঠিক সন্ধ্যার মুখে।

জাহানারা ইমাম আর শরীফ বসে ছিলেন বাগানে, ধীরপায়ে কোনো কথা না বলে তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল ওরা। এর আগে কখনো তাদের দেখেননি, তবু রুমীর মা'র মনে হয় এরা অপরিচিত কেউ নয়। এদের তিনি চেনেন, এরাও রুমীর মতো কেউ। অথবা, হয়তো এরাই রুমী।

দ্রুত ভেতরে গিয়ে ছেলে দুটোর জন্যে খাবারের ব্যবস্থা করেছেন জাহানারা ইমাম। এরপর ওদের বসিয়েছেন ডাইনিং টেবিলে। জিনিসগুলো ওদের বুঝিয়ে দিতে কিছু সময় লাগবে শরীফের, আলোচনাটা তাই পর্দা ঢাকা খাবার ঘরেই হওয়াই ভালো। জামী রোগ বাঁধিয়ে পড়ে আছে বিছানায়, নইলে দরজা পাহারা দেবার দায়িত্বটা ওকে দিয়েই সারা যেত। উপায়ান্তর না দেখে জাহানারা ইমাম তাই নিজেই বসে আছেন গেটের সামনে, বাগানে।

মায়ের বুক দুরুদুরু করে। ইচ্ছে করে, ভেতরে গিয়ে তিনি ওদের সাথে কথা বলেন। জানতে চান রুমীর খবর। কিন্তু ইচ্ছেটা কাজে পরিণত করা আর হয়ে ওঠে না। বুকে পাথর বেঁধে জাহানারা ইমাম বাগানে বসে থাকেন।

'খালাম্মা, একটা ফোন করবো।' হঠাৎ ডাকে সচকিত হয়ে রুমীর মা দেখেন গেটে সাজ্জাদ দাঁড়িয়ে আছে, দুই বাড়ি পরের রেজা সাহেবের ছেলে।

'ফোন যে এখন নষ্ট বাবা! সকাল থেকে লাইনটা ডেড হয়ে আছে, মিস্তিরি বলেছে কাল দুপুরের দিকে আসবে।' জাহানারা ইমাম অম্লান বদনে মিথ্যা বলে

দেন। বলতে তার খারাপ লাগে, কিন্তু উপায় নেই। ভেতরের অতিথিদের গোপনীয়তা বজায় রাখতে হবে যেকোনো ভাবেই।

সাজ্জাদ গেট থেকে সরে যেতেই দ্রুতপায়ে দোতলায় উঠে যান জাহানারা ইমাম। টেলিফোনের বেডরুম এক্সটেনশনের রিসিভারটা তুলে রাখেন তিনি। একটু আগে কোনো ফোন এলেই তো বিপদ হতে পারত, সাজ্জাদ বুঝে যেত তিনি সত্য লুকোচ্ছেন।

ফেরবার সময় জাহানারা ইমাম গতিটা কমিয়ে দেন ডাইনিং রুম পার হবার সময়। শরীফ আর ছেলেদের মৃদুস্বরের আলোচনা কানে আসে। অ্যাবাটমেন্ট, গিয়ার, বিয়ারিং।

বাগানে এসে আবার চেয়ারে বসতেই বসতেই রুমীর মা'র মনে হয় গেটের সামনে থেকে কেউ যেন সরে গেল। একটু অপেক্ষা করে তিনি পা চালিয়ে উঁকি দেন গেটের বাইরে। নাহ, কোথাও কেউ নেই। তিনি অযথাই দুশ্চিন্তা করছেন।

জাহানারা ইমাম ঠিকই জানেন, তাদের অবস্থা এখন প্রাচীন অ্যাথেন্সের ডেমোক্লিসের মতোই। স্বেচ্ছায় গলার ওপর তারা তলোয়ার বেঁধেছেন। একটা সামান্য ভুলেই শেষ হয়ে যেতে পারে সমস্ত কিছু।

সমর নায়কেরা

'হ্যাঁ, আমরা স্বাধীন হবো। খুব তাড়াতাড়িই স্বাধীন হবো। ...এই কথাটা তোমাকে আমি জোরগলায় বলতে পারি, বুঝলে? আমি সৈনিক, অকারণে কথা বাড়িয়ে বলা আমার সাজে না। তোমাকে একটা ঘটনা বলি, তুমি তাহলে নিজেই বুঝবে, কেন এতটা দৃঢ়ভাবে আমি এই কথা বলতে পারছি...'

মেজর শফিউল্লাহ খানিকটা আনমনা হয়ে গেলেন মনে হলো। আলাউদ্দীনের থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে চায়ের কাপে ছোট্ট একটা চুমুক দিলেন প্রথমে, এরপর চোখ রাখলেন সুদূরে– গলার স্বরও তার কেমন যেন পালটে গেল।

'সিলেটের চা বাগানে যখন ক্যাম্প ছিল আমাদের, সে সময়ের ঘটনা এটা। আমার ক্যাম্পে দুলু মিয়া বলে একটা ছেলে ছিল। ছেলেটার বদভ্যাস বলতে ছিল, মাঝে মাঝে তাড়ি খাওয়া। একবার চা বাগানের ভেতরে অ্যামবুশ করতে গিয়ে দুলু মিয়ার হাতে পড়েছিল স্থানীয় শ্রমিকদের তাড়ি। দুলু মিয়া লোভ সামলাতে পারেনি, অপারেশনের সময়েই তাড়ি খেয়ে মাতলামো শুরু করে সে। শেষ পর্যন্ত তার দলের লোকেরা তাকে ধরে বেঁধে ক্যাম্পে ফিরে আসে। আমি তাকে আদেশ দিই ক্যাম্প ছেড়ে বেরিয়ে যেতে, নইলে পরেরবার তাকে দেখা মাত্র গুলি করবো। দুলু মিয়া সেদিন কেঁদে ফেলেছিল, পায়ে ধরে মাফ চেয়েছিল বারবার। বলেছিল, আর একবার তাকে যুদ্ধ করার সুযোগ দেয়া হোক। আমিও তাই শেষ পর্যন্ত তাকে

থাকবার অনুমতি দিলাম। অবশ্য দুলু মিয়ার নিজ দলের কমান্ডার কিন্তু তাকে আর দলে নিতে চায়নি, তাকে পাঠানো হলো অন্য কমান্ডারের অধীনে।...

আসল ঘটনাটা ঘটেছে কয়েকদিন আগে। পাক আর্মির চারটা ব্যাটালিয়ান একসাথে আমাদের ওপর হামলা চালিয়েছিল। সিলেট থেকে হেডকোয়ার্টার সরাতে হয়েছিল আমাদের। সেদিন, হ্যাঁ, সেদিন দুলু মিয়া দেখিয়ে দিয়েছিল যুদ্ধ কীভাবে করতে হয়। দুটো গুলি লেগেছিল তার গায়ে। একটা পেটে, অন্যটায় ভেঙেছিল তার ডান পা। কিন্তু দুলু মিয়া একাই মেশিনগান দিয়ে আটকে রেখেছিল একটা ব্যাটালিয়ানকে, আমাদের পুরো কোম্পানি সরে পড়তে পেরেছিল শুধু ওর কারণে।

আমি যখন তার সাথে দেখা করতে গিয়েছি, দেখলাম সে এক হাতেই ফায়ার করছে, অন্য হাতে ধরে রেখেছে তার পেটের গুলি লাগা জায়গাটা সেখান থেকে রক্ত বেরিয়ে আসছে থেকে থেকে। আমায় দেখে ছেলেটা হেসে ফেলল। কী আশ্চর্য মানুষ দেখো, তার পেটে গুলি লেগেছে তবু ছেলেটা অমন করে হাসলো। ছেলেটা আমায় কী বলেছিল, জানো?

"স্যার, আপনার কাছে চিরঋণী হয়ে থাকলাম, আপনি সেদিন আমায় মাফ করে দিয়েছিলেন বলেই তো আজকে এইরকম একটা ফাইট দিতে পারতেছি। আমার গায়ের শার্টটা খুলে নিয়ে যান স্যার, এইটা শেখ সাহেবকে দেখাবেন। শেখ সাহেব বলসিলেন না, তোমরা রক্ত দিবার জন্যে তৈয়ার হইয়্যা যাও? আমি স্যার রক্ত দিছি বাংলাদেশের জন্যে, খোদা সাক্ষী!"

...দুলু মিয়ার শার্টটা আমি রেখে দিয়েছি বুঝলে। দেশ স্বাধীন হলে এই শার্টটা আমি শেখ মুজিবের কাছে নিয়ে যাবো। যে দেশে দুলু মিয়ার মতো ছেলেরা জন্মায়, সেই দেশ স্বাধীন না হয়ে পারে, তুমিই বলো?'

মেজর শফিউল্লাহর কথা শেষ হবার পরে দীর্ঘক্ষণ ধরে আলাউদ্দীন নীরব থাকে। মেজর ধীরে ধীরে চায়ের কাপে চুমুক দেন, আলাউদ্দীন টেবিলে রাখা চায়ের কাপ নিয়ে নাড়াচাড়া করে, চীনেমাটির কাপের নকশা খুঁটিয়ে দেখে।

নেহাত কাকতালীয়ভাবেই মেজরের সাথে দেখা হয়ে গেছে আলাউদ্দীনের। সে এসেছে কামারুজ্জামান সাহেবের ডাকে, তাকে কী যেন একটা কাজ দেবেন তিনি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থিয়েটার রোডে থাকবেন শুনে আলাউদ্দীনও তাই চলে এসেছে এখানেই। আপাতত কামারুজ্জামান সাহেব দরজা আটকে কার সাথে যেন কথা বলছেন, সময় কাটাতে আলাউদ্দীন তাই এক কাপ চা নিয়ে চলে এসেছিল বারান্দার দিকে। মেজর শফিউল্লাহর সাথে এখানেই দেখা হয়ে গেছে তার।

থিয়েটার রোডের বেসামরিক দপ্তর যে এখন সেনানায়কদের বুটের আওয়াজে সরব, এখানে এসেই সেটা জানা হলো আলাউদ্দীনের। সেক্টর কমান্ডারদের মিটিং চলছে নাকি। সেই মুজিবনগরে শপথ নেয়ার দিনই ওসমানী সাহেবকে

মুক্তিবাহিনীর প্রধান বানিয়ে দেয়া হয়েছে, কিন্তু বাস্তবে কেন্দ্রীয় কোনো কমান্ডের অধীনে এখনো আনা হয়নি দেশের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে থাকা যুদ্ধরত সামরিক সেনাদের। সেক্টরগুলোর সীমানা ভাগ করা, সেগুলোকে কেন্দ্রীয় অভিন্ন কমান্ডের আওতায় আনতেই নাকি এই মিটিং। শিলিগুড়ির সভার পরে রাজনৈতিক ফ্রন্টের ঝামেলা আপাতত মিটেছে প্রবাসী সরকারের; এবার তারা চোখ দিয়েছেন সামরিক ফ্রন্টের দিকে।

থিয়েটার রোডে এসেই আলাউদ্দীন শুনতে পেল, একদম নির্বিবাদে নাকি কাটছে না এই সম্মেলনটাও। কর্নেল ওসমানীর প্রতি নাকি আস্থা কম কয়েকজন অপেক্ষাকৃত তরুণ সেক্টর কমান্ডারের, তারা বরং একটা ওয়ার কাউন্সিল করতে চান। আর কর্নেল ওসমানীও নাকি এই কথা শুনেই রিজাইন করে ফেলেছিলেন সম্মেলনের প্রথম দিনেই। শেষ পর্যন্ত নাকি তাজউদ্দীন মিটমাট করেছেন দুই পক্ষকে। ওসমানীকে বুঝিয়ে শুনিয়ে তার রিজাইন লেটার ফিরিয়ে নিতে বাধ্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী।

...কেমন মানুষ এই কর্নেল ওসমানী? আলাউদ্দীন সেটা ঠিক ভেবে বের করতে পারে না।

ওসমানী সম্পর্কে মনোভাব এক নয় সকলের। তার শৃঙ্খলাবোধ আর দেশপ্রেম নিয়ে প্রশ্ন নেই। মেজর মীর শওকত আলী তো ওসমানীর প্রশংসায় একেবারে পঞ্চমুখ। তবে বিপরীত মনোভাব সম্পন্ন লোকও কম নয় একেবারে। মূল যুদ্ধক্ষেত্র থেকে দূরে কলকাতায় তার সদর দপ্তর ফেলাটাকেও ভালো চোখে দেখেননি অনেক সেনানায়কই। তদুপরি মতের অমিল হলেই রিজাইন করে ফেলার ছেলেমানুষিও আছে ওসমানীর মাঝে। গত মাসে শাফায়াত জামিলের সাথে সীমান্তের বিভিন্ন ক্যাম্প ঘুরে দেখার সময় প্রায় কুড়িবার নাকি পদত্যাগ করবেন বলে হুমকি দিয়েছিলেন কর্নেল ওসমানী।

'আপনাদের কমান্ডার ইন চিফ, ওসমানী সাহেব, কেমন মানুষ স্যার?' মেজর শফিউল্লাহর দিকে প্রশ্নটা আচমকা ছুড়ে দেয় আলাউদ্দীন।

সতর্ক চোখে আলাউদ্দীনের দিকে একটু তাকান মেজর, তারপরে মৃদু হেসে কিছু একটা বলতে গিয়েও বলা হয় না তার। বারান্দায় ততক্ষণে আবির্ভাব হয়েছে আরো একটি চরিত্রের। মেজর জিয়াউর রহমান চা-পান রত দুইজনের দিকে ঝকঝকে একটা হাসি ছুড়ে দেন।

'হালো, হাউ ডু ইউ ডু?' অপরিচিত আলাউদ্দীনের দিকে চেয়ে দরাজ গলায় সম্ভাষণ জানান জিয়াউর রহমান এবং জবাবের অপেক্ষা না করেই ঘুরে তাকান শফিউল্লাহর দিকে। 'আই থিঙ্ক উই নিড টু টক।'

এই তাহলে মেজর জিয়াউর রহমান? ওয়ার কাউন্সিল গঠনের মূল প্রস্তাবটা এসেছিল মেজর জিয়ার কাছ থেকেই, শুনেছে আলাউদ্দীন। আরো শুনেছে, সে

প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছেন খালেদ মোশাররফ। তবে মেজর শফিউল্লাহর সাথে নিচু গলায় কথা বলতে বলতে ভেতরের দিকে অপসৃমান মেজর জিয়ার দিকে তাকিয়ে সেইসব মনে পড়ে না গুণমুগ্ধ আলাউদ্দীনের। বরং কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে ইথারে ভেসে আসা 'আই মেজর জিয়া, প্রভিন্সিয়াল কমান্ডার অব চিফ অব দি বাংলাদেশ লিবারেশন আর্মি, হিয়ার বাই প্রোক্লেইম, অন বিহাফ অব শেখ মুজিবুর রহমান, দি ইন্ডিপেন্ডেন্স অফ বাংলাদেশ...' ভাষণটি স্মরণ করে সে মনে মনে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এই মেজরের কাজের জন্যে গর্বিত হয়। যুদ্ধ শুরুর সেই দিনগুলোতে, বাঙালি যে কেবল অসহায় না থেকে রুখেও দাঁড়াচ্ছে, মাথা উঁচু করে পালটা আক্রমণের সাহস দেখাচ্ছে, এই সত্য স্থাপনে মেজর জিয়ার সেই ভাষণের বড় দরকার ছিল।

আলাউদ্দীন জানে না তখনো, ভবিষ্যতে স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাসের সাথে চিরদিনের জন্যে বাঁধা পড়ে যাবে মেজর জিয়াউর রহমানের ভাগ্য।

জটিলতা

শুধু আলাউদ্দীন নয়, মেজর জিয়াউর রহমানের সাথে সেদিন থিয়েটার রোডে দেখা হয়েছিল আরো একজনেরও, তিনি আনিসুজ্জামান। শিলিগুড়ি থেকে তাজউদ্দীনের ফেরার খবর পেয়ে আনিসুজ্জামান গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করবেন বলে। সেক্টর কমান্ডারদের সম্মেলনের কথা জানা ছিল না তার। পাহারায় থাকা বিএসএফ সেদিন ঢুকতেই দিল না তাকে। জরুরি সভা, বিশেষ পাস না থাকলে কাউকেই ভেতরে ঢোকানো হচ্ছে না। আনিসুজ্জামান ফিরে আসছিলেন, ঠিক এমনি সময় ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন জিয়াউর রহমান।

মেজর জিয়ার সাথে আনিসুজ্জামানের পরিচয় ঘটেছিল রামগড়ে। সময়টা সাধারণ ছিল না। ক্র্যাকডাউনের পর যখন আনিসুজ্জামান সরে আসছেন ঢাকা থেকে, সেটা সেই সময়ের ঘটনা। কাজেই মেজর জিয়া তাকে চিনবেন কি না, এই নিয়ে দ্বিধা ছিল আনিসুজ্জামানের। তারপরেও থিয়েটার রোডের সামনের রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রাখা একটা জিপের দিকে মেজর জিয়া যখন এগিয়ে যাচ্ছেন, আনিসুজ্জামান হাঁক দিয়েছিলেন।

জিয়াউর রহমান আনিসুজ্জামানকে চিনেছিলেন। কুশল বিনিময়ের পর সেদিন আনিসুজ্জামান জানতে চেয়েছিলেন সেক্টর-কমান্ডারদের মিটিং ফলপ্রসূ হচ্ছে কি না।

'ড্যাম। কাজ যা হচ্ছে তার চেয়ে সময়ের অপচয় হচ্ছে বেশি!' মেজর জিয়ার উত্তর অবাক করেছিল আনিসুজ্জামানকে। 'এন্ড আওয়ার সি ইন সি, দ্যাট ওসমানী, হি ইজ টু ওল্ড চ্যাপ। এই রকম লোকের সাথে কাজ করা কঠিন।'

থিয়েটার রোডের আঙিনায় ধীর পায়ে হাঁটতে হাঁটতে আনিসুজ্জামান মেজর জিয়ার সেদিনের কথাগুলো আরেকবার ভেবে দেখেন। ওসমানী সম্পর্কে নবীন মেজরদের ধারণা খুব উঁচু নয়, নানা সূত্র থেকে শুনেছেন তিনি। সম্মেলনে মেজরদের ওয়ার কাউন্সিল গঠনের প্রস্তাবও কানে এসেছে তার। কানে এসেছে, মেজর জিয়া সম্পর্কেও নানা রকম সংবাদ।

জিয়াউর রহমান নাকি তুরা ব্রিগেড গঠন করেছেন, সমস্যা বাধিয়েছেন সেটার নামকরণে। জিয়া তার নামের আদ্যক্ষর দিয়ে সেটির নাম রেখেছেন জেড ফোর্স। এই ঘটনায় নাকি আবার ওসমানী খুব চটেছেন জিয়ার ওপরে। এমনকি, মেজর জিয়াকে গ্রেপ্তার করতেও নাকি ইচ্ছুক ছিলেন কর্নেল ওসমানী। সেই জটিলতাও বরাবরের মতোই কাটাতে হয়েছে তাজউদ্দীনকে।

'একটা ব্রিগেডেই তো আর আপনার চলবে না। আপনার তো আরো ব্রিগেড দরকার, নাকি?' ওসমানীকে নাকি বলেছেন তাজউদ্দীন। 'তাহলে আপনি বরং আরো দুইটা ব্রিগেড বানিয়ে নিন খালেদ মোশাররফ আর শফিউল্লাহকে দিয়ে। খালেদেরটার নাম দিন কে ফোর্স, আর শফিউল্লাহরটা এস ফোর্স। ব্যাস, তাহলেই তো ঝামেলা মিটে যায়। কাউকে গ্রেপ্তারও করা লাগল না, আর মেজর জিয়াও আলাদাভাবে গুরুত্ব পেলেন না!'

আনিসুজ্জামান মনে মনে আরেকবার তাজউদ্দীনের বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করেন। শেখ সাহেবের অনুপস্থিতিতে চারদিকে যেরকম বিশৃঙ্খলা চলছে, তাজউদ্দীন সাহেব না থাকলে আসলেই সবদিক সামলে চলা প্রায় অসম্ভব ছিল।

সন্ধ্যা হয়েছে অনেকক্ষণ, চারপাশে ঘন আঁধার নেমে এসেছে ইতোমধ্যে। আনিসুজ্জামান আজ কিছু রিপোর্ট নিয়ে এসেছেন। চত্বর থেকে মূল বাড়িতে ঢোকার পথে আনিসুজ্জামানের পাশ কেটে বেরিয়ে যায় একটি অবয়ব। আবছা বিদ্যুতের আলোতে আনিসুজ্জামান ঠিক চিনতে পারেন না লোকটিকে। গভীর চিন্তায় ডুবে থাকা আবদুল মোহাইমেন সাহেবও খেয়াল করেন না আনিসুজ্জামানকে।

ঢাকার পাইওনিয়ার প্রিন্টিং প্রেসের মালিক মোহাইমেন সাহেবকে এই কলকাতায় এসেও যুক্ত হতে হয়েছে পত্রিকার সাথে। আবদুল মান্নানের অনুরোধে মোহাইমেন সাহেব লেগে পড়েছেন জয়বাংলা পত্রিকার কাজে। বালু হাক্কাক লেন থেকে বের হওয়া এই ডবল ডিমাই সাপ্তাহিকটি বেশ আলোড়ন তুলেছে কলকাতায়। সেই পত্রিকার কাজেই আবদুল মোহাইমেন আজ এসেছিলেন এখানে, আর এসেই সাক্ষী হয়ে গেছেন একটি অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার।

সন্ধ্যার ঠিক পরপর থিয়েটার রোডে ঢুকেছেন আবদুল মোহাইমেন। দোতলার সিঁড়ির গোড়ায় এসেই চমকে গেছেন তিনি। দেখেন, তাজউদ্দীন রাগে কাঁপছেন আর অনতিদূরে এক প্রভাবশালী যুবনেতা দাঁড়িয়ে আছেন প্রবল ঔদ্ধত্যে।

তাজউদ্দীন রাগত স্বরে বললেন, 'আমি আর দিতে পারবো না।'

'আপনাকে দিতেই হবে!' পাল্টা রোষে বললেন যুবনেতাটি। 'আপনি না দেবার কে? আপনি তো একজন ইমপোস্টার, প্রতারক!'

তাজউদ্দীন আরো রেগে গেলেন। 'ইউ গেট আউট ফ্রম হিয়ার!'

'হোয়াই শুড আই গেট আউট? ইউ বেটার গেট আউট!'

মোহাইমেন সাহেব লজ্জার সাথে লক্ষ করলেন নিরাপত্তার কাজে নিযুক্ত ভারতীয় সিকিউরিটি অফিসারসহ অন্যান্য ভারতীয় কর্তারাও এই দৃশ্যটি অবাক হয়ে দেখছেন। স্বাধীন একটি দেশের প্রধানমন্ত্রীকে তাদেরই এক ছাত্রনেতা বলছে প্রতারক!! আদেশ করছে বেরিয়ে যেতে!! অকল্পনীয় ব্যাপার! হাতাহাতি হয়ে গেলে কী ভীষণ লজ্জার ব্যাপার হবে!

শেষ পর্যন্ত ঘটনা অবশ্য ততদূর গড়াল না। তাজউদ্দীন ক্রোধ সংবরণ করলেন। কোনো কথা না বলে ঢুকে গেলেন নিজের ঘরে। ছাত্রনেতাটিও কিছুক্ষণ পরে সরে পড়লেন।

মিনিট পনেরো পরে সব ঠান্ডা হয়ে গেলে মোহাইমেন সাহেব ঢুকেছিলেন তাজউদ্দীনের ঘরে। জিজ্ঞাসা করেছিলেন এই বিতণ্ডার কারণ।

'ভাই, কী আর বলবো।' তাজউদ্দীনের গলা অসম্ভব শীতল।

'এই ছাত্রনেতাদের রীতিমতো আলাদা ফান্ড থেকে মাসোহারা দেয়া হয় হাতখরচ হিসাবে। তারপরেও এরা যখন তখন এসে বলে টাকা দিতে। এরা বেশিরভাগই থাকে হোটেলে, সেই হোটেলের খরচও দিতে হয় বাংলাদেশ সরকারকে। মাসোহারা যথেষ্ট হবার পরেও মাঝে মাঝেই এদের টাকা দেয়া লাগে। এই ছেলেটিকে মাত্র কিছুদিন আগে একশো টাকা দিয়েছি। আজকে আরো টাকা চাইতে এসেছিল। আমি অস্বীকার করায় কী রকম ব্যবহার করল, সেটা তো নিজের চোখেই দেখলেন।'

তাজউদ্দীন খুব সহজে বিচলিত হন না, জানেন আবদুল মোহাইমেন। তবে আজ, এতগুলো ভিনদেশি লোকের সামনে অপমানিত হওয়াতেই মনে হয় খুব ভঙ্গুর মনে হচ্ছিলো তাকে।

থিয়েটার রোডের বাড়ির বাইরে পা ফেলতে ফেলতে আবদুল মোহাইমেনের মনে পড়ে, চলে আসার ঠিক আগমুহূর্তে তাজউদ্দীন কী বলেছিলেন।

'আমি আর এই ভার বইতে পারছি না মোহাইমেন সাহেব। কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, শেখ সাহেব দ্রুত ফিরে আসুন। তাঁর হাতে সমস্ত দায়িত্ব বুঝিয়ে দিলেই আমার মুক্তি।'

সন্ধ্যার ঘটনাটায় মন বিষিয়ে আছে তাজউদ্দীনের, কিছুই ভালো লাগছে না। তার আত্মসম্মানবোধ প্রখর, প্রয়োজনে কারো কাছে হাত পাতেন না তিনি। অথচ আজ ভিন দেশের কিছু মানুষের সামনে পর্যন্ত এরকম বেইজ্জত হতে হলো। মুজিব ভাই থাকলে নিশ্চয়ই এরকমটা ঘটত না, ঐ মানুষটা সবাইকে বশে রাখার জাদুকরি মন্ত্র জানেন।

একটা লম্বা শ্বাস আড়াল করে তাজউদ্দীন মুখ ধুয়ে আসলেন। অপ্রিয় বিষয় নিয়ে ভাবলে মানুষ এলোমেলো হয়ে পড়ে, তার চিন্তা আর বিশ্লেষণশক্তি তখন ব্যক্তিগত লাভক্ষতি দিয়ে প্রভাবিত হয়। কাজেই নিজের কথা এখন না ভাবলেও চলবে। বরং কাজ নিয়ে বসা দরকার। আনিসুজ্জামান কয়েকটা রিপোর্ট দিয়ে গেছে, হাতে বেশ কিছু চিঠিও আছে।

বেশ কিছুক্ষণ ধরে তাজউদ্দীন তার কাছে আসা রিপোর্ট আর চিঠিগুলো পড়লেন। মন খারাপ ভাবটা আরেকটু গাঢ় হলো তার। কোথাও কি কোনো ভালো খবর নেই আজ? সবখানেই দেখা যাচ্ছে লোকজন অন্তর্কোন্দলেই ব্যস্ত। মানুষের ভেতরে কি বিন্দুমাত্র দেশপ্রেম আর রেস্পন্সিবিলিটি নাই?

কোনো জায়গায় পার্টির লোকে নিজের মানুষদেরই অন্য দলের বলে প্রচার করছে, কোথাও পার্টির লোকেরা মন্ত্রিসভার নামে কুৎসা রটাচ্ছে, কারো বিরুদ্ধে জোর গুজব সে পাকিস্তানিদের সাথে হাত মিলিয়েছে। অসহ্য! সবচেয়ে বড় সমস্যা টাকার। প্রতিদিন নতুন নতুন খাতে টাকার দরকার হচ্ছে কিন্তু সরকারের আয় সীমিত...

টাকার কথা মনে হতেই সন্ধ্যার উত্তেজিত কথোপকথনটা আরেকবার মেজাজ খারাপ করে দিল। বিরোধিতা নতুন নয় তাজউদ্দীনের কাছে, ক্যাবিনেট মিটিঙে তার মুখের ওপর কাগজ ছুড়ে মেরেছেন কোনো কোনো নেতা, এই অভিজ্ঞতাও আছে তার। তাই বলে টাকার জন্যে অল্প বয়েসি একটা ছেলে তাকে এরকম কথা শুনিয়ে যাবে, এটা খুব গায়ে লেগেছে তাজউদ্দীনের।

তাজউদ্দীন অফিসরুম থেকে বেরিয়ে থিয়েটার রোডের বারান্দায় দাঁড়ালেন। ঠান্ডা বাতাসে একটু দাঁড়ালে হয়তো মাথাটা হালকা হয়ে যাবে, কাজে যেহেতু মন বসছে না, অফিসে বসে থেকে ফায়দা নেই। বাইরে বাতাস আছে হালকা, কিন্তু খুব ঘাম হচ্ছে। তাজউদ্দীন বারান্দার একটা থামে হেলান দিয়ে চোখ দূরে ভাসিয়ে দিলেন।

ছাত্রনেতাদের অনিঃশেষ টাকা পয়সা দিয়ে যাওয়া সম্ভব না বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে। এ কারণে এসব নেতাদের অনেকেই তার ওপর খুশি নন, তাজউদ্দীন জানেন। তাতে অবশ্য তার কিছু যায় আসে না। একই সাথে সকলকে খুশি রাখতে পারে কেবল নির্বোধ আর কপটেরা। অন্তর্দ্বন্দ্ব নিয়ে যুদ্ধে নামলে

সাময়িক সাফল্য আসতে পারে, দীর্ঘমেয়াদে ক্ষতিটা কেবল বাংলাদেশেরই হবে। তাজউদ্দীন তাই শঙ্কিত ভবিষ্যৎ নিয়ে, কিন্তু তিনি নিরুপায়।

মোহাইমেন সাহেব এই ছাত্রনেতাদের সম্পর্কে আরো কিছু শুনিয়েছেন সন্ধ্যায়, তাতে তাজউদ্দীনের উদ্বেগ কেবল বেড়েছেই।

বেশ কিছু ছাত্রনেতা নাকি আস্তানা গেড়েছে শিয়ালদা আর হ্যারিসন রোডের হোটেলগুলোতে। মোহাইমেন সাহেবের ভাষ্য অনুসারে, নামকরা প্রত্যেক ছাত্রনেতার পেছনে ঘুরে বেড়াচ্ছে একাধিক মাড়োয়ারি ব্যবসায়ী। ছাত্রনেতাদের টাকার দরকার হলেই থলে বাড়িয়ে দিচ্ছে ওইসব বিজনেসম্যানেরা। অথচ পার্টির ছোটখাটো আরো কিছু নেতাও থাকেন সেসব হোটেলে, তাদের দিকে ফিরেও তাকান না ঐসব ব্যবসায়ী।

এই ব্যাপারটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ, তাজউদ্দীন ভাবেন। মাড়োয়ারিরা জাত ব্যবসায়ী, অকারণে অর্থব্যয়ের মতো নির্বুদ্ধিতা তাদের ধাতে নেই। তারা যা করছে, খুব সম্ভব সেটা ভবিষ্যতের এক ধরনের বিনিয়োগ। মুক্তিযুদ্ধ গতি পাচ্ছে, কখন তা শেষ হবে সেটা অনিশ্চিত হলেও বাংলাদেশের স্বাধীনতা এখন খুবই বাস্তব একটা সম্ভাবনা। সেই ক্ষেত্রে ওই ব্যবসায়ীরা সম্ভবত হাতে রাখতে চাচ্ছে ছাত্রনেতাদের। সামনের দিনের বাংলাদেশে একটা কেউকেটা হয়ে ওঠার লক্ষণ তাদের মাঝে এখন থেকেই দেখা যাচ্ছে কি না...

কী করা যায় এদের নিয়ে? ছাত্রনেতাদের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে চেষ্টার অন্ত নেই মন্ত্রিসভার বেশ কিছু সদস্যের, এমনকি তাদের হাতে রাখতে অকাতরে অর্থ বিলি করছেন কেউ কেউ, এমনটাও শোনা যাচ্ছে। কিন্তু তাজউদ্দীন তো সরকারি টাকার এরকম অপচয় করবেন না! তবে কি কেবল নিন্দামন্দ গালিগালাজ বদদোয়া সঙ্গী করতে হবে তাকে?

তাজউদ্দীন থাম থেকে সরে এসে রেলিঙে হাত রেখে ঝুঁকে দাঁড়ালেন। তার স্কুল জীবনে একটা ঘটনা ঘটেছিল। তিনি নিজে এখন সেই ঘটনা মনে করে খুব গর্বিত হন না, কিন্তু তার স্কুল জীবনের বন্ধুরা কেন জানি তাজউদ্দীনের স্পষ্টবাদিতার উদাহরণে সবসময়ে সে গল্পটিই টেনে আনেন।

ক্লাস এইট নাইনে তাজউদ্দীন পড়তেন ঢাকার মুসলিম বয়েজ গভর্মেন্ট স্কুলে, থাকতে হতো ডাফরিন মুসলিম হোস্টেলে। হোস্টেলের ছেলেদের একটা ফুটবল টিম ছিল, তাজউদ্দীন নিয়মিত জায়গা না পেলেও প্রায়ই খেলতে নামতেন সে দলের হয়ে। একবার হোস্টেলের ছেলেরা নিজেরা চাঁদা তুলে টুর্নামেন্টে দল নামাল, স্কুলের হয়ে খেলল না। চ্যাম্পিয়নের কাপও পেল হোস্টেলবাসীরাই।

হোস্টেল টিমের ক্যাপ্টেন ওয়াহিদুজ্জামান তাজউদ্দীনের রুমমেট। অঙ্কের শাহাবুদ্দিন স্যার ওয়াহিদকে ডেকে ভয় দেখিয়ে বললেন, 'তুমি তো স্কুলের স্যারদের কথা শুনো না, স্কুলের টিমে না খেলে তুমি হোস্টেলে খেললা! আমাদের

বদদোয়া নিয়ে তোমার কী লাভ হইলো? সামনে ম্যাট্রিক, স্যারের বদদোয়া পাইলে কী হবে বুঝো না? ভালো চাও তো কাপ সারেন্ডার করো।'

ওয়াহিদ বদদোয়ার ভয়ে কাপ ফিরিয়ে দিল।

অথচ পরের দিন ক্লাসে তাজউদ্দীন মানতেই চাইল না শিক্ষকের কথা। 'স্যার, হোস্টেলে মাত্র তিরিশ-চল্লিশটা ছেলে। ওদের দেখারও কেউ নাই। আবার স্কুল থেকেও বলা হয় নাই যে হোস্টেলের ছেলেরা আলাদা দল দিতে পারবে না। আপনারা স্কুলের এত ছেলে নিয়েও যেখানে কাপ জিততে পারলেন না, সেখানে কাপ সারেন্ডার করানোটা ঠিক হয় নাই।'

তর্ক চলে। যুক্তিতে হটে গিয়ে এক পর্যায়ে স্যার রেগে গিয়ে বলেন, 'আমি হেডমাস্টার হলে ওদের স্কুল থেকে বের করে দিতাম।'

তাজউদ্দীন তখন আরো স্পষ্টভাষী। 'এই জন্যেই তো আপনার মতো লোক হেডমাস্টার হন নাই!'

বিষয়টা গড়িয়েছিল বহুদূর। তাজউদ্দীন ক্লাস টেনের শুরুতে সেই স্কুল ছেড়ে দিয়েছিলেন। ওয়াহিদকে অভয় দিয়ে বলেছিলেন, 'এসব ফালতু লোকের বদদোয়া কখনো কাজে আসে না, ভয় পেয়ো না।'

থিয়েটার রোডের বারান্দায় দাঁড়িয়ে তাজউদ্দীনের মনে হয়, এই মুহূর্তে তার পাশেও অভয় দেয়ার মতো কাউকে বড় দরকার ছিল। তাজউদ্দীন এখন নিন্দিত, তাজউদ্দীন এখন অবজ্ঞাত। বেশুমার বদদোয়া তাকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে নিয়ত।

তাজউদ্দীন রেলিংগুলোতে খানিক চাপ দিয়ে দেখেন। সেগুলো নড়বড়ে, একটু চাপেই মচমচ করে। অথচ যুদ্ধের বারান্দায় ভর দিয়ে দাঁড়াবার মতো কিছু অবলম্বন, এ মুহূর্তে প্রধানমন্ত্রীর বড় দরকার ছিল।

খালেদের হাসি

গতরাতে ঘুম হয়নি। গুমোট গরমটাতো ছিলই, সাথে বাড়তি হিসেবে ছিল টরে টক্কার আওয়াজ। মোর্স কোডের র‍্যাট-ট্যা-ট্যাট-ট্যাট শব্দ। তারেকুল আলমদের তাঁবু থেকে অল্প দূরেই সিগনাল কোম্পানির জায়গাটা আলাদা করা। প্রবেশাধিকার সংরক্ষিত সেখানে। এমনকি অফিসারদেরও খুব বেশি ঢুকতে দেখা যায় না সিগনাল কোম্পানির এলাকায়।

জায়গাটার নাম মেলাঘর। মাসখানেক হলো, সেক্টর টুয়ের হেড কোয়ার্টার মতিনগর থেকে সরিয়ে আনা হয়েছে এই পাহাড়ি টিলাগুলোর মাঝে। ভ্যাপসা গরম আর যখন তখন বৃষ্টি মেলাঘরের বৈশিষ্ট্য।

খাওয়া দাওয়ার কষ্টটা অবশ্য ভোগায় সবচেয়ে বেশি। সকালে নাশতা দেয়া হয় রুটি আর ডাল। দুপুর-রাতে ভাত-ডাল। আর ডালের যে কী অবস্থা! রুমী

তো নামই দিয়ে দিয়েছে ঘোড়ার ডাল! অবশ্য আশপাশে প্রচুর কাঁঠাল গাছ আছে। সিরাজ, বকুল, ইফতেখার, এরা তো আজকাল অসময়ে খিদে পেলেই উঠে পড়ে গাছগুলোতে।

অবশ্য ওরা যে জায়গাটায় ক্যাম্প করে আছে, ঠিক তার বাইরে ছোটখাটো একটা বাজার বসে গেছে এখন। তেল, শাক-সবজি থেকে ফলমূল; অনেক কিছুই পাওয়া যায় সেই অস্থায়ী বাজারে। ক্যাম্প থেকে বাইরে বেরুতে চাইলে অনুমতি নিতে হয় দায়িত্বে থাকা সুবেদার মেজরের। হাজারো প্রশ্ন থাকে সেখানে। কেন যেতে চাও, কখন ফেরত আসবে, হ্যানোত্যানো। ছেলেরাও অবশ্য এখন চালাক হয়ে গেছে, কী জবাব দিলে দ্রুতই ছাড়পত্র মিলবে, সেটা বেশ বুঝে ফেলেছে ওরা।

গেরিলা যুদ্ধের কলাকৌশলও ছেলেরা শিখছে তাড়াতাড়িই। ক্যাপ্টেন হায়দার এখন আর শুধু ওদের ওস্তাদ নন শুধু, সাথে ছেলেদের বড় ভাইয়ের দায়িত্বটাও বুঝে নিয়েছেন। সবার আগে সবার ভালো মন্দের খবর নিতে এগিয়ে যান হায়দার। মেজর খালেদ মোশাররফের যোগ্য জুড়ি এই ক্যাপ্টেন। এই মেলাঘরেও রোজ রাতে ঘুমোতে যাবার আগে বই পড়তে ভালোবাসেন অদ্ভুত মানুষটা। চে গুয়েভারার 'ডাক দিয়ে যাই' বইখানা প্রায়ই দেখা যায় তার হাতে। চে'র বক্স অ্যামবুশের সাথে মাও সেতুং-এর গেরিলা নীতিও ক্ষণে ক্ষণে ওদের মনে করিয়ে দেন হায়দার।

'মনে রাখবা, শত্রু যখন পালাচ্ছে সেই সময় তাকে আক্রমণ করতে হয়, ধ্বংস করতে হয় তার আত্মবিশ্বাস। আর শত্রু যখন তোমাকে খুঁজছে, তুমি তখন পালাবা, তাকে ক্লান্ত করবা। আবার আক্রমণে যাবা তার বিশ্রামের সময়, কিছুতেই সে যেন বিশ্রাম নিতে না পারে।'

রেকি, অ্যামবুশ, রেইড, তারেকুল আলমদের নানা কিছুর শিক্ষক ক্যাপ্টেন হায়দার। মেজাজ প্রসন্ন থাকলে নিজের কমান্ডো ট্রেনিং নিয়েও ওদের গল্প শোনান তিনি। 'বুঝলা, আমার তো ট্রেনিং হইছিল তোমার চীনে। চীনা জঙ্গলের ভেতরে একটা বেয়নেট হাতে দিয়া শুধু ছাইড়া দিছিল। ঐ নিয়াই টিক্যা থাকতে হইবো ছয়দিন। ঐ বেয়নেট দিয়াই সাপ-ব্যাঙ কত্ত কিছু মাইরা খাইলাম!'

আপাতত এই সব চিন্তা থামিয়ে তারেকুল আলম মনোযোগ দেয় খালেদ মোশাররফের মার্কারে। এই মুহূর্তে সে আছে সেক্টর কমান্ডারের ঘরে। মেজর খালেদের সাথে ঘরে আরো আছেন মেজর মতিন আর ক্যাপ্টেন হায়দার। আলোচনা করতে করতে টেবিলে বিছানো ম্যাপের উপর মার্কার দিয়ে কী যেন আঁকিবুকি করছেন খালেদ। তাকে কেন ডাকা হয়েছে সেটা তারেকুল আলম জানে না। বোধহয় পরে তাকে কোনো কাজের জন্যে ব্রিফ করা হবে। পা মচকে যাওয়ায় হাবিবুল আলমদের সাথে ইন্টারকন্টিনেন্টালের অপারেশনে যেতে পারেনি

সে। তবে সেরে যাবার পরে প্রায়ই তাকে ঢাকায় যেতে হয়েছে। ছদ্মবেশে ঢাকার রাস্তায় ঘোরাঘুরিতে বেশ পারদর্শিতা দেখিয়েছে তারেকুল আলম, আলতাফ মাহমুদসহ বেশ কিছু মানুষের সাথে এদিকের যোগাযোগও ঘটিয়ে দিয়েছে সে।

মেজরদের আলোচনা শেষ হবার আগেই বেজে উঠল টেলিফোন। খালেদ ফোন ধরলেন। কয়েক সেকেন্ড পরেই তার কপালে বিরক্তির ভাঁজ পড়ল। 'চোখ বেঁধে রেখে দাও সবাইকে, আমি আসছি।'

ফোন নামিয়ে খালেদ মোশাররফ আগে বিদায় দিলেন মেজর মতিন আর ক্যাপ্টেন হায়দারকে। তারপর তারেকুল আলমের দিকে ফিরে বললেন, 'আসো তো, গাড়িতে ওঠো। দুনিয়ার যত আজেবাজে ঝামেলা এসে হাজির হয় এই মেলাঘরে!'

এম-৩৮ খোলা জিপে উঠবার আগে খালেদ মোশাররফ সাথে ডেকে নিলেন কামরুল হাসান ভূঁইয়াকেও। ক্যাপ্টেন গাফফারের সাব-সেক্টর সদর কোনাবনে যাবেন নাকি তিনি।

'কী হইসে জানেন নাকি?' ফিসফিস করে তারেকুল আলম প্রশ্ন করে কামরুল হাসান ভূঁইয়াকে।

'আর বইলো না। বাচ্চা পোলাপাইনের কাজকারবার আর কী। ক্যাম্পে ঢুকতে চাইছে একদল বাচ্চা। দশ-পনেরো বছর বয়েস হবে ম্যাক্সিমাম। ক্যাম্পের গেটের আরপির হাবিলদার আটকাইছে ওদের। ওরা নাকি রেগে গিয়ে হাবিলদারের সাথে ঝগড়া শুরু করে দিছে। হাবিলদার নাকি স্যারের কথা মতো এখন চোখ বাইন্ধে আটকায়া রাখসে ওদেরকে। শুধু শুধু স্যারের জার্নির আগে একটা বাজে ঝামেলা!'

আরপি চেকপোস্ট পেরিয়ে পনেরো বিশ গজ যাবার পরেই খালেদ মোশাররফের নির্দেশে থেমে গেল এম-৩৮। তারেকুল আলম দেখতে পেল, মেজরের দৃষ্টি তারই সাথে চোখ বেঁধে দাঁড় করিয়ে রাখা আট-নয়জন কিশোরের দিকে। বয়েস পনেরো পেরিয়েছে কি পেরোয়নি।

খালেদ মোশাররফের নির্দেশে সরানো হলো ওদের চোখের বাঁধন। চোখ কচলে কিশোরেরা ভালো মতো চাইল ওদের সামনে দাঁড়ানো মানুষটার দিকে। তাদের মুখে বিস্ময় আর ঔদ্ধত্য সমানে সমান।

'কী চাই এইখানে?' ট্রেডমার্ক রুক্ষ স্বরে প্রশ্ন করলেন সেক্টর কমান্ডার। 'এইটা কী খেলার মাঠ, বেড়াতে আসার জায়গা?'

ছেলেরা একে অন্যের দিকে চাইল কিছুক্ষণ। তারপর সাহস করে এক পা এগিয়ে এল একজন। 'আমরা যুদ্ধ করতে আসছি। আমাদের আপনার ক্যাম্পে ভর্তি করে নেন।'

'শাটাপ!' আকাশ কাঁপিয়ে ধমক দিলেন খালেদ মোশাররফ। তারেকুল আলম নিজেই চুপসে গেল এই হুঙ্কারে। 'ফাজলামি? যুদ্ধটাকে খেলা মনে করো নাকি তোমরা? এইটা ফুটবল খেলা? ...ভাগো, ভাগো এইখান থেকে। বাসায় যাও। যুদ্ধ সবার জন্যে না।'

ছেলেদের কিছুক্ষণের জন্যে বিভ্রান্ত দেখাল। এরপরেই সবচাইতে ছোটখাটো ছেলেটা চ্যাঁচিয়ে উঠল গলার রগ ফুলিয়ে। 'বাসায় যাবো কেন? আপনার ক্যাম্পে না নিলে না নিবেন, বাসায় যেতে বলেন ক্যান? আপনাদের সাথে যুদ্ধ করতে না দিলে অন্য জায়গায় গিয়ে যুদ্ধ করবো। আপনি আমাদের ফিরায়ে দেয়ার কে? বাংলাদেশ কি আপনার একার?'

খালেদ মোশাররফ কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলেন ছেলেটির দিকে। আর তারপরেই, তারপরেই পালটে গেল তার মুখের ভাব। কঠোরতাকে সরিয়ে দিয়ে সেখানে জায়গা করে নিল স্নিগ্ধতা। হাসিতে ফেটে পড়লেন সেক্টর কমান্ডার। প্রথমে মুচকি হাসি। ধীরে ধীরে সেটা রূপ নিল অট্টহাসিতে।

খালেদ মোশাররফ হাসছেন!

এইসব কিশোরদের দিকে চেয়ে অসহ্য ভালো লাগায় ভিজতে ভিজতে তারেকুল আলম অনুভব করে, খালেদের এই হাসির অর্থ অন্যরকম। এই হাসি পরিহাসের নয়, ব্যঙ্গের নয়। বরং এই হাসি আত্মবিশ্বাসের। এই হাসি এমন এক সেনাপতির, যিনি জানেন যুদ্ধে জয় তার অনিবার্য।

ফ্রেন্ড উইথ স্যাডনেস ইন হিজ আইজ

'আমরা কোনো রাজনৈতিক বার্তা প্রচার করতে এখানে আসিনি,' সারি বাঁধা অগণিত মানুষের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকা রবিশঙ্কর মাইক্রোফোনের সামনে বললেন। 'আমরা শিল্পী। আমরা কেবল চাই, সংগীতের ভাষা দিয়ে আপনাদের জানান দিতে বাংলাদেশের মানুষ এখন দিন কাটাচ্ছে কেমন তীব্র বেদনায়।' দর্শকেরা নীরব থাকে, কোনো শব্দ করে না।

সেতারে আলতো হাত বুলিয়ে রবিশঙ্কর আরেকবার ওই উৎসুক চোখগুলোর দিকে তাকান। সমবেত দর্শকদের একটা বেশ বড় অংশই বয়েসে তরুণ। গলা পরিষ্কার করে পণ্ডিত রবিশঙ্কর আরো একবার মুখ খুলেন, 'দেখতে পাচ্ছি, তারুণ্যের উৎসাহই আপনাদের বেশিরভাগকে আজ নিয়ে এসেছে এই আয়োজনে। আপনাদের সবাইকে সবিনয়ে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, আমি নিজে প্রাচ্যের মানুষ। আমাদের ভারতবর্ষের ধ্রুপদী সংগীত আপনাদের পাশ্চাত্যের রক সংগীতের চাইতে অনেক বেশি গম্ভীর। সেই তফাৎ মাথায় রেখে আমাদের পরিবেশনা আপনাদের খারাপ লাগলে, নিজ গুণে ক্ষমা করে দেবেন।'

পণ্ডিতের বক্তব্যের অর্থ বুঝতে একটু সময় নিল শ্রোতারা, তারপর তুমুল হাততালিতে জীবন্ত হয়ে উঠল নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কোয়ার। অথচ রবিশঙ্কর সেতারে টান দিতেই অলৌকিক মিরাকলে চুপ হয়ে গেল সে উদ্যান। আলী আকবর খাঁর সরোদ আর আল্লা রাখার তবলা যোগ দিল রবিশঙ্করের হাতের যন্ত্রটির সাথে। বড় মৃদু অথচ আরো করুণ এক অনুভূতিতে ছেয়ে গেল শ্রোতাদের হৃদয়।

মিনিট তিনেক পর পণ্ডিতেরা থামতেই আবার হাততালি। দর্শকেরা গভীর আগ্রহে গ্রহণ করেছে এই নতুন ধাঁচের সংগীতকে। সহাস্যে রবিশঙ্কর শ্রোতাদের উদ্দেশে বললেন, 'ইফ ইউ অ্যাপ্রিশিয়েট দা টিউনিং সো মাচ, আই হোপ ইউ উইল এনজয় দা প্লেয়িং মোর!'

এরপরে শুরু হয়ে গেল ইতিহাস লেখা সেই কনসার্টের মূল পর্ব।

রবিশঙ্কর-আলী আকবর খান-আল্লা রাখাদের সাথে সুর মেলাল কমলা চক্রবর্তীর তানপুরা। বেজে উঠল বাংলা ধুন। ম্যাডিসন স্কোয়ার হয়ে গেল বাংলার সবুজ গ্রামের বিস্তীর্ণ প্রান্তরের একটি অংশ। বাংলার লোকসংগীতের সারল্য আর মূর্ছনায় মোহিত নিউইয়র্কবাসী যুগপৎ শোনে ও দেখে, সেতার সরোদ তবলা তানপুরায় কীভাবে বহুদূরের একটি মানচিত্র জীবিত হয়ে উঠে এসেছে তাদের সামনে। সংগীত ঈশ্বরের ভাষা, আরো একবার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পায় তারা।

আর বাংলার বিস্তীর্ণ পথে হাঁটতে হাঁটতে ব্যাকস্টেজে বসা জর্জ হ্যারিসনের মনে পড়ে পণ্ডিত রবিশঙ্করের সাথে তার সেই কথোপকথন।

রবিকে খুব মনমরা দেখাচ্ছিলো সেদিন, কারণ জানতে চাইলে সে বলেছিল বাংলাদেশের গণহত্যার খবরটা। জর্জ হ্যারিসনের মনে হয়েছিল, শিল্পী হিসেবেই ঐ মানুষদের সাহায্য করা উচিত তার। রবিকে সেই প্রস্তাবটাই দেয় সে।

'হ্যাঁ, ২৫-৩০ হাজার ডলার তো আমরা রিলিফ ফান্ডে পাঠাতেই পারি... কিন্তু ঠিক ওরকম কিছু না।' জর্জ হ্যারিসনের কথা শুনে বলেছিল রবিশঙ্কর। 'আমাদের মনে হয় আরো কিছু করার আছে। যদি অনেক শ্রোতাকে গান দিয়ে বাংলাদেশের অবস্থাটা জানিয়ে দেয়া যায়, মানে একটা সচেতনতা তৈরি আর কী, তাহলে মনে হয় একটা কাজের মতো কাজ হবে।'

এরপর চটজলদি শুরু হয়ে গেল সব কাজ। আবেগের বশেই গত কয়েকটা সপ্তাহ উন্মাদের মতো কাজ করে গেছেন তারা, মনে পড়ে জর্জ হ্যারিসনের। দ্য সাইলেন্ট বিটলস ডাকনামেই খ্যাত জর্জ হ্যারিসন ফোন করে করে আজকের আয়োজনের জন্যে ডেকে এনেছেন তার পরিচিত শিল্পীদের।

বিশাল এই আয়োজন সাড়া ফেলেছে দর্শক-শ্রোতাদের মাঝেও। টিকেট বিক্রি শুরু হবার আগেই তাদের ব্যগ্রতা ছিল দেখার মতো। আয়োজনের খরচ

বাদে কনসার্টের টিকেট, ফটো, ক্যাসেট সমস্ত কিছু থেকে প্রাপ্ত অর্থই চলে যাবে ইউনিসেফের বাংলাদেশ শরণার্থী তহবিলে।

শুধু দর্শক না, কনসার্টের বিশালতা চাপে ফেলে দিয়েছে শিল্পীদেরও। প্র্যাকটিস করতে গতকাল বব ডিলান যখন এসেছিলেন ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেনের স্টেজে, চারদিকের বিশাল সব ক্যামেরা আর মাইক্রোফোনের ভিড় দেখে ভড়কে গেছিলেন তিনিও। বলেছিলেন, 'কী বিশাল ব্যাপার হচ্ছে এখানে দেখো দেখি! এই মঞ্চে গান গাওয়া আমাকে দিয়ে হবে না!' বব ডিলান আজকেও এসেছেন, এবং তাকে ক্রমাগত ঘামতে দেখা যাচ্ছে!

জর্জ হ্যারিসন ব্যাকস্টেজে বসে হেসে ফেললেন। শুধু বব ডিলানের দোষ দিচ্ছেন কেন তিনি? খানিক আগে কনসার্ট শুরুর পূর্বেই তাকেও তো প্রশ্ন করেছে এক সাংবাদিক, 'জর্জ, অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ তো তুমিই। কেমন অনুভূতি তোমার, বলবে?'

'নার্ভাস!' রাখঢাক না করে একদম মনের কথাটাই বলে বসেছেন প্রাক্তন বিটলস।

জর্জ হ্যারিসনের অপেক্ষা পর্ব শেষ হয় একসময়। মঞ্চে উঠতে হয় তাকেও। হোয়াইল মাই গিটার জেন্টলি উইপস, গানটি দিয়ে জর্জ হারিসন শুরু করেন অনুষ্ঠানের পরের পর্ব। প্রাচ্যের পরে পাশ্চাত্যের গানে মেতে ওঠে দর্শকেরা। জর্জ হ্যারিসনের কণ্ঠের পূর্ণতা দিতে থাকে এরিক ক্ল্যাপটনের হাতের সেমি অ্যাকুস্টিক গিটারের পরাবাস্তব সুর। অথচ কেউ জানে না আসক্ত এরিক ক্ল্যাপটন শেষ মুহূর্তে মঞ্চে উঠেছেন ড্রাগের অভাবে অ্যালেন ক্লেইন হতে ধার করা আলসারের ওষুধ খেয়ে!

গান শুনিয়ে যান লিওন রাসেল, রিঙ্গো স্টারেরা। বব ডিলান দর্শকদের প্রশ্ন করে করে উত্তর উড়িয়ে দেন ব্লোয়িং ইন দ্য উইন্ড এর সাথে।

এবং অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে আবার মঞ্চে উঠে আসেন জর্জ হ্যারিসন। শেষ পর্বে তিনি গাইবেন শুধু এই অনুষ্ঠানের জন্যে লেখা একটি নতুন গান, বাংলাদেশ।

পুরো আয়োজন জুড়ে অনেকবার মুগ্ধ হওয়া দর্শকেরা আরো একবার নীরব হন ইতিহাসের সাক্ষী হতে। গতকাল পাওয়া লিওন রাসেলের পরামর্শে জর্জ হ্যারিসন গানের আগে দর্শকদের শুনিয়ে দেন ছোট্ট একটি ভূমিকা। এরপর শোনা যায় তার গান–

মাই ফ্রেন্ড কেম টু মি,
উইথ স্যাডনেস ইন হিজ আইজ,
টোল্ড মি হি ওয়ান্টেড হেল্প,
বিফোর হিজ কান্ট্রি ডাইজ...

জর্জ হ্যারিসনের মতো ভিনদেশি, ভিনভাষী এরকম আরো ফ্রেন্ডের অভাব হয়নি ১৯৭১'এ।

ফরাসি ঔপন্যাসিক প্রেসিডেন্ট গলের সংস্কৃতিমন্ত্রী, আঁদ্রে মালরো জানালেন, আহ্বান জানালে তিনিও প্রস্তুত বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অস্ত্র ধরতে।

সুদূর আর্জেন্টিনায় রবীন্দ্রনাথের পরিচিতা ভিক্তোরিয়া ওকাম্পো আর খ্যাতনামা লেখক লুই বোর্হেসেরা সরকারের কাছে স্মারকলিপি দিলেন পাকিস্তান জান্তার গণহত্যার প্রতিবাদে।

ব্রাসেলসের ফাইন আর্টস প্যালেস থেকে চুরি যাওয়া ভার্মিয়ারের 'দ্য লাভ লেটার' নামের অয়েল পেইন্টিংটির সাথেও জড়িয়ে গেল বাংলাদেশের নাম। চিত্রচোর জানালেন, ছবি ফিরিয়ে দেবেন তিনি বিনিময়ে কর্তৃপক্ষকে ৪০ লক্ষ ডলার জমা দিতে হবে বাঙালি শরণার্থীদের সাহায্যে। মারিও রামান্স নামের বেলজিয়ান এই রবিনহুডের মনেও ধান বুনে গিয়েছিল বাংলাদেশের প্রতি আবেগ।

বাংলাদেশ অভিশপ্ত। জন্মমুহূর্তেই শত্রুর অমানুষিক নিষ্ঠুরতায় ইয়াহিয়া খান আর ফরমান আলীর বেয়নেটে বারবার বিদ্ধ হয়েছে সে।

বাংলাদেশ ধন্য। তার জন্যে দু'চোখে স্যাডনেস নিয়ে মারিও রামান্স আর জর্জ হ্যারিসনেরা বারবার ছুটে গিয়েছেন মানুষের কাছে।

মোশতাকের মাকড়সা জাল

আমীর-উল ইসলাম বারান্দায় দাঁড়িয়ে কলকাতা দেখেন কিছুক্ষণ। তিনি এসেছেন খন্দকার মোশতাকের ফ্ল্যাটে, তবে বসার ঘরে এত বেশি মানুষ, আপাতত সেখানে বসে কাজের কথা বলা অসম্ভব। আমীর-উল ইসলাম তাই মোশতাক ভাইকে একবার দেখা দিয়েই চলে এসেছেন বারান্দার নিরিবিলিতে। ঠিক করেছেন লোকজন বিদায় না হলে আর ভেতরে যাবেন না।

বিশেষ সামরিক আদালতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার করা হবে নাকি দ্রুতই। ইয়াহিয়া খান বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে বলে বেশ কিছুদিন ধরেই বলে আসছিল এরকমটা, রেডিও পাকিস্তানে খবরটা নিশ্চিত করেছে দিন চারেক আগে। বিচার না হয়ে যে এটা প্রহসন হবে সেটা বুঝতে অবশ্য বাকি নেই কারুরই। মুজিবনগর সরকার কাজ করছে এই বিচারের বিপক্ষে বিদেশে জনমত গড়ে তোলার জন্যে। খন্দকার মোশতাকের বাসায় আমীর-উল ইসলামের আজকের আগমনও সেই কারণেই। যে কাজ নিয়ে এসেছেন, সেটা পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছাড়া সম্ভব নয়।

মোশতাক ভাইয়ের বসার ঘর ফাঁকা হয়ে গেল মিনিট বিশেক পর। আমীর-উল ইসলাম ভেতরে গিয়ে বসলেন।

'বলেন বলেন আমীর-উল ইসলাম সাহেব, কী এত জরুরি কাজ নিয়া আসছেন আপনি শুনি। আপনেরা তো আবার কাজের মানুষ। হে হে...', খন্দকার মোশতাকের কথার সুরে চিরকালীন বিনয়। আমীর-উল ইসলাম জবাবে সময় নষ্ট না করে সরাসরি কাজের কথায় যান।

'মোশতাক ভাই, আপনি তো শুনেছেন যে খুব তাড়াতাড়িই বঙ্গবন্ধুর বিচারের একটা প্রহসন করতে যাচ্ছে পাকিস্তান। তো আমরা বিভিন্ন জায়গায় চিঠিপত্র লিখছি এটা নিয়ে। জেনেভা কনভেনশন অনুযায়ী তো বঙ্গবন্ধুর বিচার করাটা বৈধ না। কোনো যুদ্ধকালীন অবস্থায় যারা সরাসরি লড়াই করছে, তাদের গ্রেফতার ও বিচারে তো জেনেভা কনভেনশনে নিষেধ আছে।'

আমীর-উল ইসলামের মনে হয় খন্দকার মোশতাক যেন ঈষৎ বিরক্ত এই কথোপকথনে। তাই বক্তব্য আরো সংক্ষিপ্ত করেন তিনি। 'তো আপনার কাছে যে জন্যে আসা মোশতাক ভাই, সেটা হলো শন ম্যাকব্রাইড আমাদের কর্মসূচির একটা লিগ্যাল ফরম্যাট দিয়েছেন, বলেছেন রেডক্রসের মাধ্যমে আমরা এই ব্যাপারে আন্তর্জাতিকভাবে আবেদন করতে পারি শেখ সাহেবের জন্যে। এখন আপনি যদি কাগজগুলো একটু দেখে দিতেন আরকি।'

খন্দকার মোশতাক নিরাসক্তভাবে কাগজগুলো হাতে নিলেন। আইরিশ মানবাধিকারকর্মী ম্যাকব্রাইডের নাম তিনি জানেন। শোনা যাচ্ছে যেকোনো সময় শান্তিতে নোবেল পেয়ে যেতে পারে ব্যাটা।

আমীর-উল ইসলাম এদিক সেদিক তাকিয়ে অপেক্ষা করতে থাকেন মোশতাক ভাইয়ের মতামতের জন্যে। মোশতাক কাগজপত্র নেড়েচেড়ে দেখেন, এরপর, হঠাৎ করেই আমীর-উল ইসলামকে চমকে দিয়ে এক অদ্ভুত মন্তব্য করে বসেন। 'ইউ মাস্ট ডিসাইড, হোয়েদার ইউ ওয়ান্ট শেখ মুজিব অর ইন্ডিপেন্ডেন্স। ইউ ক্যান নট হ্যাভ বোথ!'

আমীর-উল ইসলাম হতচকিত হয়ে যান মোশতাক ভাইয়ের এই নিরাবেগ মন্তব্যে। সেই ভাব কাটিয়ে ওঠা মাত্রই তড়িৎ জবাব দেন তিনি, 'বাট উই ওয়ান্ট বোথ! শেখ উইদাউট ইন্ডিপেন্ডেন্স অর ইন্ডিপেন্ডেন্স উইদাউট শেখ বোথ আর ইনকমপ্লিট!'

খন্দকার মোশতাক মুখে কোনো কথা বলেন না। কাঁধ ঝাঁকিয়ে কাগজগুলো আরেকটু দেখে নিয়ে ফেরত দেন আমীর-উল ইসলামকে। চা দেয়া হয়েছিল, তবে বিস্মিত আমীর-উল ইসলাম সেটায় চুমুক না দিয়েই বিদায় নেন মোশতাকের কাছ থেকে। তার মনে ঝড় তুলেছে মোশতাক ভাইয়ের মন্তব্য। যা শুনলেন, সেটা কি ঠিক শুনলেন? পররাষ্ট্রমন্ত্রীর গলায় এ কিসের আভাস?

...চিন্তার ঝড় চলেছে খন্দকার মোশতাকের মাথার ভেতরেও। চায়ের কাপ হাতে নিয়ে সোফায় শরীর এলিয়ে দেন তিনি। পুরো পরিস্থিতিটা একবার ভেবে দেখা দরকার।

পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পদে অসন্তুষ্ট মোশতাক চেলেছেন এক কূটচাল। জহিরুল কাইয়ুমকে দিয়ে কলকাতার আমেরিকান কনস্যুলেটের সাথে ইতোমধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করেছেন তিনি। মার্কিনদের জানান দেয়া গেছে, যদিও মুজিবনগর সরকারের মাথারা প্রায়ই বক্তব্য দিচ্ছে যে অখণ্ড পাকিস্তান কাঠামোতে আর ফিরে যাবে না বাঙালিরা; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অনেকেই মনে করেন রাজনীতিক সমাধান এখনো সম্ভব। আর মার্কিনরা ছাড়া পুরো দুনিয়ার জন্যে সর্বজনগ্রাহ্য রাজনৈতিক সমাধান আর কে দিতে পারে!

যদি শেখ মুজিব জীবিত থাকেন, তবে তাকে নিয়ে আলোচনায় বসলে এখনো সমঝোতার আশা করা যাবে, নইলে নয়, এই প্রস্তাব মোশতাকের। মোশতাক শুনেছেন দিল্লি কনস্যুলেট হয়ে নিক্সন আর কিসিঞ্জার পর্যন্ত পৌঁছে গেছে তার এই প্রস্তাব। দূতকে দিয়ে মোশতাক ইশারা দিয়ে রেখেছেন ভিসার জন্যে। তিনি একা নন, পররাষ্ট্র সচিব মাহবুবুল আলম চাষির জন্যেও ভিসা দরকার। জাতিসংঘের বার্ষিক অধিবেশনের ছুতোয় একবার আমেরিকায় পৌঁছতে পারলে মুখোমুখি আলোচনায় অনেকদূর এগিয়ে যাওয়া যায়!

নিউইয়র্কের কথায় মোশতাকের মনে পড়ে মইদুল হাসানকে। ব্যাটা তাজউদ্দীনের চামচা একেবারে! ভারত আর সোভিয়েত ইউনিয়নের মৈত্রী চুক্তি হওয়ার পরদিনই সে এসেছিল এক ফ্রন্ট গঠনের প্রস্তাব নিয়ে। মস্কোপন্থি দুই দলসহ স্বাধীনতাকামী সব দলকে নিয়ে সেরকম এক ফ্রন্ট বানানো গেলে সেটা নাকি রাশিয়ানদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা বাড়ায়। হ্যাঁ-না করে মোশতাক একরকম বিদায় করেছেন মইদুল হাসানকে।

চায়ের কাপে শেষ একটা চুমুক দিয়ে মোশতাক অনুধাবন করেন, ভারত-সোভিয়েত চুক্তি হয়ে দাবার বোর্ডে ব্যস্ততা বেড়ে গেছে সবারই। যুদ্ধে সোভিয়েতরা এখন সাহায্য করার একটা প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি পেয়েছে। ভারতেরও যুদ্ধে সাহায্য করার ক্ষেত্রটা বেড়ে গেছে বহুগুণ। সীমান্তের ক্যাম্পে ক্যাম্পে এতদিন বহু তরুণ ভিড় জমিয়েছে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে, এখন বেড়ে গেছে তাদের ট্রেনিং-এর আয়োজন। মুজিবনগর সরকার বহু বিরুদ্ধস্রোত ঠেলে এখনো ঠিক পথেই আছে।

খন্দকার মোশতাক তবু জাল বিছিয়ে যাচ্ছেন। তিনি জাত রাজনীতিবিদ। জানেন, শুধু জাল ছিন্ন করাই নেতার কাজ নয়। রাজনীতিতে মাঝে মাঝে শিকারের জন্যেও জাল বিছাতে হয়।

অদ্ভুত এক প্রধানমন্ত্রী

রিমির আজকে জন্মদিন। সকাল বেলা তার ঘুম ভেঙেছে আম্মার চুমুসহ 'হ্যাপি বার্থডে রিমি' ডাকে। রিমি এমন ভাব দেখাল যেন তার মনেই ছিল না জন্মদিনের কথা। আসলে রিমি কিন্তু কালকে থেকেই অপেক্ষা করে ছিল, পরীক্ষা করে দেখছিল আসলে ওর জন্মদিনের কথা কে কে মনে রেখেছে!

এই জন্মদিনটা অন্যরকম। দেশের ভেতরে যুদ্ধ হচ্ছে, কখন কী হয় কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই, এর মাঝে উৎসব করা সাজে না। ছোট হলেও রিমি এইটুকু বোঝে। তারপরেও গতকাল থেকে রিমি অপেক্ষা করছিল এই দিনের জন্যে। আজকে যে ওদের আব্বুর সাথে দেখা করতে যাবার কথা! জীবনের প্রথম তিন বছরের কথা রিমির মনে পড়ে না, কিন্তু এরপরের আর কোনো জন্মদিনেই রিমি আব্বুর দেখা পায়নি। আব্বুর সাথে দেখা হবে ভাবতেই রিমির কেন যেন ভালো লাগে।

গতকাল রিমিদের কলকাতার বাসায় কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা এসেছিলেন। তাদের মুখেই রিমিরা শুনেছে, আব্বু নাকি অসুস্থ। এমনিতেই আব্বুর ডায়াবেটিস আছে, কিন্তু অফিসের কাজে নাকি আব্বু খাওয়া বিশ্রাম কোনোটাই নিয়ম মেনে করেন না আজকাল। আম্মা তাই খাবার টেবিলে গতকাল ঘোষণাই দিয়ে দিল, আজকে আব্বুকে দেখতে সবাই থিয়েটার রোডে যাবে।

রিমি আজ প্রথম এসেছে থিয়েটার রোডে। সাথে আম্মা, রিপি, রতন ভাই আর বদরুননেসা খালাও এসেছেন। ট্যাক্সি থেকে নেমে বাড়ির ভেতরে ঢুকেই রিমির মনে হয়, এটাই তাহলে সেই থিয়েটার রোড, সবার মুখে মুখে এর কথাই শুনি তাহলে!

বাড়ির ভেতরে ঢুকে একটু হেঁটে বাম দিকে আব্বুর অফিস। রিমিরা সে ঘরের সামনে আসতেই বাইরে বসে থাকা লোকটা চিনে ফেলল আম্মাকে। 'ম্যাডাম স্লামালেকুম! আমি মতিউর রহমান, স্যারের এখনকার পিএস। কোনো খবর না দিয়ে এভাবে হঠাৎ চলে আসলেন?'

আম্মা সালামের জবাব দিলেন। তারপর বললেন, 'ফারুক আজিজ সাহেব কোথায় গেলেন? উনিই তো পিএস ছিলেন শুনেছিলাম?'

মতিউর রহমান সাহেব মাথা নাড়েন। 'ঠিকই শুনেছিলেন ম্যাডাম। ফারুক আজিজ সাহেব হঠাৎ করেই আসলে অসুস্থ হয়ে গেছেন। আমাকেই তাই এখন স্যারের পিএসের দায়িত্বটা পালন করতে হচ্ছে।'

'আব্বুরও নাকি অসুখ? আমরা আব্বুর সাথে দেখা করতে এসেছি।' রিমি চটপট উত্তর দেয়।

'তুমি বুঝি স্যারের মেয়ে?' মতিউর রহমান আদর করে রিমির গাল টেনে দেন। কিন্তু এরপর তার গলায় অস্বস্তির আভাস। 'ইয়ে, স্যারের সাথে দেখা

করবেন? মানে স্যারের ডায়াবেটিসটা একটু বেড়েছে কিন্তু। ডাক্তার তাই আসলে বারণ করেছেন...'

ঘরে উপস্থিত আরেকজন লোক, রিমির ওনাকে দেখে ডাক্তার বলেই মনে হলো, এগিয়ে এসে বাঁচালেন মতিউর রহমান সাহেবকে। 'না না, এখন তো তাজউদ্দীন সাহেবের সাথে কারো দেখা করা চলবে না। তাঁর কাছ থেকে কাজ পেতে হলে তাকে বিশ্রাম নেবার সময় তো দিতেই হবে।'

মতিউর রহমান সাহেব নিচু গলায় ডাক্তারকে কী যেন বললেন। রিমির মনে হলো, ওরা যে বাইরের কেউ নয়, সেই কথাটাই বুঝি ডাক্তার কাকুকে জানিয়ে দিলেন মতিউর রহমান।

আম্মাও কথা বলে উঠলেন, 'বেশি সময় তো আমরা নেবো না ভাই। সামান্য একটু কথা বলেই আমরা চলে যাবো। বাচ্চারা দেখতে এসেছে, বোঝেনই তো...'

ডাক্তার ভদ্রলোকটি বললেন, 'আচ্ছা, যান ভেতরে। তাড়াতাড়ি কথা সারবেন। কী জানেন, তাজউদ্দীন সাহেব আসলে একটুও বিশ্রাম নেন না। বুকে একটা ফোঁড়া উঠেছে কয়দিন আগে। খুব মারাত্মক অবস্থা সেটার। জ্বরও এসেছে। কিন্তু তিনি সারাদিনই ফাইলপত্র নিয়ে কাজ করেন। এজন্যেই দেখা করতে নিষেধ করেছিলাম।'

রিমিরা ঘরে ঢুকে পড়ে দল বেঁধে। কিন্তু সে ঘর ফাঁকা!

আব্বু গেল কোথায়? রিমিরা খেয়াল করে আব্বুর অফিসের সাথে লাগোয়া তাঁর শোবার ঘর। শোবার ঘরে গিয়ে দেখা যায় একটা সিঙ্গেল খাট আর একটা টেবিল আছে সেখানে। টেবিলটা কাগজ আর ফাইলে ভরপুর হয়ে আছে, আর অ্যাটাচড বাথরুমের আধাখোলা দরজার ভেতর থেকে ভেসে আসছে পানির শব্দ।

আম্মা সে দরজায় কড়া নাড়তেই ভেতর থেকে আব্বুর মুখ উঁকি দিল। এক মুহূর্ত পরেই সেই মুখ ভরে গেল হাসিতে। 'ও, তোমরা এসেছো? বসো, একটু বসো।'

পুরো দরজাটা হাট করে খুলে দিলেন তাজউদ্দীন। দেখা গেল, ছোট্ট একটা জলচৌকিতে বসে কাপড় ধোবার আয়োজন করছেন তিনি। রিমিদের দিকে তাকিয়ে একগাল হেসে তাজউদ্দীন বললেন, 'কালকে একজন বিদেশি গেস্টের সাথে ফিল্ডে যেতে হবে বুঝলা। শার্টটা ময়লা হয়ে গেছিল। জ্বরের সুযোগে এটা ধুয়ে ফেললাম, রাতের মাঝে শুকায়ে যাবে।'

রিমিদের বিস্ময়ের সীমা থাকে না। এত ফাইলপত্রের মাঝেও আব্বু এখানে কাপড় ধোবার সময় পান!

মতিউর রহমান ওদিকে বাইরের ঘর থেকে রিমিদের চোখ বড় হয়ে যাওয়া দেখে মিটিমিটি হাসেন। কিছুদিন আগে তারও এরকম এক চমকে দেয়া অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে।

তাজউদ্দীন সাহেবের খাবার এতদিন আসত বিএসএফের মেস থেকেই। কিন্তু ডায়াবেটিসের সমস্যাটা বেড়ে যাবার পর স্যার নিজেই একদিন তাকে অনুরোধ করেছেন একজন রান্নার লোক যোগাড় করে দিতে। মেহেরপুরে যে মকফুর মিয়া তার অর্ডারলি হিসেবে কাজ করত, তাকে মতিউর রহমান এখানেও সাথে রেখেছিলেন। সেই মকফুর মিয়াকেই মতিউর রহমান লাগিয়ে দিলেন তাজউদ্দীন স্যারের রান্নার কাজে।

সেই সকালে প্রতিদিনের রুটিনমতো প্রধানমন্ত্রীর ডেস্ক ক্যালেন্ডারে তার অ্যাপয়েন্টমেন্টগুলোর তালিকা দেখতে অফিসে ঢুকেছিলেন মতিউর রহমান। দেখেন, প্রধানমন্ত্রী নেই। শোবার ঘরে উঁকি দিয়েও অবাক হলেন মতিউর রহমান, তাজউদ্দীন স্যারকে দেখা যাচ্ছে না সেখানেও। মতিউর রহমান চিন্তিত হয়ে পড়লেন, একটু একটু ভয়ও লাগছিল তার স্যারের আবার কী হলো!

হয়তো অর্ডারলি বলতে পারবে স্যার কোথায় মকফুর মিয়াকেই তাই জিজ্ঞাসা করে দেখা যাক, এই ভেবে মূল বাড়ির বাইরে আউট হাউসের দিকে রওয়ানা দিয়েছিলেন মতিউর রহমান। মকফুর রাতে ওখানেই থাকে।

মকফুরের ঘরে ঢুকেই চমকে যান মতিউর রহমান। তাজউদ্দীন সাহেব মকফুরের বিছানায় বসে আছেন, মকফুরের মাথায় পানি ঢেলে দিচ্ছেন!

তাজউদ্দীন মতিউর রহমানকে দেখে কেমন যেন থতমত খেয়ে গিয়েছিলেন। একান্ত সচিবের বিস্মিত দৃষ্টির সামনে উঠে দাঁড়িয়েও কেমন যেন অপ্রস্তুত দেখাচ্ছিলো তাকে। 'ইয়ে, মতিউর রহমান সাহেব, সকালে মকফুর মিয়া আমার কাছে আসতে দেরি করছিল। ওর খোঁজ নেবার জন্যে এখানে এসে দেখি বেচারার জ্বর এসেছে। ওর গা এখনো অনেক গরম, আমি তাই মাথায় একটু পানি ঢেলে দিচ্ছিলাম। একটা ডাক্তার-টাক্তার কিছু ডাকা দরকার।'

তাজউদ্দীন স্যারকে সেদিন অফিসে পাঠিয়েই মতিউর রহমান মকফুরের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিলেন। আর তার নিজের মনে চলছিল নানা অনুভূতির উথালপাথাল। বিস্ময়ের চেয়ে অবশ্য খুশির পরিমাণটাই বেশি ছিল সেখানে।

ক্যাবিনেট মিটিং-এর প্রশাসনিক সভায় চিরব্যস্ত মানুষটি, যিনি স্বাধীনতার দাপ্তরিক ইতিহাস ফাইলপত্রে ধরে রাখছেন ঝকঝকে এক হাতের লেখায়, সেই হাতেই তিনি আবার অসুস্থ পিয়নকে শুশ্রূষা করছেন অফিস বিস্মৃত হয়ে। এমন অদ্ভুত এক প্রধানমন্ত্রীর কথা কেউ আগে শুনেছে কখনো!

টেক অফের জন্যে মূল রানওয়েতে যাবার আগে শ দুই গজের একফালি জায়গা পেরিয়ে যেতে হয়। ছোট্ট একটা টিলা কন্ট্রোল টাওয়ারের দৃষ্টিসীমার আড়ালে রেখেছে এই অংশটুকু। টি-৩৩ বিমানের ভেতরের পাইলট অফিসার রশীদ মিনহাজ এখান থেকেই কন্ট্রোল টাওয়ারের কাছে দ্বিতীয়বারের মতো ওড়ার অনুমতি চাইল।

কন্ট্রোল টাওয়ার একসময় ক্লিয়ারেন্স দিল রশীদ মিনহাজকে, টি-৩৩ ধীরস্থির ট্যাক্সিইং করে এগিয়ে গেল রানওয়ে বরাবর এবং ঠিক এই সময়, রশীদ মিনহাজের চোখ গেল তার ফ্লাইটের পেছন দিকে। লালরঙা ওপেল ক্যাডেট গাড়িতে বসে টি-৩৩কে ধাওয়া করে আসা সেফটি অফিসারকে চিনতে ভুল হয় না তার। এই বাঙালি অফিসার তো মাস তিনেক আগে তার ফ্লাইট ইন্সট্রাকটর ছিলেন, এখন আছেন গ্রাউন্ড ডিউটিতে। গত মাসে পিআইএ'র একটা বিমান ছিনতাই হবার গুজব শোনার পর থেকেই সব বাঙালিদের গ্রাউন্ডে রাখা হয়েছে, রশীদের মনে পড়ে।

সেফটি অফিসারের ওপেল ক্যাডেট রীতিমতো হলিউডি সিনেমার মতো রশীদের বিমানকে ছাড়িয়ে একটা ইউ-টার্ন নিল। রশীদ মিনহাজ লক্ষ করে, সেফটি অফিসার হাত দিয়ে তাকে নির্দেশ করছেন বিমানের লেজের দিকটায়। কোনো গোলমাল আছে নিশ্চয়ই! রশীদ মিনহাজ বিমানের গতি কমিয়ে আনে।

বাঙালি সেফটি অফিসার গাড়ি থেকে নেমে লাফ দিয়ে ওঠেন বিমানের পাখায়। রশীদ মিনহাজ তার ককপিটের উপরের স্বচ্ছ আবরণটা সরিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে সেফটি অফিসার কী বলবেন তা শুনতে। সেফটি অফিসার মুখ বাড়িয়ে কিছু বলতে যান রশীদ মিনহাজকে, এবং পরমুহূর্তেই....

টি-৩৩ এর পেছনের সিটে লাফিয়ে পড়ে সেফটি অফিসার জাপটে ধরেন রশীদ মিনহাজকে। রেডিওর তার ধরে টান দেন, ঝটকা মারেন অক্সিজেন লাইনেও।

২০ আগস্ট, বেলা ১১টা ৩০ মিনিটে করাচির মসরুর বিমান ঘাঁটির রানওয়েতে ট্যাক্সিইং করে যখন ব্লু বার্ড নামের টি-৩৩ বিমানটি মাটি ছেড়েছে, কন্ট্রোল টাওয়ার তখন ইথারে শুনতে পেল পাইলট অফিসার রশীদ মিনহাজের হতচকিত কণ্ঠ, 'অ্যালার্ট! টি-বার্ডকে হাইজ্যাক করা হচ্ছে!'

বাঙালি সেফটি অফিসারটি তখন প্রবল হাতাহাতি করছেন রশীদ মিনহাজের কাছ থেকে টি-৩৩ এর নিয়ন্ত্রণ নিতে। রশীদকে ক্লোরোফর্ম দেয়ার প্ল্যানটাই ভেস্তে গেছে শুধু, বাকিটুকু কাজ করেছে ঠিকঠাক। ওপেলকে রানওয়ের এমন জায়গায় রেখে এসেছেন তিনি, সহসা কোনো পাকিস্তানি বিমান টেক অফ করতে পারবে না। কাজটায় ঝুঁকি ছিল, কিন্তু মরণের ঝুঁকি নেয়া তো নতুন কিছু নয় তার

কাছে! বন্ধুমহলে প্রায়ই তিনি গর্ব করে বলেন, ‘দুই-দুই বার বেঁচে গেছি মৃত্যুকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে, বুঝলে? তৃতীয়বার বেঁচে গেলেই বুঝতে হবে আমার কপালে আর অপঘাতের মরণ নেই।’

প্রথমবারের কথা এখনো মনে পড়ে তার। কমিশন পাবার কিছুদিন পরেই ঘটেছিল সেই ঘটনা। ডগফাইট, মানে যেটা বিমান নিয়ে এঁকেবেঁকে উড়াল দেবার খেলা, সেটায় তিনি চ্যালেঞ্জ করেছিলেন এক সহকর্মীকে। তার বিমানের গতি একটু বেশিই কমে গিয়েছিল। ব্যাস, সোজা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেল ব্যাটা। সেবার তিন হাজার ফুট ওপর থেকে প্যারাসুট নিয়ে ড্রাইভ দিয়ে কোনোমতে রক্ষা হয়েছিল।

আর দ্বিতীয়বার অবশ্য ছিল বিমানের বদলে গাড়ি, আকাশের বদলে লাহোরের মরুময় রাস্তা। এক পথচারীকে বাঁচাতে এমন হার্ডব্রেক কষতে হয়েছিল যে গাড়িটাই গেল উলটে। তার কিছু হয়নি, তবে আহত হয়েছিল তার সাথে গাড়িতে থাকা আরেক বন্ধু।

এই মুহূর্তে রশীদ মিনহাজের সাথে ধ্বস্তাধ্বস্তি করতে করতেই সেফটি অফিসারের মনে হয়, এটাই তো তৃতীয়বার। মাত্র চল্লিশফুট উঁচু দিয়ে টেক অফ করেছেন তিনি। পারবে এই রকম, পাকিস্তানের ঐ কাপুরুষ পাইলটগুলো?

কন্ট্রোল টাওয়ার এদিকে হতচকিত ভাব কাটিয়ে মরিয়া হাইজ্যাকারের পরিচয় জানতে। বারবার রেডিওতে চেষ্টা করে যাচ্ছে তারা মিনহাজের সাড়া পেতে। ‘টাওয়ার কলিং ব্লু বার্ড, টাওয়ার কলিং ব্লু বার্ড। হু ইজ দিস?’

বেলা ১১টা ৩৬ মিনিটে বেতার সংযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার আগে প্রথম এবং শেষবারের মতো কন্ট্রোল টাওয়ার শুনতে পেয়েছিল এক বিরক্ত স্বরের প্রত্যুত্তর, ‘রিমেম্বার মাই নেইম ক্লিয়ারলি বাস্টার্ডস, ডোন্ট আস্ক মি এগেইন! দিজ ইজ মতিউর রহমান। ...অ্যান্ড আই এম গোয়িং হোম!’

মিনিট কয়েকের মাঝেই পাকিস্তান এয়ারফোর্সের দুটি বিমান উড়াল দিল মতিউর রহমানের পিছু পিছু। অথচ কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না ব্লু বার্ডের। এত নিচ দিয়ে উড়ে গেছেন মতিউর রহমান যে রাডারের চোখেও ধরা পড়েনি তার উড়ালপথ।

এরপরে কী হয়েছিল তা জানে না কেউই। অস্পষ্টতার সানগ্লাসে ঢেকে রাখা ওই কয়েকটি মুহূর্তের পরে আকাশের কোনো প্রান্তেই কোনো চিহ্ন পাওয়া যায় না ব্লু বার্ডের। বিধ্বস্ত টি-৩৩ বিমানটিকে খুঁজে পাওয়া যায় ঘণ্টা কয়েক পরে, ককপিটের লড়াইয়েই হয়তো নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছিল সেটা। পাকিস্তান সরকার বীরত্বের সর্বোচ্চ খেতাব নিশানে হায়দারে ভূষিত করল রশীর হায়দারকে, আর মশরুর বিমান ঘাঁটির চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের সাথে জানাজা ছাড়াই দেয়া হলো মতিউরের কবর।

মৃত্যুকে ফাঁকি দেয়া প্রায় অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল তার, আগুনপাখি মতিউরকে তবু থামতে হলো ইকারুস হয়ে।

নয়টি মাসের মুক্তিযুদ্ধে ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমানের আগে এমন বীরত্বের আগুনে পুড়েছিলেন ল্যান্সনায়েক মুন্সি আবদুর রউফ আর সিপাহি মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল। আগুনে পোড়া ফিনিক্স পাখির দলে মতিউরের পরেও যুক্ত হয়েছিলেন আরো চারজন। ল্যান্সনায়েক নূর মোহাম্মদ শেখ, সিপাহি হামিদুর রহমান, ইঞ্জিনরুম অফিসার মোহাম্মদ রুহুল আমিন আর ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর।

অজ্ঞাত কোনো কারণে, মাত্র কয়েকযুগ পরেই এমন বীরশ্রেষ্ঠদের জন্ম দেয়া জাতিটি, এইসব আগুনপাখিকে বিস্মৃত হবে অকল্পনীয় নির্মমতায়।

বাহিনীর ভেতর বাহিনী

ফকির আবদুর রাজ্জাক আরো একবার পাশে বসা আলী তারেকের দিকে চাইলেন। মুজিবনগর সরকারের তথ্য বিভাগে কার্যরত আলী তারেক খুব সম্ভবত বুঝতে পারলেন বন্ধুর উদ্বেগ। মৃদু হেসে বললেন, 'আরে ভয়ের কিছু নাই। কী হইছে, সেটা খালি তাজউদ্দীন সাহেবকে গুছায়ে বলবা। স্যার শুধু শুধু রেগে যাবার মতো মানুষ না। অকারণে কাউরে দূষবেন না তিনি...'

বন্ধুর কথায় মাথা নাড়েন ফকির আবদুর রাজ্জাক। অযৌক্তিক কোনো কিছু করেননি তিনি, ঠিক জানেন মনে মনে, তবুও একটা খটকা তো থেকেই যায়। অযথাই তো কাউকে বনগাঁর টালিখোলা যুবশিবির থেকে এই কলকাতায় ডেকে আনা হয় না !

পুরো ঘটনাটা মনে মনে আরো একবার খুঁটিয়ে দেখেন তিনি।

মাস কয়েক আগে রাজনৈতিক প্রশিক্ষক হিসেবে তাকে বনগাঁর টালিখোলা যুব শিবিরে নিয়োগ দিয়েছিলেন মন্ত্রী কামারুজ্জামান, হেনা ভাই বলেই তাকে ডাকেন ফকির আবদুর রাজ্জাক। দেশ থেকে তখন প্রতিদিন বহু যুবক আসছে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে, এইসব যুব শিবিরেই হয় তাদের প্রাথমিক ঠাঁই। সেখান থেকে বেছে বেছে ভারতের বিভিন্ন সেনা ছাউনিতে পাঠানো হয় তাদের। টালিখোলার ওই শিবিরে তখন প্রায় পাঁচ হাজার সদস্য।

সেই যুবকদের মুক্তিযুদ্ধ, স্বদেশ, মাতৃভূমি সম্পর্কে উদ্বুদ্ধ করাটা তার কাজ। ক্যাম্পের ভেতরে প্রতিদিনের বক্তৃতায় এটাই করতে হয় তাকে। এক সন্ধ্যায়, ক্যাম্পে এসে হাজির অচেনা এক লোক। ফকির আবদুর রাজ্জাককে বনগাঁর একটা হোটেলের নাম বলে লোকটা, সেখানে কেউ একজন নাকি তার সাথে দেখা

করতে চায়। কে দেখা করতে চায়, এই প্রশ্নের উত্তরে স্মিত হেসেছে লোকটা। বলেছে, 'গেলেই দেখবেন। আপনার চেনা মানুষ!'

কৌতূহল দমাতে না পেরেই পরদিন দুপুরে ফকীর আবদুর রাজ্জাক গিয়ে হাজির হন সেই হোটেলে এবং দেখেন চেনা মানুষটি আর কেউ নন, সিরাজুল আলম খান। ষাটের দশক থেকেই সিরাজুল আলম খান চেনেন ফকির আবদুর রাজ্জাককে, এবার এসেছেন তাকে বিশেষ একটি কাজের দায়িত্ব দিতে।

সিরাজুল আলম খান তাকে জানান, মুজিব বাহিনী গঠন করা হয়েছে। এখন মুক্তিবাহিনীতে তো কোনো রাজনৈতিক বাছবিছার না করে সবাইকেই উচ্চতর অস্ত্র প্রশিক্ষণ দিতে চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ আর স্বাধীনতা রাজনৈতিক বিষয়। দলমত নির্বিশেষে সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করলে সেখানে রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জন অসম্ভব।

দুপুরের খাবার একসাথে খেয়ে ফকির আবদুর রাজ্জাক উত্তেজিত অবস্থায় ফিরেছিলেন সেদিন ক্যাম্পে। সাথে ছিল সিরাজুল আলম খানের অনুরোধ। মুজিব বাহিনীর জন্যে তাকে সদস্য রিক্রুট করতে হবে।

দায়িত্ব পেয়ে সাত দিনের মাঝে পঞ্চাশ জনের একটি দলকে গোপনে মুজিব বাহিনীর ট্রেনিং-এর জন্যে পাঠিয়েছিলেন ফকির আবদুর রাজ্জাক। একমাস পরে পাঠিয়েছেন আরো একটি দল। গোলমাল লেগেছে দ্বিতীয়বার, গোপন রাখা যায়নি বিষয়টা। প্রতিটি যুব শিবিরের সার্বিক দায়িত্বে এক বা একাধিক এমপি থাকেন। টালিখোলা ক্যাম্পের ইনচার্জ ছিলেন সাবেক বিমান বাহিনী অফিসার, এমপি মতিউর রহমান।

এমপি মতিউর রহমান বিষয়টি নিয়ে তর্ক করেছিলেন তার সাথে, শেষে রেগে বলেছিলেন এ বিষয়ে রিপোর্ট করবেন তিনি। কাজেই প্রবাসী সরকারের চিঠি পেয়ে ফকির আবদুর রাজ্জাক নিশ্চিত হয়েছেন, তার বিরুদ্ধে রিপোর্ট করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর অফিসে আজ এজন্যেই ডাক পড়েছে তার। তাজউদ্দীন যে রকম রাগি মানুষ বলে শুনেছেন, তাতে একা আসতে ভরসা পাননি ফকির আবদুর রাজ্জাক। বন্ধু আলী তারেককে নিয়ে এসেছেন সে তাজউদ্দীনের পরিচিত মুখ বলে।

...ফকির আবদুর রাজ্জাকের অপেক্ষার শেষ হয় এক সময়। ঘরের ভেতরে ডাক পড়ে তার আর আলী তারেকের। ঘরে ঢুকে তারা দুইজন দেখেন তাজউদ্দীন আহমদের সাথে সেখানে বসে আছেন অ্যাকটিং প্রেসিডেন্ট সৈয়দ নজরুল ইসলামও।

সালাম বিনিময়ের পর তাজউদ্দীন চশমার আড়াল থেকে গভীর মনোযোগে খানিক দেখেন ফকির আবদুর রাজ্জাককে। তারপর গম্ভীর স্বরে বলেন, 'রাজ্জাক সাহেব, আপনার নামে তো আপনার ক্যাম্প ইনচার্জ অভিযোগ করেছেন আমার

কাছে। আপনি নাকি তার অনুমতি ছাড়াই ক্যাম্পের বেশ কয়জন সদস্যকে মুজিব বাহিনীতে রিক্রুট করতে পাঠিয়েছেন?'

ফকির আবদুর রাজ্জাক গলা পরিষ্কার করে বলেন, 'জ্বি স্যার, পাঠিয়েছি।'

'কেন পাঠিয়েছেন, বলবেন? আমরা একটা যুদ্ধের মাঝখানে আছি, সেখানে এরকম একটা কাজ করবার আগে আপনার কি কর্তৃপক্ষের অনুমতি নেয়া উচিত ছিল না?' তাজউদ্দীন বলেন।

'এই ব্যাপারে স্যার আমার কিছু বলবার আছে।' ফকির আবদুর রাজ্জাক আলী তারেকের দিকে তাকিয়ে সাহস সঞ্চয় করে বলা আরম্ভ করেন। 'মুক্তিযুদ্ধ স্যার একটা রাজনৈতিক বিষয়। নির্দিষ্ট মতাদর্শের মানুষ ছাড়া সবাইকেই এর সাথে সংযুক্ত করাটা স্যার, আমি মনে করি ঠিক না।'

ফকির আবদুর রাজ্জাক এরপরে গড়গড় করে অনেক কিছু বলে গেলেন। সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের নানা ঘটনা, রাজনৈতিক মোটিভেশন, মুজিব বাহিনীর নেতাদের দেশপ্রেম। বক্তব্য শেষ করে তিনি লম্বা একটা দম নিয়ে তাজউদ্দীনের দিকে তাকালেন। কী জানি বলে বসেন প্রধানমন্ত্রী আবার।

তাজউদ্দীনের মাথায় তখন চিন্তার ঝড়। মে মাস থেকে বাতাসে খবর ভাসছিল র-এর অধীনে বিশেষ একটি বাহিনীকে সশস্ত্র ট্রেনিং দিচ্ছে ভারত সরকার। সেই খবর নিয়ে তখন মাথা ঘামানোর অবসর ছিল না তার, তবে এখন আর উড়িয়ে দেয়া যাচ্ছে না বিষয়টা। যুব নেতাদের দ্বারা পরিচালিত এই বাহিনী এখন নাকি সশস্ত্র ঢুকতে শুরু করেছে দেশের ভেতরেও। বড় কোনো বিপদ না হলেও এই বাহিনীর সাথে কয়েক জায়গায় নাকি ভুল বোঝাবুঝি হয়ে গেছে মুক্তিবাহিনীর। রাজ্জাক সাহেবের মতো কয়েক জায়গায় মুক্তিবাহিনী থেকেও লোক রিক্রুট করা হয়েছে প্রবাসী সরকারের অগোচরে।

প্রধানমন্ত্রীকে চিন্তামগ্ন দেখে খানিক অপেক্ষা করেন, তারপর আবার কথা বলেন ফকির আবদুর রাজ্জাক। '...স্যার, বেয়াদবি না নিলে বলি, আপনারা আমাদের না ডেকে সরাসরি একটা সমন্বয় করে ফেলেন না ওনাদের সাথে। মনি ভাই, সিরাজ ভাই, রাজ্জাক ভাইকে আপনারা ডাকেন। ওনাদের সাথে সরাসরি কথা বলেন।'

নীরবতা ভেঙে তাজউদ্দীন অসহায় স্বরে বলেন, 'রাজ্জাক সাহেব, চেষ্টা তো করছি। কিন্তু ওদের তো পাই না...। আচ্ছা, আপনি এখন আসুন। সামনে আর এরকম কিছু না করে আগে ক্যাম্প ইনচার্জের সাথে কথা বলে নিয়েন।'

তাজউদ্দীন আবার ভাবনায় ডুবে যান। মৈত্রীচুক্তি স্বাক্ষর হবার কয়েকদিন পরেই দিল্লি ঘুরে এসেছেন তিনি এবং এইবার, প্রথমবারের মতো মুখ ফুটে র ডিরেক্টর রমানাথ কাউ-এর সাহায্য চেয়েছেন মুজিব বাহিনী নিয়ে। অপরপক্ষ নীরব থেকেছে তার আবেদনের জবাবে। এদিকে ওসমানীও খেপে আছেন মুজিব

বাহিনীর ওপর। দ্রুতই এই ইউনিটকে তার কমান্ডের আওতায় না আনলে পদত্যাগের হুমকি দিয়েছেন তিনি আবার।

ফাইলের আড়ালে ডুবে থাকা সৈয়দ নজরুল ইসলাম খেয়াল করেননি এতক্ষণ কী ঘটেছে। দীর্ঘক্ষণ পরে মুখ তুলে তিনি দেখতে পান, তাজউদ্দীন দুই হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে তর্জনি স্পর্শ করছেন বারবার।

গ্রিন গ্রিন গ্রাস

সিমকি ভাবি ফোনের ওই প্রান্ত থেকে প্রায় চেঁচিয়েই উঠলেন এবার, 'উফফ, ভাবি, তারপর যা হলো যদি দেখতেন! আমি তো বারান্দাতেই দাঁড়িয়ে ছিলাম। গুলি শুরু হওয়া মাত্রই অবশ্য চলে গেলাম ভেতরে। দোতলার জানালার ফাঁক দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখলাম পুরোটা। একটা গার্ডও বাঁচেনি ভাবি, মুক্তিবাহিনী সবগুলোকে শেষ করেছে!'

জাহানারা ইমাম ফোনের এই প্রান্তে নীরবে হাসলেন। ঢাকা শহরে মুক্তিযোদ্ধাদের অপারেশন এখন আর কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, প্রায় প্রতিদিনই কোথাও না কোথাও বোমা ফাটছে এক দুইজন খানসেনা মারা যাচ্ছে। গ্রেনেড আর হালকা কিছু অস্ত্রের সাথে অনিঃশেষ সাহস আর দেশপ্রেমে ভর করে বাচ্চা কিছু ছেলে যেন স্পর্ধিত চ্যালেঞ্জ ছুড়ছে পাকিস্তানিদের দেখি, পারলে আটকাও দেখি আমাদের!

সিমকি ভাবিকে জাহানারা ইমাম চেনেন বহু আগে থেকেই। তার ছেলে তূর্যও তো বেশ নামডাক করেছে ফুটবল খেলে, সালাউদ্দিন নামের স্টেডিয়াম পাড়ায় এক নামে পরিচিত সে। তূর্য নাকি এখন স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলের সাথে খেলে বেড়াচ্ছে। তা এই তূর্যদের বাসার সামনেই সেদিন এক দারুণ গেরিলা অপারেশন দেখে ফেলেছেন সিমকি ভাবি। ফোন করে এত উচ্ছ্বাস নিয়ে বলছিলেন সেটার কথাই।

ফোনের আলাপ শেষ করে জাহানারা ইমাম নিচে নেমে এলেন। গ্রাম থেকে হাফিজ এসেছে। সে অপেক্ষা করছে রুমীর জন্যে। আর রুমী এদিকে সকাল বেলাতেই বেরিয়েছে কোথায় যেন, দুপুরে নাকি কী মিটিং আছে ওদের। হ্যাঁ, কয়েকদিন হলো রুমী ঢাকাতেই থাকছে।

সিমকি ভাবি ফোনে ২৫ আগস্টের অ্যাকশনের কথা বলছিল। এর আগে ঢাকায় যত গেরিলা অপারেশন হয়েছে, সবগুলোর বর্ণনা লোকমুখে শুনেছেন জাহানারা ইমাম। আর এবার সরাসরি শুনেছেন গেরিলাদের মুখে, রুমীরাই তো করে এসেছে অপারেশনটা! জাহানারা ইমামের গর্ব ভেতরে ভেতরে খুব হচ্ছে ছেলের জন্যে, ছেলের বন্ধুদের জন্যে। তবে একটা অসুবিধাও হচ্ছে এবার তার।

গেরিলাদের গল্প করার সময় নিজের কোনো অনুমান যোগ করতে পারছেন না জাহানারা ইমাম, যদি কেউ সন্দেহ করে ফেলে!

২৫ তারিখের অপারেশনটার কথা ছেলেদের মুখে শুনতে শুনতে একরকম মুখস্থই হয়ে গেছে জাহানারা ইমামের। সেদিন কালোরাত ২৫ মার্চের পাঁচ মাস হবে। বদি, হাবিবুল আলম, শাহাদাত, স্বপন, হ্যারিস, রুমী ওরা সবাই মিলে ঠিক করে, এই ২৫ তারিখেই পাকিস্তানিদের মনে রাখার মতো একটা দাগা দিতে হবে। হ্যারিস, জিয়া, মুক্তার, আনু, সাথে আরো দুটা ছেলে চলে যায় রাজারবাগ পুলিশলাইনের দিকে। আর হাবিবুল আলম, কাজী, রুমী, বদি, স্বপন, সেলিম এরা ঠিক করে ধানমণ্ডির দিকে অপারেশন চালাবে। ২০ নম্বর রোডে এক চাইনিজ ডিপ্লোম্যাট আর ১৮ নাম্বার রোডে এক ব্রিগেডিয়ারের বাড়ি রেকি করে এসেছে ওরা। ওখানে প্রতিদিনই প্রায় সাত আটজন পাকিস্তানি মিলিটারি পুলিশ পাহারা দেয়। রুমীদের টার্গেট ছিল ওই মিলিটারিরা।

হাবিবুল আলমেরা ধানমণ্ডি চার নম্বর রোড থেকে একটা মাজদা গাড়ি হাইজ্যাক করে প্রথমে। সে এক মজার ব্যাপার, কারণ গাড়ির কাগজপত্র ঘেঁটে দেখা গেল সেটা আবুল মনসুর আহমেদের বড় ছেলে মাহবুব আনামের গাড়ি। অর্থাৎ, তাদের পরিচিত মুক্তিযোদ্ধা মাহফুজ আনামের বড় ভাই যিনি। তা এই নিয়ে খানিক হাসাহাসিও হলো।

মূল অপারেশন আরম্ভ হলো সাড়ে সাতটা নাগাদ, সন্ধ্যার আলোছায়া মিলিয়ে অন্ধকার নামার পর। হাবিবুল আলম গাড়ি চালাচ্ছিলো, আর তার পাশে বসেছিল সেলিম ও কাজী। পেছনের সিটে মাঝে রুমী, দুই পাশে স্বপন আর বদি। প্রথমেই ওরা যায় চীনা ডিপ্লোম্যাটটির বাসার সামনে। সেখানে গিয়ে ওদের হতাশ হতে হয়, কারণ সেদিন বাসার পাহারায় কোনো মিলিটারিকেই দেখা যায়নি। হতাশ হয়ে ছেলেরা ঠিক করে, এবার তাহলে ধানমণ্ডি ১৮ নম্বরেই যাবে ওরা।

১৮ নম্বরে ব্রিগেডিয়ারের বাড়ির সামনে দিয়ে গাড়ির গতি কমিয়ে ওরা দেখল সাত-আটজন মিলিটারি বেশ গল্প করতে করতে আড্ডা দিচ্ছে। কমান্ডে থাকা হাবিবুল আলম ছেলেদের অপারেশনের জন্যে সময় বেঁধে দেয় তিন মিনিট, এরপর সে সাত মসজিদের মোড় থেকে গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে আসে।

দ্বিতীয়বার বাড়িটিকে ক্রস করতে গিয়েই গাড়ির ভেতর থেকে হাবিবুল আলমের 'ফায়ার' ডাকের সাথে সাথে বদি আর কাজীর স্টেনগান দুই লেভেলে গুলি ছুড়ল। বদি টার্গেট করেছিল পেট, আর কাজী বুকের দিকে। ব্যাস, খতম! কিছু বুঝে ওঠার আগেই শেষ মিলিটারিগুলো!

তবে অ্যাকশনের এরপরেও বাকি ছিল অনেকটাই। ধানমণ্ডির মাঝ দিয়ে এদিক-সেদিক ঘুরে হাবিবুল আলম যখন গাড়িকে নিয়ে মিরপুর রোডে ফেলল, দেখল পাঁচ নম্বর রোডের সামনে থেকে মিলিটারি চেকপোস্ট বসে গেছে, লম্বা

লাইন সেখানে। এর একটা অর্থ, ১৮ নম্বরের ঘটনা ছড়িয়ে গেছে এতক্ষণে। রাস্তায় ব্যারিকেড।

রুমীরা খেয়াল করে, রাস্তায় মাটির উপরেও এল-এম-জি নিয়ে সতর্ক শুয়ে আছে দুইজন গার্ড। হাবিবুল আলম ইনডিকেটরে ডান দিকে টার্ন নেবার সিগন্যাল দিয়ে সামান্য ডানে ঘুরবার ভান করতেই দাঁড়ানো মিলিটারিদের একজন ওদের গাল দিয়ে বলে, 'কিধার যাতা হ্যায়?'

সেই মুহূর্তেই হাবিবুল আলম গাড়ি ঘুরিয়ে ফেলে বাঁ দিকে, আর চাপা গলায় রুমীর 'ফায়ার' চিৎকারের সাথে স্বপন আর বদি গুলি করে। এল-এম-জি নিয়ে শুয়ে থাকা গার্ড দুইজন শেষ সাথে সাথেই, বাকিদের হতচকিত ভাব কাটবার আগেই গেরিলারা ঢুকে পড়ে পাঁচ নম্বর রোডে।

মিলিটারিরা কিন্তু এরপরেও হাল ছাড়েনি। পাঁচ নম্বর দিয়ে গ্রিন রোডে যখন প্রায় পৌঁছে গেছে মাজদা, ঠিক তখনি রুমীই খেয়াল করে ব্যাপারটা। 'লুক, লুক! আ জিপ ইজ ফলোয়িং আস!'

রুমীকে বলে দিতে হয় না, চোখের পলকে সিনেমার মতন স্টেনের বাঁট দিয়ে গাড়ির পেছনের কাঁচ ভেঙে ফেলে সে। শুরু করে গুলি ছুড়তে। দুই পাশের জানালা দিয়ে বদি আর স্বপনও যোগ দেয় সাথে। ওদের নিশানা ব্যর্থ হয়নি, জিপের ড্রাইভার মারা পড়ে প্রথম চোটেই। জিপটা গিয়ে ধাক্কা খায় ল্যাম্পপোস্টে, উলটে পড়ে সাথে সাথেই।

এই অ্যাকশনের কথাই মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছে সারা ঢাকায়। ফোনের সিমকি ভাবি থেকে শুরু করে বাসায় বেড়াতে আসা ফকির বা মোর্তুজা এরা সবাই খুব আত্মতৃপ্তি নিয়ে বলছে, 'এরা তো মানুষ না ভাবি, এরা হলো জ্বিন! চোখের সামনে দিয়ে না হলে এরকম কেউ উধাও হয়ে যেতে পারে?'

জাহানারা ইমামকেও চোখ বড় বড় করে বলতে হচ্ছে, 'নাহ্, বিচ্ছুগুলোর সাহস আছে বলতে হবে, এরকম বেপরোয়া কাণ্ড কীভাবে করে নইলে!!'

... রুমী বাসায় এল সন্ধ্যারও পরে। হাফিজকে দেখে সে মহা খুশি তাকে ছাদের ঘরে নিয়ে গেল কথা বলবে বলে। রাত ন"টার দিকে খেতে বসে সবাই। সাইড টেবিলের রেডিওর কলকাতা স্টেশন থেকে ভেসে আসে একের পর এক বাংলা গান। ওদের কানে আসে খুদিরামের সেই গান একবার বিদায় দে মা, ঘুরে আসি।

রুমী বলে, 'কী আশ্চর্য আম্মা! দুপুরেই এই গানটা একবার শুনলাম আজকে, আবার এখনও বাজতেছে! কপালে কী আছে আল্লায় জানে!'

জাহানারা ইমাম মৃদু ধমক দেন রুমীকে, 'অ্যাই, অলুক্ষুণে কথা একদম বলবি না। তুই বরং ভর্তাটা আরেকবার নে।'

খাওয়ার পরে রুমীর আবদার ধরে বসে। 'আম্মা, মাথাটা দপদপ করছে। একটু টিপে দাও না!'

যুদ্ধ শুরুর আগে মায়ের আদরের ভাগ নিতে বেশ মধুর একটা ঝগড়া করত রুমী আর জামী। এখন জামী আর সেদিকে যায় না। 'আমার ভাগেরটা এই কয়েকদিন ভাইয়াকেই দাও!' খুব উদারতার সাথে এই মন্তব্য করেছে সে কয়দিন আগে।

রুমীর ঘরে জিম রিভসের রেকর্ড বাজতে থাকে। জাহানারা ইমাম রুমীর মাথার কাছে বসে চুলে বিলি কাটতে থাকেন। জিম রিভস গান গাইতে গাইতে থেমে যান একসময়, জাহানারা ইমাম বলেন– 'কী গান যে শুনিস, কথা তো কিছুই বুঝি না!'

উঠে গিয়ে রুমী আরেকটা রেকর্ড লাগায়। মায়ের আদর পেতে আবার বিছানায় শুয়ে বলে, 'আম্মা, এই গানটা শোনো মন দিয়ে। কথাগুলো খুব সুন্দর।'

ঘরের ভেতর ভাসতে থাকে টম জোনসের গলা। গ্রিন গ্রিন গ্রাস। রুমীর খুব প্রিয় গান এটা, প্রায়ই বাজায় সে। জাহানারা ইমামেরও শুনতে শুনতে সুরটা মুখস্থ হয়ে গেছে। যদিও কথাগুলো বিশেষ ভালো বোঝেন না তিনি।

তিন মিনিটের গানটা শেষটা হয়ে যাবার পর রুমী মুখ খোলে। সে কথা বলে থেমে থেমে। গলা শুনে মনে হয়, কেউ যেন বহু দূর থেকে কথা বলছে ফিসফিস করে। 'গানটা কী বলছে জানো আম্মা?...

এক ফাঁসির আসামী তার গ্রামের বাড়িতে ফিরে এসেছে। ট্রেন থেকে নেমে সে দেখে, তার বাবা আর তার প্রেমিকা ম্যারি এসেছে তাকে বাড়ি নিতে। সে দেখে, এতদিনের বিরহেও তার প্রিয় ছোটবেলার গ্রামের বাড়িটাও একদম বদলায় নি, আগের মতোই আছে। সেই বাড়ির চারপাশে বাতাসে কী সুন্দর দুলছে সবুজ সবুজ ঘাস। লোকটার এত ভালো লাগল, কী যে সুন্দর সেই সবুজরঙা ঘাস! এরপর হাত বাড়িয়ে সে যেই ছুঁতে চাইল সবুজ রংটাকে, তখনই সে চমকে দেখে তার হাত ঠেকেছে ধূসররঙা পাথরে। লোকটা বুঝে যায় মা, সে আসলে শুয়ে আছে তার জেল কুঠুরিতে, সে এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিল...'

জাহানারা ইমাম কেমন অমঙ্গলের আশংকায় রুমীর মাথা বুকে জড়িয়ে ধরে বলেন, 'চুপ কর রুমী, চুপ কর! এত কম বয়স তোর রুমী, তুই এসব কথা বলছিস কেন, জীবনের কিছুই তো দেখলি না, পৃথিবীর কিছুই তো জানলি না!'

রুমী কেমন অদ্ভুত বেদনার এক হাসি দিয়ে বলে, 'মা, বিন্দুতে সিন্ধু দর্শন বলে একটা কথা আছে, জানো না? আমি জীবনের পুরোটা তোমাদের মতো দেখিনি সত্যি। কিন্তু মা, জীবনের যত মাধুর্য, যত তিক্ততা, সবকিছুরই আমি স্বাদ পেয়েছি। চলে যেতে হলে আমি কোনো আক্ষেপ নিয়ে যাবো না।'

সত্যিই রুমী কোনো আক্ষেপ নিয়ে গেল না। ঘণ্টা দুয়েক পরেই একদল মিলিটারি এসে ধরে নিয়ে যায় রুমী আর তার বাবা শরীফ ইমামকে। শরীফ ইমাম ফিরে এসেছেন পরে, রুমী আর কখনো ফেরেনি জাহানারা ইমামের কাছে।

সেই রাতের শেষে মিলিটারি পুলিশ হানা দেয় ৩৭০, রাজারবাগের বাড়িটাতেও।

আলতাফ মাহমুদ তখন ঘুমোচ্ছিলেন স্ত্রী সারা আর মেয়ে শাওনকে নিয়ে। পাশের ঘরে ফজরের নামাজ শেষ করে তসবিহ্ জপছেন সারার মা, আর রেওয়াজ করছেন সারার ছোট বোন শিমুল বিল্লাহ, পরবর্তীতে যিনি পরিচিত হবেন শিমুল ইউসূফ নামে।

শিমুলের রেওয়াজের ফাঁকে জানালায় চোখ রাখতেই দেখেন ট্রাকভর্তি মিলিটারি ঘেরাও করে ফেলেছে বাড়ি। শিমুলের চিৎকারে গোটা বাড়ি জেগে ওঠে, মা নির্ভাবনায় হাত রাখেন কুরআন শরিফে। মায়ের সরল বিশ্বাস ছিল, তারা রক্ষা পাবেন সকল বিপদ থেকে।

শেষ রক্ষা হয়নি। পেছনের দরজা ভেঙে মিলিটারি ঘরে ঢোকে। আলতাফ মাহমুদ, সারার চার ভাই আর সারার ছোট মামা আবুল বারাক আলভীকে সারি বেঁধে দাঁড় করানো হয় ড্রইংরুমে।

'ইধার আলতাফ মাহমুদ কৌন হ্যায়?'

পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চির আলতাফ মাহমুদ এগিয়ে আসেন পুরু লেন্সের চশমা নিয়ে। সাদা স্যান্ডো গেঞ্জি আর লুঙ্গি তার পরনে। অফিসারের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ঝিলু দ্য গ্রেট বলেন, 'আমি। আমিই আলতাফ মাহমুদ।'

পর মুহূর্তেই বন্দুকের বাঁটের আঘাতে ঠোঁট কেটে যায় আলতাফ মাহমুদের। তিনি সে অবস্থাতেই বলেন, 'তোমরা যা খুঁজছো, তার খবর এরা কেউই জানে না। ধরতে হলে কেবল আমাকেই ধরো।'

আলতাফ মাহমুদ চলে গেলেন উঠোনের লেবু গাছটার গোড়ায়। ক্র্যাক প্লাটুনের ছেলেদের জন্যে ঢাকায় এক দুর্গ হয়ে উঠেছিল রাজারবাগের এই বাড়িটি। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের জন্যে এখান থেকেই ছেলেদের হাতে করে গানের টেপ পাঠিয়েছেন তিনি, তাদের অস্ত্র পর্যন্ত আলতাফ মাহমুদ লুকিয়ে রেখেছেন এই উঠোনে। আলতাফ মাহমুদ বুঝে গেছেন, সেই অস্ত্রের খোঁজ পেয়েই এখানে আসা মিলিটারির। অস্ত্র না পেলে তারা হয়তো অত্যাচার করবে সবাইকেই, তিনি তা চান না।

একা একাই কোদাল হাতে মাটি খুঁড়ে অস্ত্র বোঝাই দুটো বড় ট্রাঙ্ক বের করলেন আলতাফ মাহমুদ। এর মাঝে বেয়নেট অজস্রবার আঘাত করেছে তার কপালে, সেখান থেকে চামড়া কেটে ঝুলছে। রক্তে ভেসে গেছে তার মুখ, সেটা কাদায় মাখামাখি।

আলতাফ মাহমুদ অস্ত্রের ট্রাঙ্ক বের করার কাজ শেষ করে উঠে দাঁড়ালেন। পাকিস্তানি মেজরটির সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, 'নাও, তোমরা যা খুঁজছো, সব এখানেই আছে। এবার আমায় অ্যারেস্ট করে বাকিদের ছেড়ে দাও।'

পরমুহূর্তেই প্রবল এক চড় খেয়ে আলতাফ মাহমুদ পড়ে গেলেন মাটিতে। মিলিটারির চড়ে তার চশমা অর্ধেক ভেঙে কোনোক্রমে ঝুলে রইল চোখে। তাচ্ছিল্যের গলায় মেজরটি বলল, 'বেহেনচোত বানগাল!'

ঝিলু দ্যা গ্রেট উঠে দাঁড়ালেন ধীরে ধীরে। এরপর, ভোরের ধোঁয়া ধোঁয়া আলোয় অদ্ভুত এক অপার্থিব দৃশ্যের জন্ম দিয়ে মেজরটিকে বললেন, 'সুরের চেয়ে বেয়নেটের ক্ষমতা অনেক বেশি, তাই মনে হচ্ছে না মেজর সাহেব? আমার কী মনে হচ্ছে জানেন? মনে হচ্ছে, ইতিহাসে আপনার ঐ বেয়োনেটের কোনো জায়গা থাকবে না। সেখানে জায়গা থাকবে স্বাধীন বাংলাদেশের।'

মেজরটি তীব্র চোখে আলতাফ মাহমুদের চোখে চেয়ে রইলেন। আধভাঙা চশমার নিচের যে চোখজোড়ায় কোনো আক্ষেপ ছিল না। রুমীর মতোই।

মাথা উঁচু করে শিস বাজাতে বাজাতেই বাড়ির আঙ্গিনা থেকে শেষবারের মতো বেরিয়ে গেলেন আলতাফ মাহমুদ।

রুমী আর আলতাফ মাহমুদেরা জেল কুঠুরির ধূসর সেলে নির্মম অত্যাচারের মাঝে স্বপ্ন দেখেছিলেন স্বাধীন বাংলাদেশের ফেরার, কিন্তু কখনো ছোঁয়া হয়নি তাদের আটষট্টি হাজার গ্রামের গ্রিন গ্রিন গ্রাস।

আলো অন্ধকারের কূটনীতি

মইদুলের পরনে ঘিয়া রঙের ফুলহাতা শার্ট, কালো প্যান্ট, তাকে চমৎকার দেখাচ্ছে। অন্য সময় হলে তাজউদ্দীন হয়তো মইদুলকে হালকা দুয়েকটা রসিকতা শুনিয়ে তারপর কাজের কথায় আসতেন। কিন্তু আজ মইদুলকে দেখে সে চিন্তাটা তাজউদ্দীনের মনে জায়গা পেল না একদমই। মাইক্রোস্কোপ ছাড়াই মইদুলের মুখের একরাশ দুশ্চিন্তার ব্রণ দেখা পাওয়া যাচ্ছে।

'কী ব্যাপার মইদুল, কিছু খবর আনতে পারলেন?'

মইদুল মাথা নাড়েন চেয়ারে বসে। 'না! রমানাথ কাউ আমার কথা খুব মন দিয়ে শুনলেন, কিন্তু তার মুখে কোনো বিকার দেখা গেল না। আপনার কথাই গ্রাহ্য করে নাই, আমার কথা আর কী শুনবে।' সপ্তাহ চারেক আগে মুজিব বাহিনী নিয়ে যে তাজউদ্দীন র ডিরেক্টর রমানাথের সাথে একটি নিষ্ফ মিটিং করেছিলেন, মইদুল সেটাই যেন আরেকবার মনে করিয়ে দিলেন।

হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে তাজউদ্দীন বারবার তর্জনি ছুঁয়ে যেতে লাগলেন। মুজিব বাহিনী আর মুক্তিবাহিনী যাতে নিজেদের পরস্পরের শত্রু বলে মনে না

করে, সেইজন্যেই তাদের এক কমান্ডের আওতায় আনাটা বড় জরুরি। যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাদল বিশৃঙ্খল থাকলে লাভটা আদতে হয় বিপক্ষের। তাজউদ্দীন আগে নিজে একবার র ডিরেক্টরকে বলেছিলেন, তারপরে মইদুলকে দিল্লি পাঠিয়ে আরো একবার চেষ্টা করেছেন রমানাথকে বিষয়টা বোঝাতে, লাভ হয়নি দেখা যাচ্ছে। এবার হয়তো সরাসরি ইন্দিরা গান্ধীকেই বলতে হবে।

কী মনে হতে তাজউদ্দীন চেয়ার থেকে উঠে সামনের ফাইলপত্রের স্তূপ ঘেঁটে কয়েকটা চিঠি বের করলেন। মইদুলের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'পড়ে দেখেন।'

মইদুল চিঠিগুলো পড়লেন। সবগুলো চিঠিই এসেছে দেশের ভেতর থেকে। নানা রকমের অভিযোগ করে চিঠি, বিভিন্ন সমস্যার প্রতিকার চেয়ে চিঠি। বক্তব্যগুলোর মাঝে একটাই সাধারণ অভিযোগ রয়েছে, সেটা হলো যুদ্ধের ডামাডোলে স্থানীয় কিছু দুর্নীতিবাজ লোক টাকাপয়সা এদিক-ওদিক করছে।

চিঠিগুলো গুছিয়ে আবার ফাইলে রাখতে রাখতে মইদুল বলেন, 'দেখলাম।'

তাজউদ্দীনের গলার স্বরে বিরক্তি উপচে পড়ে। 'ক্যামনটা লাগে! সবদিকে চুরিচামারি। এনকোয়ারি কমিটি বানানোর আদেশ দিয়ে আমাকে সপ্তায় সপ্তায় চিঠি পাঠাইতে হয়। যুদ্ধ করবো না চুরি সামলাবো আপনারা বলেন।'

মইদুল খানিক কালক্ষেপণ করেন তাজউদ্দীনের বিরক্তিটা কমে আসার জন্যে। তারপর সামনে ঝুঁকে বলেন, 'তা, মুজিব বাহিনী নিয়ে কী ঠিক করলেন?'

'দেখি, ইন্দিরা গান্ধীরে বিষয়টা বুঝানো যায় কি না। তবে এই মুহূর্তে সেটা নিয়ে ভাবতেছি না। সমস্যা যখন আসে, তখন চারপাশ থেকেই আসে বুঝলেন মইদুল। নয় নম্বর জোনাল ডিভিশনাল অফিসে নাকি একদল আমার বিপক্ষে অনাস্থা আনছে। আমার তো ধারণা ছিল শিলিগুঁড়িতেই এইসব নিয়ে আলোচনা বন্ধ হয়ে যাবে। এখনো থামে নাই দেখে খুব আশ্চর্য লাগতেছে। কী সব কাণ্ড!'

'বিষয়টা আসলে আমারও কানে আসছে।' মইদুল বলেন। 'মানে অনাস্থা প্রস্তাবের বিষয়টা জানতাম না। তবে উত্তরবঙ্গে নাকি পার্টির ভেতরের কিছু লোকই উপদলীয় পলিটিক্সে ব্যস্ত, কানে আসতেছে। পার্টির মধ্যে নিজেদের মেজরিটি দেখায়ে তারা নাকি গভর্মেন্ট রিফর্ম করতে চাচ্ছে...'

তাজউদ্দীন মাথা ঝাঁকান। 'হ্যাঁ, কিছু রিপোর্ট আমিও পাইছি। ওই বিষয়ে পরে কথা বলবো নে। ডিটেইলস না জেনে কথা বলাটা ঠিক হবে না।'

'ভালো কথা, আপনি গোলাম আজমের সাক্ষাৎকারটা দেখছেন পেপারে? ওই যে, জামায়াতে ইসলামীর আমির?' মইদুল প্রসঙ্গ পালটে বলেন। 'স্বাধীন বাংলাদেশ প্রশ্নে বাংলাদেশি প্রতিনিধি দলকে জবাব দিতে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে পাকিস্তানি যে প্রতিনিধিরা যাবে, গোলাম আজমের পরামর্শ হইলো তাদের মধ্যে সবুর খান টাইপের কয়জন দালালকেও ইনক্লুড করা হোক।'

'না, দেখা হয় নাই। পাকিস্তানিদের চেয়ে এই লোকগুলাকে আমার বেশি অমানুষ বলে মনে হয় বুঝলেন!' তাজউদ্দীন মুখ শক্ত করে বলেন। এরপরেই তিনি চেয়ারে একটু নড়েচড়ে বসেন। খানিক ইতস্তত করে বলেন, 'ইউএন জেনারেল অ্যাসেম্বলি'র প্রসঙ্গটা তুলে ভালো করছেন মইদুল। আচ্ছা, ইয়ে, মোশতাক সাহেবের সাথে আজকালের মধ্যে কোনো যোগাযোগ হইছে নাকি আপনার, বলেন তো? বেশ কিছু কথা রিপোর্ট আসতেছে উনার সম্পর্কে...'

মইদুল আবার খানিক এগিয়ে আসেন উৎসুক হয়ে, গলার স্বর নামিয়ে বলেন, 'মোশতাক সাহেবকে নিয়ে আবার কী রিপোর্ট পেলেন?'

'মোশতাক সাহেব নাকি মার্কিনদের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা চালায়ে যাচ্ছেন।' তাজউদ্দীনের গলা খুব শুষ্ক। 'জহিরুল কাইয়ূম আর মাহবুবুল আলম চাষিকে সাথে নিয়ে উনি কলকাতার মার্কিন কনসুলেটের মাধ্যমে নিক্সন গভর্মেন্টের সাথে গোপনে আঁতাত করার তালে আছেন। মোশতাক সাহেবের বক্তব্য, এখনো নাকি রাজনৈতিক আলোচনার মাধ্যমে পাকিস্তানের কনফেডারেশন টিকায়ে রাখা যাবে। সামনে জাতিসংঘের যে অ্যাসেম্বলি ছিল, ওইটার ছুতায় মোশতাক সাহেব তার কয়েকজন সহকারী নিয়ে নাকি রেডি হচ্ছিলেন আমেরিকা যাবার জন্যে।'

একটা বিস্ময়সূচক শব্দ বেরোয় মইদুলের মুখ থেকে। 'ইন্টারেস্টিং! কীভাবে জানলেন এই ঘটনা?'

'ইন্ডিয়ান গভমেন্টের কাছে ইন্টিলেজেন্স রিপোর্ট আসছে। ওয়াশিংটনের কোন এক আন্ডার সেক্রেটারি নাকি বিষয়টা ফাঁস করছে। ইন্ডিয়ান গভর্মেন্ট এই ঘটনা জানায়ে আমাদের অনুরোধ করছে, মোশতাক সাহেবকে যাতে পদচ্যুত করা হয়। এই জায়গাটাতেই সমস্যা লাগতেছে আমার, বুঝলেন। মানে মোশতাক সাহেবের বিষয়টা ফাঁস হয়ে গেলে আমাদের ছেলেদের অবস্থা কী হবে ভেবে দেখছেন? সরকারের ভেতরেই যদি এরকম অন্তর্ঘাতক বসে থাকে, তাহলে যোদ্ধাদের মনোবল কি আর টিকবে? আর ইউএন অ্যাসেম্বলির তারিখও এসেই পড়েছে। তাড়াতাড়ি কিছু একটা ব্যবস্থা নিতে হবে...'

'তাহলে আপনার হাতে তো এখন সমস্যার শেষ নাই, কী বলেন?' মইদুল হাতের আঙুল গুনে গুনে যেন পরিমাপ করে দেখান। 'তরুণ নেতাদের বিষয়টা নিয়ে ইন্দিরার সাথে আলাপ করতে হবে, অনাস্থা প্রস্তাব ট্যাকল করতে হবে, আবার মোশতাক সাহেবের ঝামেলা হ্যান্ডেল করাটাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ।'

তাজউদ্দীন যেন একরকম হাত নেড়ে উড়িয়ে দেন বিষয়গুলো। 'ধুর, অনাস্থা প্রস্তাব আবার একটা সমস্যা নাকি অন্যগুলার তুলনায়! শুনেন, কাজ করাটাই হলো আসল, কে কাজ করল সেটা কোনো ব্যাপার না। ভালো কথা, ডি পি ধর আসতেছেন কবে জানেন?'

'কাল পরশুর মাঝেই আসবেন শুনলাম।'

আলোচনা চলে আরো কিছু সময়। টুকটাক আলাপ সেরে, কিছু নির্দেশ নিয়ে মইদুল বেরিয়ে যান। তাকে বিদায় দিয়ে তাজউদ্দীন চেয়ারে বসে থাকেন।

রং চা খেতে ইচ্ছে করছে তার, কিন্তু চিন্তায় ব্যাঘাত ঘটবে বোধ করে চা বানানোর কথা কাউকে বলতে ইচ্ছে করছে না। ভারত সোভিয়েত চুক্তির পেছনে মূল কৃতিত্ব যার, সেই ডি পি ধরের সাথে আসন্ন আলোচনাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হতে যাচ্ছে। ন্যাপ-সিপিবি কর্মীদের মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি রিক্রুট করা হবে কি না, আশা করা যায় এবারের মিটিঙে তার একটা ফয়সালা মিলবে।

স্বাধীনতার যুদ্ধ রাজনৈতিক যুদ্ধ, ঠিক আছে। কিন্তু তাজউদ্দীন মনে করেন, দেশপ্রেমিকদের রাজনৈতিক বিশ্বাস ভিন্ন হতে পারে; তবে দেশের প্রতি আবেগের রংটা অভিন্ন। হয়তো অকারণ এই বিশ্বাস করাটা খুব বিবেচক সিদ্ধান্ত হচ্ছে না। কিন্তু তাজউদ্দীন তবু সবার উপর বিশ্বাস রাখছেন।

মানুষকে বিশ্বাস করতে তাজউদ্দীনের বড় ভালো লাগে।

বিশ্রামগঞ্জ

জায়গাটার নাম বিশ্রামগঞ্জ। আহত মুক্তিযোদ্ধারা এই হাসপাতালে এসে চিকিৎসা নেবে, সুস্থ হবে বিশ্রাম পেয়ে। নামটা কেমন চমৎকার মানিয়ে গেছে কাজের সাথে! নামের এই আশ্চর্য সমাপতন বাদ দিলেও বিশ্রামগঞ্জের অবস্থানটা খুব চমৎকার। পাকিস্তানি আর্টিলারির ফায়ার রেঞ্জের বাইরে, আবার মেলাঘর থেকেও জিপে আসতে সময় লাগে মাত্র বিশ মিনিট।

বাংলাদেশ হাসপাতালটা গড়ে তোলা হয়েছে হাবুল ব্যানার্জির লিচুবাগানে। ভদ্রলোকের আদি নিবাস কুমিল্লা, বাংলাদেশের প্রতি টানটা তার একেবারে অযাচিত নয় তাই। হাসপাতাল করার ব্যাপারে অনুমতি দিতে দ্বিধা করেননি তিনি একেবারেই। হাবুল ব্যানার্জি নিজেও নাকি স্বদেশি আন্দোলন করতেন একসময়। স্থানীয় লোকেদের কেউ কেউ তো বলে, সুভাষ বোসের আজাদ হিন্দ বাহিনীতে স্বয়ং নেতাজির বডিগার্ড ছিলেন এই হাবুল ব্যানার্জি।

হাবিবুল আলমেরা এবার এসেছে নরসিংদী রুট ধরে। বুদ্ধিটা ছিল শাহাদাত চৌধুরীর। শাহাদাত আর হাবিবুল আলম মিলে ঢাকা ছাড়ার সময় মেলাঘরে নিয়ে এসেছে আরো দশ বারোজনের একটা ছোট্ট দলকে। এসেই জানতে পেরেছে যে হাসপাতাল সরে গেছে মেলাঘর থেকে আরো একটু উত্তরে, বিশ্রামগঞ্জে। ঢাকা থেকে কেকা আর মিনু এসেছিল হাবিবুল আলমদের সাথে। যুদ্ধে অংশ নেবার সুযোগ হারাতে চায়নি ওরা, ঢাকা ছেড়েছে যোদ্ধাদের সাথে কাজ করবে বলে। ডালিয়া, খুকু ওরা তো আগে থেকেই ছিল হাসপাতালের কাজে। কেকা, মিনুদের সাথে আগে থেকেই চেনা ওদের।

মিনু বিল্লাহর কথা মনে হতেই হাবিবুল আলমের আলতাফ মাহমুদের কথা মনে পড়ে গেল।

৩১ তারিখ ঘটনাটা প্রথমবার শুনতে পায় হাবিবুল আলমেরা, ঢাকা থেকে এসেছে ফতেহ আলি চৌধুরী সে নাকি পাগলের মতো খুঁজে বেড়াচ্ছে হাবিবুল আলম আর শাহাদাত চৌধুরীকে। হাবিবুল আলম খুঁজে বের করল ফতেহকে। অদ্ভুত এক অনুভূতিহীন চোখে– অমন দৃষ্টি ফতেহর চোখে জীবনে দেখেনি সে, দেখতে চায়ও না আর কখনো– তাদের দিকে চেয়ে ফতেহ জানায়, সব শেষ। বদি, জুয়েল, আলতাফ মাহমুদ, রুমী, বাকী এদের সবাইকে ধরে নিয়ে গেছে পাকিস্তানি মিলিটারি।

বুকের ওপর পাথর নিয়ে সব খবর শোনে ওরা।

প্রথমে নাকি ধরা পড়েছে বদি। ঢাকা কলেজের প্রিন্সিপাল জালাল স্যারের ছেলে ফরিদের সাথে খাতির ছিল তার, সেখানে তাস খেলতে গিয়েই বদি দুপুর বেলায় ধরা পড়ে গেল। সামাদকে ধরে নিয়ে যায় বিকাল নাগাদ। আজাদের বাসায় মিলিটারি যায় প্রায় মাঝরাতের দিকে। সেদিন আজাদের বাসায় ছিল জুয়েল, কাজী আর বাকী। মিলিটারিরা বাসাটা চারদিকে ঘেরাও করে আগে, এরপরে ভেতরে ঢোকে। সবাইকে লাইন ধরে হাত উপরে তুলে দাঁড় করায় ওরা। অল্প কিছুদিন আগে হাতে আঘাত পেয়েছে বলে জুয়েলের আঙুলে ব্যান্ডেজ করা ছিল, ওকেই তাই টার্গেট করে পাকিস্তানিরা। এক ক্যাপ্টেন সেই ব্যান্ডেজ করা আঙুল সজোরে চেপে ধরলে, জুয়েল 'মা গো!' বলে চেঁচিয়ে ওঠে ব্যথায়। এর মাঝেই কাজী হঠাৎ করেই এক লাফ দিয়ে ক্যাপ্টেনটির হাতের স্টেন কেড়ে নিয়ে ফায়ার করা শুরু করে। এত দ্রুত ব্যাপারটা ঘটে যায় যে ঘরের অন্য মিলিটারিরা কিছু বুঝে উঠার আগেই কাজী পালিয়ে যায়। সেই পলায়ন একেবারে দিগম্বর অবস্থায় একটা সুতোও ছিল না কাজীর গায়ে।

কাজী রাত দেড়টার দিকে হাবিবুল আলমের বাসায় গিয়ে পৌঁছে। সেখানে গিয়ে সে জানায়, আজাদদের বাসায় রেইড হয়েছে, অতএব এখানেও মিলিটারি চলে আসতে পারে। আলমের মা কাজীকে লুঙ্গি দিয়ে বিদায় করে দেন। কাজীর পূর্বানুমান সত্য করে খানিক পরে আলমদের বাসাতেও মিলিটারি আসে। কয়েকদিন আগেই বাড়ির রান্নাঘরের মেঝের নিচে পাকা হাউজ করে সেখানে অস্ত্র লুকিয়ে রেখেছিল হাবিবুল আলমেরা। আর্মি এসে প্রথমেই রান্নাঘরের খোঁজ করে। বোঝা যায়, ওরা এসেছে খবর নিয়েই। খুলনা থেকে কয়দিন আগেই ঢাকায় আসা হাবিবুল আলমের ফুপা আর ফুপাতো ভাই, বাড়িতে পুরুষ বলতে ছিল এই দু'জন মাত্র। বেচারাদের কিছু না জেনেও তাই প্রচুর মারধোর খেতে হয়েছে মিলিটারির। এর বেশি আর কিছু জানা নেই ফতেহর।

কাঁদতে থাকা ফতেহকে নিয়ে এরপর শাহাদাত আর হাবিবুল আলম চলে যায় ক্যাপ্টেন হায়দার আর খালেদ মোশাররফের সাথে দেখা করতে। জানায় ২৯ আগস্টের বিস্তারিত।

সব শুনে কেমন যেন থতমত খেয়ে সেক্টর কমান্ডার খালেদের তাঁবু থেকে বেরিয়ে যান হায়দার ভাই। খানিক পরে আরেকজন গেরিলা এসে শোনায় মেজর হায়দার অঝোরে কাঁদছেন নিজ তাঁবুতে।

ফতেহ, হাবিবুল আলমদের বিষণ্ন চোখের সামনে ক্র্যাক প্লাটুনের মাস্টারমাইন্ড মানুষটি বিছানায় বালিশে মাথা ঢেকে কাঁদতে থাকেন 'মাই বয়েজ, মাই বয়েজ!' বলে।

রাতের আঁধারে হাসপাতালের সামনের মাঠে সিগারেট টানতে টানতে হাবিবুল আলমের মনে পড়ে যায়, খালেদ মোশাররফও খুব আপসেট হয়ে পড়েছিলেন সেদিন। পরদিনই তিনি নির্দেশ দেন, ঢাকায় থাকা ক্র্যাক প্লাটুনের প্রত্যেক গেরিলাকে দ্রুত ফিরে আসতে হবে মেলাঘরে।

তবে তাই বলে গেরিলা তৎপরতা কিন্তু থেমে যায়নি।

নতুন আরো কিছু গেরিলা গ্রুপকে দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়েছে ঢাকার ভেতরে। হাবিবুল আলম শুনেছে সেরকম একটা দল নাকি ইতোমধ্যেই আস্তানা গেড়েছে সাভারের দিকে। এই গেরিলা গ্রুপের কমান্ডে আছে রেজাউল করিম আর নাসিরউদ্দীন ইউসূফ। মানিক আর বাচ্চু নামেই অবশ্য দুইজন বেশি পরিচিত। হায়দার ভাই এবার অস্ত্রের ঝুলিটা আরেকটু ভারী করে দিয়েছে এই গেরিলাদের। দুটা করে এলএমজির সাথে দেয়া হয়েছে দুই ইঞ্চির মর্টারও।

...সিগারেটটা শেষ হওয়া মাত্র মাঠের কোনায় কে যেন গান শুরু করল। হাবিবুল আলম সেদিকে তাকিয়ে মৃদু আলোতে বসে থাকা মানুষগুলোর মাঝে তারেকুল আলম আর মোর্শেদকে চিনতে পারে। মোর্শেদ ফতেহ আলির ছোট ভাই, মেডিক্যালে ফোর্থ ইয়ারে পড়ছিল। এখন কাজ করছে বিশ্রামগঞ্জ হাসপাতালে।

সন্ধ্যার পরে প্রায়ই ডাক্তার-নার্সেরা মিলে আড্ডা দেয় এই মাঠটাতে। মাঝে মাঝে হয়তো হায়দার ভাই আসেন, কখনো খালেদ মোশাররফ স্বয়ং। সেই দিনগুলোতে আড্ডা আরেকটু বেশি করে জমে ওঠে।

হাবিবুল আলম জানে, গান গেয়ে এই মানুষগুলোও নিজেদের ভুলিয়ে রাখার ব্যর্থ চেষ্টা করছে। চাইছে একটি অসম যুদ্ধের অস্তিত্ব বিস্মৃত হতে। ওরা সবাই চাইছে। সেই চেষ্টায় কখনো হাবিবুল আলমের ঠোঁটে সিগারেট, কখনো তারেকের গলায় গান।

কারো চোখেই ঘুম নেই, উনিশশো একাত্তরের আর একটি রাত বাড়ছে।

এক একটা দিন

শরণার্থী জীবনের প্রথম কয়েকটা মাস ছিল একরকম। তারা এসেছিল অভুক্ত অবস্থায়, জামা কাপড় ছিল ময়লা, চোখে বহু বহুদূর হেঁটে আসার ক্লান্তি। তারপরেও কলকাতার মানুষ তাদের বুকে নিয়েছিল পরম মমতায়। 'সে কী, আপনারা জয় বাংলার মানুষ? আসুন দাদা, আসুন!'

কলকাতা শহর তাদের আপন করে নিতে চেয়েছিল অনাবশ্যক দ্রুততায়। ভীমনাগের দোকানে কাউন্টারের ওপাশে বসা মানুষটা, শিয়ালদার বাইরে ট্যাক্সিচালক, বউবাজারের হোস্টেলের সিঁড়ি ঘরের পাঁড়েজি, সকলেই তাদের বীরের সম্বর্ধনা দিয়েছে, খাইয়েছে আগ বাড়িয়ে, আশ্রয় দিয়েছে যেচে পড়ে। আর এখন, এই অক্টোবর আসি আসি সময়ে এসে কেমন পালটে গেছে সব কিছু আবদুল বাতেনের মনে হয়।

হোস্টেলের স্টুডেন্ট ভাইদের মাঝেও এখন কেমন যেন রেষারেষি। দল হয়ে গেছে বেশ কয়েকটা। ছোটখাটো চায়ের কাপ বা সিগারেট নিয়েও মাঝে মাঝেই তুমুল কাণ্ড বেধে যায়। এখানকার লোকে সে দৃশ্য দেখে মুচকি হাসে আড়ালে। তাদের কাছেও আস্তে ধীরে প্রথম দিকের মোহ কেটে গিয়ে বাড়তি শরণার্থীর বোঝা হয়ে উঠছে অনাকাঙ্ক্ষিত। অবশ্য সেটা হবার বিস্তর কারণও তো আছে, আবদুল বাতেন ভেবে দেখে। পার্ক, ট্রাম, রাস্তা, ময়দান সবখানে ছড়িয়ে পড়েছে বাংলাদেশের উদ্বাস্তু মানুষেরা। ঘরহীন জয় বাংলার মানুষেরা গিজগিজ করছে যেদিকে চোখ যায়। কলকাতা এখন বিরক্ত।

'জয় বাংলা' কথাটা এখন বেশ চালু। সবকিছুর সাথে বাংলাদেশকে মিলিয়ে নেয়াটা এখানকার লোকজনের একটা অভ্যাস হয়ে গেছে। দোকানে গিয়ে সস্তার গেঞ্জি চাইলে দোকানি বলে জয় বাংলা গেঞ্জি, একদম ন্যাতানো নানখাটাই বিস্কুটগুলো হয়ে গেছে জয় বাংলা বিস্কুট। মাস দুয়েক আগে যখন শহরে চোখ ওঠা রোগ ছড়িয়ে গেল, তখন কলকাতার লোকে বলতে শুরু করল চোখে জয় বাংলা হয়েছে। জয় বাংলা মানেই যেন খুব ক্ষণস্থায়ী কিছু। আবদুল বাতেন এই অবজ্ঞার মানে ধরতে পারে না।

আবদুল বাতেন ফিরছে রিপন স্ট্রিট থেকে। মেসবাহ ভাই তাকে সেখানে পাঠিয়েছিলেন একটা কাজে, ভোরে উঠেই তাই সে রওয়ানা দিয়েছিল সেখানে। বউবাজার হোস্টেলের বাসিন্দারা আজকাল সকালে ঘুম থেকে বেশ দেরি করেই ওঠে। কারণ তারা বহু রাত পর্যন্ত জেগে থেকে উঁচু গলায় আলোচনা আর তর্ক করে। সে সময় ঘণ্টায় ঘণ্টায় চা বানাতে হয় আবদুল বাতেনকে। সকালে একটু দেরি করেই ইস্টুডেন ভাইরা ঘুম থেকে উঠবেন, খবরের কাগজটা ভাগাভাগি করে পড়বেন বাতেনকে তখন তাদের ফরমাশ খাটতে হবে, এই মোটামুটি আজকাল রুটিন।

হোস্টেলে ঢুকেই আবদুল বাতেন দেখল আরো একটা দিন শুরু হয়ে গেছে এখানে। ছেলেদের মাঝে কয়েকজন কাল রাতে শিয়ালদার ওদিকে কোথায় যেন একটা পথ নাটক করে এসেছে, শুধু তারাই ঘুমোচ্ছে খুব আরাম করে। বাকিরা দোতলার বড় ঘরটাতে বসে পত্রিকা কাড়াকাড়ি করছে এখন। পত্রিকায় আজকে বেশ বড় করে এসেছে ছবিসহ অ্যাপোলো-১৫ এর মহাকাশ অভিযানের বর্ণনা।

অ্যাপোলো-১৫ চাঁদ থেকে ফিরে এসেছে মাস দেড়েক আগেই। নাসা দাবি করছে এখনো পর্যন্ত এটাই চাঁদের মাটিতে মানুষের সফলতম অভিযান। ব্যাটারি-চালিত একটি গাড়িতে চাঁদের পাহাড়ি উপত্যকায় ঘুরে বেড়িয়েছেন তিনজন মহাকাশচারী, নিয়ে এসেছেন ৭৭ কেজি মাটি আর পাথর।

'একটা বিষয় বেশ চোখে পড়ার মতো।' মামুন নামের ছেলেটা বলে। 'খেয়াল করেছেন আপনারা, সোভিয়েত ইউনিয়ন আজকাল কিন্তু বেশ ভালোমতো ডিফিট খেয়ে যাচ্ছে মার্কিন বিজ্ঞানীদের সামনে। নাসার লাস্ট কয়েকটা অভিযানই খুব সফল হয়েছে। কোল্ড ওয়ারের এই সাইডটাতে দারুণ মার খাচ্ছে রাশানরা।'

'আমেরিকা আমেরিকা করে এত মাতামাতির কিছু নাই।' মাসুদ বলে। 'চাঁদের পাথরের জন্যে শালাদের যত দরদ, বাংলাদেশের জন্যে তার অর্ধেকটা থাকলে এতদিনে যুদ্ধ বন্ধ করে দিত পাকিস্তান। কেনেডি তো আসল গত মাসেই, কোনো চেঞ্জ দেখলা ওদের পলিসিতে?'

'মার্কিন পাবলিক সেন্টিমেন্ট কিন্তু আমাদের দিকেই। রবিশঙ্কর আর জর্জ হ্যারিসনের ওই কনসার্টের কথাই ধরো। এখন নিক্সন গভর্মেন্টের দায়ে সব আমেরিকানকে দোষ দেয়াটা তো আবার ঠিক হবে না তোমার।'

'শুধু মার্কিন দেশ ক্যান, সব দেশেই যত শুয়োরের বাচ্চাগুলা আছে সব গিয়ে যোগ দেয় গভর্মেন্টে।' মাসুদ মুখ বিকৃত করে ফেলে। 'আমাদের মোশতাক, জ্বি হ্যাঁ প্রবাসী সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এই হারামজাদা কী করছে শুনো নাই? কলকাতায় বইসেও শালা নাকি গোপনে যোগাযোগ করছে আমেরিকানদের সাথে! ব্যাটা আস্তা একটা দুইমুখা সাপ। জাতিসংঘে বাংলাদেশকে রিপ্রেসেন্ট করার ছুতায় বাইরে যাইতে পারলেই মতলব হাসিল করে ফেলতো ব্যাটা! এইসব মন্ত্রী নিয়া দেশ স্বাধীন হবার স্বপ্ন দেখি আমরা!'

খন্দকার মোশতাকের সাথে গোপনে মার্কিন যোগাযোগের খবরটা কীভাবে যেন ছড়িয়ে পড়েছে কলকাতায়। মাসুদের কথা শুনে আড্ডার শ্রোতা আলাউদ্দীন ভেবে দেখে, ইন্ডিয়ান ইন্টিলেজেন্স ছাড়া আর কারো পক্ষে সম্ভব নয় এই খবর ফাঁস করা।

তবে খবরটা ছড়িয়ে যাবার সাথে সাথেই জাতিসংঘে পাঠানো প্রতিনিধি দল থেকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোশতাককে। নিউইয়র্কে সেই দলটিকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন আবু সাইদ চৌধুরী। পুরো ব্যাপারটাতে অসম্ভব বুদ্ধিমত্তার পরিচয়

দিয়েছেন তাজউদ্দীন, আলাউদ্দীনের মনে হয়। খন্দকার মোশতাককে পদচ্যুত করলেই দলের অন্তর্গত বিরোধটা বেরিয়ে যেত, সাথে বাইরের বিশ্বে বিরূপ প্রচারের বিষয়টা তো আছেই। কৌশলে মোশতাককে ক্ষমতাহীন করে ফেলাটাই অনেক বেশি যৌক্তিক সিদ্ধান্ত হয়েছে।

'মোশতাক আসলেই একটা সলিড মীরজাফর।' খোরশেদ ভাইকে বলতে শোনে আবদুল বাতেন। 'আওয়ামী লীগের নুরুল ইসলাম সাহেবের সাথে খাতির আছে আমার, সেদিন দেখা করতে গেছিলাম ওনার সাথে। উনি আমারে ইন্টারেস্টিং একটা ঘটনা শুনাইলেন। সিআইটি রোডের মোশতাকের ফ্ল্যাটে গেছিলেন একদিন তিনি। মোশতাক নাকি নুরুল ইসলাম সাহেবকে দেখেই হাউমাউ করে কেঁদে দিল। একেবারে সিনেমার স্টাইলে কাঁদতে কাঁদতে বলল, না না নুরু, আমি আর বাঁচতে চাই না। এ জীবন রেখে আমার আর কী হবে! মুজিব ভাই বেঁচে না থাকলে আমাদের আর বেঁচে থেকে কী লাভ!

... নুরুল ইসলাম সাহেব তো প্রথমে কিছুই বুঝলেন না, একদম থ হয়ে গেছিলেন। কিছুদিন পরেই শুনলেন, আমেরিকার মাধ্যমে নাকি পাকিস্তান রফা করতে চায়। তবে প্রবাসী সরকার মুক্তিযুদ্ধ চালায়ে গেলে নাকি শেখ সাহেবকে তারা মেরে ফেলবে। ইটস এইদার শেখ মুজিব অর দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্স অব বাংলাদেশ।

কানেকশনটা পরিষ্কার না এখন? মোশতাকের গোপন যোগাযোগের খবরটা ফাঁস হবার পরেই আসলে ক্লিয়ার বোঝা যাচ্ছে ওই নাটকটার কারণ। হারামজাদা এইরকম একটা রফা করবার তালে ছিল এতদিন।'

মেসবাহ ভাই কথা বললেন এবার। 'হ্যাঁ, এইটা স্বীকার করতেই হয় যে, সরকারের আরো ফাইন টিউনিং করার সুযোগ আছে। মন্ত্রীদের সবার মধ্যে যে সমন্বয়ের অভাব আছে, সেটা নানাভাবেই দেখা যাচ্ছে। তবে আস্তে আস্তে সবকিছু একটা পরিকল্পনার মাঝে চলে আসছে, এটাও ঠিক। এই তো কয়েকদিন আগেই যেমন ন্যাপ-সিপিবির ছেলেদের সরাসরি যুদ্ধে রিক্রুটের সিদ্ধান্ত নেয়া হলো, আমার তো মনে হয় এটা একটা দারুণ কাজ হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধে তো দলমত নির্বিশেষে সবারই সুযোগ পাওয়া উচিত।'

'এখানে আমার একটা কথা ছিল মেসবাহ।' খোরশেদ বলে। 'তোমার কথা ঠিক, মুক্তিযুদ্ধটা কোনো দলের একার না। কিন্তু রাজনৈতিক মতাদর্শটা একেবারেই উড়ায়ে দেবার মতো কিছু না। যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হইলে আগুনে পুড়ে পুড়ে যোদ্ধারাও খাঁটি হয়ে যাবে। আমি তাই একদম বেছে বেছে খুব ডিভোটেড ছেলেদের রিক্রুট করার পক্ষপাতী। হরে দরে সবাইকে এক করে দেখলে আমাদের না দেশ স্বাধীন হবার পর পস্তাতে হয় আবার!'

'উপদেষ্টা কমিটি নিয়ে কী মনে হয় তোমাদের?' আলাউদ্দীন চোখ সরু করে খোরশেদের দিকে তাকিয়ে প্রশ্নটা করে।

জাতীয় উপদেষ্টা কমিটি গঠিত হয়েছে কয়েক সপ্তাহ আগে। পাঁচ দলের মধ্যে আওয়ামী লীগ ছাড়া আছে ভাসানী আর মোজাফফর, দুই ন্যাপ, মনোরঞ্জন ধরের জাতীয় কংগ্রেস আর মণি সিংহের কমিউনিস্ট পার্টি। কাগজে কাগজে কমিটির মিটিং এর ফটো এসেছে বেশ ফলাও করে, আলাদা করে চোখে পড়ে মওলানা ভাসানীর ছবিটি।

'স্টান্ট, পিওর স্টান্ট এইসব।' মাসুদ যেন প্রশ্নটার জবাব দেয় খোরশেদের কথা কেড়ে নিয়ে। 'কমিটিতে সব দলের মতের দাম কি সমান আছে মনে করছো? একদম না। আওয়ামী লীগ বাদে বাকি চার দল তো লোক দেখানোর জন্যে। মওলানা ভাসানীরে কুমির ছাও দেখানোর মতো দুনিয়ারে জানানো যে সব ঠিকঠাক। কিন্তু মওলানা যে ইন্ডিয়ার হাতে বন্দী, এইটা এতদিনে তো দিনের আলোর মতো পরিষ্কার...'

'বাজে কথা।' মাসুদের কথা দৃঢ় স্বরেই উড়িয়ে দিল খোরশেদ। 'কমিটির সামর্থ্যের ব্যাপারটা নিয়া তোমার সাথে অনেকটাই আমি একমত কিন্তু ইন্ডিয়ান গভমেন্ট ভাসানীরে আটকায়া থুইসে, এইটা একদমই ভুল ধারণা। মওলানা এইবার কলকাতায় আসার পর আমিই হাজরা স্ট্রিটে গেছিলাম তার সাথে দেখা করতে। হুজুর নিজ মুখে আমারে বললেন বুজলা কুরশেদ, আমারে নিয়া হিন্দুস্তান এক জটাজালে জড়ায়া পইড়ছে। পেপার, কনফারেন্স কোনো কিছু দিয়াই বুঝাইবার পারছে না যে আমি মুক্ত।'

মাসুদ ঠোঁট উলটে বলে, 'হুহ। তবে সর্বদলীয় উপদেষ্টা কমিটি নামের অকর্মণ্য জিনিসটা না বানায়ে বরং সর্বদলীয় মন্ত্রিসভা গঠন করলে লাভ ছিল। সবার কথার একটা ওজন থাকত তখন।'

খোরশেদ হেসে ফেলল এই কথায়। 'মাই ডিয়ার মাসুদ, তোমার এই প্রস্তাব আবারো পালটা যুক্তিতে আটকায়া গেল। এইবার যুক্তিটা দিছেন মওলানা স্বয়ং। কী, অবাক হইতেসো? শুনো, মোজাফফর ন্যাপ বা কংগ্রেস, এরা তো সর্বদলীয় মন্ত্রিসভা করার জন্যে প্রেসার কম দেয় নাই। মওলানা উলটা বরং তাদের ইলেকশনে হারের ব্যাপারটা মনে করায়া দিসেন। বলছেন, হারু পার্টির দল! ইলেকশনে হাইরা আবার মুজিবনগরে বইসা মন্ত্রী হবার স্বপ্ন দেখো, লজ্জা করে না!'

আলাউদ্দীন খুব মন দিয়ে এতক্ষণ শুনছিল এই কথোপকথন। খোরশেদের কথা বলার ভঙ্গিতে সে হেসে দিল এইবার। বলল, 'ইন্ডিয়ান গভমেন্ট শুনলাম একটা সিনেমা ইউনিট পাঠাইছে মওলানার কাছে। তারে নিয়া একটা প্রামাণ্য চিত্র টাইপ বানাইবো।'

দীর্ঘক্ষণ উপুড় হয়ে অ্যাপোলো -১৫ নিয়ে ব্যস্ত থাকা মেসবাহ ভাই ঝট করে উঠে বসলেন সিনেমা শব্দটা শুনেই। 'হায় আল্লাহ, দেরি হয়ে গেল তো!! আরে সবাই দেখি ভুলে বসে আছো, আজকে জহির ভাই দুপুরে যেতে বলে দিয়েছেন না? আরে মনে নাই, টাউন হলে আজকে স্টপ জেনোসাইড-এর প্রাইভেট শো? এই, চটপট রেডি হয়ে নাও সবাই। ইশ, সাড়ে বারোটা বাজে। দেরি হয়ে গেছে অলরেডি!'

হোস্টেল ঘরে ব্যস্ততা বেড়ে যায়। জহির ভাইয়ের অনুরোধ তো আর ফেলে দেয়ার মতো না। প্রস্তুত হতে থাকে সকলে মিলে। আবদুল বাতেন তলানি পড়ে থাকা চায়ের কাপগুলো নিয়ে যেতে যেতে এই তাড়াহুড়ো দেখে। এমনকি তার কাছেও জহির ভাইয়ের নামটা বেশ পরিচিত আজকাল। কিছুদিন আগে মেসবাহ ভাইয়েরাই তাকে সিনেমা হলে নিয়ে দেখিয়েছিলেন জহির ভাইয়ের 'জীবন থেকে নেয়া'।

সিনেমার এক জায়গায় তো বাতেনের চোখে পানিই চলে এসেছিল। মধু'র মৃত্যুদৃশ্যটায়। তার মনে হয়েছিল, সে আর মধু দুইজনে কোথায় যেন একদম মিলে যায়!

আকাশের কাছে

সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে রিমি বলল, 'জানো, আমরা না পরশুদিন বিকালে সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম। জহির রায়হানকে চিনো? উনি কিন্তু খুব নামকরা মানুষ! সিনেমা বানায় বাংলাদেশে। উনি নিজে আমাদের নিয়ে গিয়েছিলেন সিনেমা দেখাতে!'

চোখজোড়ায় একরাশ বিরক্তি নিয়ে মিঠু পেছন ফিরে তাকাল। এরপর ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বলল, 'হুশ, শব্দ করো না। মালি এসে পড়লে পিট্টি দিবে কিন্তু!'

রিমি এই ছোটখাটো ধমকটা খেয়ে একটু দমে গেল। আসলেই তো, বোকামি হয়ে গেছে! প্রত্যেকদিন তো আর ছাদে উঠার সুযোগ পাওয়া যায় না।

যে বাড়িতে ওরা থাকে, সেটার ছাদে যাবার সিঁড়িটা বলতে গেলে প্রায় সারাদিনই বন্ধ থাকে। কেবল প্রতিদিন সন্ধ্যার আগে মালি আসে ছাদে। ছোট একটা বালতি, মগ আর কাস্তে না খুরপিকী একটা জিনিস নিয়ে রোজ ঘণ্টাখানেক সময় ছাদে কাটায় সে। মালি লোকটা যা ভয়ানক রাগি! ছাদে উঠতে দেয়া দূরে থাক, সিঁড়ির পাশে গেলেই জোরে চিৎকার দিয়ে তেড়ে আসে। তবে আজকে আর ওদের আটকানো যায়নি। বিকেল বেলা সিঁড়িটা খোলা পেয়েই পা টিপে টিপে রিমি আর মিঠু উঠে এসেছে ছাদের দিকে।

ছাদে ওঠা মাত্রই রিমির মনের গুমোট ভাবটা কেটে গেল। কত্ত বড় ছাদ আর সাথে কী ভীষণ নীল রঙের আকাশ! ঠিক কতদিন পর এরকম খোলা আকাশ দেখার সুযোগ মিলল সেটা রিমি নিজেও মনে করতে পারে না কিছুতেই। যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবার পর আর এভাবে দেখা হয়নি, এইটুকু মনে পড়ে শুধু।

একটা ছোটখাটো বাগান করা আছে ছাদ জুড়ে। অনেকগুলো ছোট টবে নানা রকমের গাছ সাজিয়ে রাখা। মালিটা নিশ্চয়ই এই গাছগুলোরই দেখাশোনা করে প্রতিদিন। মিঠু আর রিমি আস্তে আস্তে ছাদের রেলিং এর কাছে চলে যায়। মিঠু হাত উঁচিয়ে দূরে কী যেন দেখায়, 'রিমি, ওই-ই-ই দ্যাখো!! ওই-ই যে!! ...দেখলে? ওটাই হাওড়া ব্রিজ, তুমি তো এখনো দেখতে যাওনি!'

মিঠুরা সি আই টি রোডের বাড়িতে রিমিদের ঠিক পাশের ফ্ল্যাটেই থাকে। ওরা দুই বোন। মিঠু আর সোমা। ওদের দুইজনের বয়সও রিমি আর মিমির প্রায় সমান। রিপি যদিও ওদের থেকে একটু বড়, কিন্তু তার সাথেও কিন্তু মিঠু-সোমাদের ভালো বন্ধুত্ব। স্কুলের সময়টা বাদ দিলে, ওরা পাঁচজনে বলতে গেলে সারাদিন একই সাথে থাকে আজকাল। এমনকি ছোট্ট সোহেলের সাথেও ভীষণ খাতির মিঠুদের বাসার সবার।

ওরা দুই বোন ছাড়া, মিঠুর বাবা-মা আর দাদু থাকেন তাদের ফ্ল্যাটে। সোহেল করে কি, প্রত্যেকদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই ওদের ফ্ল্যাটের দরজার দিকে রওয়ানা দেয়। ওইটুকু পিচ্চি হাতে ওদের দরজার জোরে জোরে কড়া নাড়ে। সাথে 'মামা, মামা!' বলেও ডাকে।

তবে সোহেল বা রিমি না, মিঠুর বন্ধুত্ব আসলে সবচেয়ে বেশি রিপির সঙ্গেই। মিঠুটা রিপি দিদির কথা বলতে অজ্ঞান, আর রিপিও মিঠুর জন্যে একেবারে পাগল। বইয়ের বাইরে রিপি বোধহয় মিঠুকেই সবচেয়ে বেশি সময় দেয়। এমনিতে তো রিপি সারাদিন বই নিয়েই আছে। এত্ত ভাবুক হয়ে থাকে রিপি, যে নিজের বড় বোনকেও রিমির মাঝে মাঝে অনেক দূরের অচেনা কেউ মনে হয়। মনে হয় রিপি অনেক জ্ঞানী কেউ। আর বই পড়ে দেখে ও অনেক বিষয় নিয়েই কথা বলতে পারে মানুষের সাথে। মিঠুর দাদুর সাথেও কেমন চটপট করে কথা বলে রিপি। বই নিয়ে ওদের কথাবার্তার অনেক কিছুই বুঝতে পারে না রিমি। অথচ আলোচনায় রিপি কেমন তুখোড়!

দাদু মানুষটাকেও রিমির খুব উদার মনে হয়। প্রাণখোলা। রিমি, সোহেল মাঝে মাঝে পূজার ফুলে হাত দিয়ে দিলেও রাগ করেন না। অথচ অন্যরকম অভিজ্ঞতাও তো আগে হয়েছে রিমির। ঢাকায় থাকার সময় রিমিরা যখন মাঝে মাঝে লক্ষ্মীবাজারে ছোট কাকুর বাসায় যেত, তখন পাশের বাড়ির বিপ্লবের সাথেও খেলতে যেত সে প্রায়ই। বিপ্লবের যে দাদু ছিলেন, উনি আবার ছিলেন মিঠুর

দাদুর একদম উলটো। তিনি খুব খেয়াল রাখতেন যেন রিমি পূজার ঘরের সামনে গিয়ে কিছু ধরে না ফেলে।...

'রিমি, এদিকে এসো! দেখো, দেখো, ভেতরে কী দেখা যায়!' মিঠুর ডাকে ছাদের রেলিং ছেড়ে রিমি এগিয়ে যায় চিলেকোঠার দিকে।

মিঠু আসলে উঁকি মারছে চিলেকোঠার সাথে লাগানো আরেকটা ঘরে। দরজাটা বন্ধ তালা দিয়ে। কাচের জানালা দিয়ে ঘরের ভেতরের অল্প একটু অংশ দেখা যাচ্ছে। সেখানেই কিছু একটা দেখে মিঠু খুব উত্তেজিত।

'কই, দেখি কী দেখলে!' বলে পায়ে ভর দিয়ে জানালায় চোখ রাখতেই রিমি চমকে পিছিয়ে আসে। চাপা একটা চিৎকারের সাথে তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে, 'এ কী! এটা তো একটা কঙ্কাল!'

মিঠুও খুব চমকে গেছে। 'কিন্তু ছাদের ঘরে কঙ্কাল কীভাবে এলো?'

রিমির ছোট্ট মাথায় তখন তীব্র চিন্তা ভাবনা চলছে। প্রচুর ডিটেকটিভ বই পড়ার কারণে তার মাথায় সবসময় বুদ্ধি গিজগিজ করে। রিমি ভাবে, বইয়ের গোয়েন্দারা এই অবস্থায় কী করত? কীভাবে দিত এই কঙ্কালের ব্যাখ্যা? উত্তর বের করে নিতে খুব বেশি সময় লাগে না তার।

নিশ্চয়ই এই ঘরে কেউ কাউকে খুন করেছে! এই কঙ্কাল সেই খুন হওয়া লাশের, নিশ্চিত! আর লাশ যখন আছে, খুনিও তো থাকতেই হবে। কিন্তু সেই খুনিটা কে হতে পারে? জবাব খুঁজে পেতে দেরি হয় না এইবারও। এটা তো একদমই সহজ! ছাদের ঘরের চাবি তো একমাত্র ওই মালিটার কাছেই আছে। যে লোক এরকম চেঁচামেচি করে সবসময়, সে কি খারাপ মানুষ না হয়ে পারে? আর দেখো না, কাউকে ছাদের ঘরের কাছেও আসতে দিতে চায় না লোকটা। খুনি ছাড়া অন্য কারো তো এরকম করবার কথা নয়!

পুরো ব্যাপারটার ব্যাখ্যা খুঁজে পেয়ে রিমির খুব হালকা লাগে। মুখ খুলে সে মিঠুকে সব কথা বলতে গেছে মাত্র, তখনই পেছন থেকে কে যেন জোরে ধমক দিয়ে ওঠে ওদের। 'হেই, এইখানে কী করো? ছাদে উঠা নিষেধ জানো না?'

সেই মালি! রিমি তাকিয়ে দেখে মিঠু ততক্ষণে ছুটতে আরম্ভ করেছে। 'রিমি, পালাও, পালাও।'

তাড়া দেবার দরকার ছিল না, রিমির পা জোড়াও ততক্ষণে তাকে ছুটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে জোরে! ছুট, ছুট, ছুট! ছুটতে ছুটতে একেবারে তিনতলায় লিফটের সামনে এসে থামে ওরা। ভাগ্যিস সিঁড়িতে কেউ ছিল না। যে জোরে দৌড়েছে তারা, কারো সাথে ধাক্কা লাগলে হাত পা ভাঙাটাও আশ্চর্যের ছিল না।

ওদের শব্দ করে শ্বাস নেয়া তখনো শেষ হয়নি, হাঁপাচ্ছে দুজনেই। ঠিক এমন সময় ঘটাং আওয়াজে লিফটের দরজাটা খুলে গেল। কয়েকজন মানুষ বেরিয়ে এলেন ভেতর থেকে।

এ বাড়িতে একটা বেশ বড় লিফট আছে। সবসময় একজন লিফটম্যানও থাকে, লিফটের ভেতরেই একটা টুলে বসে থাকে লোকটা। লোকটা কথা খুবই কম বলে, তবে প্রায়ই রিমিদের দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসে। কেন জানি লোকটা দেখে রিমির তাকে ভারি মজার মানুষ বলে মনে হয়।

লিফটম্যান রিমি আর মিঠুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'খুব দৌড়াদৌড়ি করছো বুঝি?'

রিমি কিছু বলবার আগেই মিঠু হড়বড় করে লোকটাকে বলে বসল, 'জানেন, আমরা ছাদে একটা কঙ্কাল দেখেছি। এরপরেই মালি আমাদের ভাগো ভাগো বলে সরিয়ে দিল!'

লোকটা এক গাল হেসে বলল, 'ও! সমীর বাবুর কঙ্কাল দেখেছো তোমরা? ভয় পেয়েছো নাকি?'

মিঠু আর রিমি অবাক হয়ে পরস্পরের দিকে তাকায়। 'সমীর বাবুটা আবার কে?'

'সমীর বাবুকে চেনো না? এই যে বাড়ি, এ বাড়ির মালিকের ছোট ছেলে সমীর বাবু। উনি মেডিক্যালে পড়েন, ডাক্তারি। পড়াশোনার সুবিধার জন্যে চিলেকোঠার নিরিবিলিতে গিয়ে থাকেন। যে কঙ্কাল দেখেছো, সেটা ওনার পড়ার ঘরের বইপত্রের সাথে আছে।'

রিমি মনে মনে খুব লজ্জা পেল। ভাগ্যিস, সে মিঠুকে তার ভাবনাটার কথা জানিয়ে দেয়নি। কঙ্কালটার পেছনে যে এমন সহজ একটা কারণ থাকতে পারে, এটা তার মাথাতেই আসেনি!

'কী খুকি, খুব ভয় পেয়েছো?' লিফটম্যান লোকটা ওদের তাকিয়ে আবারো মুচকি হাসে।

লোকটার হাসি দেখে রিমির খুব ভালো লাগে। আজকে আসলে সবকিছুই ভালো লাগছে। এমন চমৎকার একটা নীল আকাশ দেখে আসার পরে কোনো কিছু আর খারাপ লাগতে পারে?

রিমির হঠাৎ ঢাকার আকাশের কথা মনে পড়ে যায়। ঢাকার আকাশ কি আজ কলকাতার আকাশের মতোই নীল? ঢাকার রাস্তাগুলোর অবস্থা কী, রিমির স্কুলটা ভালো আছে তো?

ঢাকা, তুমি কেমন আছ?

সেই লম্বাটে মুখ, সেই একহারা গড়ন। চোখে কেবল চশমাটাই নেই, নইলে বাকি অবয়বে অদ্ভুত সাদৃশ্য দেখা গেল। বয়েসেও খুব বেশি এদিক-ওদিক হবে বলে মনে হচ্ছে না। সারির প্রথম মুক্তিযোদ্ধাকে দেখে শেখ কামালের কথা মনে পড়ে যায় তাজউদ্দীনের।

মুক্তিযুদ্ধের বিস্তৃত বইয়ের পাতায় আরো একটি নতুন অধ্যায় খুলেছে গতকাল। একদল তরুণ অফিসার কমিশন পেয়ে ক্যাডেট পদে উন্নীত হয়েছে, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ইতিহাসে এটাই প্রথমবার। তাজউদ্দীন গিয়েছিলেন সেই প্রথম ব্যাচের সমাপনী কুচকাওয়াজে, একা নন, সাথে নজরুল ইসলামও ছিলেন। কর্নেল ওসমানীর সামনে ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতিকে স্যালুট ঠুকে গেছে যে জওয়ানেরা, তাদের মাঝে মুজিব তনয় শেখ কামালও ছিল।

শেখ কামালের মুখ তাজউদ্দীনকে এক ঝটকায় মনে করিয়েছিল মুজিব ভাইকে। ইচ্ছে করছিল, কামালকে জড়িয়ে ধরে খানিকটা কেঁদে নেন। অথচ সেই মুহূর্তে অনুভূতিগুলোকে পকেটে রেখে নিরাবেগ চোখে শেখ কামালের সাথে হাত মেলাতে হয়েছে তাজউদ্দীনকে। ব্যক্তির চাদরটা রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনকালে কখনোই গায়ে জড়ান না তাজউদ্দীন। এখন আবার এই নাম না জানা মুক্তিযোদ্ধাটি শেখ কামালের মুখশ্রী মনে করাচ্ছে। তাজউদ্দীনের মনে হয়, স্মৃতির খেলা বড় অদ্ভুত!

এক মুহূর্ত বিলম্ব করে তাজউদ্দীন মুক্তিযোদ্ধাটির সাথে হাত মেলালেন, এরপর এগিয়ে গেলেন সামনে।

বাংলাদেশের উত্তরে প্রায় একশো বর্গমাইল জুড়ে মুক্তিযোদ্ধারা গড়ে তুলেছে মুক্তাঞ্চল। আমীর-উল ইসলাম, মতিউর রহমান, আলী তারেকদের সঙ্গে নিয়ে তাজউদ্দীন এসেছেন এই মুক্তাঞ্চল পরিদর্শনে। বিপুল উদ্দামে মুক্তিযোদ্ধারা সারি ধরে দাঁড়িয়ে গেছে তাদের গার্ড অব অনার দিতে।

তাজউদ্দীন এগিয়ে যাচ্ছেন যোদ্ধাদের সাথে হাত মিলিয়ে, প্রশ্ন করছেন তাদের। ক্যাম্পের কী অবস্থা, মনোবল কেমন এখন যোদ্ধাদের। ঘর পালিয়ে আসা শেখ কামালের মতো যোদ্ধাদের অনেকেই প্রধানমন্ত্রীকে কাছে পেয়ে উত্তেজিত। কোনো সমস্যা গ্রাহ্য করে না তারা, কেবল ভুগছে অস্ত্রের সংকটে। ভারতের দেয়া সীমিত অস্ত্রে চলছে না ওদের। পর্যাপ্ত অস্ত্র দেয়া হলে পাকিস্তানি হানাদারদের একমাসের ভেতরেই বাংলাদেশ থেকে হটিয়ে দেবে ওরা, এমন দাবিও করে বসে কয়েকজন। যোদ্ধাদের এমন আত্মবিশ্বাস দেখে তাজউদ্দীনের কী যে ভালো লাগে!

কিশোর এক মুক্তিযোদ্ধার ওপর চোখ আটকে গেলে দাঁড়িয়ে যান তাজউদ্দীন। ছেলেটির হাতে ধরা অটোমেটিক মেশিনগানে আলতোভাবে স্পর্শ

করে মৃদুস্বরে তাজউদ্দীন তার নাম জানতে চান। এরপরে জিজ্ঞাসা করেন, 'কত বয়েস তোমার, ভাই?'

'আঠারো।'

তাজউদ্দীন পাশে থাকা সেক্টর কমান্ডারের দিকে প্রশ্নের দৃষ্টিতে চাইলেন।

উইং কমান্ডার বাশার কানের কাছে মুখ এনে বলল, 'মিথ্যা বলতেছে, স্যার। চৌদ্দ বছর বয়স ওর। তবে স্যার ছেলেটা এক্কেবারে গোল্ড মাইন। সাতটা অপারেশনে গেছে অলরেডি, প্রত্যেকটাই সাকসেসফুল!'

কথোপকথন যে তাকে ঘিরেই আবর্তিত হচ্ছে, তা বুঝতে পেরেই যেন ছেলেটি বলে উঠে, 'আমারে বাদ দিয়েন না স্যার! বয়স কম হইলেও আমি যুদ্ধ করবার পারি।'

'কেউ তোমাকে বাদ দেবে না ভাই।' তাজউদ্দীন গম্ভীর স্বরে জবাব দেন। আর মনে মনে বলেন, দেশকে ভালোবাসার, দেশের জন্যে জীবন বাজি রাখার অধিকার তোমার তো কারো চাইতে কম না। আমি তোমায় ফিরিয়ে দেই কোন অধিকারে?

সেক্টর কমান্ডার পথ দেখিয়ে তাদের সামনে নিয়ে যেতে থাকেন। করমর্দনের পালা শেষ হয়। অল্প দূরের তীব্র খরস্রোতা নদীটি দেখিয়ে স্থানীয় সেনাপ্রধান বলেন, 'স্যার, আমাদের ডিফেন্স লাইন নদীর ঐপারে।'

'চলেন, ডিফেন্স লাইনের ছেলেদের একবার দেখে আসি।' তাজউদ্দীন প্রস্তাব করেন।

'ব্যাপারটা রিস্কি হয়ে যাবে কিন্তু স্যার।' সেনা সদস্যটি অপ্রস্তুত স্বরে বলেন। 'মানে স্যার, ডিফেন্স লাইনের থেকে দুই মাইল দূরেই পাকিস্তানিরা ক্যাম্প করছে। আপনি আসছেন শুনলে ওরা ঝাঁপায়ে পড়তে পারে স্যার। আর স্যার নদী পার হবার জন্যে নৌকা-টৌকা কিছু নাই এখন। আমরা ইউজুয়ালি ঐ কলাগাছের ভেলাগুলাই কাজে লাগাই...'

সৈনিকটির কথা শেষ হতে পারে না, তাজউদ্দীন তার আগেই গিয়ে চড়ে বসেন একটা কলাগাছের ভেলায়। একলাই। সফরসঙ্গীরা চমকে উঠলেও ততক্ষণে কিছু করার থাকে না তাদের। এই তীরে আর কোনো ভেলাও দেখা যাচ্ছে না এই মুহূর্তে।

নদীটি স্রোতস্বিনী। স্রোতের প্রমত্ততায় কলাগাছের ভেলা মাঝ নদীতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে চক্কর খেতে থাকে, সামনে আর যেতে পারে না।

জনসংযোগ অফিসার আলী তারেকের উত্তেজিত 'হায় আল্লাহ, আটকায়া গেল তো! এখন কী হবে!' এই অনুযোগে সাড়া দিয়েই যেন নদীর অপর পাশ থেকে তাজউদ্দীনের সাহায্যে এগিয়ে আসে দুইজন মুক্তিযোদ্ধা। বলিষ্ঠ দেহের সাঁতারে তারা হাতে ধরে নিয়ন্ত্রণ করে ভেলাটিকে। বিরুদ্ধ স্রোত ঠেলেই ভেলাটিকে নিয়ে

যায় অপর পারে। এপারে অপেক্ষারত মানুষগুলোর মুখে উৎকণ্ঠা। তাজউদ্দীন নিরুদ্বেগ, তার মুখে কোনো বিকার নেই। কেবল মিনিট চল্লিশেক পর, যখন ডিফেন্স লাইনের সমস্ত অতন্দ্র প্রহরীর সাথে হাত মিলিয়ে তাদের ভালোমন্দের খবর নিয়ে ফিরে আসছেন তিনি, তখনই তাজউদ্দীনের মুখে দেখা যায় পরিতৃপ্তি।

যুদ্ধদিনের সেনাপতি ছুটে বেড়াতে থাকেন বাঙ্কার থেকে বাঙ্কারে। প্রত্যক্ষ করেন ভবিষ্যতের ইতিহাস অ্যালবামের এক একটি স্ন্যাপশট।

কোথাও দেখা যায় বাঙ্কার ভরে গেছে বর্ষার জলে। তার মাঝেই কোমর পর্যন্ত পানিতে ডুবে অস্ত্র হাতে সতর্ক পাহারায় আছে মুক্তিবাহিনী। কোথাও প্রধানমন্ত্রীর আগমনে উদ্দীপ্ত যোদ্ধাদের মর্টার গর্জায়। কোথাও দেখা যায় একেবারেই তৃণমূলের গ্রামবাসীদের, বাঁশের সাথে ঝোলানো বড় আকারের পাত্রে তারা রান্না করে খাবার আনছে মুক্তিবাহিনীর জন্যে। এইসব দেখতে তাজউদ্দীনের খুব ভালো লাগে।

কখনো কখনো তাজউদ্দীন দুরবিনে চোখ রাখেন, কয়েক পলকে দেখে নেন হানাদার বাহিনীর অবস্থান বা মুক্তিযোদ্ধাদের ঘাঁটি। কখনো কখনো 'জয় বাংলা' স্লোগান দিয়ে পথের ধারে জমে যায় গ্রামবাসীর ভিড়, তাজউদ্দীন তাদের সাথে কথা বলেন, শোনান একের পর এক যুদ্ধ জয়ের খবর। ট্রেনিং ক্যাম্পে দেখা যায় গেরিলা যুদ্ধ শিক্ষার্থীদের প্রায় সবাই টার্গেটে প্র্যাকটিসে দ্রুত হয়ে উঠছে অর্জুন। মাত্র সপ্তাহ দুয়েক আগেই যারা মেশিনগান হাতে নিয়েছে, তাদেরও প্রায় সবাই পাঁচ বারের মাঝে চার বারই বুলেট পাঠাচ্ছে ঠিক নিশানায়।

প্রধানমন্ত্রী আসেন হাসপাতালের আহত মুক্তিযোদ্ধাদের দেখতে। হানাদারদের মর্টার শেল গুঁড়িয়ে দিয়েছে যার হাতজোড়া, তাজউদ্দীন সেই সৈনিকটির বিছানার পাশে বসেন। জড়িয়ে ধরে বলেন, 'ভাই, এই দেশের সৌভাগ্য সে তোমার মতো যোদ্ধাদের পেয়েছে। জানি, তোমার যা ক্ষতি হয়েছে, কোনো কিছু দিয়েই তা পূরণ করতে পারবো না। তারপরেও, তুমি কিছু চাও ভাই? কিছু লাগবে তোমার?'

সৈনিকটি প্রধানমন্ত্রীকে জবাব দেয়, 'আমি যা চাই, সেটা তো আপনি দিতে পারবেন না। পারবেন?'

তাজউদ্দীন অবনত মুখে বসে থাকেন। সৈনিকটি চিবিয়ে চিবিয়ে আবার বলে, 'স্যার, পারলে প্লাস্টিক সার্জারি করে আমার হাত দুটোকে আবার ভালো করে দেন। আমি আবার যুদ্ধে যাইতে চাই।'

...করমর্দন, পরিদর্শনের পালা শেষ হলে আসে খাবার সময়। প্রধানমন্ত্রীর আগমন উপলক্ষে আজকে ভালো খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছে ক্যাম্পে। দলবল নিয়ে খেতে বসেন তাজউদ্দীন। সেনানায়কদের প্রশ্ন করেন, 'আমাদের ছেলেরা খেয়েছে ঠিক মতো?'

'জ্বি স্যার, চিন্তা করবেন না। ওদের বাইরে খেতে দেয়া হয়েছে, সবাই খাচ্ছে।'

তাজউদ্দীন খাবার রেখে বেরিয়ে যান বাইরে। খানিক অপেক্ষার পরেও যখন তিনি ফিরে আসেন না, তখন একান্ত সচিব মতিউর রহমান নিজেই বাইরে চলে যান স্যারকে খুঁজতে।

দেখেন, প্রধানমন্ত্রী খাচ্ছেন মাটিতে সারি বেঁধে বসা মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে নিয়ে। তাজউদ্দীনের দুই পাশে বসা মুক্তিযোদ্ধাদ্বয় এই বিরল সম্মানে আড়ষ্ট, কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। হাতের টিনের থালা থেকে এক টুকরো মাংস তিনি তুলে দিলেন পাশের জনের পাতে।

মতিউর রহমানের একটি হাতঘড়ির কথা মনে পড়ে, তাজউদ্দীনের হাতঘড়ি।

মাসখানেক আগে মতিউর রহমান প্রথম খেয়াল করেন তাজউদ্দীনের হাতঘড়ির দিকে। ঘড়িটির সময় ঠিক নেই। এক-দুই-পাঁচ মিনিট নয়, সেখানে আধঘণ্টার ফারাক। মতিউর রহমান তখন তাজউদ্দীনকে সেই সময় পার্থক্যের দিকে ইঙ্গিত করে বলেছিলেন, 'স্যার আপনার ঘড়িটা তো স্যার ঠিক টাইম দিচ্ছে না। ব্যাটারিটা ঠিক আছে তো স্যার? বাজারে গেলে নিয়ে আসবো নতুন একটা ব্যাটারি?'

'ও, ওইটা?' তাজউদ্দীন হেসে জবাব দিয়েছিলেন। 'ঘড়িটা আমি ইচ্ছা করেই এই টাইমে সেট করেছি মতিউর রহমান সাহেব। এই ঘড়ি বাংলাদেশের সময় দিচ্ছে। যুদ্ধে দেশের মাটি হারিয়েছি, কিন্তু দেশের সময়টাকে তো আর হারাই নাই। হারাতে চাইও না, তাই এই সময়টা ফলো করি।'

রণাঙ্গনের প্রধানমন্ত্রীকে দেখতে দেখতে মতিউর রহমানের বড় অবাক লাগে। কোনো এক অদ্ভুত উপায়ে এই মানুষটি তার সমগ্র সত্তায় মুক্তিযুদ্ধ আর স্বদেশ ছাড়া অন্য কোনো ধারণাকেই ঠাঁই পেতে দিচ্ছেন না।

এই রোলারকোস্টার সময়ের জটিলতায় তাল রাখতে না পেরে ঘড়িও যেন এগিয়ে গেছে দ্রুত লয়ে, তাজউদ্দীন কিন্তু সেই ঘড়িরও হাল ধরে আছেন, নিয়ন্ত্রণ হারাননি একটুও।

মতবিরোধ

বালু হক্কাক লেনের 'জয় বাংলা' পত্রিকার অফিস থেকে আলাউদ্দীন বেরিয়ে এল। তার হাতে শোভা পাচ্ছে হলদে রঙের একটা ফাইল, আবদুল মান্নানের অনুরোধে বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে দিয়ে আসতে হবে সেটাকে। রোদের তীব্রতা আজকে একটু বেশি, আলাউদ্দীন বাসে উঠবে বলে ঠিক করল।

বাস আসতেই আলাউদ্দীন উঠে পড়ে সেখানে। পুরো বাসটাই বলতে গেলে খালি, মাঝামাঝি একটা সিটে বসতে গিয়েও থেমে যেতে হলো আলাউদ্দীনকে। বাসের একেবারে শেষ দিকে থেকে কেউ একজন হাত নাড়ছে তাকে উদ্দেশ করে। আলাউদ্দীনের চিনতে দেরি হয় না ভদ্রলোককে। আমির হোসেন সাহেব, যুদ্ধ শুরুর আগে ভদ্রলোক 'ইত্তেফাকে' ছিলেন, এখন 'বাংলার বাণী' পত্রিকা সামলাচ্ছেন।

'স্লামালাইকুম আমির ভাই, কেমন আছেন?' আলাউদ্দীন পাশের ফাঁকা সিটে বসতে বসতে বলে।

'এই তো ভাই, আছি আর কি। কাজের চাপে বারোটা বেজে যাচ্ছে। পত্রিকা সামলানো, প্রুফ দেখা, ম্যালা কষ্ট রে ভাই! বুঝো না, মনি ভাইয়ের পেপার; একটু এদিক সেদিক হলেই খবর হয়ে যায়!'

'মনি ভাই কেমন আছেন? তার সাথে অনেকদিন দেখা নাই।' যুবনেতা শেখ মনির সাথে আলাউদ্দীনের যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা আছে। নেহাত মন্ত্রী কামারুজ্জামান সাহেব বিভিন্ন কাজে ডাক দেন আলাউদ্দীনকে, নইলে সে হয়তো ভারতে এসে মনি ভাইয়ের সাথেই জুড়ে যেত।

'মনি ভাইয়ের কথা আর কী বলবো, উনি ভালোই আছেন। তবে ব্যস্ত ভীষণ, বুঝো না', আমির হোসেন বলেন। 'আর মাঝে মাঝে কারণে-অকারণে খুব রেগে যান। সেদিন আমাকে যা ধমক দিলেন না...'

'কী রকম?'

আলাউদ্দীনের প্রশ্ন শুনে আমির হোসেন সাবধানে আশপাশে তাকান। এরপরে উত্তরটা দেন গলা খাদে নামিয়ে। 'সেদিন পেপারের কাজ শেষ করে প্রায় ভোররাতের দিকে শুইতে গেছি বুঝলা। আমাদের অফিস রাজেন্দ্র স্ট্রিটে, জানো তো। আমি-আজাদ-ভবেশ, আমরা কয়েকজন আবার ওই অফিসেই ঘুমাই। সেইদিন ঘুমানোর কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখি দরজা ধাক্কানো শুরু হইলো। ঘুম থেকে উইঠে দরজা খুললাম। দেখি মনি ভাই আসছেন আগরতলা থেকে।

ভালোমন্দ কেমন আছেন, এইসব জিজ্ঞেস করার আগেই দেখি মনি ভাই চোখ গরম করে আমাকে বললেন, এই এডিটর, বাংলার বাণী কি আমার পত্রিকা, না তাজউদ্দীনের?

আমি তো মিয়া প্রথমে কিছুই বুঝলাম না। হা কইরে বললাম, কেন ভাই, এইটা তো আপনার পত্রিকা!

মণি ভাই আমার জবাবে আরো খেপে গেলেন। বললেন, তাইলে তুমি তাজউদ্দীনের ইন্টারভিউ আমার পত্রিকায় ছাপাইসো কেন? তুমি জানো না উনি মুজিব বাহিনীর বিরুদ্ধে লাগসেন? ট্রেনিং বন্ধের জন্যে দিল্লিতে দরবার করতেসেন?

আমি তখন আসল ঘটনা বুঝলাম। বাংলার বাণীর লাস্ট সংখ্যায় বুঝলা, প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাজউদ্দীনের সাহেবের একটা ইন্টারভিউ গেছে। ওই কারণে মনি ভাইয়ের এত রাগ। ট্যাক্সি থেকে নেমেই তাই আমার উপর রাগ ঝাড়া শুরু করছেন...'

আমির হোসেনের কথা শুনে আলাউদ্দীন খানিকক্ষণ চুপ হয়ে বসে রইল। মণি ভাই আর তাজউদ্দীন সাহেবের মাঝে খিটিমিটি আছে, মুজিবনগরের সরকারে কমবেশি সবাই জানে এ কথা। তবে ইদানীং যেন একটু বেড়ে গেছে তাদের মাঝের মতের অমিল।

পকেট থেকে সিগারেট বের করে আলাউদ্দীন নিজে একটা ধরাল, আরেকটা বাড়িয়ে দিল আমির হোসেন ভাইয়ের দিকে। 'কী আলাউদ্দীন, এক্কেবারে চুপ হয়ে গেলা দেখি!'

আমির হোসেনের প্রশ্নের উত্তরে আলাউদ্দীন সিগারেটে একটা বড় টান দেয়। 'এরকম দুয়েকটা কথা আমার কানেও আসছে আমির ভাই। আপনাকে একটা ঘটনা বলি, আমি নিজে ঘটনাটা শুনেছি এইচ টি ইমাম সাহেবের মুখে, উনার নিজ চোখে দেখা।

ঘটনাটা আগরতলা সার্কিট হাউসের। দুয়েক সপ্তাহ আগেই নজরুল সাহেব, তাজউদ্দীন সাহেব, ওসমানী সাহেব, সবাই মিলে আগরতলা গেলেন মনে আছে? সেই সময়ের ঘটনা এইটা।

মনি ভাই তার সাথে আরো কয়েকজনকে নিয়ে রাতের বেলা সার্কিট হাউসে গেছিলেন। প্রাইম মিনিস্টার, অ্যাকটিং প্রেসিডেন্ট, সবাই তখন ওইখানে ছিলেন। তো মনি ভাই নাকি, তাজউদ্দীন সাহেবের রুমে মিটিং করতে করতে হঠাৎ চিৎকার শুরু করলেন। সবাই তো তখন দৌড়ায়ে আসছে কী হইছে জানার জন্যে। মনি ভাই তখন খুব কথা শুনায়ে দিলেন ওসমানী আর তাজউদ্দীন সাহেবকে। উনারা নাকি মুজিব বাহিনী নিয়ে শেখ মনির বিরোধিতা করতেছেন, ভারতের কাছে নালিশ করতেছেন। মনি ভাই রাগারাগি করে চলে যাবার পরে কর্নেল ওসমানীও নাকি খুব চ্যাঁচানো শুরু করলেন। মুজিব বাহিনীকে তার আন্ডারে নিয়ে না আসলে নাকি উনি রিজাইন দিবেন, হ্যানোত্যানো...

কাজেই আমির ভাই, প্যাঁচ তো ভেতরে কিছু আছেই। আপনি আমি বাইরে থেকে হয়তো কিছু বুঝতে পারতেছি না, কিন্তু সমস্যা একটা আছেই।'

'মুজিব বাহিনীর ব্যাপারটা কী, জানো নাকি?' আমির হোসেন জিজ্ঞাসা করেন। 'গত কিছুদিন খুব শোনা যাচ্ছে ওদের কথা। কয়েক জায়গায় ইভেন মুক্তিবাহিনীর সাথে নাকি সরাসরি যুদ্ধ হইসে ওদের?'

'আমিও শুনছি এরকম কিছু খবর, বাট ঠিক নিশ্চিত হইতে পারি নাই বুঝলেন।' আলাউদ্দীন বলে। 'শোনা কথায় যা বুঝলাম, একটা লং টার্ম প্ল্যান

নিয়েই যুদ্ধে নামছে মুজিব বাহিনীর লিডাররা। উদ্দেশ্য খুবই চমৎকার সন্দেহ নাই। কিন্তু ওদের নিয়া ভারতের লুকোচুরি খেলাটার কোনো মানে বুঝতে পারতেছি না। এইটাই প্যাঁচ বাড়ায়া দিতেছে।'

'বুঝলাম। যাক, ওইসব কথা রাখো। এখন বলো কোথায় যাচ্ছো?'

'এই তো, সার্কুলার রোডের বেতার কেন্দ্রে যাবো। সামান্য কাজ আছে। আপনি কই যাবেন?'

'ওহ, আমিও ওই অফিসেই যাবো। ভালো হইলো, এক সাথেই নামা যাবে।' আমির হোসেন মাথা ঝাঁকিয়ে চুপ হয়ে যান।

আলাউদ্দীনও নীরব হয়ে যায়, তবে তার মাথার ভেতরে চিন্তা চলতেই থাকে। মুজিব বাহিনী প্রধানদের সাথে তাজউদ্দীনের মতের অনৈক্য নিয়ে আরো একটি অদ্ভুত ঘটনা কানে এসেছে তার। তবে সেটি এতই অবিশ্বাস্য যে গোপন না রেখে উপায় নেই।

খুব অল্প কয়েকজন মানুষই এই ঘটনা জানেন। আলাউদ্দীন যাদের কাছ থেকে শুনেছে, তাদের একজন তাজউদ্দীন সাহেবের পি এস ফারুক আজিজ খান। অন্যজন থিয়েটার রোডের নিরাপত্তার দায়িত্ব থাকা শরদিন্দু বাবু।

মুজিব বাহিনীর সদস্য, এই পরিচয় নিয়ে এক তরুণ নাকি অস্ত্র হাতে চলে এসেছিল থিয়েটার রোডে। প্রধানমন্ত্রীর সামনে গিয়ে তরুণটি নাকি বলেছে, মুজিব বাহিনীর এক লিডার তাদের আদেশ দিয়েছে তাজউদ্দীনকে খুন করে আসতে। তরুণটি এই আদেশ শোনা মাত্র স্বেচ্ছায় দায়িত্বটি নিয়ে তাজউদ্দীনের অফিসে চলে এসেছে, যাতে অন্য কেউ এই কাজ করতে না পারে। ছেলেটা নাকি আরো বলেছে যে সে প্রয়োজনে স্বীকোরোক্তি দিতেও রাজি, আর সরকার এজন্যে তাকে শাস্তি দিলে সে সেই সাজাও মাথা পেতে নেবে। তবে তাজউদ্দীন নাকি তরুণটির সাথে অল্প কিছু কথা বলেই তাকে ছেড়ে দিয়েছেন। কারণ এমনিতেই নানা জায়গা থেকে মুক্তিবাহিনীর কমান্ডাররা মুজিব বাহিনীর মুখোমুখি হয়ে বিব্রত হবার রিপোর্ট পাঠাচ্ছে, এই অবস্থায় এমন গুপ্তঘাতকের কথা ছড়িয়ে গেলে স্বাধীনতার যুদ্ধের ভেতরেই আরেকটি যুদ্ধ শুরু হয়ে যেতে পারে। ছেলেটিকে ছেড়ে দেবার পরে নাকি তাজউদ্দীন সিকিউরিটিকে এই ঘটনা জানিয়েছেন, সাথে সতর্ক করে দিয়েছেন গোপনীয়তা রক্ষার ব্যাপারে। এরপরেও একজন দুইজন করে থিয়েটার রোডের হর্তাকর্তাদের অনেকের কানেই চলে গেছে এই কথা।

আলাউদ্দীন কিছুতেই এই হিসেব মেলাতে পারে না। তাজউদ্দীন সাহেব বানিয়ে অপবাদ দেয়ার মানুষ নন। আবার মনি ভাই বা তোফায়েল ভাইকে আলাউদ্দীন যতটা চেনে; তাতে করে তারা গুপ্তঘাতক পাঠাবেন, এই ধারণাও তার কাছে অবিশ্বাস্য ঠেকে। কে সত্য বলছেন, নির্ণয় করাটা ঠিক যেন গোয়েন্দা উপন্যাসের মতোই জটিল।

মুক্তিযুদ্ধের আরো অনেক রহস্য ঘেরা ঘটনার মাঝে অজ্ঞাতনামা এই যুবকটির অস্তিত্বও ভবিষ্যতের বাংলাদেশের কাছে থেকে যাবে দুর্বোধ্য।

সার্কুলার রোড আসতেই আলাউদ্দীন আর আমির হোসেন সাহেব বাস থেকে নেমে পড়েন। স্বাধীন বাংলা বেতার অফিসে প্রচুর হট্টগোল। আবদুল জব্বার, আপেল মাহমুদ, অজিত রায়েরা লুঙ্গি পরে হারমোনিয়াম বাজাচ্ছেন একদিকে; অন্যদিকে কামাল লোহানী, এম আর আখতার মুকুলেরা স্ক্রিপ্ট লিখছেন নানা রকমের কথিকার। মান্নান ভাইয়ের নির্দেশ, হলুদ রঙা ফাইলটা দিতে হবে সুরকার সমর দাসকে। আলাউদ্দীন সমর দাসকে খুঁজতে লেগে গেল।

খুঁজতে খুঁজতেই লোকজনের মুখে আলাউদ্দীন বেশ কয়েকবার মুজিব বাহিনীর নাম শুনতে পেল। কান পেতে আলোচনা শুনতেই জানা গেল, দিল্লির মিটিং-এ তাজউদ্দীন নাকি সরাসরিই ইন্দিরার কাছে সাহায্য চেয়েছেন মুজিব বাহিনীর বিষয়ে। ইন্দিরা আশ্বাস দিয়েছেন, দ্রুতই মুজিব বাহিনীকে বাংলাদেশ সরকারের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা হবে।

সব বিপরীত স্রোত সামলে নিয়ে পালে জোর হাওয়া লাগাচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের মূলধারার নৌকা।

হাতে নিয়ে আলোকবর্তিকা

ইন্দিরা গান্ধী জানালার পাশে দাঁড়িয়ে পর্দা সরিয়ে বাইরে তাকালেন।

বেশ ঝকঝকে রোদ উঠেছে আজ। অথচ এখনো বেলা বেশি হয়নি, নয়টা কি বড়জোর সাড়ে নয়টা হবে। এর মাঝেই সূর্য সোনালি রঙা আভা ছড়াচ্ছে একেবারে। লন্ডনের টিপটিপ বৃষ্টির আবহাওয়ার মাঝে এমন মিষ্টি রোদ খুব বেশি দেখা যায় না। ইংরেজরা তাই এরকম আবহাওয়া পেলেই চাঙা হয়ে উঠে, বাড়ি থেকে বেরিয়ে কোথাও বসে রোদ পোহায়। ইস্, যদি তিনি নিজেও সব ভুলে গিয়ে কয়েকটা দিন কোথাও নিরুপদ্রবে বসে ছুটি কাটাতে পারতেন!

ইন্দিরা মনে মনে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললেন। তিনি পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশটির নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী, প্রতিবেশী দেশটিতে যদি গণতন্ত্রের দাবিকে সামরিক শক্তি দিয়ে দমানোর চেষ্টা করা হয়, তবে বসে বসে ছুটি কাটানো তার সাজে না।

বাংলাদেশ, এখনো অবশ্য ইন্দিরা জনসমক্ষে এই নামে ডাকেননি পূর্ব পাকিস্তানকে, প্রতিদিনই রুগ্ণ থেকে রুগ্ণতর হয়ে যাচ্ছে গণহত্যার আগ্রাসনে। পশ্চিম পাকিস্তানের সেনাবাহিনী পূর্ব পাকিস্তানে লাখ লাখ মানুষকে মারছে নির্বিচারে। অ্যান্থনি মাসকারেনহাস 'দ্য রেপ অব বাংলাদেশ' বই প্রকাশ করে পৃথিবীকে জানিয়ে দিয়েছে সেই গণহত্যার ভয়াবহতা, তারপরেও যেন পশ্চিমাদের

এদিকে তিলমাত্র আগ্রহ নেই। এদিকে জীবনে ভয়ে বাংলাদেশের মানুষ দলে দলে আশ্রয় নিচ্ছে ভারতে, শরণার্থীর সংখ্যা কোটি ছাড়িয়ে গেছে প্রায়। তার দেশ গরিব, এই বাড়তি জনগণের বোঝা তাই বেশিদিন বহন করা সম্ভব নয় ভারতের পক্ষে। পুরো ভারতবর্ষকে অধীর আগ্রহে রেখে ইন্দিরা গান্ধী তাই বেরিয়ে পড়েছেন ইয়োরোপ সফরে।

দরজায় টোকা দেবার আওয়াজ শুনে ইন্দিরা জানালা ছেড়ে সোফায় এসে বসলেন। স্পষ্ট গলায় 'কাম ইন' উচ্চারণ করার খানিক পরে খুলে গেল দরজা। আবু সাইদ চৌধুরী ঢুকলেন ইন্দিরার ঘরে।

'গুড মর্নিং প্রাইম মিনিস্টার!' আবু সাইদ চৌধুরী সহাস্যে অভিবাদন জানালেন ইন্দিরা গান্ধীকে। 'ইটস অ্যান অনার টু মিট ইউ!'

ইন্দিরা উঠে দাঁড়িয়ে আবু সাইদ চৌধুরীর বাড়িয়ে দেয়া হাতের সাথে হাত মেলালেন। 'গুড মর্নিং টু ইউ টু মিস্টার চৌধুরী। কী চমৎকার একটা দিন আজ, তাই না?'

আবু সাইদ চৌধুরী হেসে ফেললেন। 'আপনি তো একদম খাঁটি ইংরেজদের মতোই আবহাওয়া নিয়ে কথা বলছেন মিসেস গান্ধী। হ্যাঁ, আজকের সকালটা ভারি সুন্দর। আপনাকেও চমৎকার দেখাচ্ছে কিন্তু!'

ইন্দিরা গান্ধীর পরনে একটা ধূসর রঙা শাড়ি, উপরে একটি কালো ওভারকোট। হোটেল ক্লারিজেসের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে বসে তার বেশ শীত করছে। আবু সাইদ চৌধুরীর কথায় ইন্দিরা মৃদু হাসলেন, এরপর চলে গেলেন কাজের কথায়।

'জাস্টিস চৌধুরী, আপনার কথা বলুন এবার। আমি শুনেছি আপনি ইতোমধ্যেই বেশ কয়েকটি ইয়োরোপের দেশ ঘুরে এসেছেন সমর্থন পাবার জন্যে। অভিজ্ঞতা কেমন আপনার? পরিস্থিতি কী রকম দেখলেন?'

আবু সাইদ চৌধুরী মাথা ঝাঁকালেন। পুরো সেপ্টেম্বর মাসজুড়েই তিনি ছুটে বেড়িয়েছেন। প্রথমে গেছেন নরওয়ে, এরপরে সুইডেন। শেষে ফিনল্যান্ড, ডেনমার্ক হয়ে লন্ডনে ফিরে এসেছেন। এরপরে জাতিসংঘের জেনারেল অ্যাসেম্বলিতেও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষের প্রতিনিধি দলকে নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি।

'আপনার কাছে লুকোনোর কিছু নেই মিসেস গান্ধী।' আবু সাইদ চৌধুরী বললেন। 'আমি বেশ কয়েকটা দেশেই গেছি। নানা সভায় বক্তৃতা দিয়েছি। আমার মনে হয়েছে প্রায় সব দেশের জনগণের সহানুভূতি আমাদের পক্ষেই আছে, বাংলাদেশের পক্ষে। এমন কি রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে যারা ছিলেন, তাদের মাঝেও কেউই বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অবস্থান নেননি। আমার মনে হয়েছে তারা বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে মুখিয়ে আছে। তবে তার জন্যে পূর্বশর্ত হচ্ছে ভারতের স্বীকৃতি।'

ইন্দিরা কোনো কথা বলেন না। সাতচল্লিশে অন্নদাশংকরের বুড়ো খোকারা দুই ভাগ করে ফেলেছেন ভারতবর্ষকে। একাত্তরে এসে আরেকটা বিভক্তি হবে কি? যদি তাই হয়, তাহলে পৃথিবীর ইতিহাস কি সেই বিভক্তির মূল অনুঘটক বলে ইন্দিরা গান্ধীকেই চিনবে? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়া বড় কঠিন।

বিচারপতি চৌধুরী ইন্দিরাকে নিশ্চুপ থাকতে দেখে আবার মুখ খুললেন। এবার হয়তো আরেকটু বেশি আবেগ খুঁজে পাওয়া গেল তার গলায়। 'মিসেস গান্ধী, আমি জানি ইতোমধ্যেই ভারত তার সামর্থ্যের সর্বোচ্চ দিয়েই আমাদের শরণার্থীদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। এটাও মানি, আপনাদের এই ভালোবাসার বিনিময়ে দেয়ার কিছু এই মুহূর্তে বাংলাদেশের নেই। আমরা একটি স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবেই মাথা তুলে দাঁড়াবো, ভারতের অনুগ্রহে তাদের করদ রাজ্য হয়ে টিকে থাকা আমাদের অভিপ্রায় নয়। তবুও মিসেস গান্ধী, ভবিষ্যতের বন্ধুপ্রতিম একটি প্রতিবেশী রাষ্ট্র হিসেবেই আপনি না হয় বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিলেন। আপনি চিরশ্রদ্ধেয় জওহরলাল নেহরুর কন্যা, আপনার পিতা নিশ্চয়ই এই দুঃসময়ে শরণার্থীদের শুধু আশ্রয় দিয়েই থেমে থাকতেন না।'

'বন্ধুত্বের কথা বলে আপনি আমাদের সম্মানিত করলেন জাস্টিস চৌধুরী, ' ইন্দিরা বলেন। 'আমাদের সম্পর্ক বিচারের ভার আপাতত স্বাধীন বাংলাদেশের মানুষদের জন্যেই তুলে রাখি। বাংলাদেশের মানুষের কাছ থেকে আমরা কেবল একটি প্রতিদানই আশা করি। সেটি গণতন্ত্র। প্রতিবেশী কোনো রাষ্ট্রে সামরিক শাসন ভারত দেখতে চায় না।'

আবু সাইদ চৌধুরী আরো কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেলেন, ইন্দিরা হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিয়েছেন। 'আমি জানি, বিশ্বের কাছ থেকে স্বীকৃতি পেতে বাংলাদেশ মুখিয়ে আছে। কিন্তু আপনাকে এটাও বুঝতে হবে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আমার নিজেরও কিছু দায়িত্ব আছে দেশের প্রতি। একটা যুদ্ধের দিকে আমি আমার দেশকে ঠেলে দিতে পারি না। দরিদ্র একটি অর্থনীতির ওপর যুদ্ধের বোঝা চাপিয়ে দেয়া আমার সাজে না। তবে হ্যাঁ, বিনা প্ররোচনায় ভারতকে কেউ আক্রমণ করলে আমরা নিশ্চয়ই চুপচাপ বসে থাকবো না।' ইন্দিরার গলায় দৃঢ়তার আভাস স্পষ্ট।

আবু সাইদ চৌধুরী যা বোঝার বুঝে গেলেন। বাংলাদেশকে নিয়ে ইন্দিরা এখনো কোনো সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করেননি। আলোচনা খুব বেশি জমলো না এরপর। আরো কিছু টুকটাক কথা সেরে জাস্টিস চৌধুরী বিদায় নিলেন।

সমর্থন লাভের আশায় ইন্দিরা গান্ধী আরো কয়েকদিন রয়ে গেলেন লন্ডনে। লন্ডনের আকাশ তার চিরাচরিত বিষণ্ন রূপটি ইন্দিরার জন্যেই যেন ছেড়ে দিয়ে হাসি হাসি মুখ করে রইল সেই কয়েকটা দিন। একদিন ইন্দিরা গেলেন এক জনসভায় বক্তৃতা রাখতে। সেখানে ভিড় করল প্রচুর প্রবাসী বাঙালি আর বাংলাদেশের প্রতি সহানুভূতিশীল ইংরেজরা।

ইন্দিরা গান্ধী নিজের ভাষণে খোলামেলা ভাবেই জানালেন তার দেশের অবস্থান। 'সীমান্তে আমরা সেনা মোতায়েনের পর থেকেই জাতিসংঘ থেকে উপদেশ আসছে সৈন্য প্রত্যাহারের। যখন দলে দলে শরণার্থী সীমান্ত পেরিয়ে পূর্ব পাকিস্তান থেকে আশ্রয় নিচ্ছিলো ভারতে, তখন আমরা বারবার পুরো দুনিয়াকে আমাদের পরিস্থিতি বোঝাতে চেয়েছি, কোনো লাভ হয়নি। এখন আমরা সীমান্তে সৈন্য রেখেছি, কারণ আমরা ভারতের জনগণের আর শরণার্থীদের নিরাপত্তার বিষয়ে আশংকায় আছি। জাতিসংঘের বেশ কিছু উদ্বাস্তু পরিদর্শক দল ভারতে অবস্থান করছে। তারা যেখানে খুশি ঘুরে দেখতে পারেন।'

মিসেস গান্ধীর বক্তব্য বুঝতে দেরি হলো না উপস্থিত বাঙালিদের। তবে বাংলাদেশের স্বীকৃতি বিষয়ে কোনো কথাই ইন্দিরা বলেননি, প্রবাসী বাঙালিদের একাংশ তাই বেশ উত্তেজিত দেখাল। 'শুধু শুধু বাংলাদেশের ইস্যুটা নিয়া প্যাঁচাইতেছে, এক বারে স্বীকৃতি দিয়া ফেলাইলেই কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল কম্যুনিটি আমাগো পক্ষে আইসা পড়ত।' বলতে শোনা গেল অনেককে।

কভেন্ট্রি থেকে ইন্দিরার বক্তব্য শুনতে নুরুল আলমও এসে পড়েছিল লন্ডনে। চারপাশের এইসব আলোচনায় নাক না গলিয়ে সে হাঁটতে হাঁটতে চলে এল ওয়াটারলু ব্রিজ।

রেলিং-এর ধারে একটা ফাঁকা বেঞ্চি পেয়ে নুরুল আলম সেখানেই বসে পড়ল। টেমস নদীর ধারে আজকে বেশ ভিড়। চমৎকার রোদেলা দিন পেয়ে বুড়োবুড়িরা বাচ্চাদের মতোন খুশি। বসে বসে রোদ পোহাচ্ছে তারা। নদীর বুকে ঘুরে বেড়াচ্ছে অনেকগুলো ট্যুরিস্ট বোট আর স্টিমার। ট্যুরিস্টরাও মেতেছে উৎসবে, রোদেলা দিন মানেই লন্ডনে উৎসবের দিন।

সকালে ব্রেকফাস্ট না করেই বেরিয়ে পড়েছিল নুরুল আলম, এখন তার বেশ খিদে পেয়েছে। কাছের একটা স্টলে স্যান্ডউইচ জাতীয় খাবার বিক্রি হচ্ছে, সে উঠে তারই গোটা দুই কিনে নিল। সাথে এককাপ কফি।

গত কয় মাসের পত্রিকার রিপোর্ট দেখে সে যা বুঝতে পারছে, সেটা হলো বাংলাদেশের যুদ্ধটা এখন আন্তর্জাতিকভাবে মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত। রাজনৈতিকভাবে এর সমাধান পশ্চিম পাকিস্তানের পক্ষে এ অবস্থায় প্রায় অসম্ভব। শেখ মুজিবের মুক্তির দাবিও ধীরে ধীরে জোরালো হচ্ছে গ্লোবালি। নুরুল আলম ইন্দিরা গান্ধীর অবস্থানটা বুঝতে চেষ্টা করে। আগ বাড়িয়ে ভারত এখন যুদ্ধে নামলে সেটা বিশ্বের জনসমর্থনকে ভারতের বিপক্ষে নেবে, সেই সম্ভাবনাই বেশি। ইন্দিরা গান্ধীর তাই আরো বিলম্ব করা ছাড়া উপায় নেই।

হাতে আলোকবর্তিকা নিয়ে সাড়ে সাত কোটি মানুষের ভাগ্য সম্পর্কে উদাসীন ইয়োরোপের রাষ্ট্রগুলোর কাছে ছুটে বেড়াচ্ছেন ইন্দিরা গান্ধী, অন্ধকার কাটছে কি কাটছে না। টেমস নদীর তীরে উজ্জ্বল এই রৌদ্রস্নাত দিনও নুরুল আলমকে সেই আঁধার শেষ হবে, এমন কোনো নিশ্চয়তা দেয় না।

জাহানারা ইমাম মোড়া নিয়ে উঠানের একপাশে বসেছেন। অক্টোবরের শেষ দিক, বাতাসে শীত শীত গন্ধ। বিকালের হালকা রোদে পিঠ পেতে বসে থাকতে ভালো লাগে। সামনে উঠান দখল করে চৈতন্য আর নিরঞ্জন কাঠের কাজ করছে, র‍্যাঁদা-হাতুড়ির শব্দে ভরে আছে জায়গাটা।

কয়েকদিন ধরেই জাহানারা ইমাম ভাবছিলেন সামনের দরজার পালা দুটো বদলাবেন। মাঝে মাঝেই জোর গুজব ওঠে যে মিরপুর-মোহাম্মদপুরের বিহারিরা এদিকে আসছে লুটপাট করতে। তখন পুরো পাড়ায় হট্টগোল শুরু হয়, সবাই দরজা জানালা আটকে ছিটকিনি দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। জামী সেদিন বলছিল সামনের দরজাটার পালা দুটো হালকা হয়ে গেছে। জোরে এক লাথি মারলেই খুলে যেতে পারে। জাহানারা ইমাম তাই কাঠমিস্ত্রি খুঁজছিলেন ক'দিন ধরে। পুরনো কাঠমিস্ত্রি চৈতন্যর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিলো না, গতকাল সে নিজেই এসে হাজির।

চৈতন্য খুব পরিশ্রমী, তবে একটু বোকাটে ধরনের। জাহানারা ইমাম ভেবেছিলেন সে হয়তো ইন্ডিয়ায় চলে গেছে মিলিটারির ভয়ে, আসলে চৈতন্য নাকি লুকিয়েছিল এতদিন। চৈতন্যের বাড়ি বাড্ডার ওদিকে। মিলিটারি সেখানে নাকি সরাসরি হামলা করেনি, চৈতন্যেরও তাই সাতপুরুষের ভিটা ফেলে যাওয়া হয়নি ইন্ডিয়ায়। তবে প্রাণের ভয়ে সে এদিক-সেদিক লুকিয়ে ছিল। এখন জমানো টাকা সব শেষ, দুইবেলা উপোস দেবার সময় এসেছে বলেই কাজ খুঁজতে বেরিয়ে পড়েছে।

কাজ করতে চৈতন্য এবার সাথে নিয়ে এসেছে তার ভাস্তে নিরঞ্জনকে। বেচারারা খুব ভয়ের মধ্যে আছে, হিন্দু বলে মিলিটারির ভয়ে বাইরে যেতেই সাহস পাচ্ছে না। এর আগে সবসময় চৈতন্য নিজেই কাঠ কিনে এনেছে, এবারে সেটার জন্যেও জাহানারা ইমামকেই যেতে হয়েছে বাজারে। শরীফ ওদের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত বাড়ির দক্ষিণের সার্ভেন্টস কোয়ার্টারে থাকতে বলে দিয়েছে।

জাহানারা ইমাম উঠানের পাশে বসে রোদ পোহাতে পোহাতে কাজ দেখছেন আর টুকটাক আলাপ করছেন। আলাপের পুরো অংশটাই অবশ্য আসছে নিরঞ্জনের দিক থেকে। চৈতন্য কথা বলে কম, হাসে আরো কম, হাঁটে খুব আস্তে। নিরঞ্জনের একটা পা খোঁড়া হলেও সে জ্যাঠার ঠিক উলটো প্রকৃতির। বেশ দ্রুত চলাফেরা করে, অনর্গল হাসে আর অবিরত কথা বলে। পুরো ঢাকার খবর তার মুখের আগায়।

'অ দিদিমা, শোনছেন নাকি, মুনেম খাঁর লাশ নাকি কবর থন উঠায়ে ফেলছে!'

জাহানারা ইমাম চমকে গেলেন। দিন পনেরো দিন আগে বনানীতে নিজের বাসায় মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে গুলি খেয়ে মরেছে পূর্ব পাকিস্তানের প্রাক্তন গভর্নর মোনায়েম খান, বাঙালিরা উল্লাসে ফেটে পড়েছে সে খবর শুনে। কিন্তু কবর থেকে লাশ ওঠানোর কথা তো শোনেননি জাহানারা ইমাম। অবাক হয়ে তাই জিজ্ঞেস করলেন, 'সে কী! কারা করল এই কাজ? কেন?'

নিরঞ্জন বেশ একটা আত্মপ্রসাদের ভাব নিয়ে বলল, 'মুক্তিরা উডাইছে লাশ। হ্যারা নাকি অর মতো বেইমানের লাশও দ্যাশে থাকতে দিবো না!' চৈতন্য মৃদু ধমক দেয়। 'কী আজাইরা কথা কস্ নিরঞ্জন। চুপ যা, এত কথা কস ক্যান?'

জাহানারা ইমাম আগ্রহ নিয়ে চৈতন্যকে থামিয়ে দেন। 'আহা, বলুক না চৈতন্য! আমার ছেলেও তো 'মুক্তি' ছিল। কোনো ভয় নাই। নিরঞ্জন, তুমি মুক্তি চিনো? ওদের দেখছো?'

নিরঞ্জন উৎসাহ পেয়ে নড়েচড়ে বসে। 'কী কন দিদিমা, মুক্তি চিনুম না? আমাগো উইদিকে মুক্তি কম আছে? হ্যারা ইশটিন হাতে লয়া অ্যাকশুনে যায়, আমি হেইডি দেখছি না?'

'তাই নাকি? কী কী জানো বলো দেখি নিরঞ্জন। তোমাদের গ্রামের মুক্তিদের কথা বলো।'

'আমগো গেরামে মুক্তি নাইরে দিদিমা, ' নিরঞ্জন হাতের কাজ থামিয়ে মুখ চালিয়ে দেয় এবার। 'আমগো আশপাশের গেরামে আছে। বহুত পোলা আগরতলা থন টেরনিং লয়া আইছে। আমগো ওইদিকের এক পোলাই তো মুনেম খাঁরে মারছে। আমি সব জানি।'

জাহানারা ইমাম ভয়ানক কৌতূহলী হয়ে উঠলেন। 'বল কী, তোমাদের পরিচিত মুক্তি? বল দেখি, কীভাবে মেরেছে মোনেম খাঁকে? কী বৃত্তান্ত?'

'মেলাঘর থিকাই এক পোলা মুনেম খাঁরে মারনের অর্ডার লয়া আইছিল। মুনেম খাঁর মেলাই গরু আছিল, তার যেই রাখাল সেই রাখালের আবার মুনেম খাঁর উপরে আছিল বেজায় রাগ। রাখালটারে মুনেম খাঁ বেতন দিত না, বেতন চাইলেই পুলিশের ডর দেহাইতো। ওই রাখালই মুক্তি পোলাটারে সাহাইয্য করছে মুনেম খাঁরে মারতে। পোলাডা রাখালের লগে ভাব কইরা বাড়ির ভিতরে ঢুকসে, সইন্দা বেলায় রাখাল যখন গরু লয়া বাড়িত আইছে, তখন তার পিছ পিছ ঢুইকা পড়ছে। তাছাড়া ঢুকন তো একদম অসাইদ্য! গেইটে পাহারা, ভিতরে পিস্তলওলা মুনেম খাঁর বোডিগাড। ঐ পোলা মারনের আগেও দুইদিন বাড়িত ঢুকসে, সুবিধা করতে পারে নাই। মুনেম খাঁ দুইতলায় ছিল। তিনদিনের দিন মুনেম খাঁ একতলার বসার ঘরে বইসা বাইরের লোকের লগে কথা কইতাছিল, হেই সময় তারে মারছে ইশটিন দিয়া। এরপর পিছের ওয়াল টপকায়া পালাইছে। ঐ রাখাল ভি পালাইছে।'

নিরঞ্জনের বর্ণনা শুনে জাহানারা ইমাম চমৎকৃত হয়ে গেলেন। সমাজ এই স্বল্পশিক্ষিত, কর্মঠ মানুষগুলোর কত অবহেলা নিয়েই না দেখে; অথচ এদের বুদ্ধি কত সূক্ষ্ম। রয়টার্সের সাংবাদিকও খবর যোগাড়ের প্রতিযোগিতায় হার মেনে যাবে এদের কাছে।

'মুনেম খাঁরে মারনের পরদিনে ম্যালা লোক পোলাডারে দেখতে গেছিল দিদিমা', নিরঞ্জন একগাল হেসে বলে। 'আমিও দূর থনে দেখছি। লোক জানাজানি হইতে পোলাডার বাপে কই যেন পাডায় দিছে ওরে পরে। পুলাডার নামডা ভুইলা গেছিগো দিদিমা, জিবের আগায় আইতে চায় না, খটোমটো নাম।'

'আজাইরা প্যাঁচাল বন কর নিরঞ্জন, চুপ যা। আমারে বিপদে ফেলাইস না।' চৈতন্য ধমক দেয় আবার, নিরঞ্জন সে আদেশ মেনে আবার হাত চালায় কাজে।

জাহানারা ইমাম ঘরের ভেতরে চলে আসেন। রুমীদের ধরে নিয়ে গেছে দুই মাস হলো। ছেলের জন্যে গরু সদকা দেয়া হয়েছে, দুই বেলা পীরের কাছেও ধরণা দিতে বাদ রাখেননি ওরা; কিন্তু রুমী ফিরে আসেনি। একবার ভাবা হয়েছিল রুমীর প্রাণভিক্ষা করে শরীফ একটা মার্সি পিটিশন দেবে সরকারকে। পরে সে চিন্তা বাদ দিয়েছেন তারা। খুনি সরকারের কাছে প্রাণভিক্ষা করা মানে রুমীর আদর্শটাকেই ছোট করা, রুমীর উঁচু মাথাটাকে নিচু করে দেয়া।

আগস্টের শেষ দিকে রুমীদের ধরে নিয়ে যাবার পরের কয়েকটা দিন ঢাকা শহর নিথর ছিল। তারপরই গেরিলারা, পাকবাহিনীর কাছে যারা বিচ্ছু নামের আতঙ্ক, দলে দলে আবার ঢুকতে শুরু করেছে শহরে। জাহানারা ইমাম নানা জনের কাছ থেকে খবর পান। শরীফের বন্ধু মনজুরের ভাগ্নে নাসিরুদ্দিন ইউসুফ বাচ্চুসহ রাইসুল ইসলাম আসাদ, মানিক এরকম আরো অনেক মুক্তিযোদ্ধা সাভারের কাছের কোনো একটা গ্রামে আস্তানা গেড়েছে। আবার বাকী সাহেবের ছেলে ইকুর কাছ থেকে শুনেছেন, গোপীবাগের পেছন দিয়ে সে আরো প্রায় ষাটজন গেরিলা নিয়ে ঢুকেছে ঢাকায়। ওদের অস্ত্র আনার সিস্টেমটাও ইন্টারেস্টিং। ভোরবেলা গ্রাম থেকে লোকেরা ঝুড়ি ভর্তি করে শাকসবজি নিয়ে ঢাকায় আসে, ওদের সাথে মিশেই গেরিলারা সবজিওয়ালা সেজে ঝুড়িতে সবজির তলায় ছোট ছোট অস্ত্র নিয়ে ঢাকায় ঢুকে।

ঢাকায় এখন প্রায় প্রতিদিনই নিয়ম করে গেরিলা হামলা হচ্ছে। চরমপত্রের ভাষায় বলতে গেলে বিচ্ছু গেরিলারা মিলিটারিদের একেবারে 'ফাতা-ফাতা' আর 'ছ্যারাব্যারা' করে দিচ্ছে। আর ওদের বিচরণ যেন অপ্রতিরোধ্য, কোনোভাবেই চোরা হামলা ঠেকাতে পারছে না পাকবাহিনী। সেদিন বোমা পড়েছে ডিআইটি ভবনের সাত তলায়, তার কিছুদিন আগে স্টেট ব্যাঙ্কের ভেতরের বোমা বাস্টে মারা গেছে বেশ কয়েকজন পাকিস্তানি কমান্ডো। রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল থেকে

খিলগাঁও রেললাইন কোনো জায়গাতেই বোমা মারতে বাদ রাখছে না মুক্তিরা। সাথে সাথে আজকাল পাকবাহিনীর দোসরদেরও সইতে হচ্ছে নতুন এক উপদ্রব। শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান, মেম্বারদের কাছে নাকি পাঠানো হচ্ছে কাফনের কাপড়, দশ টাকার নোট আর চিঠি। চিঠিতে লেখা হচ্ছে, 'এই টাকায় ভালোমন্দ খেয়ে নাও, তোমার আয়ু আর বেশি দিন নেই।'

...জাহানারা ইমাম ইফতার বানাতে বসে গেলেন। রোজা শুরু হয়েছে সপ্তাহখানেক হলো। শরীফ বলে গেছে আজকে সুজির নাস্তা বানাতে। আসরের আজান দেয়া মাত্র জাহানারা ইমাম কলিংবেলের আওয়াজ পেলেন।

ঘরে ঢুকল শরীফ, তার মুখ অসম্ভব গম্ভীর। 'শুনছো, বাঁকার ওখান থেকে এলাম। খারাপ খবর আছে একটা।'

জাহানারা ইমামের বুক ধড়াস করে উঠল। 'কী খারাপ খবর? আবার কী হয়েছে?'

শরীফ মুখ কালো করে জবাব দিল, 'খালেদ, খালেদ মোশাররফ যুদ্ধে মারা গেছে।'

এ কী সর্বনাশ! রুমীদের গ্রেপ্তারের শোক গত দুই মাসে একটু একটু করে কাটানোর চেষ্টা করছেন তারা, এর মাঝে এ আবার কী দুঃসংবাদ! খালেদ মোশাররফ নেই!

রুমী যুদ্ধে যাবার পর যে কয়টা দিন বাসায় ছিল, খালেদের নাম তার মুখে অজস্র বার শুনেছেন তারা। খালেদ মোশাররফ, সেক্টর টুয়ের কমান্ডার। দেশের অন্যান্য জায়গা থেকে তো বটেই, ঢাকার যত শিক্ষিত-বেপরোয়া-মুক্তিকামী ছেলে, সব গিয়ে জড়ো হয়েছিল খালেদের সেক্টরে। খালেদের সাহস, দূরদৃষ্টি তাকে ছেলেদের কাছে করে তুলেছিল অসম্ভব জনপ্রিয়। খালেদের ভাবমূর্তি সেখানে দেবতার মতো।

সেই খালেদ মোশাররফ যুদ্ধে শহিদ হয়েছেন? রুমী নেই, বদি-আজাদ-জুয়েল এরা কেউ নেই। এখন খালেদও থাকবে না? স্বাধীনতার যুদ্ধের কী হবে?

জাহানারা ইমাম দোতলায় গিয়ে শুয়ে পড়েন মাথা চেপে। দূরে কোথাও একটা গ্রেনেড ফাটার আওয়াজ আসে। পাশের বাড়িতে কোনো ছোট বাচ্চা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে রাইমস পড়ছে, নিচে উঠানে চৈতন্য চাপা গলায় ধমক দিচ্ছে 'আজাইরা প্যাঁচাল বন কর রে নিরঞ্জন, কথা কইস না!'। রুমীর জন্যে কোথাও কিছু আটকায়নি, খালেদের জন্যেও কোথাও কিছু থেমে নেই।

পৃথিবীতে কখনো কোনো কিছু থেমে থাকে না।

একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে

খালেদ মোশাররফ যুদ্ধে মারা যায়নি, আহত হয়েছে।

দুর্ঘটনাটা ঘটেছে কসবা যুদ্ধে। শেলের স্প্লিন্টার খালেদের কপাল ফুটো করে মগজের ওপরদিক ঘেঁষে লেগেছে। জখম বেশ মারাত্মক, ডাক্তাররা বলছেন অনেকদিন ভোগাতে পারে। তবে আশা করা হচ্ছে সেক্টর কমান্ডার সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েই ফিরে আসবেন। লক্ষ্ণৌর যে হাসপাতালে খালেদকে রাখা হয়েছে, সেটা খুবই উন্নতমানের।

আলাউদ্দীন লক্ষ্ণৌ থেকেই ফিরছে, মন্ত্রী হেনা ভাইয়ের নির্দেশে খালেদ মোশাররফের খবর নিতে গিয়েছিল সে।

অধিনায়ককে আহত করার বদলা নিতেই যেন মুক্তিবাহিনী জিতে নিয়েছে কসবা। অক্টোবরের শেষ দিকে সেখানে টানা চারদিন প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়েছে। আলাউদ্দীন মনে মনে খুব হাসে। পাকিস্তানিরা কী নির্লজ্জ। খুব ফলাও করেই পত্রিকায় ছেপেছে যে 'ভারতের চর'রা ফিল্ডগান-ভারী মর্টার-অ্যান্টিট্যাঙ্ক গান নিয়ে আক্রমণ চালিয়েছে, পাকিস্তানের আর্মি প্রচুর 'ভারতীয় চর' মেরেছে। কিন্তু ব্যাটারা একবারও কাগজে লেখেনি যে মুক্তিবাহিনী তাদের কাছ থেকে কসবা কেড়ে নিয়েছে। আহাম্মকের দল, চোখ বন্ধ করলেই কি ঝড় বন্ধ করা যায় নাকি!

হাসপাতালে গিয়ে বন্ধু তারেকুল আলমের সাথেও দেখা হয়েছে আলাউদ্দীনের। সেক্টর টু'য়ের বর্তমান ইনচার্জ হায়দার নাকি তাকে খবর নিতে পাঠিয়েছেন সেখানে। তারেকের কাছ থেকেই বেশ কিছু খবর শোনা হয়ে গেছে আলাউদ্দীনের। খালেদের 'মৃত্যুর খবর' বেস ক্যাম্পে পৌঁছার সাথে সাথে যেন একদম কারবালার মাতম পড়ে গিয়েছিল ছেলেদের মাঝে। শক্তপোক্ত ডানপিটে ছেলে সব, তবুও কমান্ডারের মৃত্যুসংবাদে তারা একেবারে ছেলেমানুষের মতোই হু হু কান্নায় ভেঙে পড়েছিল। শেষ পর্যন্ত হায়দার ভাই খবর পেয়ে নিশ্চিত করলেন, খালেদ মোশাররফ বেঁচেই আছেন, যুদ্ধে জখম হয়েছেন কেবল।

তবুও মেলাঘর থেকে বিশ্রামগঞ্জ, শোকের কালো ছায়া ঘিরে রেখেছিল ছেলেদের, তারেক বলছিল আলাউদ্দীনকে। বহু মুক্তিযোদ্ধা নিয়ম ভেঙে ক্যাম্প ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিল খালেদের খবর নেবে বলে। খালেদ মোশাররফ তো শুধু ওদের নেতা নন, খালেদ ওদের গার্ডিয়ান অ্যাঞ্জেল। খালেদের আদেশে প্রয়োজনে চোখ বেঁধেও অপারেশনে যেতে রাজি হয়ে যাবে ছেলেরা।

যতজন ছেলেকে সেক্টরে রাখার অনুমতি দিয়েছে সরকার, খালেদ মোশাররফ তার চেয়ে অনেক বেশি ছেলেকে আশ্রয় দিয়েছে। কাজেই যোদ্ধাদের জন্যে যে নির্দিষ্ট রেশন, তাতেও টান পড়েছে প্রায়ই। কিন্তু খালেদ মোশাররফ ক্রমাগত বলে গেছেন, 'গেরিলা যুদ্ধ কন্টিনিউ করতে আমার প্রচুর ছেলে লাগবে। কাজেই, বাদল-আলম, তোমরা যত পারো সরাসরি ছেলে রিক্রুট করে আমার কাছে নিয়ে

আসবা। ইয়ুথ ক্যাম্পের সার্টিফাই করা ঐ লিমিটেড নাম্বারের ছেলেদের নিয়ে আমার চলবে না।'

যুদ্ধের উন্মাদনায় আগরতলা পর্যন্ত এসেও যখন ট্রেনিংয়ের অভাবে হতাশ হয়ে পড়ছে অনেক ছেলে, তখন এই খালেদ মোশাররফই এইসব দামাল ছেলেকে আশ্রয় দিয়েছেন। তিনশো ছেলের রেশনে ক্যাম্পে ভাগাভাগি করে খেয়েছে ছয়শো ছেলে, হাত খরচের রুপিও ভাগ করে নিয়েছে খুশি মনে।

'তোর তো মন্ত্রী মিনিস্টারদের সাথে ভালো খাতির', আলাউদ্দীনকে বলেছিল তারেক। 'উনারা ফাইলপত্রের মানুষ ক্যাম্পের ব্যাপারগুলা হয়তো ঠিকমতো বুঝতে পারেন না কলকাতা থেকে। তুই একটু এদিকের ব্যাপারগুলো বুঝায়ে দিস উনাদের। পারলে বলিস যে সেক্টর টু নিয়ে দুশ্চিন্তার কিছু নাই।'

'এই কথা কেন হঠাৎ?' আলাউদ্দীন বিস্মিত স্বরে প্রশ্ন করেছিল। 'কোনো বিশেষ রকম অর্ডার আসছে নাকি? সেক্টর টুয়ে কোনো রকম ঝামেলা হইছে?'

'ঝামেলা বলা ঠিক না। তবে কিছু ব্যাপার কেমন যেন চোখে লাগে।' এইটুকু বলে হাসপাতালের করিডোরে দাঁড়িয়েই সিগারেটে বিশাল একটা টান দিয়েছিল তারেকুল আলম। তারপরে নিচু গলায় আলাউদ্দীনকে খুলে বলেছিল সব।

'ইন্ডিয়া গভর্মেন্ট সেক্টর টু'তে আর্মস দেয়া বন্ধ করে দিয়েছে। কী রে, চমকাচ্ছিস শুনে?... শুনে যা। টাকা আর রেশনের সাপ্লাইও কমে আসছে। কারণ ওদের ধারণা সেক্টর টু থেকে নাকি নকশালদের হেল্প করা হয়।'

'সে কী!' আলাউদ্দীন অবাক হয় শুনে। 'এরকম অ্যাবসার্ড একটা ধারণা কীভাবে হলো তাদের?'

'বলতেছি। সেক্টর টুকে অনেক দিন ধরেই নাকি আড়ালে আড়ালে রেড সেক্টর বলে ডাকতো ইন্ডিয়া গভমেন্ট। কারণ হচ্ছে, খালেদ মোশাররফ স্যার প্রথমেই ঘোষণা করে দিয়েছিলেন যে আমাদের সেক্টরে সবাই সমান। সবাই জাতির জন্যে, সময়ের প্রয়োজনে যুদ্ধ করতে এসেছে। কে কোনখান থেকে এসেছে, কার রাজনৈতিক বিশ্বাস কী সেটা কখনোই সেক্টর টুতে পাত্তা দেয়া হয় নাই। আমাদের সেক্টরে ছাত্রলীগ যেমন আছে, তেমন আছে ন্যাপের লোকজন। আছে বামঘেঁষা পোলাপানও। সবাই সমান। এজন্যেই হয়তো ইন্ডিয়ার সন্দেহ যে নকশালীদের পক্ষের লোকজন আছে এখানে। মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং আরকি। তা খালি সেইটা হইলে তো সমস্যা ছিল না, কিন্তু মাঝেমাঝেই সরকারের উপরের নির্দেশে কাউকে কাউকে ক্যাম্প থেকে চলে যেতে বলা হচ্ছে আজকাল। এইটা খুব খারাপ হচ্ছে ক্যাম্পের ইউনিটির জন্যে।

তোর তো উপরের লোকজনদের সাথে জানাশোনা। কাজও করতেছিস উনাদের হয়ে। প্রেসিডেন্ট নজরুল সাহেব, তাজউদ্দীন সাহেব, ওসমানী সাহেবের

মতটাও আমাদের দিকেই। তুই পারলে অন্যদের সাথে কথা বল। তাদের একটু কনভিন্স কর।'

আলাউদ্দীন ঠিক করে রেখেছে, খালেদ মোশাররফের খবরের সাথে সাথে এই বিষয়টাও সে হেনা ভাইয়ের কানে তুলবে আজ।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর অফিস খালি নেই, ঢুকেই আলাউদ্দীন দেখতে পেল জায়গাটা ভর্তি হয়ে আছে মানুষ, হেনা ভাই তাদের কথা শুনছেন। আলাউদ্দীনকে চোখের ইশারায় ঘরের কোণে বসতে বললেন কামারুজ্জামান। এখন যারা কথা বলছে, আলাউদ্দীন তাদের চেনে। কয়েকজন মাঝারি গোছের নেতা এরা, খুব বেশি কাজ নিয়ে তারা এসেছেন বলে মনে হচ্ছে না। তাদের একথা-সেকথাতে হেনা ভাই বিরক্ত হচ্ছেন, সেটাও বেশ বোঝা যাচ্ছে।

একটু পরেই তারা শুরু করলেন পরচর্চা। একজন গলায় আবেগ ঢেলে বলে ফেললেন, 'স্যার, আপনি অল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক, অথচ দেখেন, আপনাকে বাদ দিয়ে কোত্থেকে তাজউদ্দীন প্রধানমন্ত্রী হয়ে গেলেন! আমরা তো স্যার ভেবেছিলাম আপনিই...'

আলাউদ্দীন প্রমাদ গুনল। এ কী ধরনের কথাবার্তা। কিছু কিছু মানুষ এত জঘন্য প্রকৃতির হয় কেন কে জানে! দুজন সম্মানিত মানুষের মাঝে অন্তর্দ্বন্দ্ব লাগিয়ে দিয়ে কী উপকারটা হবে তাদের!

আলাউদ্দীনকে অবাক করে দিয়ে হেনা ভাই লাফিয়ে উঠলেন। চোখ লাল করে বললেন, 'বেরিয়ে যান! এক্ষুণি, এই মুহূর্তে বেরিয়ে যান! প্রাণের ভয়ে দেশ থেকে বউ ছেলেমেয়ে বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়েছেন। শুধু স্বভাবটাই ফেলে আসতে পারেননি! এখানেও বসে চিন্তা করছেন দলাদলির ...'

কামারুজ্জামান না থেমে চেঁচাতে লাগলেন।

রাগত মানুষকে নাকি এমনিতে ভারি কুৎসিত দেখায়। অথচ এই মুহূর্তে আলাউদ্দীনের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে দেখতে কী যে ভালো লাগছে! গর্বও হচ্ছে খুব!

হাওয়া বদল

আবু জাফর শামসুদ্দীন নিউ মার্কেটে এসেছেন। কেরোসিন তেল কিনতে হবে, সাথে একটা চার্জ লাইটও দরকার। কয়েকদিন ধরে পানি আর বিদ্যুতের লাইন খুব ঝামেলা করছে। গতকাল তো সারাদিনই লোডশেডিং ছিল। আজ সকালে পত্রিকা পড়ে জেনেছেন শুধু ঢাকা নয়, সাথে নারায়ণগঞ্জ-টঙ্গীর শহরতলিতেও একই অবস্থা। খুব সম্ভব সিদ্ধিরগঞ্জের পাওয়ার স্টেশনে গেরিলা হামলার ফলেই এই অবস্থা, আবু জাফর শামসুদ্দীনের মনে হয়।

মুক্তিবাহিনীর গেরিলারা এখন রীতিমতো বেপরোয়া। পাওয়ার স্টেশন, ডি আই টি ভবন, পলওয়েল মার্কেটের ব্যাঙ্ক, ওদের গতিবিধি যেন সর্বত্র। পাকিস্তানি মিলিটারি মহা মুশকিলে পড়েছে এই বিচ্ছুদের নিয়ে। ক্রমাগত মার খাচ্ছে ওরা, সাথে ব্যর্থ হতে হতে এখন ব্যাটাদের মনোবল বলতেও কিছু নেই। মাঝে মাঝে তো পত্রিকায় আসছে যে মুক্তিবাহিনীর অ্যাকশান দেখে ঢাকার রাস্তার সাধারণ মানুষও আর্মির সামনেই হাততালি দিচ্ছে। এরপর ছুটে পালাচ্ছে 'জয় বাংলা' হাঁক দিয়ে।

পশ্চিম পাকিস্তানের মিলিটারি অপদার্থ এবং কাপুরুষ হতে পারে, তবে তারা প্রতিশোধপরায়ণ নয়, এমন অপবাদ তাদের কেউ দিতে পারবে না। গেরিলাদের কাছে মার খেয়ে খেয়ে জারজগুলো এখন তার শোধ নিচ্ছে সাধারণ মানুষকে হয়রানি করে। সেদিন রাত দুপুরে গ্রিন রোড থেকে হাতিরপুল পর্যন্ত এলাকা ঘেরাও করে মুক্তির খোঁজে তল্লাশি চালিয়েছে মিলিটারি। প্রায় দশ ঘণ্টা সার্চ করে সাড়ে তিনশোর মতো অল্প বয়েসি ছেলেদের ধরে নিয়ে গেছে তারা। আবু জাফর শামসুদ্দীনের মেয়ে জামাইও ছিল তাদের মাঝে। বিকেলের দিকেই তাকেসহ বেশ কিছু তরুণকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে, তবে অধিকাংশই এখনো ফেরেনি। তাদের ভাগ্যে কী ঘটেছে, আন্দাজ করা খুব কঠিন নয়।

চার্জ লাইটের দরদাম শুনতে শামসুদ্দীন সাহেব দোকান থেকে দোকানে ঘুরতে লাগলেন। ঘোরার ফাঁকেই খেয়াল করলেন, আজ নিউ মার্কেটে লোকের আনাগোনা যেন অন্যদিনের চাইতে বেশি। একটু লক্ষ করতেই কারণটা বোঝা গেল। ঈদের কেনাকাটা করতে বেরিয়েছে অনেকেই।

আবু জাফর শামসুদ্দীনের নাক কুঁচকে গেল বিরক্তিতে। সামরিক জান্তা কিছুদিন ধরে খুব করে প্রচার করছে, সামনে ঈদের খুশি। তাই নতুন কাপড় পরো, পোলাও কোর্মা ফিরনি খাও, মন খুলে আনন্দ করো। এক শ্রেণির লোক খুব মেতে উঠেছে তাই নিয়ে। সংখ্যায় এরা বেশি নয়। যাদের বাড়িতে মেয়েদের জামাকাপড় আর ছেলেদের টুপির মাঝে বেশি বেশি জরি-চুমকির ব্যবহার দেখা যায়, সেইসব বিহারি আর বাড়িতে উর্দু বলা 'বাঙালি'দের মাঝেই খালি কেনাকাটার ধুম দেখা যাচ্ছে।

আবার গুজব শোনা যাচ্ছে, বড় বড় ঈদের জামাতে নাকি মুক্তিরা বোমা হামলা করবে। এই গুজবের পেছনে যে মিলিটারির কোনো মাথাই কাজ করছে সেটা বুঝতে বাকি নেই কারো। এই করে যদি মুক্তিদের জনপ্রিয়তা কিছু কমানো যায়!

কেরোসিনের দাম বেড়ে গেছে বাজারে। প্রতি টিনের দাম এগারো টাকা থেকে এক লাফে আঠারো টাকায় উঠে এসেছে। বিচ্ছুদের অ্যাকশানের জের এটা, বোঝাই যাচ্ছে। শামসুদ্দীন সাহেব চার টিন কেরোসিন কিনে ফেললেন।

নিউ মার্কেট থেকে বেরিয়ে এসে আবু জাফর শামসুদ্দীন রিকশা খুঁজতে লাগলেন। রাস্তায় অল্প কয়েকটা রিকশা চলাফেরা করছে, সেগুলোর মাঝে একটাও খালি পাওয়া গেল না। শামসুদ্দীন সাহেব ধীর পায়ে বাংলা একাডেমির দিকে হাঁটতে লাগলেন।

নীলক্ষেত পেরিয়ে অল্প খানিক যাবার পরেই তার সাথে রহমান সাহেবের দেখা হয়ে গেল। ভদ্রলোকের দুই চোখ লাল, সারা মুখে ক্লান্তির ছাপ।

'স্লামাইকুম রহমান সাহেব', আবু জাফর শামসুদ্দীন হাত তুলে বললেন। 'কোথায় গেছিলেন ভাই? অসুস্থ লাগছে আপনাকে।'

'ওয়ালাইকুম ভাই সাহেব। ...আপনি জানেন না? আরে ভাই সকাল থেকে মাইকে ঘোষণা দিল যে বাসায় বন্দুক-পিস্তল থাকলে সেগুলার লাইসেন্স নিয়ে মেইন রোডে আসতে। জমা নিবে। আমার বাসায় একটা পুরানো দোনলা বন্দুক ছিল ভাই। লাইসেন্সসহ সেটা নিয়ে প্রায় চার ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকলাম, এইতো-একটু আগে উনারা এক টুকরা কাগজে রসিদ লিখে দিয়ে ধন্য করলেন আমাকে।'

'ও।' আবু জাফর শামসুদ্দীন মাথাটা একটু এগিয়ে আনেন। 'নতুন কোনো খবর আছে নাকি ভাই সাহেব?'

রহমান সাহেবও চারপাশটা দেখে নিলেন একবার। নিচু গলায় বললেন, 'শুয়োরের বাচ্চারা কালকে রাতে কী করেছে শুনছেন নাকি ভাই? রোকেয়া হলে অ্যাটাক করসিলো! খবর পাইলাম ২০-৩০টা মেয়েরে নাকি ....। কী বলবো ভাই, কথা বলতেও রুচি হয় না এই জালিমদের সম্পর্কে!'

শামসুদ্দীন সাহেবের মনে পড়ল, খবরের কাগজে রোকেয়া হলে ডাকাতি হয়েছে এই জাতীয় একটা খবর তিনি দেখেছিলেন। আড়ালের আসল ঘটনা তাহলে এই! তার মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল।

রহমান সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার খবর কি ভাই? একটা উপন্যাস লিখতেছেন বলছিলেন, কী খবর সেইটার?'

'আর উপন্যাস ভাই, জীবনেরই দাম নাই যেইখানে সেখানে আর উপন্যাস। লেখা ফেলে রাখছি।' শামসুদ্দীন সাহেব যুদ্ধ শুরুর আগেই বড় কলেবরের একটা উপন্যাসে হাত দিয়েছিলেন। 'পদ্মা-মেঘনা-যমুনা' নামের উপন্যাসটির পাণ্ডুলিপি আপাতত লুকিয়ে রাখতে হয়েছে তাকে, দেশের এই অবস্থায় লেখালেখির কথা ভাবা যাচ্ছে না। নিরাপত্তার ব্যাপারটাও মাথায় রাখতে হয়।

আরো টুকটাক কথাবার্তার পরে রহমান সাহেব এলিফ্যান্ট রোডের দিকে চলে গেলেন। আবু জাফর শামসুদ্দীন এগোতে থাকলেন।

বল প্রয়োগে কাজ হাসিল করতে না পেরে ইয়াহিয়া খান আরেক রাস্তা ধরেছে এইবার। একটা উপ-নির্বাচন দিয়ে খানিকটা গণতন্ত্রে মোড়া কাঠামোর সরকার

কায়েম করতে চাইছে সে বাংলাদেশে। যথারীতি কয়েকজন নেমকহারাম বাঙালিও সেই নির্বাচনের জন্যে নমিনেশন পেপার জমা দিয়েছে।

পরিবর্তন এসেছে আরো। টিক্কা খানকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশে বেসামরিক গভর্নরের পদে নিয়োগ দেয়া হয়েছে থুড়থুড়ে বুড়ো এম মালিককে। এই ঘাটের মরা ছাড়া আর কেউ সেধে দালালগিরি করতে রাজি হয়নি মনে হয়। বদলানোর পালায় সামরিক বাহিনীর প্রধান করে পাঠানো হয়েছে আরো একজন লেফটেন্যান্ট জেনারেলকে। হাতের কেরোসিনের টিনের বোঝা, সাথে করে শামসুদ্দীন সাহেব হাঁটতে লাগলেন মাথায় একটা প্রশ্ন নিয়েও। লে. জেনারেল আমীর আবদুল্লাহ খান নিয়াজী, কেমন মানুষ তিনি?

তোমাকে আসতেই হবে হে স্বাধীনতা

জেনারেল নিয়াজী প্রায়ই অপ্রয়োজনে ক্লাউনের মতো রসিকতা করেন, তবে অশ্লীল কৌতুক ছাড়া তিনি শ্রোতাদের হাসাতে পারেন না। বদ্ধমূল কিছু পূর্ব ধারণার বাইরের জিনিস তিনি মগজে ঢোকানোর চেষ্টা করেন কম। অধস্তন কর্মচারীদের নিয়াজীর বাগাড়ম্বর সবচেয়ে বেশি সইতে হয় খাবার টেবিলে। নিয়াজী, অধিকাংশ ভোগী প্রকৃতির মানুষের মতোই ভোজনরসিক।

মুরগির রানে কামড় বসাতে বসাতে জেনারেল নিয়াজী সহাস্যে বলেন, 'হাহ! কয়েকটা ছোটলোক বাঙালি মুক্তি ঐ ইন্ডিয়ার দেয়া অস্ত্র নিয়ে এখানে এসে ঠাস-ঠুস করে গুলি করলেই আমরা ভেগে যাবো? কভি নেহি। আরে আমার নাম টাইগার নিয়াজী, নেহাত হাইকমান্ডের বাধা আছে বলে, নইলে আমি নিজেই তো উড়িয়ে দিতে পারতাম পুরো ইন্ডিয়া। ঐ কলকাতাকে দখল করে আমি কাশ্মীর নিয়ে যেতাম, হ্যাঁ!'

লাঞ্চ করতে বসা জনসংযোগ কর্মকর্তা সিদ্দিক সালিক, জেনারেল রহিম ও জেনারেল জামশেদ এই কথা শুনে একে অন্যের দিকে নীরবে চাইলেন। নিয়াজী মাঝে মাঝে বড্ড আবোলতাবোল বকেন। এই কথা শুনতে পেলে সাংবাদিকেরা হাসবে।

জেনারেল জামশেদ বললেন, 'কিছু মনে করবেন না স্যার, আত্মবিশ্বাস থাকাটা ভালো। কিন্তু একটু সতর্ক থাকা আমাদের জন্যে খুবই দরকার। সীমান্তের বহু জায়গা ইতোমধ্যে ওইসব মুক্তিদের হাতে চলে গেছে।'

নিয়াজী দাঁত বের করে ফেললেন এবার। 'আরে ছাড়ো ঐ সব স্ট্যাটিসটিকস! ঐসব জায়গা তো আমি যেকোনো সময়ই উদ্ধার করতে পারি। আমার কমান্ডে সত্তর হাজার সোলজার আছে। শুনলাম আরো পাঁচ ব্যাটালিয়ান আসবে অচিরেই। আমাদের এখন এত ভয় পেলে চলে?'

সিদ্দিক সালিক একটু কেশে গলা পরিষ্কার করল। 'জেনারেল, আপনি যা বলছেন তা সম্পূর্ণ সত্যি। আমরা জানি যে সৈন্য সংখ্যায় আমরা নিতান্ত কম নই, আর তার সাথে পাকিস্তানের আছে আপনার মতো দারুণ একজন সেনাপতি...'

নিয়াজী সিদ্দিকের ঘাড়ে প্রবল এক চাপড় মেরে বললেন, 'আরে, শুধু পাকিস্তান বলছো কেন? সারা দুনিয়াতেই এখন টাইগার নিয়াজীর মতো সেনাপতি কয়টা পাবে বলো তো?... হাহাহা, একটাও না! দেয়ার ইজ ওনলি ওয়ান আবদুল্লাহ নিয়াজী!'

'ঠিক বলেছেন স্যার', সিদ্দিক সালিক শুকনো স্বরে বলে, 'আপনার তুলনা কেবল আপনিই। তবুও জেনারেল, পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি একটু অন্যরকম। আমাদের শত্রুর সংখ্যা একাধিক জেনারেল, একদিকে মুক্তিদের অস্ত্র আর অন্যদিকে দেশের মানুষের অবিশ্বাস। আমরা স্যার ভুল কারণে যুদ্ধ করছি। পশ্চিমে স্যার অন্য অনেকের মতো আমিও ভাবতাম বাঙালিরা হিন্দু। এরা সাচ্চা মুসলমান নয়। কিন্তু জেনারেল আমি লক্ষ করেছি এখানেও লোকেরা ইসলামকে মানে। আমরা এই মুসলমানদের ওপর অত্যাচার করছি, স্থানীয় মহিলাদের ধর্ষণ করছি, ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিচ্ছি, এরা আমাদের আর মুসলিম ভাই বলে ভাবে না।'

'এ কী, অ্যাঁ, কার মুখে কী কথা শুনি আজ!' নিয়াজী কৃত্রিম স্বরে রসিকতা করার চেষ্টা করেন। 'তুমিই না সেদিন বললে, বাঙালিরা যেহেতু শুধু অস্ত্রের ভাষাই বোঝে, তবে তাদের সেটা দিয়েই বোঝানো হোক? সত্যি করে বলো তো, এখন ভয় পেয়ে দল বদলাচ্ছো নাকি তুমি সালিক?...'

হঠাৎ গলার স্বর বদলে যায় নিয়াজীর। 'শোনো, তোমার কাজ এই বাস্টার্ডগুলোর মন বদলানো। সেজন্যেই তোমায় রাখা হয়েছে। রেডিও টিভিতে ভারত-বিরোধী প্রচার বাড়াও। সব জায়গায় দেশাত্মবোধক নাটক-গান ছড়িয়ে দাও।'

সিদ্দিক সালিক কথা না বাড়িয়ে চুপ করে গেল। জেনারেল জামশেদ বলে, 'ঠিক বলেছেন স্যার-যেকোনো উপায়েই পাকিস্তানের ইন্টিগ্রিটি রক্ষা করতে হবে। দরকারে আরো লাখ দশেক বাঙালির লাশ ফেলে দেবো। কিন্তু স্যার বলছিলাম যে আমাদেরও সতর্ক থাকতে হবে। অলরেডি অনেক জায়গায় আমাদের সৈনিকদের মোরালিটি ভেঙে গেছে। ওদের আবার চাঙা করতে হবে।'

নিয়াজী চোখ টিপে বললেন, 'ঠিক বলেছো, চাঙা করতে হবে! ভালোভাবে চাঙা করতে হবে! আরে, সেজন্যে বাঙালি মহিলারা তো আছেই! কী বলো, অ্যাঁ? হাহাহা...'

জেনারেল নিয়াজী একা একাই মাটিতে পা ঠুকে খুব হাসতে লাগলেন।

অথচ সেই মুহূর্তে কয়েক মাইল দূরের আজিমপুর কবরস্থানে কাঁদছেন একজন শহিদ জননী। সেই কান্নার স্বর ঢেকে যাচ্ছে নিয়াজীর হাসিতে। রেজাউল

করিম মানিকের মায়ের চোখের পানিতে ভিজে যাচ্ছে তারেকুল আলমের শার্টের বুকের কাছটা। মা বলছেন, 'আমার একটা মাত্র ছেলে! তোমরারে বলছিলাম ওরে একটু দেইখা রাখো! আর তোমরা তারে সামলাইতে পারলা না!'

মানিকের কবরের পাশে দাঁড়ানো বাবা কেমন যেন অদ্ভুত নীরব। খানিক আগে ছেলের লাশ কবরে শোয়ানোর পর থেকে বাবার মাথায় কিছু ঢুকছে না। কোথায় যেন পড়েছিলেন, পৃথিবীতে সবচেয়ে ভারী বোঝা হলো পিতার কাঁধে সন্তানের লাশ। বাবা একমনে মনে করা চেষ্টা করছেন এই উক্তির উৎস। কিন্তু মানিকের মা'র কান্নার শব্দে বারবার বাবার ভাবনা এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। এত অজস্র শব্দ কেন চারপাশে?...

ঢাকা আরিচা রোডের ভায়াডুবি ব্রিজ অপারেশন হয়েছে গতরাতে। বাচ্চু ভাই, মানিক ভাই, সাবু ভাই, ওয়াজেদ ভাই ছিলেন সামনের সারিতে। পেছনে তারেকুল আলম অপেক্ষা করছিল আরো প্রায় পঞ্চাশ জন গেরিলার সাথে। সাভারের কাছাকাছি এই ব্রিজ যোগাযোগের জন্যে পাকিস্তানিদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, এটা অকেজো করার মিশন নিয়েই গেরিলারা অভিযান করেছে গতকাল। ওয়াজেদ ভাইয়ের মর্টার, সাবু ভাইয়ের এলএমজি, বাচ্চু ভাইয়ের চাইনিজ রাইফেল গর্জন করেছিল বারবার। পিছু হটে যায় দখলদারেরা।

অথচ নীরব অপেক্ষার মিনিট বিশেক পরে ব্রিজে বিস্ফোরক লাগানোর অসমাপ্ত কাজটি শেষ করতে যখন আবার তৎপর হয়েছে গেরিলারা, ছুটে আসা বুলেট জানিয়ে দিয়েছে দখলদারদের পাতা ফাঁদে পা দিয়েছে ক্র্যাক প্লাটুন।

জীবনবাজি রেখে লড়ে গেছে এরপর সবাই এবং এইবার আর না পালিয়ে উপায় থাকেনি শত্রুদের, তারা ঢাকার দিকে পালিয়ে গেছে শেষ পর্যন্ত। আর তখনই ক্লান্ত অবসন্ন সবাই খেয়াল করেছে, মানিক ভাই নেই। বহু খোঁজাখুঁজির পরে, সবাই যাকে মওলানা বলে ডাকে, সেই ছেলেটি কোলে করে বয়ে এনেছে মানিক ভাইয়ের লাশ।

লিডার বাচ্চু ভাইয়ের নির্দেশে সকাল বেলায় ওরা নয়া পল্টনের বাসা থেকে নিয়ে এসেছে মানিক ভাইয়ের বাবাকে। চাচা একটা কথাও বলেননি। প্রায় নীরবেই ট্রাকে করে লাশ নিয়ে এসেছেন ঢাকায়। বাচ্চু ভাই তারেককে পাঠিয়ে দিয়েছেন সাথে, যদি কোনো দরকারে লাগে।

এই মুহূর্তে মা'য়ের কান্না শুনতে শুনতে বুকের মাঝে অসহ্য লাগে তারেকুল আলমের। ইচ্ছে হয়, সে একাই গিয়ে সব ভেঙেচুরে দেবে। বাচ্চু ভাইয়ের নির্দেশও সেইরকম অবশ্য। ক্র্যাক প্লাটুন অচিরেই আবার ঢুকতে হবে ঢাকায়। মানিকের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে হবে মিলিটারিদের প্রতি ক্ষণে পর্যুদস্ত করে। মা অনবরত কাঁদছেন। কেঁদেই চলেছেন।

নিশীথে

এতদিন নজরুল ইসলাম শুনে এসেছেন রাতের কলকাতার রূপ নাকি অন্যরকম। ছাত্রজীবন থেকেই পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্য পাঠের অভ্যাস তার। সেখান থেকেই জেনেছেন, রাত বাড়লেই কলকাতা ঝিমিয়ে যায় না। অথচ এই মুহূর্তে, কলকাতা নগরীর নিশীথ নীরবতা কেমন যেন অদ্ভুত মনে হয় তার কাছে; তবে কি বইতে যা পড়েছেন সবই ভুল?

পেছনে বসা সিকিউরিটি অফিসারটি যেন নজরুল ইসলামের মনের কথাটি আঁচ করেই অস্ফুটে বলল, 'শহরে রাত বারোটা থেকে কারফিউ দেয়া হয়েছে স্যার। যেসব রাস্তা ধরে আমরা বাংলাদেশের দিকে যাবো, সেই পুরো এলাকাজুড়েই কারফিউ বলবৎ থাকবে।'

প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল, তবুও সামরিক জিপে ড্রাইভারের পাশের সিটে বসা নজরুল ইসলাম স্বস্তি পান না। পেটের ভেতরটা খিদেয় কেমন যেন মোচড়াচ্ছে, সেই সন্ধ্যা থেকে খাওয়া হয়নি কিছু। বরং অপেক্ষা করে বসে থাকার কারণে খিদেটা কেমন বেড়ে গেছে। নজরুল ইসলাম আড়চোখে রিয়ারভিউ মিররে জিপের পেছনটা দেখে নিলেন একবার। সিকিউরিটি অফিসার সোজা হয়ে বসে আছে, মাঝখানে বসা তাজউদ্দীন সাহেবের মুখ সবসময়ের মতোই ভাবলেশহীন। তার অন্য পাশে বসা রহমত আলীর চোখে একরাশ বিরক্তি। নজরুল ইসলাম জানেন, রহমত ভাইও সন্ধ্যা থেকেই অভুক্ত।

অথচ দিনটা অন্যরকম হবার কথা ছিল, আজ ঈদুল ফিতর।

সকালবেলা মুজিবনগর সরকারের দফতরের সামনের ছোট্ট মাঠটায় জামাত বেঁধে নামাজ পড়লেন সবাই। নামাজের পরে ঈদের দিনের সেই চিরন্তন কোলাকুলিও হলো। বিনিময় হলো ঈদ মোবারক। শুধু সেমাই-পোলাও-গোশতের কোনো ব্যবস্থা ছিল না।

ঈদের দিন সকালে একটু ভালো মন্দ খাবেন বলে নজরুল ইসলাম প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সহকারী রহমত আলীকে নিয়ে গেলেন তাজউদ্দীনের অফিসে। কিসের কী! তাজউদ্দীনের দফতরে ঘণ্টা দুয়েক বসায় লাভ হলো না তাদের, সেখানে খাওয়ার কোনো ব্যবস্থা আছে বলেও মনে হলো না। তদুপরি মানুষজনে গিজগিজ করছে অফিসঘরে। রহমত ভাই বেরিয়ে আসার পর বললেন, 'চলো নজরুল, তাজউদ্দীন স্যারের বাসাতেই যাই। ...আরে সংকোচ কইরো না, আমার পরিচিত। আমি তো প্রায়ই ওনাদের বাজার টাজার করে দিই! ভাবি তখন রান্না করে খাওয়ান বুঝলা, জোহরা তাজউদ্দীন খুব ভালো রাঁধতে পারেন।'

রহমত ভাইকে নজরুল ভালোমতোই চেনে, শ্রীপুরের বিশ্বস্ত আওয়ামী লীগ কর্মী উনি, কাজের মানুষও বটে। তাজউদ্দীন সাহেবের নির্দেশে প্রায়ই আগরতলা-

ত্রিপুরার মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পগুলোতে ঘুরে বেড়াতে হয় তাকে। স্যারের পরিবারের সাথে রহমত ভাইয়ের পরিচয় থাকাটা তাই আশ্চর্যের কিছু নয়।

কিন্তু সিআইটি রোডের অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করে মনে মনে আবার একটু লজ্জা পেয়ে যান নজরুল ইসলাম। প্রধানমন্ত্রীর বাসায়ও ভালো খাওয়ার কোনো ব্যবস্থা হয়নি। একই বিল্ডিংয়ে থাকা সৈয়দ নজরুল ইসলাম সাহেব, মোশতাক সাহেব আর মনসুর আলীর সাহেবের বাসা থেকে কিছু মিষ্টি খাবার এসেছে মাত্র, জোহরা তাজউদ্দীন আর বাচ্চারা তা দিয়েই ঈদ কাটাচ্ছেন। ঈদের দিন বেড়াতে গিয়ে রহমত ভাই নিজেই বরং অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন।

চলে আসার আগে জোহরা তাজউদ্দীন তাদের শুকনো মুখে বললেন, 'রহমত আলী-নজরুল, আপনাদের স্যার তো বাসার কোনো খোঁজখবর রাখেন না। একটা ফোনও করেন নাই ঈদের দিনে। উনাকে বাসায় আসতে বলবেন, পারলে আপনারাই উনাকে ধরে নিয়ে আসবেন। বলবেন, পরশু রাত থেকে ছেলেটার খুব জ্বর।'

'সমরজিৎ, একটু সাবধানে চালাও। এইদিকের গ্রামগুলো কিন্তু নকশালাইটদের ঘাঁটি।' ড্রাইভারকে উদ্দেশ করে সিকিউরিটি অফিসার নিচু গলাতেই কথাগুলো বলল, তবে ঐটুকু আওয়াজই রাতের নীরবতার মাঝে শোনাল ভীষণ গমগমে।

ভাবনা থামিয়ে নজরুল ইসলাম সচকিত হয়ে চারপাশে তাকালেন। দেখলেন, কখন যেন কলকাতা পেরিয়ে পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত অঞ্চলের গ্রামগুলোর মাঝে চলে এসেছেন তারা। তাদের কাফেলা খুব বেশি বড় নয়, সামরিক জিপকে পথ দেখানোর জন্যে সামনে একটি ওয়ারলেস সজ্জিত সিগন্যাল জিপ আছে মাত্র। পেছনে রয়েছে গোটা তিনেক গাড়ি। পুরো সফরটাই তো কেমন যেন আচমকা, ভেবে দেখেন নজরুল ইসলাম।

পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তের কাছে বাংলাদেশের মুক্তাঞ্চলের মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্প সফরে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, তাজউদ্দীন তার অত্যন্ত বিশ্বস্ত রহমত আলীকেও মুখ ফুটে বলেননি এই সফরের কথা। রহমত ভাই নিজে এই কথা শুনেছেন সন্ধ্যায়, ভারতীয় সিকিউরিটি অফিসারদের কাছে। অফিসারেরা জানালেন, প্রধানমন্ত্রী রাত দশটার পরে বেরোবেন। রাজনৈতিক সহকারী রহমত আলী, জনসংযোগ কর্মকর্তা নজরুল ইসলাম আর ফটোগ্রাফার সুজিত রায় যেন প্রস্তুত থাকেন।

ঈদের দিন বলে কথা। প্রধানমন্ত্রীর রুমে মানুষের ভিড় লেগে রইল রাত প্রায় সাড়ে দশটা পর্যন্ত। সেই যে সকালে নামাজ পড়ে তাজউদ্দীন সাহেব রুমে ঢুকেছেন, দেখা করতে আসা মানুষের চাপে আর বেরোনোর অবসর মেলেনি তার। সারাদিন মুখেও কিছুই তোলেননি। রাত বারোটার কিছু আগে দফতর

থেকে বেরিয়ে সোজা এসে উঠেছেন এই জিপে। ভারতীয় অফিসারদের আদেশে নজরুল ইসলাম আর রহমত আলী এতক্ষণ অপেক্ষা করছিলেন নিজ নিজ ঘরে, নীরবে তারা যখন সঙ্গী হচ্ছেন প্রধানমন্ত্রীর এই হঠাৎ যাত্রার তখন থিয়েটার রোডের বাড়িটি ঢেকে গেছে নিদ্রিতদের ঘুমের ছায়ায়।

নজরুল ইসলামকে আরেকবার চমকে দিয়ে হঠাৎ হার্ডব্রেক করল সামনের সিগন্যাল জিপ। সেটাকে অনুসরণ করে সামরিক জিপটিও থামতেই পেছনের জানালায় এসে দাঁড়াল এক অফিসার। 'স্যার, এবার নামতে হয়। ক্যাম্পে এসে গেছেন।'

জিপ থেকে বেরিয়ে নজরুল ইসলাম মাটিতে পা রাখলেন। তখন একটা কথা মনে হতেই শরীরে শিহরণ খেলে গেল তার, এই মাটি স্বাধীন বাংলাদেশের! তারা এখন মুক্ত বাংলাদেশের সীমানায় দাঁড়িয়ে!

মুক্ত এই আলো আঁধারির মাঝ থেকে একজন মুক্তিযোদ্ধা এগিয়ে আসে। আর তখন, কী আশ্চর্য, কোনো প্রোটোকলের তোয়াক্কা না করেই তাজউদ্দীন আচমকা জড়িয়ে ধরেন তাকে।

যেমনটা নজরুল ইসলাম আর রহমত আলী পরে আছেন, তাজউদ্দীনের গায়েও সাদা পাঞ্জাবি। কালো ফ্রেমের চশমার আড়ালের চোখজোড়ায় কী চলছে বোঝা যায় না। অথচ আবেগহীন তাজউদ্দীনের এই হঠাৎ আলিঙ্গনের দৃশ্য দেখে চোখে কেন যেন পানি চলে আসে নজরুল ইসলামের নিজেরই। নজরুল ইসলাম প্রাণপণে চেষ্টা করেন এই কান্না ঢেকে রাখতে। কী মুশকিল! এত বড় ব্যাটা ছেলেকে কাঁদতে দেখলে লোকে কী ভাববে!

সুজিত রায় ক্যামেরায় বন্দী করে ফেলেন এই আলো-আঁধারির দৃশ্যটি।

কুষ্টিয়া জেলার নিকটস্থ এই সীমান্ত এলাকাতে অল্প পরেই মঞ্চস্থ হয় আরো কিছু দৃশ্য। সে দৃশ্যে অতিথি বরণ করতে অখ্যাত বনের অজানা নামের ফুলের সাথে লতা জুড়ে যোদ্ধারা তৈরি করবে ফুলের মালা, যে মালা তারা প্রধানমন্ত্রীকে দিতে চায় শ্রদ্ধায়, ভালোবাসায়। তাজউদ্দীন বাকপটু নন। কিন্তু নজরুল ইসলামদের আবেগাক্রান্ত করে তিনি সংলাপ আওড়ান। বলেন, 'মালা তো আমি নিই না! আমার জন্যে মালা কেন? মালা তো পরবেন বঙ্গবন্ধু! আমাকে বরণ করার তো কিছু নাই। তবে আজকের এই মালা আমি নিলাম। এই মালা নেবার পরে মরে গেলেও আমার আক্ষেপ থাকবে না। আমি জানবো, মুক্ত বাংলার মাটিতে জন্মানো একটি ফুলের মালা একদিন আমার গলায় ছিল...'

ঈদ উপলক্ষে মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে কিছু সেমাই রান্না করা হয়েছে। বরণ পর্বের পরে সেটাই খেতে দেয়া হয় অতিথিদের। নজরুল ইসলাম সারাদিনে এই প্রথম মিষ্টিমুখ করার অবসরে আড়চোখে খেয়াল করেন, রহমত ভাই গোগ্রাসে খাচ্ছেন। বেচারার নিশ্চয়ই অসম্ভব খিদে পেয়েছিল!

মাঝরাতের ক্লান্তি চোখে নিয়ে এরপর নজরুল ইসলাম আর রহমত আলী তাজউদ্দীনকে অনুসরণ করেন। সামরিক জিপের বহর সাথে করে এনেছে বেশ কিছু কম্বল-শুকনো খাবার-ঔষধ। সেগুলো বুঝিয়ে দেয়া হয় ক্যাম্প কমান্ডারকে। পাশেই ফিল্ড হসপিটাল। তাজউদ্দীন সেখানে গিয়ে কথা বলেন কর্তব্যরত চিকিৎসকদের সাথে, যুদ্ধে যারা গুরুতর আহত, বসেন তাদের বিছানার পাশে। নজরুল ইসলাম শোনেন, প্রধানমন্ত্রী গভীর স্বরে বলছেন, 'আপনার এই ত্যাগ বৃথা যাবে না ভাই। বাংলাদেশ স্বাধীন হবেই, দেখে নেবেন!'

ঘড়ির কাঁটার দিকে খেয়াল করেননি কেউই। তাই হঠাৎ করেই যেন মনে হলো সিকিউরিটি অফিসারটি উদয় হলেন হাতঘড়িতে চোখ রেখে। তাজউদ্দীনের কানের কাছে মুখ এনে তিনি বললেন, 'সময় কিন্তু বেশি নেই, স্যার! রাত প্রায় শেষ, সূর্য উঠে গেলেই কারফিউও আর বলবৎ থাকবে না। তখন স্যার ঝামেলা হবে কলকাতায় ফিরতে। এখনই রওয়ানা দিতে হবে স্যার।'

অতএব ফেরার জন্যে বেরিয়ে আসতে হয় তাদের। নজরুল ইসলাম জিপে উঠতে গিয়ে দেখেন তাজউদ্দীন সাহেব রহমত ভাইকে নিয়ে আরো খানিকটা সামনে এগিয়ে গেছেন। তাদের দৃষ্টি সামনের শরণার্থী ক্যাম্পের দিকে নিবদ্ধ। রাতজাগা লোকজনের অসন্তোষের চিৎকার, কোনো হতভাগিনীর ফোঁপানোর শব্দ, শিশুদের কান্না, এইসব আওয়াজে অলৌকিকতা কেমন বেড়ে যায় নিশীথের।

নাতিদীর্ঘ এক নিশ্বাস ফেলে তাজউদ্দীন বলেন, 'আল্লাহ এইসব জায়গায় ঈদের কোনো উৎসব আনেন নাই। চলো রহমত, চলেন নজরুল সাহেব। দেরি হয়ে যাচ্ছে, কলকাতায় ফিরতে হবে।'

আবারো ড্রাইভারের পাশের আসনে জায়গা নেন নজরুল ইসলাম, পেছনেও একই আসন বিন্যাসে যাত্রা শুরু হয়। সামরিক জিপ এগিয়ে চলে। বাইরে থাকা ভেসে আসা রাতের বাতাসে কেমন যেন একটা যান্ত্রিক শব্দ পুনরুচ্চারিত হয় বারবার। রহমত আলী যেন আনমনেই প্রশ্ন করেন, 'কিসের শব্দ এটা?'

'সাব, এটা টিউবওয়েলের আওয়াজ। রাতের বেলা খিদা লাগলে শরণার্থী শিবিরের লোকেরা টিউবওয়েল চেপে পানি খায় স্যার।' ড্রাইভারের জবাবে জিপের ভেতরে নামে গাঢ় নীরবতা।

নীরব একের পর এক গ্রাম ছাড়িয়ে যখন তারা ঢুকছেন কলকাতার সীমানায়, তখন আকাশের এক প্রান্তে দেখা যাচ্ছে লালচে আভা। মহানগরীর কোনো এক মসজিদ থেকে ভেসে আসছে আযানের সুর। স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হচ্ছে আল্লাহু আকবার ধ্বনি।

অল্প পরেই জিপ গাড়িটি ছুটে চলে সিআইটি রোডের ওপর দিয়ে। সিকিউরিটি অফিসারের ইশারায় মন্থর হয়ে যায় গাড়ির গতি, তিনি মৃদু স্বরে প্রশ্ন করেন, 'স্যার, বাসায় নামবেন, গাড়ি থামাবো?'

'না, নামতে হবে না। অফিসে চলেন।'

সিকিউরিটি অফিসার ইতস্তত স্বরে আবার অনুরোধ করেন। 'স্যার, আপনার ছেলের গায়ে বেশ জ্বর। কয়েকদিন ধরেই ভুগছে। ম্যাডাম বলেছিলেন আপনাকে বাসায় নিয়ে যেতে।'

'প্রধানমন্ত্রীর ছেলেমেয়েদের নিয়ে চিন্তা করতে লোকের অভাব হবে না। আমিসহ তারা সবাই কলকাতার নিরাপদ আশ্রয়ে আছে।' তাজউদ্দীনের গলা বরফশীতল। 'একবার শুধু বঙ্গবন্ধুর কথা চিন্তা করে দেখুন। আমি যদি কলকাতায় না থেকে পাকিস্তানের বন্দিশালায় থাকতাম, আমার স্ত্রী-সন্তানেরা যদি বন্দী থাকত হানাদারদের কব্জায়, তখন আমাদের এই নিরাপদ জীবন কোথায় যেত? ...আপনি গাড়ি চালান। আমার নামতে হবে না।'

জিপের ভেতরের পরিবেশ তখন গম্ভীর। সমরজিৎ অ্যাক্সিলেটেরে চাপ দেয় জোরে। বাকি পথটা আর মুখ খোলারই সাহস পায় না যেন কেউ।

থিয়েটার রোডের অফিস এসে থামেন তারা। তাজউদ্দীন সিকিউরিটি অফিসারসহ নেমে যান গাড়ি থাকে। দীর্ঘক্ষণের দম আটক ভাব থেকে মুক্তি পাওয়ার দৃষ্টিতে নজরুল ইসলাম তাকান রহমত আলীর দিকে।

'নজরুল সাহেব, আমার কপালটাই খারাপ বুঝলেন।' কৃত্রিম স্বরে রসিকতা করে বলেন রহমত আলী।

'কেন ভাই, আবার কী হলো?'

'আরে ভাই, পার্টির পোলাপান অন্যান্য নেতার পিছে দিল্লি বোম্বে ঘুইরে বেড়াইতেছে, ট্যাকা পয়সা উড়াইতেছে দেদার। আর আমি পইড়া গেছি তাজউদ্দীন সাহেবের লগে। অদ্ভুত মানুষ ভাই, দেখলেনই তো! কী খাইলাম, কী পরলাম, এই নিয়া কোনো কথা নাই। খালি গাড়িভাড়া দিয়াই খালাস।

এমন মাইনষের লগে পারা যায় নজরুল সাহেব, আপনিই বলেন?'

নজরুল ইসলাম তাকিয়ে দেখেন, রহমত ভাইয়ের চোখে কিন্তু কোনো আক্ষেপ নেই, কোনো অনুযোগ নেই। সেখানে দেখা যায় শুধুই মুগ্ধতা।

যুদ্ধের ভবিষ্যৎ, ভবিষ্যতের যুদ্ধ

'ইয়াহিয়া খান কী কয় শুনছো তোমরা? শালার ব্যাটা নাকি বলতেছে আর দশ দিনের মধ্যেই যুদ্ধে নাইমা যাবো ইন্ডিয়ার লগে! গাধা কোন হানকার!'

মামুনের বক্তব্যকে ঠিক প্রশ্ন বলা যায় না। কাজেই কথাটির পিঠে কে কথা জুড়বে, সেটা ঠিক করতেই ঘরের মানুষদের একটা মানসাঙ্ক কষতে হয়। খানিক পরে মেসবাহই কথা বলে সবার আগে, 'এই একটা বিষয় কিন্তু খুব লক্ষ করার মতো বুঝলে। ইয়াহিয়া আর ইন্দিরার কাজকর্মের পার্থক্যটাই এখান থেকে ফুটে

উঠছে। খেয়াল করো, ইন্দিরা গত কিছুদিন ধরে যে বক্তব্যগুলো দিয়ে যাচ্ছেন সেখানে কিন্তু কোথাও তিনি বলছেন না যে সমস্যার সামরিক সমাধান চাই তার। নেহরুর মেয়ে পলিটিক্সটা শিখেছে ভালো। ইন্দিরা বরং সব বক্তৃতায় বলছেন যে শরণার্থী সমস্যার মানবিক দিকটাকেই ভারত বড় করে দেখছে। অন্যদিকে পাকিস্তানকে দেখো! ক্রমাগত বলে বেড়াচ্ছে যে ভারতকে যুদ্ধে ওড়ানোটা তাদের জন্যে কোনো ব্যাপারই না।

....ইয়াহিয়া শুনলাম সেদিন আবার জরুরি অবস্থা জারি করেছে। পাকিস্তানের পত্রিকায় নাকি প্রতিদিন আসছে যে 'ভারতের দুষ্কৃতিকারী'দের সাথে নানা সেক্টরে যুদ্ধ হচ্ছে। দুনিয়ার লোকজন তো আর বোকা নয়, আসল বিষয়টা তারা মনে হয় ঠিকই ধরতে পারছে।'

নিজের পরনের স্যান্ডো গেঞ্জির গন্ধ শুঁকে খোরশেদ নিজেই নাক কুঁচকে ফেলে। সেটা খুলে ফেলতে ফেলতেই সে বলে, 'ইন্দিরা তো কম দৌড়াইলো না। কিন্তু খুব কী লাভ হইছে এতে? ব্রিটেন বলো, ফ্রান্স বলো, জার্মানি বলো, কারো কাছ থেইকাই তো সাহায্যের কোনো শক্ত প্রতিশ্রুতি আনতে পারে নাই।'

'সেইটা পারে নাই। তবে পশ্চিমের মিডিয়া যথেষ্টই শক্তিশালী। বিশেষ করে ওদের ইয়ং ছেলেপিলের মাঝে কিন্তু ইন্দিরার ভিজিট ভালোই সাড়া ফেলছে। আরো একটা জিনিস খেয়াল করার মতো। কংগ্রেসবিরোধী যারা, যারা ইন্দিরাকে আগে ব্যক্তিগতভাবেই পছন্দ করত না, এই সফরের পর তাদেরও প্রায় সবাই কিন্তু চুপ করে আছে। ইন্দিরার বিপক্ষে মুখ খুলছে না। বিশেষ করে নিক্সন গভমেন্ট যেরকম ঠান্ডা আচরণ করেছে ইন্দিরা গান্ধীর সাথে, আমার মনে হয় সেটাই মূল কারণ। যত মতবিরোধই থাকুক, নিজের দেশের অপমানটা কেউ সহ্য করতে পারে না।'

'ইন্দিরার কথা বাদ দেও। চীনা সাইডের খবর টবর কী? কিছু শুনো নাই?' পত্রিকাটা হাত থেকে নামিয়ে রেখে প্রশ্ন করে মামুন।

'চীনা সাইডের আবার খবর কী। ভুট্টো নিজে পিকিং গেল, তারপরেও অগো কাছ থেইকা কোনো বিবৃতি পর্যন্ত আদায় করতে পারল না।' খোরশেদ ততক্ষণে আধোয়া কাপড়ের ঝুড়িতে ফেলে দিয়েছে তার গেঞ্জিটা, খালি গায়ে তাকে খুব বিচ্ছিরি দেখাচ্ছে।

'পেপার তো পড়ো না মনোযোগ দিয়ে, খোঁজখবরও তাই কম রাখো।' মেসবাহ হাসিমুখে বলে। 'চীন তো নিজের ঘর নিয়েই ব্যস্ত!

লিন পিয়াও এর নাম শুনেছো না? আরে কমিউনিস্ট পার্টির ভাইস চেয়ারম্যান লিন পিয়াও, ইন্ডিয়ার নকশালরাও যারে গুরু বলে মানে। সেই লিন পিয়াও হাপিশ হয়ে গেছে। কেউ বলছে মারা গেছে, কেউ বলছে লিন অসুস্থ, আর কারো কথা

হচ্ছে লিন নিজেই ক্ষমতা দখল করতে ক্যু করেছিল, ব্যর্থ হয়ে পালিয়ে গেছে কোথাও।

...এই শেষের কথাটা সত্য হবার সম্ভাবনাই সব থেকে বেশি। কারণ পেপারের খবর অনুযায়ী চীনে সামরিক বাহিনীতে খুব ধরপাকড় করা হচ্ছে। বাহিনী প্রধানেরা গ্রেপ্তার হচ্ছে, অফিসারদের ছুটি বাতিল হচ্ছে, প্রচুর গোলমাল। কাজেই এই অভ্যন্তরীণ ঝামেলা পাশ কাটিয়ে চীন পাকিস্তানকে খুব বেশি সাহায্য দিতে পারবে বলে মনে হয় না। অস্ত্র দিতে পারে হয়তো চুক্তি টুক্তি করে, সরাসরি যুদ্ধে নামা চীনের পক্ষে মনে হয় না সম্ভব।'

'চীনরে না হয় আটকানো গেল, কিন্তু আমেরিকার কী হইবো? নিক্সন গভমেন্ট তো লজ্জার মাথা খাইছে।' মাসুদ বলে। 'আর আমাদের ইদিকে তো মোশতাক সাবেরা এক্কেরে ঘাপটি মাইরে বইসা আছে আমেরিকারে ঢুকার সুযোগ দেবার অপেক্ষায়। প্রবাসী সরকারের তো সইরষ্যার ভেতরেই ভূত!'

খোরশেদ তার অনাবৃত দেহের এখানে সেখানে চুলকাতে থাকে। বলে, 'কেন? পররাষ্ট্র সচিব মাহবুবুল আলম চাষিরে যে বরখাস্ত করা হইছে, সেইটা তুমি জানো না মনে হয়!'

'ও! শুধু চাষিরে সাসপেন্ড করলেই সব মাফ, না?' মাসুদ তার তীব্র আওয়ামী লীগ বিরোধী ভাবমূর্তি বজায় রেখেই কথা বলে। 'আর নাটের গুরু মোশতাক? সেইটারে ছাইড়া রাখা হইছে কেন?'

'সবুর করো, সেইটারও ব্যবস্থা হবে অচিরেই।' মামুন বলে। 'আমি তো বেতারকেন্দ্রে প্রোগ্রাম-ট্রোগ্রাম করি, জানোই তো। সেইদিন স্টুডিওতে গেছি একটা কামে, আমারে চরমপত্রের মুকুল সাহেব একটা লাল রঙের মার্কা মারা ফাইল দেখাইলো, গোপনীয় ফাইল আরকি। সেই ফাইলে দেখলাম পাকিস্তানের লগে গোপনে যেইসব মেসেজ চালাচালি করা হইছে, সবগুলারই রেকর্ড আছে। দেখলাম ফাইলের সাথের নোটে লেখা, পাকিস্তানের সাথে যুদ্ধবিরতি আর আপসের প্রস্তাব পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে পাঠানোর অপরাধ যে সব রাজনৈতিক নেতা করেছেন, তাদের ব্যবস্থা রাজনৈতিকভাবে আওয়ামী লীগের পক্ষেই করা বাঞ্ছনীয়। মানে মোশতাকের কথাই বুঝাইছে, বুঝলা তো। তবে চাষি সরকারি কর্মচারী বইলা তারে সাথে সাথেই দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হইছে। নোটের নিচে তাজউদ্দীনের সাইন দেয়া।'

আবদুল গাফফার চৌধুরী দীর্ঘ সময় ধরে চুপচাপ বসে আড্ডার গতি লক্ষ করছিলেন। ফাইলের কথা শুনে তার মুখে একটা মৃদু হাসি দেখা গেল। 'তোমরা কি একটা জিনিস খেয়াল করছো, গত কয়েকদিনে মুজিবনগর সরকারকে নিয়ে গুজব ছড়ানোর হার কিন্তু খুব বেশি বেড়ে গেছে!'

খানিক ভেবে খোরশেদ বলে, 'হ্যাঁ, কিছু গুজব তো বাতাসে উড়তেছে। কেউ বলতেছে ভারত বাংলাদেশের স্বাধীনতা চায় না বইল্যাই এখনো স্বীকৃতি দেয় নাই। কেউ বলতেছে মুজিবনগর সরকার নাকি চায় না যে শেখ সাহেব ফিইর্যা আসুক। কারণ তাইলে তাদের হাতে আর ক্ষমতা থাকবো না। কেউ বলতাছে কমিউনিস্ট পার্টিরে সরকারে না ঢুকাইলে নাকি সোভিয়েত ইউনিয়ন যুদ্ধে কোনো সাহায্য করবো না। সবচেয়ে চালু গুজব হইলো, আমেরিকা নাকি সেভেন্থ ফ্লিট পাঠাইতাছে। এইটা সত্যি হইলে তো আর যুদ্ধে আমাগো কোনো চান্সই থাকে না!

... ক্যান গাফফার ভাই, গুজব শুইনা কী করবেন?'

'নাহ, তেমন কিছু না।' গাফফার চৌধুরী সিগারেটের ধোঁয়ায় মুখের চারপাশটা আড়াল করে ফেললেন। 'আমেরিকা সেভেন্থ ফ্লিট পাঠাবে কি না, সেটা তো আমার জানা নাই। কিন্তু মার্কিনরা তলে তলে কী করছে, কীভাবে গুজব ছড়াচ্ছে, সেই খবর সেদিন শুনে আসলাম তাজউদ্দীনের সাথে দেখা করতে যেয়ে। তোমরা একটু সতর্ক থেকো, চোখ-কান খোলা রেখে চলো। হুট করে কোনো কথা বিশ্বাস করে ফেলো না আবার!'

'কী বলেছেন তাজউদ্দীন?' উৎসুক স্বরে জানতে চায় কয়েকজন।

'বলছি। সেদিন রাতে তাজউদ্দীন ডেকে পাঠিয়েছিলেন আমাকে। তার রুমে তো মানুষের ভিড় লেগেই থাকে, ঘর একটু ফাঁকা হলে তাজউদ্দীন আমার সামনে একটা ফাইল ঠেলে দিলেন। বললেন, গাফফার সাহেব, এই ফাইলটা পড়েন। এইখানে দুইজন বুদ্ধিজীবীর নামে রিপোর্ট আছে।

... রিপোর্টটা পড়ে আমি একদম থ হয়ে গেলাম। আমাদের পরিচিত দুইজন সহকর্মী নাম না বলি, তোমরা সবাই চিনো তাদের তোমাদের এই হোস্টেলেও আমি বেশ কয়েকবার তাদের সাথে আড্ডা দিয়েছি। সেই দুইজন মুক্তিসংগ্রামের নাম করে এখানে এসেছেন, প্রতিদিন বারে বসে বিদেশিদের সাথে দেদার মদ গিলছেন। সেই মদ খাবার পয়সা আবার দিচ্ছে বিদেশিরা।

আমি সেই রিপোর্ট দেখে তাজউদ্দীনকে বললাম, তো এখন কি বিদেশি সাহায্য বন্ধ করে দেবেন?

তাজউদ্দীন মাথা নেড়ে বললেন, বিদেশি সব সাহায্যের উদ্দেশ্য তো খারাপ নয়! কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে, অনেক দেশই আমাদের স্বাধীনতা চায় না। তাদের সাহায্য সম্পর্কে সাবধান থাকতে হবে। এদের পরিকল্পনা অনেক দূর ছড়ানো। স্বাধীনতার পক্ষের লোকজনের মাঝে এরা নিজেদের একটা সমর্থক গ্রুপ তৈরি করতে চাচ্ছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়া মাত্র তারা বিপুল সাহায্যের অফার নিয়ে আসবে। সেই সাহায্যের বেশিরভাগ ব্যয় হবে তাদের নিজেদের লোকের পেছনে। এইভাবে তারা ভবিষ্যৎ সরকারের বিরুদ্ধে একটা গোষ্ঠী এখন থেকেই প্রস্তুত করছে। স্বাধীন দেশের সরকার যদি এইসব দাতা দেশের কথামতো না চলে,

দেখবেন – মিলিটারি ক্যু এর মধ্য দিয়ে সেটার পতন ঘটানোর চেষ্টা করা হবে। ...তৃতীয় বিশ্বে ফরেন এইডের রাজনৈতিক ভূমিকা সম্পর্কে আমি বেশ কিছু মার্কিনদের লেখা পড়েছি। এখন এদের কাজকর্মের সাথে ওইসব ইতিহাস মিলিয়ে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে আমি শঙ্কিত হয়ে গেছি গাফফার সাহেব।

আমি প্রশ্ন করলাম, তো এইখানে আমরা কী করতে পারি বলেন?

আপনারা গুজব ছড়ানো বন্ধ করতে সাহায্য করতে পারেন। বাজারে যা গুজব আসছে, বেশিরভাগ ছড়াচ্ছে ওই মার্কিন দাতা সংস্থাগুলোর লোকেরাই। আপনারা জয় বাংলা পেপারে, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে এইসব গুজব কাউন্টার করবেন।'

গাফফার চৌধুরীর দীর্ঘ বক্তব্যের পরে ঘরে খানিক নীরবতা নামে। শেষ পর্যন্ত মুখ খোলে মাসুদ। 'ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট গাফফার ভাই। কিন্তু আমার মনে হয় আপাতত এত দূর না ভাইবা সরকারের উচিত কীভাবে সেভেন্থ ফ্লিটরে ঠেকানো যায়, সেইটা চিন্তা করা। টেলিভিশনে ভিয়েতনাম যুদ্ধের ছবিতে সেভেন্থ ফ্লিট দেখসিলাম। বাপরে! বোমা মাইরা বিমানগুলা আবার জাহাজে ফিরে গিয়া রেডি হয়া আসে। কঠিন জিনিস!'

'চোখের সামনের চেনা শত্রুর চেয়ে বন্ধুর ছদ্মবেশে থাকা দুর্জন অনেক বেশি ক্ষতিকর মাসুদ।' গাফফার চৌধুরীর গলা ভারী শোনায় খানিকটা। 'যুদ্ধ জিতলেই স্বাধীনতা আসবে ঠিক। তবে স্বাধীনতা আসার পরেও কিন্তু যুদ্ধ করতে হবে আমাদের। খেয়াল রেখো বিষয়টা।'

পরিশেষের প্রারম্ভ

আবদুল বাতেন দাঁড়িয়ে আছে ময়দানের এক কোণে। জায়গাটা প্রথমে মোটামুটি ফাঁকাই ছিল, এখন আস্তে আস্তে ভিড় বাড়ছে। দুপুরের পর থেকে ময়দানমুখী মানুষের সংখ্যা হয়ে গেছে কয়েক গুণ। শুধু কলকাতার বাসিন্দারাই আসছে না আজ, আগত মানুষদের একটা বড় অংশই যুদ্ধের শরণার্থী, পালিয়ে আসা বাংলাদেশি। অনেকে বলছে ইন্দিরা গান্ধী আজকের বক্তৃতাতেই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়ে দেবেন।

সামনের দোকানি কাঁসার থালায় ছাতু-লবণের সাথে কাঁচালংকা মিশিয়ে কী একটা খাবার বানিয়ে রেখেছে। তার সাথে দোকানি এক ঘটি পানিও দিচ্ছে ক্রেতাদের। চারপাশের লোকেদের অনেকেই কিনছে এই খাদ্যদ্রব্য। একটাকা বিশ পয়সা দাম। আবদুল বাতেন কিনবে না কিনবে না করেও শেষ পর্যন্ত এই ছাতুর দানা কিনে ফেলল।

জিনিসটা খেতে খুব খারাপ নয়, কেমন এক রকম নোনতা স্বাদ। আবদুল বাতেন আশপাশের লোকদের দেখাদেখি ছাতুর দানা গোলা পাকিয়ে মুখে দিতে লাগল। ইন্দিরা এখনো ময়দানে এসে পৌছাননি, আরো দেরি হবে বলে মনে হচ্ছে। এর মাঝে কিছু একটা করে সময় কাটানো দরকার। ছাতুর দানা চিবোনোর ফাঁকে বাতেন চারপাশে নজর বোলাতে লাগল।

মাঠের একপাশে বাঁশের ঘের দিয়ে আলাদা করা। ওই জায়গার ভেতরে সামনের দিকে বেশ সোফাটোফা পাতানো, বোঝাই যায়, খুব উঁচু পর্যায়ের মানুষেরাই বসবেন সেখানে। সোফায় এরই মাঝে বসে থাকা মানুষদের কাউকে কাউকে টিভিতে দেখেছে বলে মনে হয় আবদুল বাতেনের, সে নিশ্চিত হতে পারে না।

সাজানো গোছানো সোফাগুলোর পেছনের সারিতে রয়েছে কাঠের ফোল্ডিং চেয়ার, বিয়েবাড়িতে যেমনটা থাকে। এই অংশটা প্রায় ভর্তি হয়ে গেছে মানুষ দিয়ে। বাতেন খেয়াল করল, বাঁশের ঘেরের মুখে কয়েকজন অস্ত্রসহ গার্ড দাঁড়ানো। যারা ভেতরে ঢুকছে, তাদের প্রায় সবার হাতেই টিকেটের একটা কাগজ; সেটা ভালোমতো দেখে গার্ডেরা তারপর অতিথিদের ভেতরে ঢোকাচ্ছে। ইন্দিরা যেখানে ভাষণ দেবেন, সেই মঞ্চ বাঁশের ঘেরের একদম সামনে সোফার সারি থেকে বেশ খানিকটা দূরত্ব রেখে।

চারপাশে যেন স্লোগান লাগানো ফেস্টুনের ছড়াছড়ি। আবদুল বাতেন বাংলা পড়তে পারলেও ইংরেজিতে অল্প কিছু গৎ বাঁধা শব্দের বাইরে তার দখল নেই। এদিকে আজকে ব্যানার ফেস্টুনের প্রায় সবই যেন ইংরেজিতেই লেখা। যুদ্ধের ফটোওয়ালা কিছু ব্যানারও আছে, ঐ ফটোগুলো দেখলেই কেমন মনখারাপ হয়ে যায়। বাতেন বাংলা ফেস্টুনগুলোই পড়বার চেষ্টা করে। 'বাংলাদেশের মানবিক বিপর্যয়ে বিশ্ববিবেক সাড়া দাও', 'শেখ মুজিবের বিচার প্রহসন বন্ধ করো ইয়াহিয়া'।

হঠাৎ আকাশ কাঁপিয়ে স্লোগান শোনা গেল চারপাশ থেকে। 'ইন্দিরা কি জয়!' 'ইন্দিরা জিন্দাবাদ!' হিন্দি স্লোগানগুলোর সাথে কয়েক সেকেন্ড পরে প্রতিযোগিতায় নামে বাংলাভাষী কণ্ঠরাও, এদিকে অবশ্য স্লোগান একটাই। 'জয় বাংলা!'

স্লোগানের আচমকা তীব্রতা বৃদ্ধির কারণ অনুসন্ধানে আবদুল বাতেন মাথা উঁচু করে মঞ্চের দিকে তাকিয়েই দেখতে পায় ইন্দিরা গান্ধীকে। ঐ তো ইন্দিরা! অবাঙালি হয়েও কেমন শাড়ি পরে আছেন, মাথার ঘোমটায় চুল ঢেকে থাকায় তাকে দেখাচ্ছে আরো সাদামাটা।

হাততালির প্রবল শব্দ সাথে করে ইন্দিরা মঞ্চে উঠলেন। সেখানে কখন যেন জায়গা করে নিয়েছে কয়েকজন তরুণী। তরুণীদের সবার পরনে লালপাড়ের

হলদে শাড়ি, তাদের চুলের ফাঁকে বেলিফুল দেখা যায়, তাদের সকলের হাতে ডালা। এত দূর থেকে সে ডালায় কী আছে সেটা ঠাহর করতে পারে না আবদুল বাতেন, খালি শেষ দুপুরের রোদে ছোট ছোট তেলের প্রদীপের ম্লান আলোটাই সে নির্ণয় করতে পারে। এই মেয়েরা তবে ইন্দিরাকে বরণ করছে!

তরুণীদের দলের কেউ বামহাত দিয়ে ইন্দিরার কপালে টিপ এঁকে দেয়। তার সঙ্গীনীরা সে মুহূর্তে উলুধ্বনি করে। প্রিয়দর্শিনী ইন্দিরা হাসিমুখে তরুণীদের চিবুক ধরে সস্নেহে আশীর্বাদ জানান তাদের।

এইসব আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে সমবেত মানুষের সামনে এসে দাঁড়ালেন মহিলাটি। চোখের রোদচশমা খুলে নিয়ে ইন্দিরা গান্ধী মঞ্চের খোলা তিন প্রান্তে গিয়ে দুইহাত কপালে ঠেকিয়ে কুর্নিশ জানালেন ধ্বনিরত জনতাকে। এরপরে বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশটির প্রধানমন্ত্রী তার ভাষণ শুরু করলেন। মাঠ ততক্ষণে জনমানুষে পরিপূর্ণ।

ইন্দিরার ভাষণে কোনো রণহুঙ্কার থাকল না, থাকল না কোনো অযাচিত বাগাড়ম্বর। সহজ হিন্দি এমনকি আবদুল বাতেনও মোটামুটি ভালোই বুঝতে পারল সেটা আর ভাঙা ভাঙা বাংলায় ইন্দিরা বলে গেলেন তার বক্তব্য।

'আপনারা যারা এদেশে সাহায্যের খোঁজে এসেছেন, নিশ্চিত থাকতে পারেন, আমরা আপনাদের কোনো বিপদের মুখে ঠেলে দেবো না। বধ্যভূমি নয়, এখান থেকে আপনাদের গন্তব্য যাতে স্বাধীন দেশ হয়, আমরা সেই চেষ্টাই করবো। শুধু ধর্ম, শুধু বর্ণ অথবা শুধু ভাষা এক হলেই মানুষের মাঝে বন্ধন গড়ে ওঠে না। মানুষের মাঝে একতা তৈরি করে তাদের আদর্শবোধ।'

ইন্দিরার ভাষণ শুনে মোহিত হয়ে রইল পুরো গড়ের মাঠ। তার কণ্ঠের সাথে উঠল নামল আবদুল বাতেনসহ জড়ো হওয়া হাজারো শরণার্থীর আবেগ। ইন্দিরা মঞ্চত্যাগও করলেন বাংলাদেশি এই মানুষগুলোর উদ্দেশে কথা বলে। 'তুমলোগ হামারা ভাই, হামারা বহিন। আমি আশা করি খুব শিগগিরই আবার আপনাদের সাথে আমার দেখা হবে। আশা করি, সেবার আমি আপনাদের স্বাধীন দেশে অতিথি হয়ে যেতে পারবো।'

শুনতে শুনতে আবদুল বাতেনের মনে হয়, এবার তাহলে আর বেশিদিন লাগবে না। সত্যিই খুব দ্রুত বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে যাবে!

ভাষণ শেষ করার পরে ইন্দিরা বেশ তাড়াহুড়ো করেই ময়দান ছাড়লেন। কয়েকজন বলাবলি করতে লাগল, মঞ্চের পেছনেই ইন্দিরার জন্যে হেলিকপ্টার অপেক্ষা করছিল। ইন্দিরা নাকি ময়দান থেকে সোজা দমদম গিয়ে দিল্লির প্লেন ধরবেন।

আবদুল বাতেন ময়দান ত্যাগ করল সন্ধ্যা নামারও পরে। লোকজনের ভিড় এড়াতে চাওয়াটা একটা কারণ, আবার মাঠেও থাকা হলো আরেকটু বেশি।

বাতেনের আসলে ময়দানের হাওয়াটা বড্ড ভালো লাগে। এখানে এলে তার ঢাকা ভার্সিটির খেলার মাঠটার কথা মনে পড়ে যায় বারবার। মনে হয়, সেসব যেন অন্য কোনো জন্মের ঘটনা!

সন্ধ্যার পরে শহরে নেমেই আবদুল বাতেন খেয়াল করে, কেমন যেন খালি হয়ে গেছে পথঘাট। লোকজন রাস্তার ধারের দোকানগুলোতে জটলা পাকিয়ে বসে আছে রেডিওর সামনে। কী হয়েছে, একজনকে ডেকে জিজ্ঞেস করতেই বাতেন চমকে যাওয়ার মতো একটা খবর শুনল। গড়ের মাঠে ইন্দিরা যখন বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, ঠিক সে সময় নাকি পাকিস্তানি বিমান বাহিনী আগ্রা, শ্রীনগরসহ ভারতের কয়েকটি শহরে হামলা চালিয়েছে।

আবদুল বাতেন হোস্টেলে ফিরল ছুটতে ছুটতে। হোস্টেলের দোতলার বড় ঘরটাতে এর মাঝেই রেডিও ঘিরে বসে পড়েছেন মেসবাহ ভাইরা। ভারতের প্রেসিডেন্ট সারা দেশে জরুরি অবস্থা জারি করেছেন। ঘণ্টায় ঘণ্টায় প্রচার হচ্ছে বিশেষ বুলেটিন।

সে রাতের রেডিওগুলো অংশ হয়ে গেল ইতিহাসের। বাংলাদেশের অদম্য মুক্তিযোদ্ধারা বর্বর পাকিস্তানি হানাদারদের বিপক্ষের যুদ্ধে আনুষ্ঠানিকভাবে আরো একটি প্রশিক্ষিত সেনাদলকে পাশে পেল ঠিক মধ্যরাতে। ইন্দিরা গান্ধী পাকিস্তানের বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন।

আকাশ যুদ্ধ

রাস্তা প্রায় ফাঁকা। অথচ ঘণ্টাখানেক আগে যখন নিউমার্কেটে ঢুকছিলেন, তখনও মোটামুটি লোক চলাচল ছিল রাস্তায়। জাহানারা ইমাম বয়স্ক রিকশাওয়ালাটিকে তাড়া দিলেন, 'বুড়া মিয়া জলদি চালাও, প্লেন চলে আসবে আবার!'

রিকশাওয়ালা পেছনে তাকিয়ে ফিক করে হেসে দিয়ে বলল, 'কুনো ভয় নাই গো আম্মা! আমরার বন্দু পেলেন, অহনতরি আমরার মাইনষের গায়ে বুমা মারে নাই!'

জাহানারা ইমাম বুড়োর কথা শুনে মনে মনে হাসেন। জামীও অবিকল এই কথা বলেছে। ইন্ডিয়ান প্লেনের টার্গেট নাকি কেবল এয়ারপোর্ট আর ক্যান্টনমেন্ট। ওদের নাকি সিভিলিয়ানদের ওপর বোমা ফেলতে মানা করে অর্ডার আছে। এসব বলে জামী চারপাশের বাড়ির মানুষদের উদাহরণ টানে, 'দেখছো না আম্মা, প্লেনের যুদ্ধ শুরু হইলেই সবাই ছাদে চলে যাচ্ছে!'

জামীকে তাই জাহানারা ইমাম যুক্তি দিয়ে কিছুতেই বোঝাতে পারেন না যে প্লেন ফাইটের সময় ছাদে ওঠাটা ঝুঁকিপূর্ণ। যতই অর্ডার আর অনিচ্ছা থাক, তারপরেও বিমান থেকে কি আর্মি আর সিভিলিয়ান হিসেব করে বোমা মারা

যায়?... কে শোনে কার কথা। যুদ্ধ লাগার পর থেকেই শরীফ আর জামী সকালের নাশতা খেয়ে সুড়সুড় করে রেডিও বগলে ছাদে উঠে যায়। সেখানে তারা, অবশ্য চারপাশের অন্যান্য ছাদের মানুষেরাও, আকাশ দখলের যুদ্ধ দেখে।

রিকশা যখন বাড়ির গলির মুখে, জাহানারা ইমাম তখন পাড়ার বিহারি দারোয়ানটাকে দেখতে পেলেন। তার মুখ শক্ত হয়ে গেল সাথে সাথে। মনে মনে তিনি এই পাকিস্তানি দালালটিকে একটা গালিও দিয়ে বসলেন। খাওয়ার সাথে সাথেই নিউমার্কেট যেতে হয়েছে এই দারোয়ানের জন্যেই। গিয়েছিলেন কালো রঙের ড্রয়িংশিট কিনতে।

ইন্দিরা গান্ধী গত পরশুরাতে যুদ্ধ ঘোষণা করার পর থেকেই মিলিটারি ঢাকায় ব্ল্যাকআউট ডেকেছে। প্রতিদিন সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত পূর্ণ নিষ্প্রদীপ অবস্থা পালিত হবে। গতকাল সারা বিকাল খেটেখুটে সবগুলো জানালায় কাগজের ফালি লাগিয়েছেন তিনি। তবুও রাতে এসে দারোয়ানটা কথা শুনিয়ে গেল। শরীফ তাকে বারবার বোঝানোর চেষ্টা করল যে নিয়ম হচ্ছে বাইরের মাটিতে যেন ঘরের ভেতরের আলো না পড়ে, কারণ সেটা প্লেন থেকে দেখা যায়। কিন্তু বিহারিটাকে সেটা বোঝানো গেল না। তার এক কথা, সে গলি থেকে ঘরের ভেতরের আলো দেখতে পাচ্ছে জানালায় কাগজের ফালি সত্ত্বেও, অতএব সরকারি আদেশ মানা হচ্ছে না।

জাহানারা ইমাম ঘরে ঢুকেই ছাদ থেকে শরীফ আর জামীকে ডেকে নিলেন। 'শুনো, খালি প্লেন দেখে সময় কাটিও না। একতলার সিঁড়ির নিচে যাতে সবাই শুতে পারি আজকে সেই ব্যবস্থাটা করে ফেলো। যুদ্ধ তো পরে আরো সিরিয়াস হয়ে যেতে পারে। তখন দরকারে আমরা না হয় দৌড়ে নিচে নামতে পারবো, বাবা তো পারবে না! যাও, রুমী-জামীর খাটগুলা নিচে নিয়ে আসো।'

জামী জানে, গতরাতে পাহারাদারের গজগজ শোনার পর থেকেই আম্মার মেজাজ চড়ে আছে। কাজেই কথা না বাড়িয়ে সে আব্বুকে নিয়ে তার রুমের সিঙ্গেল খাটগুলো নামানোতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

শরীফের সাথে জামী টেনে টেনে খাট নামায়, ডিভান-ইজিচেয়ারের জায়গা পাল্টায়, জাহানারা ইমাম বসে বসে কুচকুচে কালো মোটা ড্রয়িংশিটগুলোর দুই মাথা সেলাই করতে থাকেন। রুমীকে নিয়ে গেছে আজ প্রায় একশো দিন হয়ে গেল। তার অবাক লাগে, এত দ্রুত কী করে রুমীর অনুপস্থিতিতে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন তারা সবাই? মানুষ বড় ভয়ানক প্রাণী।

কিছুদিন আগে রুমীকে দেখতে বড় ইচ্ছে করছিল। জাহানারা ইমাম তখন অ্যালবাম খুলে বসেছিলেন। রুমী খুব বেশি ছবি তুলতে চাইত না, বেশিরভাগ ছবিতেই রুমী আরো দু'তিন বছরের ছোট। কী বাচ্চা বাচ্চা যে ছিল তখন ছেলেটা...

জাহানারা ইমাম চমকে উঠলেন। তিনি 'ছিল' বলছেন কেন? তারমানে কি তিনিও ধরে নিয়েছেন যে তার ছেলে মৃত? মেনে নিয়েছেন, যে রুমী আর ফিরে আসবে না? ...তার মাথাটা কেমন যেন গরম হয়ে গেল। সেলাইয়ে বারবার ভুল করে জাহানারা ইমাম সুঁইয়ের গুতো খেতে লাগলেন।

একসময় সেলাইয়ের কাজ শেষ হলো। জাহানারা ইমাম সেগুলো ঘরের বালবগুলোর চারপাশে ঝুলিয়ে দিলেন, ঘর হয়ে গেল প্রায় অন্ধকার। সন্ধ্যার পর আসল পরীক্ষায় পাস করতে পারলেই হলো! জাহানারা ইমাম এবার জানালার দিকে মনোযোগ দিলেন। সেখানে কীভাবে কালো শিটগুলো আটকাবেন, তিনি যখন এই চিন্তায় ব্যস্ত, তখনি আশপাশের বাড়ির ছাদ থেকে কেমন হাততালির শব্দ আসা শুরু হয়ে গেল।

মা কিছু বলার আগেই জামী দৌড়ে চলে গেল ছাদে। মিনিট পাঁচেক ছাদে কাটিয়ে সে যখন ফের নিচে নামল, তার মুখ তখন ঝকমক করেছে আনন্দে।

'উফ আম্মা, কী যে একটা ডগ ফাইট হলো যদি দেখতে! আরে ডগ ফাইট চিনলা না? ওই যে মোরগ লড়াইয়ে দুই ছেলের একজন আরেকজনকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিতে চায় ওই রকম আরকি, দুইটা প্লেনের মধ্যে ফাইট!'

'আমার আর তোমার মতো খেয়েদেয়ে কাজ নাই, ছাদে উঠে এই বিকালে ডগ ফাইট দেখি!' জাহানারা ইমাম কপট রাগে বলেন। 'তা কী হলো শেষ পর্যন্ত, কে জিতলো ডগ ফাইটে?'

'কেউ না। পাকিস্তানি প্লেনটা শেষে ফাইট না করে পালিয়ে গেল যে!'

জাহানারা ইমাম অথবা জামীর জানার কথা নয়, আকাশ যুদ্ধ ততক্ষণে হয়ে পড়েছে একতরফা। নিচু দিয়ে উড়ে উড়ে ভারতের বিমান বাহিনী কৌশলে বেকায়দায় ফেলে দিয়েছে পাকিস্তানি এয়ারফোর্সকে। ঢাকার তেজগাঁও এয়ারপোর্টের রানওয়েতে বোমা ফেলে গর্ত করে দেয়ায় পাকিস্তানি স্যাবার জেটগুলোর টেকঅফ হয়ে পড়ল অসম্ভব। গর্ত বোজানোর আগেই ভারতের বারবার ঝটিকা বিমান হামলায় বিপর্যস্ত হয়ে গেল পাকিস্তানের বিমান আর বৈমানিকেরা।

যুদ্ধের প্রথম ধাক্কাতেই আকাশ পথে কার্যত ভেঙে গেল পাকিস্তানের পাখা।

মানচিত্রের জন্ম

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে ভারত! ইন্দিরা গান্ধী নাকি গভীর রাত পর্যন্ত মিটিং করেছেন ভারতীয় মন্ত্রীদের সাথে, বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে সেখানেই।

আনন্দবাজার পত্রিকায় বড় বড় হেডিং এ ছাপা হয়েছে সম্পাদকীয়, শিরোনামে বলা হচ্ছে, "স্বীকৃতির তিলক বাংলাদেশের ললাটে "। সম্পাদক লিখেছেন, 'সূর্যোদয়কে যাহারা অস্বীকার করে, তাহারা অন্ধ মাত্র, অস্বীকৃতির দৃষ্টিহীনতা সকালের রশ্মিজালকে মিথ্যা করিয়া দিতে পারে না। জয় বাংলার যাত্রা শুরু হইয়াছে আগে, সেই পথ আজ নতুন এক মোড় লইলো এবং এই পথও কুসুমাস্তীর্ণ নয়, রুধিরাক্ত।...'

নজরুল ইসলাম খুব চেষ্টা করছেন এই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ সম্পাদকীয়টির প্রতিটা লাইন মাথায় ঢুকিয়ে রাখতে। পারছেন না। একটু পর পর তার চোখ ভিজে আসছে, পুরোটা আর পড়া হয়ে উঠছে না। কী যন্ত্রণা! পত্রিকা ফেলে রেখে তিনি অফিস ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

মুজিবনগর সরকারের সদর দপ্তরের আঙিনায় উৎসবের আমেজ। জায়গাটা গমগম করছে মানুষে। নজরুল ইসলাম আঙিনায় নামার আগেই কোত্থেকে ছুটে এল আলাউদ্দীন। 'নজরুল সাহেব! ধরেন, মিষ্টি খান!'

'আরে করো কী, করো কী, মিষ্টি আবার নিয়া আসলা কখন!'

'কী বলেন ভাই, আকাশবাণী শোনেন নাই? সাড়ে দশটায় বিশেষ বুলেটিন করছে তো! ব্যাস, কলকাতায় আমরা যারা যে যেইখানে ছিলাম সাথে সাথে রাস্তায় বের হয়ে গেছি! মিষ্টির দোকানে গিয়া দেখি দোকান খালি। এত্তো খুশি লাগতেছে না!'

অতিরঞ্জন নয়, আলাউদ্দীনকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে, সে খুশি চেপে রাখতে পারছে না। নজরুল ইসলামের মুখে মিষ্টি গুঁজে দিয়েই সে ছুটে আরেকদিকে চলে গেল।

বারান্দার এক কোণে কামারুজ্জামান সাহেবকেও দেখা যাচ্ছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মুখ এই শীতের হালকা রোদেও কেমন ঝকঝক করছে। সাংবাদিকেরা তাকে ঘিরে রেখে একের পর এক প্রশ্ন করে যাচ্ছে। একজন প্রশ্ন করল, 'বাংলাদেশ তো স্বাধীনতার পথে লম্বা একটা পদক্ষেপ নিল। পাকিস্তানি মিলিটারি এখন তো যুদ্ধ আর গণহত্যার তীব্রতা আরো বাড়িয়ে দিতে পারে, এটা ভেবে আপনাদের কোনো আশঙ্কা হচ্ছে না?'

কামারুজ্জামান আত্মবিশ্বাসী স্বরে জবাব দিলেন, 'নাহ্, বাংলাদেশের মানুষ প্রমাণ করে দিয়েছে তারা ওইসব দানবদের পরোয়া করে না। আমাদের সুপ্রিম লিডার, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নির্দেশ দিয়েছেন, সর্বশেষ পাকিস্তানি মিলিটারিটি বাংলাদেশের মাটিতে থাকা পর্যন্ত যুদ্ধ চলবে। আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের কথা ভেবে এখন বরং পাকিস্তানের ভয় পাওয়া উচিত!'

প্রশ্নকর্তাদের ভিড় একটু হালকা হতেই নজরুল ইসলাম যেন কামারুজ্জামানের চোখে পড়ে গেলেন। 'এই যে নজরুল সাহেব, এই সময়ে

এরকম মুখ শুকনা করে ঘুরে বেড়ালে চলবে? আরে আপনি হচ্ছেন পিআরও, আপনার তো এখন ম্যালা কাজ! যান যান, এক্ষুণি গিয়ে বাংলাদেশ মিশনে ফোন লাগান। হোসেন আলী সাহেবকে বলেন জাতীয় সংগীত বাজানোর পরে পতাকা তুলতে।'

অতএব নজরুল ইসলামকে দৌড়াতে হলো অফিসের দিকে। কয়েকবারের চেষ্টার পর বাংলাদেশ মিশনে লাইন পাওয়া গেল। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্দেশটা ওদিকে জানিয়ে দিলেন তিনি।

ফোন রেখে সারতে পারলেন না নজরুল ইসলাম, প্রায় সাথে সাথেই রিং বেজে উঠল। অপর প্রান্তে আকাশবাণীর উপেন তরফদার। উপেনবাবু কলকাতা কেন্দ্রের জনপ্রিয় অনুষ্ঠান সংবাদ সমীক্ষার প্রযোজক। কয়েকদিন আগেই ভদ্রলোক নজরুল ইসলামকে অনুরোধ জানিয়ে রেখেছিলেন, ভারত স্বীকৃতি দেয়ার পরে আকাশবাণীর পক্ষ থেকে তিনি তাজউদ্দীনের একটা সাক্ষাৎকার নিতে চান। উপেনবাবু ফোন করেছেন সে ব্যাপারেই খোঁজ নিতে। এই বিষয়ে খানিক পরে জানাবেন প্রতিশ্রুতি দিয়ে নজরুল ইসলাম ফোন নামিয়ে রাখলেন।

তাজউদ্দীনের অফিস ঘরে রহমত আলী আর নুরুল ইসলাম সাহেবকে বসে থাকতে দেখা গেল। নজরুল ইসলাম সেখানে গিয়ে ইতস্তত স্বরে বললেন, 'স্যার, মানে আকাশবাণী থেকে আপনার একটা সাক্ষাৎকার চাইছে। খুব করে ধরেছে স্যার। এখন আপনি নিশ্চিত করলেই ওদের জানাতে পারি...'

'আমি আর কী বলবো?' তাজউদ্দীনের গলা সবসময়ের মতোই ভাবলেশহীন। 'আমার এখানে কী বলার আছে? সব ত্যাগ স্বীকার করেছে দেশের মানুষ। যা বলার তা তো ওরাই বলবে।'

নজরুল ইসলাম এই উত্তরে কেমন থতমত খেয়ে গেলেন। প্রধানমন্ত্রী হ্যাঁ বলেছেন, না কি সাক্ষাৎকারের ব্যাপারে সাড়া দেননি এই প্রশ্নের তো কোনো সমাধা হলো না। মনে মনে নজরুল ইসলাম মহা মুশকিলে পড়লেন। উপেনবাবুকে আসতে বলবেন? কিন্তু উনি আসার পরে যদি তাজউদ্দীন সাহেব সাক্ষাৎকার না দেন? তখন তো বেইজ্জতি। কলকাতার সাংবাদিক জগৎ হাসাহাসি করবেন তাকে নিয়ে।

গভীর চিন্তায় ডুবে থাকা নজরুল ইসলামের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন রহমত আলী। ইঙ্গিতে তিনি নজরুল ইসলামকে বাইরে নিয়ে এলেন। 'কী নজরুল সাব, খুব চিন্তায় পইড়া গেছেন স্যারের কথা শুইনা? ...আরে আপনি ভাই মানুষটা খুবই সরল। এতদিনেও তাজউদ্দীন সাহেবকে চিনলেন না? উনি কখনোই সরাসরি নিজের সাক্ষাৎকার দিতে চাইবেন না। আপনি এক কাজ করেন। আকাশবাণীর লোকেরে নিয়া আসেন এখানে, তারপর আমরা দেখতেছি।'

এই কথায় দুশ্চিন্তা অনেকখানি কমে গেল নজরুল ইসলামের। তিনি উপেন তরফদারকে জানিয়ে দিলেন যত দ্রুত সম্ভব থিয়েটার রোডে চলে আসতে।

টেপ রেকর্ডার কাঁধে ঝুলিয়ে উপেন তরফদার থিয়েটার রোডে চলে এলেন মিনিট বিশেক পরেই। নজরুল ইসলাম উপেনবাবুকে নিজের রুমে বসিয়ে চা খেতে দিলেন, আর নিজে চলে গেলেন প্রধানমন্ত্রীর ঘরে।

'স্যার, ওই যে আকাশবাণীর কথা বলেছিলাম না একটু আগে, উনি স্যার চলে এসেছেন আপনার ইন্টারভিউ করতে। বসে আছেন আমার ঘরে।'

'আরে উনাকে আবার বসিয়ে রাখলে কেন?' নুরুল ইসলাম সাহেব যেন নজরুলের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন, তাজউদ্দীনকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই। 'এখানে সরাসরি নিয়ে আসলেই তো পারতে। যাও যাও, উনাকে চট করে নিয়ে আসো!'

অতএব উপেন তরফদার খানিক পরেই নজরুল ইসলামের সাথে প্রবেশ করলেন তাজউদ্দীনের অফিসে। প্রধানমন্ত্রীর ঘরে সাক্ষী তখন রহমত আলী আর নুরুল ইসলাম। কখন যেন খবর পেয়ে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের ফটোগ্রাফার সুজিত রায়ও চলে এসেছেন এই সাক্ষাৎকারের ছবি তুলতে।

বিশ্বের নবীনতম সার্বভৌম রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রীর দিকে এগিয়ে গেল আকাশবাণী কলকাতার সিল মারা টেপরেকর্ডারের মাউথপিস। খানিক পরে নাসিরুদ্দীন রোডের ফ্ল্যাটে শরণার্থী হয়ে থাকা গোলাম মুরশিদের সাথে আরো বহু মানুষ শ্রোতা হয়ে যাবেন এই ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকারটির।

উপেন তরফদার প্রশ্ন করলেন, 'আপনি তো এই মুহূর্তে একটি স্বাধীন-সার্বভৌম দেশের প্রধানমন্ত্রী। নানা রকম বিঘ্ন ছিল, মতের মিল-অমিল ছিল। কিন্তু সব রকমের প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে এই যে আপনারা, মুজিবনগর সরকার দেশকে স্বাধীনতা এনে দিলেন, এটা তো একটা বিশাল অর্জন। এই মুহূর্তে কী মনে হচ্ছে আপনার?'

'আপনার কথা ঠিক নয়।' প্রশ্ন শুনে তাজউদ্দীন কেমন শীতল গলায় যেন উত্তর দিলেন উপেনবাবুকে। অদ্ভুত এক দৃষ্টিতে প্রশ্নকর্তার দিকে খানিক তাকিয়ে থেকে তিনি আবার বললেন, 'আপনি ভুল বলছেন।'

মনে মনে প্রমাদ গুনলেন উপেন তরফদার। স্কুপ সাক্ষাৎকার নিতে গিয়ে কি প্রথমেই হিসেবে ভুল হয়ে গেল? সরকারের ভেতরে মতের মিল-অমিলের কথা তোলাতেই কি রেগে গেলেন প্রধানমন্ত্রী?

তাজউদ্দীন চোখ থেকে চশমা খুলে নিলেন এরপর। সামনে ঝুঁকে স্পষ্ট স্বরে বললেন, 'মুজিবনগর সরকার দেশ স্বাধীন করে নাই। বাংলাদেশ স্বাধীন করেছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। আমরা শুধু ধাত্রীর কাজ করে গেছি। এই মুহূর্তে

তাই শেখ সাহেবের মুক্তি ছাড়া অন্য কিছুর চিন্তা নেই আমাদের। এটা আমার একার চিন্তা নয়, পুরো বাংলাদেশের ভাবনাই এখন এটা!'

এরপরে, অস্বস্তিকর নীরবতার মাঝে লক্ষ করল সবাই, নয়টি রক্তাক্ত মাসে যে মানুষটি কাজ করেছেন দানবের উদ্যম আর অবসাদগ্রস্তের নিস্পৃহতায়, গৃহবিবাদের ধাক্কা আর অপ্রাপ্য অপবাদের মুখে যিনি ভাবলেশহীন ছিলেন বহুবার, সেই তিনিই কেমন কান্নায় ভেঙে পড়লেন গ্রাম্য কিশোরের আবেগে।

ভূগোলকের গোলমাল

জর্জ বুশের পরনে ধূসর রঙা স্যুট, টাইটা হালকা লাল বর্ণের। তার সামনে থাকা মাইক্রোফোনটি বহু ব্যবহারে জীর্ণ, গায়ের লেখা অস্পষ্ট হয়ে গেছে ইতোমধ্যেই। জর্জ বুশ সেটি পড়ার চেষ্টায় অহেতুক সময় ক্ষেপণ করলেন কিছু, এরপর হঠাৎ করেই যেন কথা বলে উঠলেন।

'দিন দুয়েক আগে আমি নিরাপত্তা পরিষদে যে প্রস্তাবটি রেখেছিলাম, আমার এবং আমার বিশ্বাস মার্কিন জনসাধারণেরও ধারণা, সেটি খুবই সময়োপযোগী প্রস্তাব ছিল। আপনারা জানেন আমরা অবান্তর কিছুই বলিনি। আমরা বলেছি অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি ঘোষণার কথা, আমরা বলেছি শরণার্থী সমস্যার সমাধানে জাতিসংঘের মহাসচিবকে ক্ষমতা দিতে হবে। আমরা বলেছি, ভারত আর পাকিস্তান, দুই দেশের সৈন্যদেরই নিজ ভূখণ্ডে ফিরিয়ে আনা হোক।'

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের মার্কিন প্রতিনিধি বক্তব্যের এই পর্যায়ে নাটকীয়ভাবে থামলেন, যেন শ্রোতাদের সময় দিলেন তার বক্তব্যের অসাধারণত্ব অনুধাবনের। তারপর বললেন, 'অথচ আপনারা জানেন বন্ধুগণ, এমন চমৎকার প্রস্তাবও খারিজ হয়ে গেছে! কারণ, আমাদেরই এক বন্ধু সোভিয়েত ইউনিয়ন, সেই প্রস্তাবে ভেটো দিয়েছে! এমন দারুণ একটা প্রস্তাবেও কেউ ভেটো দিতে পারে, এ তো অকল্পনীয় ব্যাপার!'

ভারতের প্রতিনিধি সমর সেনের প্রত্যুত্তরে তীব্র শ্লেষের ছোঁয়া থাকল। 'বাহ! জেনে খুব ভালো লাগল যে মার্কিন জনমতের প্রতিফলন তাদের সরকারি কার্যকলাপে উপস্থিত থাকে। গত কয়েক মাসে তো এই বিষয়ে আমরা রীতিমতো সন্দিহান হয়ে পড়েছিলাম!'

জর্জ বুশ একটা শুকনো হাসি দিলেন। 'আমার ভারতীয় বন্ধু মিস্টার সেনের রসবোধ খুব চমৎকার, কী বলেন আপনারা? কিন্তু শুধু রসিকতা করে তো আর বাস্তব কোনো সমাধান হবে না। আর আমাদের ভারতীয় বন্ধু সম্ভবত ভুলবশত পুরো ব্যাপারটাকে ভিন্নভাবে উপস্থাপন করতে চাইছেন। আমেরিকার

পত্রিকাগুলোতে সরকার বিরোধী যে অংশগুলো ছাপা হয়, তিনি শুধু সেই সব বিষয়কেই রং চড়িয়ে হাজির করছেন আমাদের সামনে। কিন্তু...'

'এ-তো বড় আশ্চর্য কথা!' সমর সেনের স্বর ভারি তীক্ষ্ণ শোনায়। 'মাসের পর মাস ধরে পাকিস্তান নির্বিচারে গণহত্যা চালাচ্ছে, ভারতে বাড়ছে শরণার্থী মানুষের চাপ, বাংলাদেশের মানুষ মরছে পাখির মতো এ সবই শুধু পত্রিকার বানানো ঘটনা? রং চড়ানো সংবাদ? মিস্টার বুশ, আপনার কাছে বিনীত জিজ্ঞাসা, আঞ্চলিক অখণ্ডতা বড় না মানবিকতা? এতদিন কোথায় ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের মতো গালভরা কথা?

এখন যখন ভারতও আক্রান্ত হয়েছে পাকিস্তান দ্বারা আর সম্মুখ যুদ্ধে মিত্রবাহিনীর হাতে ক্রমাগত মার খাচ্ছে পাকিস্তানি ফৌজ, তখনি আপনাদের হঠাৎ করে যুদ্ধবিরতির কথা মনে পড়ে গেছে, তাই না?'

উপস্থিত অন্যান্য দেশের প্রতিনিধিরা খুব আগ্রহ নিয়ে এই বাক্‌যুদ্ধ শুনতে লাগলেন। নাটক চলছে যেন সাধারণ পরিষদের এই অধিবেশনে।

সে নাটকের আরেক গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হিসেবে আবির্ভাব হলো ইয়াকভ মালিকের। ইয়াকভ এই সভাতে সোভিয়েত প্রতিনিধি। 'প্রস্তাব কিন্তু কেবল আমেরিকাই দেয়নি মাই ডিয়ার মিস্টার বুশ, ভুলে যাবেন না; যুদ্ধ বন্ধের প্রস্তাব কিন্তু আমরাও দিয়েছিলাম। আমরা চেয়েছিলাম 'রাজনৈতিক নিষ্পত্তি'। যেটা ঘটলে, আমরা মনে করি সমস্ত সংঘর্ষের নিশ্চিত অবসান ঘটতো। আর আমরা চাই না জাতিসংঘের মতো সংস্থা বাস্তবতা উপেক্ষা করুক। সমস্ত পরিস্থিতির মূল অনুঘটক যে পাকিস্তানি মিলিটারির সহিংসতা এর চেয়ে বড় বাস্তবতা আর কী হতে পারে?'

উল্লেখ্য, সোভিয়েত ইউনিয়নের এ প্রস্তাবও আটকে গেছিল লাতিন শব্দ 'ভেটো'র জালে। মাত্র চল্লিশ দিন পূর্বে নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী ভেটো ক্ষমতা লাভ করা চীন নামের গণপ্রজাতন্ত্রী দেশটি, তার মিত্র পাকিস্তানের স্বার্থরক্ষায় বাংলাদেশের বিপক্ষে প্রথমবার যাচাই করে নিয়েছিল তার নয়া খেলনার পরিধি।

জটিলতা দিকে দিকে। একদিকে তাদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে বাংলাদেশ স্বীকৃতি পেয়ে গেছে বলে নাখোশ কিসিঞ্জার-নিক্সন জুটি, অন্যদিকে তাদের স্বদেশি রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ সিনেটর কেনেডি রব তুলেছেন বাংলাদেশের পক্ষে। বাংলাদেশের আবির্ভাবেই টালমাটাল হয়ে যাচ্ছে দুনিয়ার রাজনৈতিক ভারসাম্য, গোলমালের জাল জড়িয়ে ধরছে ভূ-গোলককে।

এদিকে সাধারণ পরিষদে যখন চলছে এই কাণ্ড, তার খানিক আগে ঢাকার গভর্নর হাউজে ডেকে পাঠানো হয়েছে জেনারেল নিয়াজীকে। গভর্নর এম মালিক নানা জায়গা থেকে যুদ্ধের যে সকল খবর পাচ্ছেন তার বেশিরভাগই

পরস্পরবিরোধী। গভর্নরের ধারণা, জেনারেল নিয়াজী ছাড়া কারো পক্ষে যুদ্ধকালীন কোনো খবরের সত্যতা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়।

জেনারেল নিয়াজীর জন্যে দিনটি বিশেষ শুভ নয়। আজ সকালেই মুক্তিবাহিনী যশোর ছিনিয়ে নিয়েছে। দুপুরবেলা আরেক দুঃসংবাদ, নিয়াজীর হাতছাড়া হয়ে গেছে সিলেটও। টাইগার নিয়াজীর মতো দাম্ভিক সেনাপ্রধানের পক্ষে এই রকম চড় হজম করা খুবই কষ্টের ব্যাপার। তারচেয়েও বড় কথা, একজন সামান্য সিভিলিয়ান, একটা বুড়ো অথর্ব গভর্নরের কাছে নিয়াজীকে এই বিপর্যয় ব্যাখ্যা করতে হবে। যুদ্ধে হারের চেয়েও এই অপমানের জ্বালাই বেশি বিঁধছে নিয়াজীকে। লাল দামি কার্পেটে মোড়া ঘরটায় বসে যুদ্ধে হারার বর্ণনা দিতে গিয়ে নিয়াজীর স্বর তাই বেশ নিচুতে নামল।

গভর্নর মালিক নিয়াজীর বক্তব্য শেষে একটা বড় শ্বাস ছাড়লেন। এরপর ধীরে ধীরে বললেন, 'জেনারেল, সবার জীবনেই উত্থানপতন থাকে। এটাই ভবিতব্য। কী করবেন বলুন, এটাই মেনে নিতে হবে। জীবনের এক পর্যায়ে আপনি খ্যাতির মোড়কে ঢেকে যাবেন, আরেক পর্যায়ে আবার আপনার মর্যাদা মাটিতে মিশে যাবে...'

ঘটল এক অদ্ভুত দৃশ্যের অবতারণা।

বিশালদেহী নিয়াজী, স্বঘোষিত বিশ্বসেরা সেনাপ্রধান, পাকিস্তানি মিলিটারির টাইগার জেনারেল, দুই হাতে মুখ ঢেকে ভেঙে পড়লেন কান্নায়! বাচ্চাদের মতো ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন নিয়াজী। জেনারেলের কফি নিয়ে ঘরে ঢুকছিল যে বাঙালি ওয়েটারটি, সে এই দৃশ্যের সাক্ষী হয়ে রুম থেকে বেরিয়ে গেল দ্রুত। খুব তাড়াতাড়িই গভর্নর হাউজের বাঙালিদের মারফত এই ঘটনার কথা ছড়িয়ে যাবে সর্বত্র, মনোবল আরেক দফা ভেঙে পড়বে পাক মিলিটারিদের।

নিয়াজীর অবস্থা দেখে গভর্নর মালিক তাকে পরামর্শ দিলেন ইয়াহিয়া খানকে জরুরি বার্তা পাঠাতে। এভাবে চললে মানচিত্র থেকে পূর্ব পাকিস্তান হারানো তো সময়ের ব্যাপার মাত্র। বহির্বিশ্বের সাহায্য অতি দ্রুত দরকার। বার্তার বিষয়বস্তু শুনে জেনারেল নিয়াজী চোখ মুছে এই প্রস্তাবে সাড়া জানালেন।

যুদ্ধের বাকি সময়টায় সদা হাস্যজ্জ্বল নিয়াজীর চোখে আর কখনো প্রাণ ফিরে আসেনি। পাকিস্তানের গর্বের জায়গা ছিল তাদের স্থল সেনাবাহিনী, তাদের মতে সেটি দুনিয়ার সেরা। কখনো অস্ত্র হাতে না ধরা বাংলাদেশের ছাত্র-গ্রাম্য চাষি-নৌকার মাঝি নিয়ে তৈরি মুক্তিবাহিনীটাই পাকিস্তানি মিলিটারির দর্পের আয়নাকে করে দিল গুঁড়ো গুঁড়ো।

পায়ের স্পর্শে মেঘ কেটে যাবে

শীতের দিন সকালে এমনিতেই বিছানা ছাড়তে ইচ্ছা করে না, তার উপরে যদি ভোর সাড়ে চারটায় ঘুম থেকে ওঠা লাগে, তাহলে কেমন লাগে বলো তো! কিন্তু আজকের দিনটা তো আর সাধারণ না, রিমিরও তাই ঘুম থেকে উঠতে একটুও কষ্ট হয়নি। বরং রাতে আম্মা যখন ঘুমাতে এল দেরি করে, তখন উলটো রিমির দুশ্চিন্তা হওয়া শুরু হলো। সকালে আম্মা ঠিকমতো ওদের ডেকে দিতে পারবে তো? আম্মা নিজেই যদি উঠতে না পারে, তাহলে তো সবই মাটি!

গাড়ি চালাচ্ছে এখন মিঠুর বাবা। তার পাশের সিটে বসেছে হাসান ভাই। পেছনের সিটে রাধা মাসি মানে মিঠুর মা, মিঠু, সোমা আর রিমি নিজে। গাড়ি ছুটছে যশোরের দিকে।

৭ তারিখ রাতে যখন শোনা গেল যশোর মুক্ত হয়ে গেছে, সাথে সাথেই চিৎকার দিয়ে রিমি-রিপিরা ওদের ফ্ল্যাট বাড়িটাকে মাথায় তুলেছিল। রিমি নিজে আশপাশের প্রত্যেকটা ফ্ল্যাটে ছুটে গেছে যশোর জয়ের খবরটা বিলিয়ে আসতে।

পরদিন সন্ধ্যায় মিঠুর বাবা-মা এসেছিলেন রিমিদের বাসায়, অভিনন্দন জানাতে। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কত যে কথা বলল সেদিন সবাই মিলে। রিমিরা সে সন্ধ্যায়ই প্রথম জানল যে রাধা মাসিদের বাড়ি আগে ছিল বিক্রমপুরের ভাগ্যকূলে। 'জানো লিলিবু, যশোরের খবরটা শোনার পর থেকে কী যে খুশি লাগছে! মনে হচ্ছে নিজেরাই একবার ঘুরে আসি ওখান হতে।' আম্মাকে বলছিলেন মাসি।

'তাহলে চলেন না ঘুইরে আসি একবার যশোর থেকে। আরে এইটা তো কোনো ব্যাপারই না। গাড়িতে গেলে কয়েক ঘণ্টার মামলা!' হাসান ভাইয়ের গলায়ও ছিল প্রচণ্ড আগ্রহ।

এভাবেই দ্রুত সব ঠিক হয়ে গেল। স্থির হলো মিঠুরা সবাই মিলে যশোর যাবে, হাসান ভাইও সাথে থাকবেন ওদের। রিমি তো শোনা মাত্র আম্মাকে চেপে ধরল, ওকেও যেতে দিতে হবে যশোরে। হাসান ভাইয়ের সব কথা শুনবে, এই শর্তে রাজি হওয়ার পরেই কেবল আম্মা রিমিকে ছাড়লেন।

সারা রাত রিমির ঘুম একটু পর পর ভেঙে যাচ্ছিলো। টানা ঘুম হয়নি বলেই বোধহয়, এ মুহূর্তে শীতের সকালের হু হু করা বাতাস রিমির চোখে ঢুকে ওকে ঘুম পাড়াতে চাইছে বারবার। রিমি একটু পরপর খুব জোরে চোখ কচলে নিচ্ছে, যাতে ঘুম পালিয়ে যায়।

রাস্তায় গাড়ির ভিড় বাড়তে লাগল একটু বেলা হতেই। সাথে সাথে রাস্তার দুপাশে মানুষের বসতিগুলোও ঘন হতে লাগল। হাসান ভাই জানালেন এগুলো শরণার্থী শিবির। ওদের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে রিমির মনটা খারাপ হয়ে গেল। কত্ত মানুষ। অনেকেই তো বয়েসে ওর সমান। যুদ্ধ শুরুর আগে ওরাও নিশ্চয়ই ওর মতোই স্কুলে যেত। স্কুলে নিশ্চয়ই ওরাও স্যারের চোখ এড়িয়ে

কাটাকুটি খেলত খাতায় কিংবা পেন্সিল দিয়ে খোঁচা মারত বন্ধুর পিঠে। কী দোষে আজকে ওরা এই শরণার্থী শিবিরে, কে জানে!

'মিঠু-সোমা, তোমরা কি জানো আমরা এখন যে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি, সে রাস্তাটার নাম কী?' গাড়ির ভেতরের নীরবতা কেটে যায় মিঠুর বাবার প্রশ্নে।

মিঠু ঝটপট উত্তর দেয়, 'যশোর রোড।'

'বাহ, জানো দেখি।' মিঠুর বাবার মুখে হাসি ফুটল। খানিক বিরতি নিয়ে তিনি আবার কথা বললেন। 'রাধা, তোমার সুনীলকে মনে আছে? আরে ঐ যে সুনীল, আমাদের সাথে ভার্সিটিতে পড়ত?'

রাধা মাসিমা একগাল হেসে বললেন, 'যাহ্, সুনীল গাঙ্গুলীকে চিনবো না? তোমার এই একটা বন্ধুর নামই যে কালেভদ্রে পেপারে আসে! সত্যজিৎ রায় গত বছর যে 'প্রতিদ্বন্দ্বী' সিনেমা বানালেন সে তো তোমার বন্ধু সুনীলের বই থেকেই!'

বন্ধুর প্রশংসা শুনে মিঠুর বাবাও মনে হয় খানিকটা খুশি হয়ে গেলেন। 'যাক, তোমার মনে আছে দেখি!

কিছুদিন আগে বুঝলে, আমেরিকা থেকে অ্যালান গিনসবার্গ নামে এক কবি কলকাতায় এসেছিল। সে আবার আমাদের সুনীলের খুব বন্ধু। সেই সময় বন্যার পানিতে এই যশোর রোড একেবারে ডুবে ছিল বুঝলে। তো সুনীল তখন নৌকায় করে সেই গিনসবার্গকে নিয়ে এখানে এসেছিল। এখানকার শরণার্থীদের অবস্থা দেখে ফিরে গিয়ে গিনসবার্গ একটা চমৎকার কবিতা লিখেছে। সেপ্টেম্বর অন যশোর রোড নামে। কবিতাটা পড়লেই বুঝলে, মনটা এত খারাপ হয়...

মিঠুর বাবা এবার হঠাৎ করেই গম্ভীর গলায় কবিতা আবৃত্তি শুরু করলেন, 'মিলিয়নস অব বেবিজ ওয়াচিং দা স্কাই...'

গাড়ির ভেতরটা একটা আশ্চর্য বিষণ্নতায় ভরে গেল তখন।

মিঠুদের গাড়ি রাস্তায় মাঝে মাঝেই থামল লোকজনের জমায়েত দেখে।

এক জায়গায় দেখা গেল প্রচুর মানুষ জড়ো হয়ে আছে। গাড়ি থামিয়ে রিমিরা সবাই মিলে এগুলো কী হয়েছে জানার জন্যে। সেটা ছিল পাকিস্তানি সেনাদের একটা পরিত্যক্ত বাঙ্কার। মিঠু একবার ভেতরে তাকিয়েই চোখ বন্ধ করে ফেলল। এক মহিলার লম্বা চুলওয়ালা মাথা পড়ে আছে ধড় নেই। সেটার পাশেই পচে গলে আছে বেশ কয়েকটা লাশ। এর শরীর থেকে ওর শরীর আলাদা করা যাচ্ছে না। প্রচণ্ড গন্ধে ভরে আছে জায়গাটা। এই বীভৎস দৃশ্য সইতে না পেরে ওরা সরে এল দ্রুত।

গাড়ি আবার এগোল। যশোরে পৌঁছে দেখা গেল, শহরের সমস্ত মানুষই যেন রাস্তায় নেমে পড়েছে আনন্দে। একটু পরপর 'জয় বাংলা' চিৎকারে ছেয়ে যাচ্ছে পথঘাট। পাকিস্তানি মিলিটারি যাবার আগে অনেকগুলো ব্রিজ ভেঙে দিয়ে গেছে।

ভারতের আর্মির ইঞ্জিনিয়ারিং কোর আপাতত অস্থায়ী কিছু ব্রিজ তৈরি করে দিয়েছে সেসব সেতুর উপর।

লোকমুখে শোনা গেল, কাছেই ঝিকরগাছা বলে একটা আছে। সেখানে এতদিন বহু বিহারি থাকত। যুদ্ধের পুরো সময়টাতেই এই বিহারিরা মিলিটারিদের দোসর হয়ে স্থানীয় বাঙালিদের ওপর প্রচুর অত্যাচার করেছে। একে মেরেছে, ওর মেয়েকে তুলে নিয়ে দিয়ে এসেছে পাকিস্তানি ক্যাম্পে, তার ঘরে আগুন দিয়েছে। যশোর মুক্ত হবার পর থেকেই তাই বিহারিরা দলে দলে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করেছে। যারা পালাতে পারেনি, স্থানীয় লোকেরাই তাদের অনেককে ধরে পিটিয়ে মেরেছে। যারা প্রাণে মরেনি, তাদের অনেকেই নাকি এখনো ঝিকরগাছা রেল স্টেশনের আশপাশে পড়ে আছে। ছটফট করছে ব্যথায়।

'ব্যাটাদের একেবারে শেষ করে ফেলা দরকার ছিল!' সব শুনতে শুনতে মিঠুর বাবা উত্তেজিত স্বরে বলেন।

রিমি চমকে ভদ্রলোকের দিকে তাকায়। কী নিষ্ঠুর কথা! কে বলবে, একটু আগে এই মানুষটিই কেমন চমৎকার কবিতা পড়ছিলেন যশোর রোড নিয়ে!

যুদ্ধ একটা ব্লটিং পেপার, সেটা মানুষের সমস্ত সুন্দর কবিতা শুষে নিয়ে মনের কাগজের মন্দ বর্ণের কালিটাকে স্পষ্ট করে দেয়।

হাসান ভাই হঠাৎ করে রিমির হাতে টান দিয়ে বলেন, 'রিমি, ঐ দ্যাখ! মামা যাচ্ছেন! তোর আব্বা!'

সত্যিই তো, ঐ তো খোলা ট্রাকের পিঠে চড়ে এগিয়ে আসছেন তাজউদ্দীন। উনি একা নন, সাথে ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামও আছেন।

মুক্ত যশোরের সার্কিট হাউজে সেদিন সৈয়দ নজরুল ইসলাম তাজউদ্দীনকে পাশে নিয়ে মুখোমুখি হলেন দেশবিদেশের সাংবাদিকদের। পত্রিকা, রেডিও, টিভির জন্যে খবর সংগ্রহ করতে আসা সেসব মানুষের কত রকম প্রশ্ন।

'স্যার, দেশ তো স্বাধীন হয়ে যাচ্ছে, দেশের মানুষের প্রতি আপনাদের প্রথম অঙ্গীকার কী হবে?'

অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বললেন, 'শেখ মুজিবকে ছাড়া বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভ পূর্ণতা পাবে না। আমাদের প্রথম কাজ হবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্ত করে আনা। এরপরে আমরা দেশবাসীকে সংবিধান উপহার দিতে চাই, পাকিস্তান যে কাজটা ২৪ বছরেও সারতে পারেনি।'

একজন প্রশ্ন করল, 'এই মুহূর্তে ভারতের পরে আপনাদের মতে বাংলাদেশে বন্ধু কে? আমেরিকা না সোভিয়েত ইউনিয়ন?'

সৈয়দ নজরুল ইসলাম মুচকি হাসলেন এই প্রশ্ন শুনে। 'ভারতের পরে বাংলাদেশের সেরা বন্ধু হচ্ছে ভুটান। কারণ তারাও আমাদের স্বীকৃতি দিয়েছে ইতোমধ্যে।'

'আপনারা কি তাহলে এখন এই মুক্ত যশোরকেই রাজধানী করার সিদ্ধান্ত নেবেন?'

'অল্প কয়দিনের মধ্যেই তো আমরা ঢাকা দখল করবো, শুধু শুধু যশোরকে অস্থায়ী রাজধানী করতে যাবো কেন?'

অ্যাকটিং প্রেসিডেন্টের গলার স্বরের অদ্ভুত দৃঢ়তা অবাক করে উপস্থিত সাংবাদিকদের। 'সত্যিই আপনারা অল্প দিনের মাঝে ঢাকা দখলের চিন্তাভাবনা করছেন তাহলে? আপনারা নিশ্চিত?'

'কেন, আপনারা সুকান্ত পড়েন নাই?' সৈয়দ নজরুল ইসলাম খুব মিষ্টি করে হাসেন। হাসতে হাসতেই বলেন, 'পড়েন নাই, তোমরা রয়েছো, আমরা রয়েছি, দুর্জয় দুর্বার/পদাঘাতে পদাঘাতেই ভাঙবো মুক্তির শেষ দ্বার?'

দুইমুখো বলপয়েন্ট

অ্যাকুরিয়ামের অধিকাংশ মাছের গায়ের রং লালচে, কিছু আছে সোনালি বর্ণের। পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর এম মালিক এই বড় ঘরটিতে এলেই মাছগুলোর সাথে কিছু সময় কাটান। বিশেষ করে কাচের দেয়ালে টোকা মারতে তার খুব ভালো লাগে। হঠাৎ আলোড়নে বিব্রত হয়ে পড়া মাছগুলোর দিগ্বিদিক ছোটাছুটি করার দৃশ্যটা বড় চমৎকার ঠেকে গভর্নর মালিকের কাছে। তবে আজকের পরিস্থিতি ভিন্ন, গভর্নরের নিজেরই এখন মাথার ঠিক নেই।

চারপাশে বসে থাকা মন্ত্রিপরিষদের দিকে তিনি একবার চোখ বোলালেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, 'এখন কী করা যায় আপনারাই বলুন। প্রেসিডেন্টকে টেলিগ্রাম করলাম পরশুদিন, এখনো তো সেটার কোনো জবাব এলো না। জানি যে প্রেসিডেন্ট খুব ব্যস্ত মানুষ, তবুও...'

'ছাই ব্যস্ত!' আব্বাস আলি খান গজগজ করলেন। 'এদিকে ইস্টার্ন কমান্ডের বেহাল দশা, মিত্রবাহিনী নাকি ঢাকার হাতছোঁয়া দূরত্বে এসে পড়েছে। এইসময় প্রেসিডেন্টের আর কী ব্যস্ততা থাকতে পারে? নিজে নিরাপদে আছেন তো, আমাদের জ্বালা তাই বুঝতে চাচ্ছেন না।'

'সেভেন্থ ফ্লিট আসবে বলে শুনেছিলাম। আরো শুনেছিলাম চীনও নাকি সাহায্য পাঠাচ্ছে। কোথায় কী! জেনারেল নিয়াজীকে নাকি কাল বলা হয়েছে অন্তত আরো আটচল্লিশ ঘণ্টার আগে কোনো রকম হেল্প আসবে না।' ওবায়দুল্লাহর কণ্ঠে তীব্র হতাশা।

'আহা, এসব বলে এখন কোনো লাভ আছে, বলুন?' গভর্নর মালিক যেন নিজেকেই নিজে প্রবোধ দেন। 'জেনারেল সাহেবও তো কম চেষ্টা করছেন না। নানা জায়গায় দৌড়ে বেড়াচ্ছেন।'

আব্বাস আলি খান টেবিল থেকে পত্রিকা তুলে ধরলেন একটা। 'ছোট মুখে বড় কথা বললে মাফ করে দেবেন। আচ্ছা, আমাদের জেনারেল নিয়াজী এখনো কি প্রকৃত অবস্থাটা বুঝতে পারছেন না? বিদেশি সাংবাদিককের জেনারেল কী কী বলে বেড়াচ্ছেন খেয়াল করেছেন আপনারা কেউ?'

গভর্নর মালিক পত্রিকাটা হাতে নিয়ে আব্বাস আলি খানের ইশারা মাফিক স্থানটি পড়া আরম্ভ করলেন। দিন দুই আগে এয়ারপোর্টে বিমানের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন কিছু বিদেশি সাংবাদিক। নিয়াজী হঠাৎ তাদের সামনে পড়ে যাওয়ায় প্রচুর প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়েছিল তাকে। পত্রিকার খবরটিতে সেরকম কিছু প্রশ্ন আর নিয়াজীর খিটখিটে প্রত্যুত্তরগুলো দেয়া আছে।

"-'জেনারেল, আপনি পালিয়ে গেছেন বলে একটা গুজব শুনেছিলাম...'

-'আপনি গুজব শুনলে আমি কী করবো। যান, যে গুজব ছড়িয়েছে তাকে ধরে নিয়ে আসুন...'

-'মিত্রবাহিনীর কথা শুনেছেন জেনারেল, তারা নাকি অবিলম্বেই ঢাকা পৌঁছে যাবে?'

-'এইসব বকোয়াজে কান দেবার সময় আমার নেই। আপনি নিজে গিয়ে দেখে আসুন ওরা কোথায়।'

-'আপনার বর্তমান প্ল্যান কী? ঢাকা রক্ষা করতে পারবেন বলে মনে করেন আপনি?'

-'আমার নাম টাইগার নিয়াজী। আমার শেষ সৈন্যটি জীবিত থাকা পর্যন্ত আমি হাল ছাড়বো না। আমার বুকের ওপব ট্যাঙ্ক না চালিয়ে কেউ ঢাকা দখল করতে পারবে না' "

উপস্থিত মন্ত্রীরা বুঝতে পারল না, খবরটি পড়ে গভর্নর মালিক লম্বা একটা শ্বাস ফেলেছেন। জেনারেল নিয়াজীর যুদ্ধকৌশল মার খেয়ে গেছে। নিয়াজী এমন কৌশল ঠিক করেছিলেন, যাতে সীমান্তের প্রতিটা বড় শহরকে দুর্গের মতো অভেদ্য করে তোলা হয়েছিল। কিন্তু মিত্রবাহিনী সেই সব দুর্গ জয়ের চেষ্টা না করে পাশ কাটিয়ে এসেছে। কিছু গোলন্দাজকে রেখে আসা হয়েছে অপেক্ষমাণ পাকিস্তানি মিলিটারিকে ব্যস্ত রাখতে। সেইসব গোলন্দাজদের কামান বর্ষণের আধিক্যে পাক বাহিনী ভেবেছে যৌথবাহিনী সোজাসুজিই এগোনোর চেষ্টা করছে। এই ভেবে তারা মূল সড়কগুলো আগলেই বসে ছিল কয়েকদিন, বিমান বাহিনী আগেই অচল হয়ে গেছে বলে মিত্রবাহিনীর এই কৌশল বোঝার অন্য রাস্তাও অবশ্য তাদের ছিল না।

এদিকে ভারতের সেনাপ্রধান মানেকশ ক্রমাগত রেডিওতে তাগাদা দিচ্ছে, পাকিস্তানি কমান্ডারেরা যাতে আত্মসমর্পণ করে। সারেন্ডার করা সৈনিকদের সাথে জেনেভা কনভেনশন মোতাবেক ব্যবহারের প্রতিশ্রুতিও পাওয়া যাচ্ছে। গভর্নর

মালিক বুঝতে পারছেন না, পদত্যাগ করে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে চলে যাবেন কি না। ঐ এলাকাকে আবার নিউট্রাল জোন ঘোষণা করা হয়েছে।

নওয়াজেশ আহমেদ মুখ খুললেন কিছু একটা বলবার জন্যে। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই...

হঠাৎ বিস্ফোরণে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল সভাকক্ষের ছাদ। হতচকিত ভাব কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই আরো একবার বিস্ফোরণ ঘটল আশপাশেই। এরপর আরো একবার। চারবার, পাঁচবার, ছয়বার।

বিমানের জোরাল গর্জনে সবার আগে ওবায়দুল্লাহই বুঝতে পারল ঘটনা কী। 'ইন্ডিয়ান প্লেন অ্যাটাক করেছে স্যার! দৌড়ান, সময় থাকতে পালান!!'

ভারতীয় মিগগুলো আবার ফিরে আসার আগেই প্রাণপণে দৌড়ালেন গভর্নর ও তার মন্ত্রিপরিষদ। দৌড়ে বাগান পেরিয়ে তারা আশ্রয় নিলেন গভর্নর হাউজের সামনের বাঙ্কারে। সেই বাঙ্কারে তখন জীবন বাঁচাতে মাথা গুঁজেছেন দি অবজারভারের গ্যাভিন ইয়ংসহ আরো কয়েকজন সাংবাদিক।

'স্যার, চলেন হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালেই চলে যাই!' কাতর স্বরে অনুরোধ করল কোনো এক মন্ত্রী।

'কিন্তু সরকারি পদে থাকা অবস্থায় তো আপনারা নিউট্রাল জোনে ঢুকতে পারবেন না।' গ্যাভিন ইয়ং বলেন।

'দুত্তোরি!' চুয়াত্তর বছরের গভর্নর মালিক চেঁচিয়ে উঠলেন স্থান-কাল ভুলে। 'চেয়ারের নিকুচি করি, আগে জান বাঁচানো ফরজ!'

এই বলে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর টেনে নিলেন হাতের কাছে পাওয়া এক টুকরো কাগজ। আশপাশের উৎসুক সাংবাদিকদের কাছ থেকে একটা কলম নিয়ে কাঁপা কাঁপা হাতের লেখায় সেখানেই লিখে ফেললেন নিজের এবং তার মন্ত্রীদের সম্মিলিত পদত্যাগপত্র।

গভর্নর হাউজের বিশাল সভাকক্ষের অ্যাকুরিয়ামের লাল কিংবা সোনালি রঙের মাছগুলো যখন জলহীনতায় ছটফট করছে খোলা ছাদের নিচে, ধার নেয়া একটি বলপয়েন্ট সে সময় সাক্ষী হয়ে গেল মিত্রবাহিনীর অনন্যসাধারণ একটি বিজয়ের।

ইতোমধ্যে আরো একটি কলম তালিকাবদ্ধ করেছে বেশ কিছু মানুষের নাম।

সে তালিকায় নাম ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক গিয়াসুদ্দীন আহমদের।

মহসিন হলের এই হাউজ টিউটরের কাছে ইসলামী ছাত্রসংঘের কিছু ছাত্র অনুরোধ নিয়ে এসে বলবে, 'স্যার, হলের পানির পাম্প নষ্ট, কাজ করে না। মিস্ত্রিরা কারফিউর মাঝে আসতে চায় না, একটা ব্যবস্থা নিতে হয় যে স্যার!'

গিয়াসুদ্দীন আহমদ নিজেই বাসার দেয়াল টপকে চলে যাবেন পাম্পটি সারাই করতে। ওই অবস্থাতেই আল বদরের সদস্যেরা ধরে নিয়ে যাবে গিয়াসুদ্দীন স্যারকে। নষ্ট পানির পাম্পটি মেরামত হবে না আর বহুদিন।

অথবা সেই তালিকায় নাম থাকা সন্তোষ ভট্টাচার্যের কথা মনে করা যায়।

ইতিহাসের অধ্যাপক সন্তোষ বাবু তখন মাত্র বসেছেন আহ্নিক নিয়ে। জানালায় কাদামাটি মাখা একটি মাইক্রোবাস এসে দাঁড়ায় তাঁর বাড়ির সামনে। কোনো এক আলবদর এসে তাকে বলবে, 'স্যার, আমাদের সঙ্গে একটু আসতে হয় যে!'

সন্তোষ স্যার নির্বিকার থেকে বলবেন, 'বাবারা, মাত্র পুজোয় বসেছি। তোমরা একটু বসো, আমি আসছি।'

'মালাউনের বাচ্চা! ভালোমতো বললাম, কথা কানে গেল না!' হুঙ্কার দিয়ে মাইক্রোবাসের ভেতরে টেনে তোলা হবে সন্তোষ ভট্টাচার্যকে। প্রার্থনা রয়ে যাবে অসমাপ্ত।

ঢাকা মেডিকেলের ডা ফজলে রাব্বীও ছিলেন তালিকায়।

সিদ্ধেশ্বরীর জলপাইগুঁড়ি হাউজের দোতলার বারান্দায় বসে আকাশের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখবেন তিনি। কাঁধে চড়ানো ছোটমেয়েকে বলবেন, 'দেখো দেখো আম্মু, ঐ যে প্লেন যায়! ঐ দেখো প্লেনগুলা যুদ্ধ করে!!'

তখন উর্দুভাষী কয়েকজন আল বদর এসে ঘেরাও করবে জলপাইগুঁড়ি হাউজ, আর তিনটি দরজার তালা খুলে রক্ষাব্যূহের বাইরে বেরিয়ে আসবেন ফজলে রাব্বী। পেছনে চির অপেক্ষায় রইবে তার স্বজনেরা।

এতসব ক্ষণজন্মা মানুষের রঙিন জীবনের ছেদ পড়বে সাদা পাতায় কালো কালির একটি বলপয়েন্টের খোঁচায়। রাও ফরমান আলী তার কলমে স্বহস্তে এইসব মানুষদের নাম ডায়েরিতে তুলবে বাঙালিদের মেধাশূন্য একটি ভবিষ্যতের আশায়, আর সেই তালিকা ধরে কে জানে কেন, যুদ্ধের এই হার নিশ্চিত পর্যায়ে এসেও আলবদর বাহিনী চালাবে এক অমানুষিক হত্যাযজ্ঞ।

একটি বলপয়েন্ট তার গতিপথে হাতছোঁয়া দূরত্বের চূড়ান্ত বিজয়ের ছায়া দেখিয়ে দেবে সবাইকে, অথচ আরেকটি বলপয়েন্টের নির্মম অক্ষরগুলো সাক্ষাৎ করাবে গোপীবাগ রেললাইনের ওপারের এক বৃদ্ধের সাথে। বারান্দায় নিশ্চল বসে থাকা বুড়ো মানুষটি, দৈনিক পূর্বদেশের সিনিয়র সাব এডিটর গোলাম মোস্তফার বাবা মৌলবি জহিরুদ্দীন আহমদ, কোনো আগন্তুককে দেখলেই বলবেন, 'বাবা, আমার পোলাটার কোনো খোঁজ পাইলা?'

জীবন কী আশ্চর্য বৈপরীত্যে ভরপুর!

প্রথম শব্দটির প্রতি মানুষের অনুভূতি বড় তীব্র। প্রথম প্রেম কখনো সে ভোলে না, আজীবন শিহরিত হয় প্রথম চুম্বনের স্মৃতিতে। তাজউদ্দীনকে যেমন এখনো তাড়িয়ে বেড়ায় তার প্রথম মৃত্যুজনিত আঘাত। অথচ কী আশ্চর্য, বড় ভাই কিংবা পিতা, মাথার উপরের এই দুই মহিরুহকে হারিয়ে তাজউদ্দীন মৃত্যুর আঘাত পাননি। তাদের বিদায়ে কেবল পারিবারিক দায়িত্বের বোঝাটা একটু বেশি করে অনুভব করেছিলেন তাজউদ্দীন, ঐটুকুই। তাজউদ্দীনকে প্রথমবার স্তম্ভিত করে দিয়েছিল যে প্রয়াণ, সেটি মহাত্মা গান্ধীর।

তাজউদ্দীনের এখনো মনে পড়ে সেদিনের স্মৃতি। সেই শুক্রবারের সন্ধ্যা, সেই বেচারাম দেউড়িতে নিজ কানে রেডিও শুনে তবেই অবিশ্বাস্য সংবাদটিকে আত্মস্থ করা। নয়াদিল্লির এক প্রার্থনা মঞ্চের সামনে নাথুরাম গডসের পিস্তলের তিনটি গুলি গান্ধীজির হৃৎপিণ্ডের সাথে অবশ করে দিয়েছিল বহুশত মাইল দূরের তাজউদ্দীন নামের এক যুবককে। বছরখানেক আগেই মাত্র যে যুবকটি বাবার মৃত্যুর খবর শোনার কিছু পরেই গোশত আর পরোটা খেয়েছিল জৈবিক তাড়নায়, মহাত্মার মৃত্যুতে সেই ছেলেটিই আহার আর নিদ্রা বিস্মৃত হলো আক্ষরিক অর্থেই।

পরদিন রেল স্টেশনে খবরের কাগজের জন্যে কী ভিড়টাই না হয়েছিল! লোকে কাড়াকাড়ি করে কাগজ পড়ল, গাদাগাদি করে অল ইন্ডিয়া রেডিওতে গান্ধীজির শেষকৃত্যের ধারাবিবরণী শুনল। কংগ্রেসের কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন গান্ধী, সে সময়ের মুসলিম লীগার তাজউদ্দীনকে তাই বহু সময় ব্যয় করেছেন মহাত্মার রাজনৈতিক ত্রুটি আবিষ্কার করতে। অথচ গান্ধীর প্রয়াণের পরমুহূর্তে তাজউদ্দীন অনুধাবন করতে পেরেছিলেন, তার ফেলে যাওয়া পায়ের চিহ্ন ধরে আরো বহুদিন চলতে পারবেন রাজনীতিমনস্ক মানুষেরা। মুসলিম লীগ অফিসে একবার মহররমের দিনে মুখে ক্রিম মেখে তিরস্কার শোনায় তাজউদ্দীন শক্ত গলায় বলেছিলেন, 'দুঃখের বাহ্যিক প্রকাশে আমি বিশ্বাস করি না'। অথচ কেশবিন্যাস ছাড়া অন্য কোনো বিলাস নেই যার, সেই তাজউদ্দীন তিনদিন চুল আঁচড়ালেন না গান্ধীর শোকে। সেবারই প্রথম অমন একটা অনুভূতির সাথে পরিচয় তাজউদ্দীনের, একটি মৃত্যু তবে এমন শোকাহতও করতে পারে মানুষকে!

আজ, হাতে ধরে থাকা রিপোর্টটির দিকে আরো একবার চোখ বুলিয়ে তাজউদ্দীন সেই একই মাত্রার বিষাদ অনুভব করলেন। ঢাকা থেকে পাওয়া খবর, গত দুদিনে বেশ কিছু বাঙালিকে ঘর থেকে ধরে নিয়ে গেছে পাকিস্তানিরা, তাদের সাহায্য করেছে স্থানীয় আলবদররা। এখনো চূড়ান্ত কোনো খবর আসেনি, কিন্তু ধরে নেয়া যায় এদের অনেকেই আর ফিরবেন না। অপহৃত এসব বাঙালিদের মাঝে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা ছিলেন, সাংবাদিকেরা ছিলেন, প্রথিতযশা

লেখকেরা ছিলেন। যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে এসে এরকম কিছু সোনার মানুষদের হারাতে হবে, কে আন্দাজ করতে পেরেছিল সেটা!

তবে ক্ষতিটা আরো অনেক বেশি হতে পারত। এমনও হতে পারত, যে বাংলাদেশে কোনো সংস্কৃতিমনা বা শিক্ষিত লোককেই বাঁচিয়ে রাখেনি পশ্চিমা পাষাণেরা। গতকাল, মানে ১৪ তারিখ ভারতীয় বিমান দফতরের রেডিওতে ধরা ঐ গোপন সিগন্যালটা আরো বড় বিপর্যয় থেকে বাঁচিয়েছে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎকে।

গতকাল দুপুরের কিছু আগে সংগ্রহ করা পাকিস্তানি ঐ বার্তার মূল কথা ছিল, মাত্র ঘণ্টাখানেক পরেই ঢাকার গভর্নর ভবনে একটি বিশেষ মিটিং শুরু হবে এবং আগামীকাল, মানে আজ, ওই গভর্নর ভবনেই প্রভাবশালী শিক্ষিত বাঙালিদের এক সভায় ডেকে নিয়ে মেরে ফেলা হবে। বাংলাদেশ সরকার তৎক্ষণাৎ ওই বার্তা পেয়ে মিত্রবাহিনীকে অনুরোধ জানাল, গভর্নর হাউজে এখনই বোম্বিং শুরু হোক। মিত্রবাহিনী ওই অনুরোধ মান্য করে বোম্বিং শুরু করার পরে তো গভর্নর মালিক পদত্যাগই করে ফেললেন।

তাজউদ্দীন বাইরের শেষ বিকেলের রোদের দিকে চাইলেন। আঙিনায় খেলা করা গাছগুলোর দীর্ঘ ছায়া প্রত্যক্ষ করার পর হঠাৎ ক্লান্তির একটা বাতাস কাঁপিয়ে দিয়ে গেল তাকে, তিনি বড্ড পরিশ্রান্ত বোধ করলেন।

ইতিহাস খেলাচ্ছলে তার কাঁধে যে মৃতদেহের মতো ভারী দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছিল, তিনি বোধহয় তা শেষ করে এনেছেন প্রায়। ঢাকা আর তার চারপাশের গুটিকয় ছোটখোটো এলাকা বাদে বাংলাদেশের প্রায় সবটুকু এখন শত্রুমুক্ত। কোনো সরকারি নির্দেশ জারি হয়নি, দেয়া হয়নি কোনো অভয়বাণী; তবু হাজার হাজার শরণার্থী নিছক প্রবৃত্তির টানেই ফিরতে শুরু করেছে দেশের দিকে। বিজয় বলতে গেলে হাতের মুঠোয়। কিন্তু তাজউদ্দীন নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না।

আমেরিকার সপ্তম নৌবহর এখনো এগিয়ে আসছে, যদিও তার গতি ধীর। আজ বিকালে জেনারেল নিয়াজীর যুদ্ধবিরতির একটা আবেদন বার্তা এসে পৌঁছেছে দিল্লিতে, আবেদনে সে প্রস্তাব করেছে যুদ্ধবিরতির পরে দক্ষিণের উপকূল ভাগে সমবেত হতে চাওয়া পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর পূর্ণ নিরাপত্তা দেয়া হোক। এই দুইয়ে মিলে তাজউদ্দীন কিছুটা অনিশ্চয়তার দোলাচলে ভুগছেন, যুদ্ধ কি আসলেই শেষ হতে চলেছে? নাকি মার্কিনদের হঠাৎ নাক গলানোয় সেটা অপ্রত্যাশিত একটা বাঁক নেবে সামনের কয়েকদিনে?

আজ আর গতকাল ভারতের বিমান বাহিনীর সৌজন্যে অবরুদ্ধ ঢাকার পাকিস্তানি সেনাদের প্রায় মাটিতে মিশিয়ে দেয়া হয়েছে। মার খেতে খেতে নানা কূটকৌশল অবলম্বন করেছে হানাদারেরা। কয়েকটা বাঙ্কারে বিমান আক্রমণ করতে গিয়েও পারেনি ভারতীয় প্লেন, কারণ সেসব বাঙ্কারের ছাদে রোদের মাঝে হাত-পা বেঁধে ফেলে রাখা হয়েছিল স্থানীয় বাঙালিদের। ক্যান্টনমেন্ট থেকে

পাকিস্তানি আর্মির অফিসারেরা পালিয়ে গিয়েছে বিভিন্ন জায়গায়, কিন্তু লাভ হয়নি। আশপাশের মানুষ সাথে সাথে আর্মির নতুন অবস্থান জানিয়েছে মুক্তিযোদ্ধাদের, আর মুক্তিরা অব্যাহত আক্রমণে ধ্বংস করে দিয়েছে আর্মির মনোবল।

তাজউদ্দীন উঠে দাঁড়ালেন। তার কাছে প্রতিদিন অজস্র চিঠি আসে। তার মাঝে দিন পাঁচেক আগে আসা একটি চিঠি তিনি আলাদা করে রেখেছেন। বিহার থেকে লাভলী রায় মৌলিক নামের ক্লাস এইট পড়ুয়া একটি কিশোরীর চিঠি। তাজউদ্দীন চিঠিটা নিয়ে জানালায় গিয়ে দাঁড়ান, অপরাহ্নের শেষ আলোয় আরো একবার চিঠিটা পড়েন।

'...বাংলাদেশের ছেলেমেয়েরা স্বাধীন হবার জন্যে কত কষ্ট করেছে তা আমরা বুঝি। ওদের স্বপ্ন সার্থক হয়েছে। আমরা সবসময় ওদের পাশে আছি। পরম পূজনীয় দাদু, আমার সভক্তি নমস্কার জানবেন। আপনি আমায় আশীর্বাদ করবেন দাদু। ইতি, আপনার স্নেহের লাভলী।'

দাদু শব্দটার দিকে আরো একবার নজর বুলিয়ে তাজউদ্দীন হেসে ওঠেন। কত সহজে বুড়ো হয়ে গেছেন তারা! আর কত নতুন, কত অদ্ভুত সারল্য ঘিরে রেখেছে লাভলীদের। নতুনেরা খুব সহজে পুরাতনদের সাথে সেতু গড়ে তুলতে পারে, বুড়োদেরই যত সমস্যা হয় সেই সেতু পার হতে। তাজউদ্দীনের হঠাৎ করে শৈশবের একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল।

সেই প্রাইমারিতে পড়াকালীন, তাজউদ্দীন তখন নয় কি দশ বছরের। স্কুলে যেতে ছয়টা খাল পেরিয়ে যেতে হতো তাদের। কী যে সমস্যা তখন মানুষের। তাজউদ্দীন করলেন কী, গজারি গাছের কয়টা গুঁড়ি যোগাড় করলেন বড়দের বলে। তারপর নিজের স্কুলের বন্ধুদের সাহায্য নিয়ে খালগুলোর উপর বানিয়ে ফেললেন সাঁকো! ওইটুকু তাজউদ্দীনের বুদ্ধির প্রশংসায় তখন সারা গ্রাম অস্থির!

চিঠিটা হাতে নিয়ে দ্রুত পায়ে টেবিলে গিয়ে বসেন তাজউদ্দীন। তিনি লাভলীকে একটা চিঠি লিখবেন বলে মনস্থির করেছেন। লাভলীর মতো বাচ্চারা একটা সাঁকো তৈরির চেষ্টা করছে দুই মিত্র দেশের মাঝে, তার কর্তব্য এই বাচ্চাদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।

তাজউদ্দীন লিখতে থাকেন। 'স্নেহের লাভলী, খুব খুশি হলাম তোমার চিঠি পেয়ে।...'

যুক্তি বলছে যুদ্ধ আরো কিছু দিন দীর্ঘায়িত হতে পারে, কিন্তু তাজউদ্দীনের মন বলছে যুদ্ধ শেষ হবে হঠাৎ করেই। কে বলতে পারে, হয়তো আজই যুদ্ধের শেষ বিকেল! যুক্তির বিপরীতে মনকে কখনোই প্রাধান্য দেন না তিনি। কিন্তু শেষ বিকেলে একটি কিশোরীর সাথে হাত মিলিয়ে সেতু তৈরি করতে করতে তাজউদ্দীন প্রাণপণে ইচ্ছা করেন, আজ যুক্তি হেরে যাক। জিতে যাক লাভলীদের শুভকামনা।

সকালের ঘন কুয়াশায় আচ্ছন্ন চারপাশ, দুরবিন চোখে দিয়েও সেতুর ওপারের ঢাকা শহরকে তাই দেখা যাচ্ছে না। জেনারেল নাগরার মুখে তাই সামান্য বিরক্তির ভাব, সেটা দেখে কেউ ধারণা করতে পারবে না এই মুহূর্তে তার বুকের ভেতর কেমন সব অনুভূতির উথালপাতাল।

জেনারেল নাগরাকে প্রাথমিক দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল টঙ্গী পর্যন্ত পৌঁছে অবস্থান নিতে। সেই দায়িত্ব পূরণ করার পরে হাইকমান্ড থেকে নির্দেশ এসেছে ঢাকার পনেরো মাইলের মাঝে চলে যেতে। এরপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা। সেনাপতি যদি সব দেখে সামনে এগিয়ে যেতে চান, তাহলে যেতে পারেন। আর এই জায়গাতে দাঁড়িয়েই নাগরার বুকে আশার সাথে দৌড়াচ্ছে আশঙ্কার ঘোড়া। এখনো পুরো জেনারেল নন, মেজর জেনারেল তিনি। অথচ ঢাকা এখন তার হাতছোঁয়া দূরত্বে চলে এসেছে। ইতিহাসের অংশ হবার ললাটলিপি কি ভাগ্য তার জন্যেই রেখেছে? ঢাকার পতন কি তবে তার হাতেই হতে যাচ্ছে?

দুরবিন থেকে চোখ সরিয়ে হাতঘড়িতে নিলেন নাগরা। গতকাল বিকাল পাঁচটা থেকে আজ সকাল নয়টা পর্যন্ত ভারতীয় বিমান হামলা বন্ধ রাখা হয়েছে জেনারেল মানেকশ'র নির্দেশে, নিয়াজী নাকি অনুরোধ করেছেন। এর মাঝে নিয়াজী আত্মসমর্পণ না করলে ঢাকা শহরের ওপর অল আউট অ্যাটাক চালাবে ভারতের বিমান আর মিত্রবাহিনীর সৈন্যরা। বেলা নয়টা হতে আর মাত্র এক ঘণ্টা বাকি।

জেনারেল নাগরা তার চারপাশে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষগুলোর দিকে একবার চাইলেন। ব্রিগেডিয়ার সান সিং আর ব্রিগেডিয়ার হরদেব সিং-এর পাশে অবিন্যস্ত চুলের এক বাঙালি যুবক দাঁড়িয়ে। নাগরা শুনেছেন, মার্চে পাকিস্তানি মিলিটারির আক্রমণের কদিন পরেই টাঙ্গাইল এলাকায় বেসামরিক মানুষদের নিয়ে এক দুর্ধর্ষ বাহিনী তৈরি করেছিল এই যুবক। গত কয়েক মাসে অগণিতবার সম্মুখযুদ্ধে মিলিটারিদের চমকে দিয়েছে সেই বাহিনী। এই এলাকায় বজ্র নামের ছেলেটির জনপ্রিয়তা রবিনহুডের মতোই।

...নাগরা তার কর্তব্য স্থির করে ফেললেন। প্রতিপক্ষের সাথে দর কষাকষিতে জেতাটা দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করে ট্রেনে ওঠার মতোই, যেখানে অপেক্ষমান ব্যক্তিটি প্রায়ই জানে না ট্রেন কোন স্টেশনে থামবে। নাগরার বিশ্বাস, এই মুহূর্তে তিনি ঠিক স্টেশনেই দাঁড়িয়ে আছেন। পকেট থেকে কাগজ নিয়ে সামনের জিপটার বনেটের ওপরেই নাগরা একটা চিরকুট লিখলেন।

'প্রিয় আবদুল্লাহ,

খেলা শেষ। তোমার হাতে আর কোনো চাল নেই। আমরা এসে পড়েছি, পালানোর কোনো রাস্তাও অবশিষ্ট নেই তোমার। আমার পরামর্শ হচ্ছে, সারেন্ডার

করাটাই তোমার জন্যে বুদ্ধিমানের কাজ হবে। কথা দিচ্ছি, আমি ব্যক্তিগতভাবে তোমার নিরাপত্তার দায়িত্ব নেবো। অন্যদের সাথেও জেনেভা চুক্তি মোতাবেক আচরণই করা হবে। আমরা মিরপুর ব্রিজে অপেক্ষা করছি।

— মেজর জেনারেল নাগরা।'

চিরকুটটা পেয়ে নিয়াজীর মুখের অবস্থা কী হতে পারে, নাগরা সেটা ভেবে মনে মনে মৃদু হাসলেন। নিয়াজী তার পূর্ব পরিচিত। ব্রিটিশ আর্মিতে তিনি আর নিয়াজী একই সাথে কমিশন পেয়েছিলেন, এখন পাকিস্তানি ফৌজে গিয়ে নিয়াজী লেফটেন্যান্ট জেনারেল আর তিনি মেজর জেনারেল হয়েই থেমে আছেন।

সাদা ফ্ল্যাগ উড়িয়ে একটি জিপ নাগরার বার্তা বহন করে নিয়ে গেল পাকিস্তানি ইস্টার্ন কমান্ডের হেডকোয়ার্টারে। নিয়াজী যখন চিরকুটটি হাতে পেলেন, ঘড়ির কাঁটা তখন নয় ছুঁই ছুঁই।

বার্তাটি পেয়েই স্বঘোষিত এই ব্যঘ্র শাবক চেয়ারে কেমন এলিয়ে পড়লেন। বিহ্বলভাবে তিনি চিঠিটি এগিয়ে দিলেন চারপাশে দাঁড়িয়ে থাকা জেনারেল জামশেদ, রাও ফরমান আলী আর রিয়ার অ্যাডমিরাল শরীফের দিকে। গত নয়টি মাসের রক্তপিপাসা হঠাৎ দ্রবীভূত হয়ে গেল যেন, নীরবতার বাষ্পের ধোঁয়া ঘরটিকে করে তুলল আচ্ছন্ন।

নিয়াজী হতাশ স্বরে বললেন, 'কথা ছিল চীন সৈন্য পাঠাবে। কথা ছিল আমেরিকা সেভেন্থ ফ্লিট নিয়ে আসবে। রাওয়ালপিন্ডির ঐ কুত্তার বাচ্চারা আমাকে এতদিন এইসব ভুলভাল বুঝিয়ে এসেছে। ঐ বেজন্মারাই আমার আজকের এই অবস্থার জন্যে দায়ী!'

আমেরিকান কনসাল স্পিভাক মারফৎ অবশ্য নিয়াজী আগেই ভারতের সেনাপ্রধান মানেকশ'কে একটা অনুরোধ পাঠিয়েছিলেন যুদ্ধবিরতির আবেদন জানিয়ে। সেই আবেদন মানেকশ'কে পাঠানোর আগে মার্কিনরা প্রায় একদিন নষ্ট করেছে, খতিয়ে দেখেছে এখনো পাকিস্তানকে বাঁচাবার কোনো উপায় আছে কি না। তারপর স্থির করেছে, উপমহাদেশের এই অবস্থায় আর কিছু করবার নেই তাদের। প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা পর তারা নিয়াজীর বার্তা প্রেরণ করেছে মানেকশ'র কাছে। মানেকশ' সেটা যথারীতি প্রত্যাখ্যান করেছেন। হাতের মুঠোয় এরকম একটা জয় অপেক্ষা করছে, এমন সময় কোনো সেনানায়ক যুদ্ধবিরতি মেনে নেবেন কেন?

মানেকশ'র প্রত্যাখ্যান মনে করে নিয়াজী অপমানে আর কোনো কথাই বললেন না। খানিক অপেক্ষার পরে সিদ্ধান্তহীন হেডকোয়ার্টারের নীরবতা অবশেষে ছিন্ন করলেন ফরমান আলী। শীতল রক্তের প্রাণী বলে খ্যাত ফরমান বলে উঠলেন, 'এখন তো তাহলে আর কিছু করার নাই। যাও, জেনারেল নাগরাকে খাতির করে নিয়ে এসো।'

মিরপুর ব্রিজে অপেক্ষমাণ জেনারেল নাগরার কাছে প্রত্যুত্তর বয়ে নিয়ে এল একটি স্টাফ কার, সেখানে উপবিষ্ট জেনারেল জামশেদের মুখ আসন্ন অপমানের আশঙ্কায় কালো হয়ে আছে। গাড়ি থেকে বেরিয়ে মাথা নিচু করে জামশেদ তার রিভলভার আর সামরিক টুপি বাড়িয়ে দিলেন নাগরাকে। ব্রিজের ওপারের সাড়ে তিনশো বছরের পুরনো শহরটিতে তখন কুয়াশা কেটে যাচ্ছে, রোদ উঠছে।

কয়েক মিনিট পরে একটি নীরব, কেউ জানে না তখন অপেক্ষা ঠিক কিসের জন্যে, ঢাকা শহরের রাস্তায় ছুটতে দেখা গেল একটি মিলিটারি জিপকে, তার সামনে যাচ্ছে একটি স্টাফ কার। জেনারেল জামশেদ পথ দেখিয়ে ইস্টার্ন কমান্ডের সদর দফতরে নিয়ে যাচ্ছেন জেনারেল নাগরা আর তার সাথিদের।

সদর দফতরের অপারেশন রুম ততক্ষণে নিয়েছে অন্য চেহারা। দেয়ালজুড়ে এতদিন যেসব ম্যাপ ছড়ানো ছিল যুদ্ধের পরিস্থিতি বিচার করতে, আজ সেসব অনুপস্থিত। ঘরের মাঝখানটা দখল করেছে নানা রকম খাদ্যদ্রব্য বোঝাই একটি ডাইনিং টেবিল। পরাজিত সেনাপতি নিয়াজী আপ্যায়নের ত্রুটি রাখেননি 'মেহমান'দের জন্যে।

আমীর আবদুল্লাহ খান নিয়াজী ঘরে ঢুকেই করমর্দন করলেন তার পূর্বপরিচিত মেজর জেনারেল নাগরার সাথে। নাগরা তখন নিয়াজীকে একে একে পরিচয় করিয়ে দিলেন তার সহকর্মীদের সাথে। '...এ হচ্ছে ব্রিগেডিয়ার সান সিং। ইনি হলেন হরদেব সিং, ব্রিগেডিয়ার। আর এই যে ছেলেটা, এর নাম হচ্ছে কাদের সিদ্দিকী।'

এরপরেই ঘটল এক নাটক। কূটনীতির পরোয়া না করে টাইগার নিয়াজীর বাড়ানো হাতকে অগ্রাহ্য করলেন টাইগার সিদ্দিকী নামেও ইদানীং অল্পস্বল্প পরিচিত হয়ে ওঠা বজ্র নামের সেই যুবকটি। তার কাঁটাতারে মোড়ানো পরিষ্কার স্বর বলে উঠল, 'মাফ করবেন, আমি নারী ও শিশু হত্যাকারীদের সাথে হাত মেলাই না! আল্লাহর কাছে আমি অপরাধী হতে পারবো না।'

কাদের সিদ্দিকী যখন ইস্টার্ন কমান্ডের হেডকোয়ার্টারে জন্ম দিচ্ছেন এই অভূতপূর্ব নাটকের, আরো একজন বাঙালি তখন আবেগি শহর ঢাকার রাস্তায় ছোটাছুটি করছেন ইস্পাতের স্নায়ু নিয়ে। ক্র্যাক প্লাটুনের দীক্ষাগুরু মেজর হায়দার ভারতীয় ব্রিগেডিয়ার সাবেগ সিং'কে সাথে নিয়ে টহল দিচ্ছেন শহরে, আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি যাতে না হয় সেটাই তাদের লক্ষ্য।

অবরুদ্ধ ঢাকার রাস্তায় তখন বেরিয়ে এসেছে হাজারো প্রাণ। কে জানত এ শহর এখনো এত শব্দ লুকিয়ে রেখেছিল! 'জয় বাংলা' স্লোগানে মুখরিত রাজপথ ক্ষণে ক্ষণে মনে করাচ্ছে দশটি মাস পেছনে ফেলে আসা মার্চের স্মৃতি। মেজর হায়দারের ছেলেরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে নানা জায়গায়, বাঙালি জনমানুষের আক্রোশ থেকে তারাই রক্ষা করছে পাকিস্তানি পলায়নপর সেনাবাহিনীকে।

ইতোমধ্যে ভারত থেকে এসে আত্মসমর্পণের বিষয়ে নিয়াজীর সাথে আলোচনা করেছেন মেজর জেনারেল জ্যাকব। ঠিক হয়েছে, আজ বিকালে মিত্রবাহিনীর প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার কাছেই সারেন্ডার করবেন নিয়াজী। স্থান সেই রেসকোর্স, একটি তর্জনি যেখানে স্বাধীনতা শব্দটি তুলেছিল বাংলাদেশের খাতায়।

দুপুর পেরিয়ে ঘড়ির কাঁটা যখন বিকালের দিকে যাচ্ছে, ঢাকা এয়ারপোর্টে তখন অবতরণ করল অনেকগুলো ভারতীয় হেলিকপ্টার। লে. জেনারেল অরোরা নামলেন একটি কপ্টার থেকে, বাংলাদেশের প্রতিনিধি হয়ে আরেক কপ্টার থেকে নামলেন এ কে খন্দকার। 'ওসমানী কোথায়?' এরকম একটি গুঞ্জন উঠেই স্তিমিত হয়ে গেল সাথে সাথে। চূড়ান্ত বিজয় ছাড়া অন্য কিছু নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় কোথায় আজ!

বিমানবন্দরে চারপাশে ভিড় করে থাকা অগণিত মানুষের ফাঁক গলে মেজর হায়দার তখন ছুটলেন রেসকোর্সের দিকে, পাকিস্তানি আত্মসমর্পণের জোগাড়যন্ত্র করতে হবে। 'জালাল, একটা টেবিল যোগাড় করা লাগবে যে! চেয়ারও লাগবে কয়েকটা!'

ক্র্যাক প্লাটুন সদস্য জালাল ছুটলেন ঢাকা ক্লাবে। যোগাড় হলো একটি টেবিল আর একজোড়া চেয়ার। মানুষের হাতে হাতে সেগুলো পৌঁছে গেল রেসকোর্সে।

মিত্রবাহিনীর তৈরি করা নিরাপত্তা বেষ্টনীর ভেতরে লে. জেনারেল আরোরা, এ কে খন্দকারের সাথে নিয়াজীকেও ভেতরে ঢোকানো হলো। রেসকোর্সের ময়দানে ভিড় করা অগণিত মানুষ তখন নিয়াজীকে জ্যান্ত ছিঁড়ে ফেলতে উদগ্রীব, মেজর হায়দারের তাই সতর্ক না হয়ে উপায় তাকে না। অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো ঘটনা প্রতিহত করতে তাকে তাই নিচু মাথার নিয়াজীর পাশে হাঁটতে দেখা যায় উদ্ধতভাবে।

নির্ধারিত চেয়ারে বসে আত্মসমর্পণের দলিলটিতে নিয়াজী একবার চোখ বোলালেন। ভোগী প্রকৃতির নিয়াজীর চোখে তখন আশ্চর্য বিষণ্ণতা। তবে চূড়ান্ত আত্মসমর্পণের মুহূর্তটি আরেকটু বিলম্বিত হলো। কারণ প্রথম দফায় দলিলে সই করতে গিয়ে নিয়াজীর হাত কেঁপে গেল, কলম থেকে বেরুল না কোনো কালি। মেজর হায়দারের পেছন থেকে কেউ একজন তখন এগিয়ে দিল আরেকটি কলম। টাইগার উপাধির মিথ্যা গরিমায় অবসান ঘটিয়ে– 'স্থলযুদ্ধে বিশ্বসেরা' পাকিস্তানি মিলিটারির যথার্থ প্রতীক, নিয়াজী নতমুখে স্বাক্ষর করলেন দলিলে।

বিকাল তখন চারটা বেজে একত্রিশ।

বনেটে লেখা চিরকুট দিয়ে শুরু হয়েছিল যে দিনটি, যে দিনটা প্রত্যক্ষ করল অজস্র মুক্তিযোদ্ধার সদম্ভ স্পর্ধার প্রতীক বজ্র নামের ক্ষ্যাপাটে যুবকটির চূড়ান্ত

ঔদ্ধত্য, যে দিনের শেষ প্রান্তে রেসকোর্সের দলিলে কয়েকটি স্বাক্ষর ইতিহাসের পাতায় নিয়ে গেল দ্বি-জাতি তত্ত্বকে; সেই প্রাথমিক কুয়াশাচ্ছন্ন দিনটি শেষ পর্যন্ত চিরদিনের জন্যে হয়ে গেল বাংলাদেশের।

কত প্রহেলিকা সর্বত্র। মায়ের অলিন্দে আশা আশঙ্কার দোলাচল, পিতার নিলয় কাতর প্রতিশোধের নেশায়। ভাইয়ের এক হাত মুষ্টিবদ্ধ নতুন করে গড়বে বলে, বোনের অন্য হাত বধ্যভূমিতে খুঁজে বেড়াচ্ছে স্বজনের লাশ। এক চোখে ভবিষ্যতের অগণিত সব স্বপ্নের কথা ভেবে জল, অন্য চোখে অজস্র সব মৃত্যুক্ষতি প্রত্যক্ষ করে পানি। বুকে অজস্র গল্প নিয়ে ঘুরছে প্রতিটি মানুষ, একটি মাত্র জনপদে ভর করেছে সম্ভাব্য সমস্ত মানবীয় অনুভূতির আখ্যান।

চারপাশে রুক্ষ সব ধ্বংসপাহাড়, এর মাঝে আশার উর্বর উপত্যকা নিয়ে সৃষ্টি হলো বাংলাদেশ।

অচেনা যোদ্ধা, অন্য যুদ্ধ

মেজর হায়দার হাতে ধরা কাগজটি থেকে পড়ে যেতে লাগলেন। একটানা বেশিক্ষণ পড়তে পারেন না তিনি, দুয়েকটা বাক্য বলেই থেমে যান। এরপর আবার কাগজটা দেখেন, পুনরায় পড়তে থাকেন।

'আমি মেজর হায়দার বলছি। প্রিয় দেশবাসী, আমাদের দেশকে হানাদার মুক্ত করা হয়েছে। আপনারা সবাই এখন স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিক। আপনারা নিজ এলাকার আল বদর, আল শামস, রাজাকারদের ধরিয়ে দিন। তবে আইন শৃঙ্খলার দায়িত্ব নিজ হাতে নেবেন না অনুগ্রহ করে। গেরিলাদের প্রতি আমার অনুরোধ, যতদিন পর্যন্ত না প্রবাসী সরকার রাজধানীতে এসে দেশের শাসন ভার না নেবেন ততদিন তোমরাই নিজ এলাকার আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করবে। লুটপাট বন্ধ করতে হবে, প্রয়োজনে দিনরাত পাহারা দিতে হবে...'

হাবিবুল আলম রেকর্ডিং রুমের বাইরে দাঁড়িয়ে ঘড়ি দেখল, সকাল সোয়া আটটা। যাক, দেশের মানুষের কাছে বিজয়ের ঘোষণা পৌঁছে দিয়েছে বাংলাদেশ সরকারেরই একজন প্রতিনিধি। আর তাছাড়া ঢাকা তো সেক্টর-টুয়ের আন্ডারেই। সেক্টরের কমান্ডার ইন চার্জ হিসেবে মেজর হায়দার তো দেশবাসীর কাছে বক্তব্য রাখতেই পারেন।

আজ ভোর বেলা থেকেই হাবিবুল আলম দলবল নিয়ে পজিশন নিয়েছিল নারিন্দায়। পাকিস্তানি বাহিনী গতকাল আত্মসমর্পণ করলেও ঢাকা এখনো বিপদমুক্ত নয়। অধিকাংশ সৈনিকই ইতোমধ্যে ক্যান্টনমেন্টে গিয়ে আর্মস সারেন্ডার করেছে, তবে বাইরে থেকে যাওয়া সৈন্যের সংখ্যাও খুব কম হবে না। নারিন্দার অবাঙালি পরিবারগুলোর মাঝে নাকি বেশ কিছু পাকিস্তানি সোলজার

অস্ত্রসহ লুকিয়ে আছে, কায়দায় পেলে গুলিও ছুড়ছে মুক্তিবাহিনীর লোকেদের। ক্র্যাক প্লাটুনের এক ছেলে এর মাঝেই আহত হয়েছে তাদের হাতে। স্ক্রু টাইট দিতেই তাই হাবিবুল আলমদের নারিন্দা অবরোধ।

অপারেশনের মাঝেই শোনা গেল ইন্ডিয়ান আর্মি নাকি আজ সকাল সাড়ে আটটার দিকে ঢাকা রেডিও থেকে বাংলাদেশের মানুষের উদ্দেশে বক্তব্য রাখবে, অনেকটা বিজয়ের আনুষ্ঠানিক ঘোষণার মতো। হাবিবুল আলমের সাথে সাথেই মনে হয়েছিল, ভারতীয় আর্মি কেন? ঢাকা বেতারের প্রথম জাতীয় ঘোষণাটা কি আমাদের কারো পক্ষ থেকেই যাওয়াটা বেশি সমীচীন না?

ভাবনা-চিন্তার খুব বেশি সময় পায়নি হাবিবুল আলম। কাজেই অপারেশনের দায়িত্ব অন্যদের বুঝিয়ে দিয়েই নারিন্দা চলে এসেছিল সে। এরপর ইস্কান্দার, ফতেহ, শহিদ সবাই মিলে নানা হাঙ্গামা করে রেডিও স্টেশন চালু করেছে, মেজর হায়দারকে ডেকে এনেছে সেক্টর টুয়ের ইনচার্জ হিসেবে দেশের লোকের সামনে ঘোষণা দেবার জন্যে। তবে দৌড়াদৌড়ি সার্থক হয়েছে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর তরফ থেকে কেউ আসার আগেই হায়দার ভাই অন এয়ারে চলে যেতে পেরেছেন।

মেজর হায়দার রেকর্ডিং রুম থেকে বের হবার একটা ছোটখাটো হাততালি পড়ে গেল তার উদ্দেশে। হায়দার ভাই খুব বেশি গা করলেন না এ নিয়ে, তিনি যেন কী ভাবনায় ডুবে আছেন। শুধু বললেন, 'আলম, চা আনতে বলো দেখি।'

হাবিবুল আলমেরা সবাই মিলে যখন স্টেশনের পিয়নের বানানো সরে ভাসা চা খাচ্ছে, এমন সময় রেডিও স্টেশনে থাকা শামসুল হুদা চৌধুরী আরেকটা বিষয় তুলে আনলেন। 'মেজর সাহেব, রেডিওতে তো বক্তব্য দিলেন, টিভির কথা কি ভুলে গেলেন নাকি? টেলিভিশনের পরিচালক এজাজ আহমেদের সাথে আমার জানাশুনা আছে। আপনারা বললে আমি ওনার সাথে যোগাযোগ করিয়ে দিতে পারি আপনাদের।'

আইডিয়াটা কম বেশি মনে ধরে ওদের সবারই। হায়দার ভাই অবশ্য এই নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে বেরিয়ে গেছেন, তিনি ঠিক করেছেন ইস্কাটন লেডিজ ক্লাবকে আপাতত সেক্টর-টুয়ের সদর দপ্তর হিসেবে ব্যবহার করবেন। সেটারই ব্যবস্থা করতে হবে।

ফতেহরা অবশ্য হাল ছাড়ল না এদিকে। নানা দিকে ফোন করে বিকেল সাড়ে চারটায় ডিআইটি ভবনের টিভি স্টুডিওতে যাবার ব্যবস্থা করে ফেলল সে। হাবিবুল আলম ধরে নিয়ে এল মেজর হায়দারকে। পশ্চিম পাকিস্তানের লান্ডিকোটাল মার্কেট থেকে কেনা প্রিয় লেদার জ্যাকেটটি গায় চড়িয়ে ক্র্যাক প্লাটুনের হায়দার ভাই যখন বক্তব্য দিলেন স্টুডিওতে, টিভি পর্দায় তখন প্রথমবারের মতো দৃশ্যমান হলো বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা। মেজর হায়দারকে

অবশ্য টিভি পর্দায় হাসিমুখে দেখা গেল না, তিনি খুবই গম্ভীর হয়ে রইলেন পুরোটা সময়জুড়ে।

...গম্ভীর হয়ে আছেন জাহানারা ইমামও। তারেকুল আলম তার সামনে বসে অস্বস্তি বোধ করছে।

তারেকের নিজের মা গত হয়েছেন অনেক আগে। বন্ধু রুমীর বাসায় যতবারই এসেছে সে, জাহানারা ইমাম তাকে কিছুক্ষণের জন্যেও হলেও ভুলিয়ে দিয়েছেন মায়ের অভাব। রুমীর মা'কে ওরা সকলে জেনেছে নিজেদের মায়ের মতোই আপন বলে। যুদ্ধ জেতা হয়েছে, কিন্তু রুমীরা আর কখনো ফিরে আসবে না। তারেকুল আলম ভেবেছিল আম্মা– এ নামেই ওরা ডাকে রুমীর মাকে– তাকে দেখে কাঁদবেন, কিন্তু জাহানারা ইমাম কিছুই বলছেন না তাকে দেখে। তারেকের অস্বস্তি আরো বাড়ছে।

শোনা যায় না এমন স্বরে, প্রায় ফিসফিসিয়ে হঠাৎ করেই জাহানারা ইমাম কথা বলে ওঠেন। 'শরীফের গতকাল কুলখানি ছিল।'

তারেকুল আলম এই সংবাদের জন্যে মোটেই প্রস্তুত ছিল না। চমকে উঠে সে বলল, 'কী বলেন আম্মা!'

জাহানারা ইমাম যেন শুনতেই পান না তারেকের কথা, তার মুখ দিয়ে শব্দ বেরিয়ে আসে স্রোতের মতো, সেই স্রোতে তারেকুল আলম হাবুডুবু খায় বারবার। 'বলতে গেলে একদম বিনা চিকিৎসায় চলে গেছে বুঝলে। হার্ট অ্যাটাক হলো, হাসপাতালে নিয়ে গেলাম। লাইফ সেভিং মেশিনটাও চালু করা যায়নি, তখন ব্যাক আউট চলছিল তো! হাসপাতালের মেইন সুইচটাই বন্ধ করা ছিল। ...একটা যুদ্ধ যখন চলে, তখন দশ-বিশটা এরকম জীবন তো চলে যেতেই পারে, তাই না? ... আমি এসব বুঝি তারেক। আমার কোনো কষ্ট হয় না। তোমাদের মতো এতগুলো ছেলে আমার, আমি কেন কষ্ট পাবো বলো? ...সত্যি বলছি তারেক, আমার খুব গর্ব হয়। তোমাদের জন্যে আমার খুব গর্ব হয় বাবা!'

ঘরে একটা কেমন বাতাস বয়ে যায়, তারেকুল আলম মাথা নিচু করে বসে থাকে। জাহানারা ইমাম খানিক পরে আবার কথা বলেন।

'খালি জামীটাই কিছু বুঝতে চায় না বুঝলে, একদম বুঝতে চায় না। শরীফ মারা যাবার পর থেকেই মাঝে মাঝে সে খেপে উঠে। বলে পাঞ্জাবি মারবে, বিহারি মারবে। আমি একদম দিশেহারা হয়ে যাই বাবা, ওকে কী বলে বুঝাবো ভেবে পাই না!'

ভেতর ঘর থেকে কেউ একজন জাহানারা ইমামকে ডাক দেয়। সেদিকে তাকিয়ে তিনি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন। বলেন, 'বসো তারেক। আমি আসি।'

তারেকুল আলম এই প্রথম সজ্ঞানে আম্মার আদেশ অমান্য করে বেরিয়ে আসে বাইরে। কী করে এই জননীকে স্বান্ত্বনা দেবে সে? কোন মুখে সে দাঁড়াবে সব কিছু হারানো এইসব মানুষদের সামনে?

হাঁটতে হাঁটতে তারেকুল আলম রাস্তার মোড়ে পৌঁছতেই দেখে মেজর হায়দারকে দেখতে পায়। জিপে সওয়ার হয়ে মেজর হায়দার রুমীদের বাড়ির দিকেই যাচ্ছেন, সাথে হাবিবুল আলমেরাও আছে।

পিঠের স্টেনটা হাতে নিয়ে তারেকুল আলম মেজর হায়দারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। হায়দার ভাই ওকে দেখে জিপ দাঁড় করান। 'আরে তারেক, তুমি এইদিকে? রুমীর বাসায় আসছিলা নাকি?'

'জ্বি হায়দার ভাই, রুমীর বাসায় আসছিলাম। শুনছেন নাকি, রুমীর আব্বা মারা গেছে!'

তারেকুল আলম খেয়াল করে, এই কথা শুনে হায়দার ভাইয়ের মুখ শক্ত হয়ে যায়। 'আচ্ছা, ঠিক আছে। গাড়িতে উঠো, দেখি, আমরাও রুমীর বাসা একটু ঘুরে আসি। ...কী বললা, আর যাইতে চাওনা? আচ্ছা, তুমি গাড়িতেই থাইকো না হয়। আমরা ভিতরে গিয়ে দেখা করে আসবো।'

ফতেহ, আনু, চুল্লুর পাশে তারেকুল আলমও জিপে উঠে বসে। স্টেনটা হাতে নিতেই তার গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটা মনে পড়ে।

'হায়দার ভাই, কালকে রাত থেকেই কিন্তু রাস্তাঘাটে প্রচুর পোলাপানের হাতে চাইনিজ স্টেনগান দেখতেছি। মুক্তি দেখলেই আমরা চিনতে পারি, আমি শিওর এদের বেশিরভাগই যুদ্ধ করে নাই। খুব সম্ভব পাকিস্তানি সারেন্ডার করার পরে যেই সব আর্মস ফেলে গেছে, এইসব পোলাপান সেই অস্ত্রগুলাই হাত করছে। এদের তাড়াতাড়ি আইডেন্টিফাই করে সব আর্মস নিয়ে নিতে হবে। নাহলে কয়দিন পরে এরাও নিজেদের মুক্তিযোদ্ধা দাবি করবে দেখবেন।'

'সামনাসামনি যুদ্ধ অনেক বেশি সরল তারেক।' মেজর হায়দার চিন্তাক্লিষ্ট স্বরে বলেন। 'কিন্তু যুদ্ধের পরের এই সময়টা যুদ্ধের চেয়েও ক্রিটিকাল। যুদ্ধে আমরা শত্রু মিত্র চিনি। কিন্তু এখন কে ভালো, কে মন্দ কে রং পালটানো গিরগিটি, সেইটা বুঝা খুব কঠিন কাজ। খুব খুব কঠিন কাজ।

যুদ্ধ এখনো শেষ হয় নাই তারেক, যুদ্ধ এত সহজে শেষ হয় না।'

নয়া নথি, নয়া নাম

সচিবালয়ের করিডোরগুলো ফাঁকা ফাঁকা। নিরাপত্তা নিয়ে দুশ্চিন্তার কারণেই হোক, অথবা সরকারের কাছ থেকে স্পষ্ট কোনো বার্তার অভাবেই হোক, লোকজন এখনো অফিসে আসা শুরু করেনি ভালোমতো। বিশেষ করে মিত্রবাহিনীর বিমান হামলার সময় থেকেই কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অনুপস্থিতির হার বেড়েছে। আর অবাঙালি যারা ছিল, তাদের প্রায় সবাই ঢাকা ছেড়েই চলে গেছে।

এই আধা শূন্য সচিবালয়ের কোন অংশে নুরুল কাদের আছেন, সেটা বের করতে আলাউদ্দীনের বেশ কষ্টই হবার কথা ছিল, তবে সেটা হলো না। আলাউদ্দীনের ভাগ্য ভালো, দেখা গেল সচিবালয়ের বাইরে পোস্ট অফিস বিল্ডিং-এর সামনেই নুরুল কাদের উঁচু গলায় কথা বলছেন। তার সামনে ভিড় করে আছে সচিবালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা।

'...আপনাদের টেনশন করার কিচ্ছু নেই,' আলাউদ্দীন জমায়েতের পেছনে গিয়ে দাঁড়াল নুরুল কাদের কী বলেন তা শুনতে। 'আপনারা আগেই মতোই কাজ করে যাবেন। প্রবাসী সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে আমি নিশ্চয়তা দিচ্ছি, কেউ আপনাদের কোনো ক্ষতি করবে না। আমাদের সরকার দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে, সকল বাঙালিই মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পক্ষে। কিন্তু যারা স্বেচ্ছায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সাথে হাত মিলিয়েছে, অত্যাচার করেছে বাংলাদেশের মানুষের ওপর, শুধু তাদেরকেই অভিযুক্ত করা হবে। কেবল তাদেরকেই বাংলাদেশ সরকারের কাছে জবাবদিহি করতে হবে।'

আলাউদ্দীন লক্ষ করল, নুরুল কাদেরের বক্তব্য শোনার পর উপস্থিত ব্যক্তিদের একটু হালকা দেখাল। এরা হয়তো ধারণা করছিল যুদ্ধের সময় সরকারি চাকরির দায়িত্ব পালন করে আসাটা নতুন দেশের সরকার ভালোভাবে দেখবে না। তবে সাথে সাথেই আলাউদ্দীনের মনে আরো একটা প্রশ্নও উঁকি দিয়ে গেল। নিঃসন্দেহে অধিকাংশ বাঙালিই মনে মনে মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে ছিল, তবে উল্টোটাও কি একেবারেই ব্যতিক্রম? সেক্ষেত্রে কী হবে? প্রশাসনযন্ত্রের ভেতর থেকে সেইসব ক্যামোফ্লেজ কর্তাকে কী করে আলাদা করবেন সরকার? এখনই ছাঁকনিতে আটকানো না হলে ভবিষ্যতে সরকারের প্রতিটা উদ্যোগেই তো এরা ঘরের শত্রু বিভীষণের কাজ করে যাবে!

একজন হঠাৎ প্রশ্ন করে ওঠে, 'স্যার, এখন আমাদের অফিস আওয়ার কী হবে?'

নুরুল কাদেরের মুখ দেখে বোঝা গেল এই প্রশ্ন শুনতে হবে, এমনটা তার প্রত্যাশায় ছিল না। বিরক্ত মুখে, উচ্চস্বরে তিনি উত্তর দিলেন, 'সকালে ফজরের নামাজের পরে অফিসে আসতে হবে। এরপর কাজ না শেষ না হওয়া পর্যন্ত কিংবা এশার নামাজ পর্যন্ত কাজ করতে হবে। এটাই হবে অফিস আওয়ার।'

আরো কিছুক্ষণ নুরুল কাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিলেন। এরপর তিনি ঢুকে পড়লেন সচিবালয়ের বারান্দায়। ঢোকার আগে অবশ্য আলাউদ্দীনের দিকে একবার হাত নেড়ে ইঙ্গিত করে গেলেন তিনি, অর্থাৎ আলাউদ্দীনকে খেয়াল করেছেন।

বারান্দায়ও নুরুল কাদেরকে খানিক ঘিরে রইল উৎসুক প্রশ্নকর্তারা। মানুষজন সরে গেলে আলাউদ্দীন চলে এল তার পাশে। 'দেখলে আলাউদ্দীন, কী রকম

মানসিকতা আমাদের! বলে কি না অফিস কতক্ষণ করতে হবে! এইসব লোক দিয়ে একটা নতুন দেশের সেক্রেটারিয়েট চলে, বলো?' নুরুল কাদেরের কণ্ঠে তীব্র ভর্ৎসনা। চুপ হয়ে থাকা ছাড়া এই প্রশ্নের আর কী জবাব দেবে আলাউদ্দীন!

'আচ্ছা বাদ দাও।' ধীরে ধীরে মুখের রাগত অভিব্যক্তি পালটে যায় নুরুল কাদেরের। 'তুমি এখানে কী করে আসলে সেইটা বলো আগে।'

'আমি স্যার গিয়েছিলাম ধানমণ্ডিতে, ' আলাউদ্দীন গলা পরিষ্কার করে বলে। 'শেখ সাহেবের ফ্যামিলিরে একটা খবর দিতে। গিয়ে স্যার শুনলাম আপনিও নাকি দেখা করতে গেছিলেন ওই বাড়িতে, ওইখান থেকেই নাকি স্যার আপনার সচিবালয়ে আসার কথা। তাই স্যার চলে আসলাম। '

নুরুল কাদের মাথা ঝাঁকালেন। শেখ মুজিবুর রহমানের পরিবারকে পাকিস্তানিদের হাত থেকে উদ্ধার করা হয়েছে, বেগম মুজিব আর পরিবারের অন্যদের এখন ভারতীয় সেনারা প্রোটেকশন দিচ্ছে। 'কী খবর দিতে গেছিলা?'

'এই তো স্যার, জেনারেল অরোরা নাকি আগামীকাল মিসেস মুজিবরে দেখতে যাবেন। সেটাই বলে আসলাম গিয়ে। আপনি স্যার ঢাকা কখন আসলেন?'

নুরুল কাদের সচিবালয়ের করিডোরে হাঁটতে হাঁটতে আলাউদ্দীনকে খুলে বলেন সব।

মন্ত্রিসভার দেশে ফিরতে হয়তো আরো কয়েকদিন লাগবে। তাদের আগমনের পূর্বেই তাজউদ্দীনের বিশেষ নির্দেশে ঢাকায় আসতে হয়েছে সংস্থাপন সচিব নুরুল কাদেরসহ আরো কয়েকজনকে। সেক্রেটারিয়েটের কর্মচারীরা কীভাবে নিজেদের দায়িত্ব চালিয়ে যাবে, সেই সাথে শূন্যপদে কীভাবে কাদের জরুরি নিয়োগ দিতে হবে, সেইসব আদেশ নিয়ে এসেছেন নুরুল কাদেররা।

সচিবালয়ে পদচারণা করতে করতেই একেকটি আদেশ জারি হতে থাকে প্রবাসী সরকারের নীতিমালা মেনে। নুরুল কাদেরের মৌখিক আদেশ নোটবুকে টুকে নিয়ে পরে সেগুলোকে অফিস অর্ডারে রূপ দেবেন আবদুল মজিদ। তৈরি হয় নতুন নতুন নথি।

আলাউদ্দীনকে সাথে নিয়ে নুরুল কাদের বেরিয়ে আসেন সচিবালয় থেকে। গভর্নর হাউজে যাবেন। আলী আশরাফ নামের এক সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, 'কোথায় যাবেন?'

তেমন কিছু না ভেবেই নুরুল কাদেরের মুখে উঠে আসে, 'বঙ্গভবন'। সাংবাদিকের কলমে পরদিন কাগজের শিরোনাম হয়ে যায় সেটি, 'গভর্নর হাউজের নয়া নাম বঙ্গভবন'।

প্রস্তাব আসে স্টেট গেস্ট হাউজকে রূপ দেয়া হবে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে। প্রধানমন্ত্রী যেহেতু জনগণের প্রতিনিধি, অতএব তার বাড়ির নাম হোক 'গণভবন'।

নতুন নতুন নথির পাশে বাংলাদেশের মানুষ অভ্যস্ত হতে থাকে নতুন নতুন নামে।

তবুও ধীরে ধীরে গুঞ্জন গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয়। এত নতুনের ভিড়ে মানুষ স্বস্তি পেতে চায় তাদের পুরাতন ভরসাদের কাছেই। কোথায় তাদের চেনা সেইসব মুখ? কোথায় প্রবাসী সরকারের মন্ত্রিসভা?

স্টেটসম্যান আর পলিটিশিয়ান

বিমানটি ট্যাক্সিয়িং করতে থাকে অতি ধীর গতিতে। রানওয়ের এখানে সেখানে ছড়িয়ে অজস্র ক্রেটার, পাকিস্তানি বিমানবাহিনীকে অচল করে দিতে ভারতীয় বিমানগুলোর বোমাবর্ষণে জন্ম হয়েছিল এদের। পাইলট সেই অদ্ভুত পথে বিমান চালায় অতি সন্তপর্ণে, অনেকটা যানজটে আটকে পড়া গাড়ির গতিতে। অজস্র মানুষ চারদিকে অপেক্ষমাণ এই বিমানের যাত্রীদের দেখতে।

টুকরো হয়ে যাওয়া পাকিস্তানের অন্যপ্রান্তে প্রেসিডেন্ট পদে শপথ নিয়েছেন জুলফিকার আলী ভুট্টো। প্রথম ভাষণে ভুট্টোর কণ্ঠে জায়গা পেয়েছে সমৃদ্ধির আশা, শোষণমুক্ত রাষ্ট্র গড়ার ইচ্ছা। আর এ প্রান্তে দীর্ঘদিন ধরে তারা শোষণ করে আসছিল যাদের, সেই মানুষগুলো তখনো বুঝে পায়নি তাদের মাথার মুকুটদের। কলকাতা থেকে ঢাকা, এই দূরত্ব অতিক্রমের পথে রাস্তা আটকে দাঁড়িয়েছিল নানা রাজনীতি-কূটনীতির ইস্যু, বহু প্রশ্নের উত্তর, কিছু প্রস্তুতি।

বিমানের দরজা খুলে যায় হঠাৎ। পৌষ মাসের পড়ন্ত রোদে খুলে যায় তার দরজা। ভেতর থেকে বেরিয়ে আসেন এক একটি চেনা অবয়ব। ওই যে সৈয়দ নজরুল ইসলাম! ঐ তাজউদ্দীনকে দেখা যায়! ওই তো মনসুর আলী, ওই তো কামারুজ্জামান সাহেব, ওই যে খন্দকার মোশতাক!

শেষ বিকেলে প্রত্যেকের দীর্ঘ ছায়া হারিয়ে যায় মানুষের ভিড়ে। কত্ত মানুষ চারপাশে। তারা ফুলের মালা দিয়ে বরণ করে নিচ্ছে দেশের মাটিতে মাথা ঠেকানো মুজিবনগর সরকারকে, তারা কান ফাটানো স্লোগান দিচ্ছে জয় বাংলা বলে। আবদুল বাতেনের খুব ইচ্ছে হচ্ছে কাছে গিয়ে মানুষগুলোকে একবার দেখে আসে, কিন্তু এই মুহূর্তে ভিড় ঠেলে সামনে এগুনো অসাধ্য তার।

তবে সাংবাদিকেদের তো আর পিছু হটলে চলে না। তারা ঠিকই জায়গা করে নিয়ে প্রশ্ন করতে থাকে স্বদেশ প্রত্যাগত সরকারকে।

'স্যার, লোকজনের হাতে তো এখন প্রচুর অস্ত্র। পাকিস্তানিদের ফেলে যাওয়া আর্মস অনেকের হাতে চলে গেছে। এই নিয়ে স্যার আপনারা কিছু ভেবেছেন?'

'আমাদের জাতীয় মিলিশিয়া বাহিনী গঠনের পরিকল্পনা আছে।' তাজউদ্দীন বলেন। 'যাদের হাতে অস্ত্র আছে, ওদের ক্যাম্পে নিয়ে আসা হবে। তরুণ

মুক্তিযোদ্ধারাই হবে দেশের ভবিষ্যৎ গড়ার প্রধান অবলম্বন। ওদের নিয়েই আমাদের পরিকল্পনা করতে হবে।'

'নতুন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি কী হবে স্যার?'

সৈয়দ নজরুল ইসলাম উত্তর দেন, 'বাংলাদেশ সকলের সাথে বন্ধুত্ব চায়, কারো সাথে শত্রুতা আমাদের কাম্য না। আমরা যুদ্ধ করে স্বাধীনতা পেয়েছি, কাজেই দেশ পুনর্গঠনের জন্যে আমাদের বহু রকম সাহায্যের দরকার হবে। বন্ধুর সংখ্যা বাড়ানো ছাড়া সেটা তো আর সম্ভব না।'

ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতির উত্তর শুনে এক সাংবাদিক তাজউদ্দীনের উদ্দেশে বলে, 'কিন্তু স্যার, আপনি তো সেদিন বললেন যে আমেরিকার কাছ থেকে কোনো সাহায্য নিবেন না!'

মুখ শক্ত করে তাজউদ্দীন উত্তর দেন, 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি আমাদের বিরোধিতা করেছে, এই ভেবে দেশ পুনর্গঠনে আমি ওদের সাহায্য নিতে আপত্তি জানিয়েছি। তারা যদি সামনে নিজেদের বাংলাদেশের বন্ধু বলে প্রমাণ করতে পারে, তাহলে তো কোনো সমস্যা দেখি না। তবে মনে রাখবেন, নিজেদের আত্মসম্মান নিজেদেরই বজায় রাখতে হবে। বিদেশি সাহায্যের জন্যে আমরা ভিক্ষার থালা নিয়ে ঘুরছি না। আমরা শুধুমাত্র শর্তহীন ঋণ নিতে চাই, কোনো শর্তযুক্ত সাহায্য চাই না।'

তাজউদ্দীনের এই উত্তরটি শুনে সৈয়দ নজরুল ইসলামের রুস্তমজির কথা মনে পড়ে গেল।

দমদম বিমানবন্দরে প্রবাসী সরকারকে বিদায় জানাতে এসেছিলেন ভারতীয় সীমান্তরক্ষীদের মহাপরিচালক কে এফ রুস্তমজি। প্লেন ছাড়ার আগে আগে তাজউদ্দীনের সাথে হাত মিলিয়ে তিনি যখন নেমে যাচ্ছেন, সে মুহূর্তে রুস্তমজি বললেন, 'স্যার, চলে তো যাচ্ছেন, আমরা আশা করবো ভারত বাংলাদেশের এই মৈত্রী বন্ধন চিরকাল অবিচ্ছিন্ন থাকবে। ইটারনাল ফ্রেন্ডশিপ যাকে বলে!'

অ্যাকটিং প্রেসিডেন্ট শুনেছেন, রুস্তমজির সাথে তাজউদ্দীনের ব্যক্তিগত সম্পর্ক এতদিনে প্রায় বন্ধুত্বের রূপ নিয়েছে। কিন্তু নজরুল ইসলামকে অবাক করেছিল তাজউদ্দীনের ব্যক্তি সম্পর্কের উষ্ণতাহীন এক শীতল প্রত্যুত্তর, 'হ্যাঁ, সার্বভৌম বাংলাদেশের ওপর যদি কোনো চাপ প্রয়োগ না করা হয়, স্বাধীন বাংলাদেশের কাজে যদি ভারত প্রভাব বিস্তার করতে না চায়; তাহলে অবশ্যই দুই দেশের মৈত্রী অটুট থাকবে। ইটারনাল ফ্রেন্ডশিপ অ্যাজ ইকুয়ালস!'

সৈয়দ নজরুল ইসলাম জানতেন না, তাজউদ্দীনের এই স্পষ্টভাষী উত্তরে চমৎকৃত হয়ে রুস্তমজির সঙ্গী গোলোক মজুমদার অবাক স্বরে রুস্তমজিকে বলবেন, 'স্যার, আই ওয়াজ রং। দিস গাই ইজ নট আ পলিটিশিয়ান। হি ইজ আ স্টেটসম্যান!'

তবে প্রবাসী সরকারকে উড়িয়ে নিয়ে আসা বিমানটির ভেতরেই একজন পলিটিশিয়ান ছিলেন, সহযাত্রীদের আলোতে আড়াল হয়ে গিয়েছিল তার আচকান সজ্জিত অবয়বের ছায়াটি।

পলিটিশিয়ানটির উপস্থিতি স্পষ্ট হবে কয়েকদিন পর, যখন বর্ধিত মন্ত্রিসভায় স্থান করে দেয়া হবে আরো নতুন পাঁচজনকে, কিন্তু পররাষ্ট্র মন্ত্রীর পদ থেকে অপসারিত হবেন তিনি। খন্দকার মোশতাক তখন থলে থেকে বের করে আনবেন এক টুকরো পলিটিক্স।

পলিটিক্সের ট্রিকস তিনি অনেকবারই দেখিয়েছেন, শেষবার দেখিয়েছেন বিজয়ের দিন তিনেক আগে আগে। মাহবুবুল আলম চাষির হাত দিয়ে যুদ্ধবিরতির এক বিবৃতি তিনি পাঠিয়েছিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলামের স্বাক্ষর সংগ্রহের জন্যে। প্রস্তাবিত বিবৃতির মূল বক্তব্য ছিল, শেখ মুজিবুর রহমানকে তাৎক্ষণিক মুক্তি দেয়া হলে বাংলাদেশ সরকার যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করবেন। ফলে যৌথ কমান্ডের অধীন ভারতের সেনাদের পক্ষে আর ঢাকামুখী অগ্রসর হওয়া হবে না। সৈয়দ নজরুল ইসলাম আসন্ন চূড়ান্ত যুদ্ধ জয় দেখতে পেরে সেই প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

গল্পের শেয়াল এক কুমিরছানা বার বার দেখায়, কিন্তু পলিটিশিয়ানদের হতে হয় শেয়ালের চাইতেও ধূর্ত। মোশতাক তাই ঠিক করেছেন, আরো একবার শেখ মুজিবের মুক্তির মহা আকাঙ্ক্ষিত টোপটি খেলাবেন তিনি।

নতুন মন্ত্রিসভা ঘোষিত হবার সাথে সাথেই তাই মোশতাককে আছড়ে পড়তে দেখা যায় বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিবের পায়ে। 'সব শেষ হয়ে গেল ভাবি, আমাদের স-অব শেষ!'

বেগম মুজিব স্বামীর যোগ্য সহধর্মিণী, সহজে বিচলিত হওয়া তার ধাঁতে নেই। তবু মোশতাকের এই শিশুসম কান্নায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন তিনি। বলেন, 'কী হয়েছে ভাই সাহেব, আপনি এভাবে কান্নাকাটি করছেন কেন?'

মোশতাক আরো একবার ডুকরে কেঁদে ওঠেন। 'সর্বনাশ হয়ে যাইতেছে ভাবি সাহেবা, তাজউদ্দীন দেশটারে ইন্ডিয়ার কাছে বেইচ্চা দিচ্ছে! তারে আটকানোর কেউ নাই!

... শেখ সাহেব থাকলে কী আর তাজউদ্দীনের এই সাহস হয় ভাবি! উনি নাই দেইখাই তাজউদ্দীন যা খুশি কইরে যাচ্ছে। শুনতেছি, আল্লাহ না করুন, বঙ্গবন্ধু যাতে আর ফিরে না আসেন সেই ষড়যন্ত্রও করা হইতেছে তলে তলে। তাই কানতেছি ভাবি, সব তো শেষ হয়ে যাচ্ছে!'

বিব্রত বেগম মুজিবের সামনে খন্দকার মোশতাক অঝোরে কাঁদতে থাকেন। তার চোখের পানিতে স্পষ্ট হতে থাকে স্টেটসম্যান আর পলিটিশিয়ানের পার্থক্য। লেখা হতে থাকে ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের একটি অনিবার্য সংঘাত।

'অস্ত্রের ট্রিগারে হাত রাখা লোকে মানুষখেকো বাঘের মতো, বুঝলে! যে উত্তেজনার সন্ধান সে পেয়েছে, সেটা সে বারবার উপভোগ করতে চায়।' শীতের শেষ বিকেলে মেসবাহর কথাটা অতি নাটুকে শোনায় ওদের কাছে।

ওরা বসেছে শরীফ মিয়ার ক্যান্টিনে, জায়গাটা ঢাকা ভার্সিটি লাইব্রেরির উত্তর দিকে। শহরের উঠতি সাংবাদিক, তরুণ কবি আর অভিনেতাদের ভিড় লেগেই থাকে এখানে। লোকে শরীফ মিয়ার ক্যান্টিনকে তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টেলেকচুয়াল কর্নারও বলে। ক্যান্টিনের মালিক শরীফ মিয়া পুরান ঢাকার মানুষ, যুদ্ধের সময় লালবাগের বাসায় পালিয়ে থাকায় সে বেঁচে গেছে; জগন্নাথ হলের মধুদার মতো তাকে গুলি খেয়ে মরতে হয়নি।

অর্ডার দেয়া বিরিয়ানির উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে খোরশেদ, বাকিরা খাচ্ছে চা আর টোস্ট বিস্কুট।

'আমাদের ছেলেরা যুদ্ধের নয় মাসে জীবনের যে তীব্র গতিটা দেখেছে, ' আগের কথার রেশ ধরে বলে মেসবাহ, 'তাতে ওদের মানসিকতায় একটা বিশাল পরিবির্তন চলে এসেছে। আসাটাই স্বাভাবিক। কাদের সিদ্দিকী যেমন ক্যামেরার সামনেই কয়েকজনকে মেরে ফেলল...

প্রতিটা গণযুদ্ধের পর এরকম যোদ্ধাদেরকে দেশের মূলধারায় জড়াতে পারার উপরেই সেই দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। আমি নিজে নবাবপুর-তাঁতীবাজারে দেখলাম লোকজন প্রকাশ্যে অস্ত্র নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, বাধা দেবার কেউ নাই। এই ছেলেগুলাকে তো ঠিক মতো গাইড করতে হবে।'

'সেটা তো অবশ্যই, তবে অস্ত্র একেবারে জমা দেবার মতো পরিস্থিতিও কিন্তু দেশে ফিরে আসে নাই, ' মামুন বলে। 'অনেক জায়গায় তো এখনো যুদ্ধ চলতেছে। বিহারিরা পাকিস্তানিদের ফেলে যাওয়া আর্মস নিয়া সাধারণ মানুষ মারতেছে! আইনের শাসন অবশ্যই কাম্য কিন্তু যুদ্ধের সময় কি এই ইমোশনগুলা কাজ করে বলো? যে ছেলেটার বাবা-মাকে পাকিস্তানিরা মেরেছে, সে যদি এখন অস্ত্র হাতে নিয়ে বিহারিদের মারতে চলে যায়, নৈতিক দিক দিয়ে কি তারে অপরাধী বলা যায়?

... রায়েরবাজারে পচা লাশগুলা দেখে তো শালার আমার নিজেরি মন চাইতেছিল স্টেন নিয়া বাইর হয়া যাই। গুলি মাইরা উড়ায়ে দিই শুয়োরের বাচ্চাগুলারে!'

'শরীফ মিয়া, আরো দুইটা চা দাও এইদিকে!' আলাউদ্দীন একটা হুঙ্কার দিয়ে খানিক অপেক্ষা করে। মামুনের আবেগটাকে প্রশমিত হবার সময় দিয়ে, এরপর কথা বলে সে।

'আমিও পার্সোনালি কাদের সিদ্দিকীরে দোষ দিতে পারতেছি না। যদিও স্বীকার করি, আইনের দৃষ্টিতে এবং এইরকম পরিস্থিতিতে কাজটা তার মোটেই ঠিক হয় নাই। তবে মেসবাহর কথা কিন্তু ঠিক। অস্ত্র হাতে থাকা মানেই যে মুক্তিযোদ্ধা, এই ধারণা এখন ঠিক না। পাকিস্তানি মিলিটারির ফেলে যাওয়া অস্ত্র হাতে পেয়ে এখন অনেক স্বঘোষিত যোদ্ধা তৈরি হয়ে গেছে। এই হারামজাদারা লুটপাট করে বেড়াচ্ছে ম্যালা জায়গায় আর মানুষ সেগুলাকে ভাবতেছে মুক্তিযোদ্ধাদের কাজ!'

আলাউদ্দীনের কথায় সায় দেয় অনেকে। ১৬ ডিসেম্বর রাত থেকেই এরকম কিছু ভুয়া মুক্তিযোদ্ধায় ছেয়ে গেছে ঢাকা শহর, লোকে এদের ডাকছে সিক্সটিনথ ডিভিশন বলে।

'খালি আমাদের ছেলেদের কথা বললেই চলবে? 'রক্ষাকর্তা' ইন্ডিয়ান আর্মির কথা ভুলে গেলা?' মাসুদের গলায় তীব্র শ্লেষ। 'তারা সব ধোয়া তুলসী পাতা? ক্যান্টনমেন্ট থেকে আর্মস সরানোর কথা বাদই দিলাম, বিহারিদের ফেলে যাওয়া টিভি-ফ্রিজ-রেডিও; কিছুই তো ফেলে দিতেছে না তারা। সব ট্রাকে উঠাইতেছে।

আমাদের সরকার তো দেশটারে বর্গা দিয়াই দিছে ইন্ডিয়ার কাছে। আরে আমাদের মেজর জলিল, সে ইন্ডিয়ান আর্মির লুটপাটে বাধা দিছিল বইলা তারে পর্যন্ত অ্যারেস্ট করা হইছে!'

খোরশেদ বিরিয়ানির প্লেট শেষ করে মুখ মুছতে মুছতে বলে, 'এই কাহিনি আমারও কানে আসছে। তবে এইটা আমি বিশ্বাস করি নাই। ওসমানী সাহেবের পিআরও নজরুল ইসলামের সাথে পরিচয় আছে আমার। উনিই আসল ঘটনা বললেন।

মুজিবনগর সরকার নাকি খুলনা মুক্ত হবার পরে সেইখানে একজন বেসামরিক ডিসি নিয়োগ দিছিল। কিন্তু মেজর জলিল সেই লোকের কাছে খুলনার দায়িত্ব বুঝায়ে দিতে রাজি হয় নাই। ওসমানী সাহেব এরপর তারে মেসেজ দিবার পরেও মেজর জলিল অবাধ্যতা দেখালেন। এই ঘটনার পরেই নাকি গ্রেপ্তার করা হইছে তাকে।'

শরীফ মিয়ার ক্যান্টিনে এই সময় হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ে বেশ কিছু লোক। তাদের চেয়ার টানাটানির শব্দে খানিকক্ষণ কথা বন্ধ রাখতে হয় ওদের।

'নানা রকম কথা শুনা যায় চারদিকে। কোনটা যে বিশ্বাস করবো, বুঝি না।' মামুন টোস্ট বিস্কুটটা ঠান্ডা হয়ে যাওয়া চায়ে ডুবিয়ে দেয়। 'কিন্তু ভারতীয় সেনাবাহিনী যে সুযোগ পেয়ে খানিক লুটপাট করে নিচ্ছে, এইটা তো আর অস্বীকারের উপায় নাই।

...আচ্ছা, ইয়ে, নিয়াজী সারেন্ডার করার সময় কিন্তু রেসকোর্সে ওসমানী আসেন নাই। তো এই নিয়ে এখন কিছু লোকে বলতেছে এইটার পেছনে নাকি

অন্য ব্যপার আছে! ওসমানী নাকি চাইছিলেন যে পাকিস্তানিরা খালি বাংলাদেশের কাছেই সারেন্ডার করুক। কিন্তু ইন্ডিয়া নাকি চাপ দিয়ে আমাদের সরকারকে বাধ্য করাইছে যৌথ কমান্ডের আন্ডারেই আত্মসমর্পণ দলিলে সাইন করাতে। তো এই নিয়ে অভিমান করেই নাকি ওসমানী রেসকোর্সে আসেন নাই, তার বদলে আমাদের সরকার না পারতে খন্দকাররে পাঠাইছে। আসলেই সত্যি এই ঘটনা?'

আলাউদ্দীন মাথা নাড়ে দুই দিকে। 'কথা যে কীভাবে এত রং মাখে, মাথায় ঢুকে না বুঝলা!

শুনো, আমি তো থিয়েটার রোডে রেগুলারই যাইতাম, তাই ভিতরের খবর কিছুটা হইলেও জানি। ওসমানী তো কলকাতাতেই ছিলেন না ওই সময়, উনি তো হেলিকপ্টার নিয়ে ততক্ষণে সিলেট চইলে গেছেন। সরকার তারে রেসকোর্সে পাঠাবে কীভাবে! আর সিলেটে ওসমানীর কপ্টারে অ্যাটাক হইছিল, এইজন্যে তার কলকাতা ফিরতেও কয়েকদিন দেরি হইছে।'

'দেখো, অপ্রিয় হলেও একটা সত্যি কথা হচ্ছে আমাদের দেশের কিছু মানুষই স্বাধীনতার বিপক্ষে ছিল, এখনো আছে।' মেসবাহ ধীরে ধীরে বলে। 'কাজেই পরিস্থিতির অস্বচ্ছতার সুযোগ নিয়ে তারা অনেক রকম কথা ছড়াবে, সত্যকে মিথ্যা বানাবে, তিলকে তাল করবে, এটাই স্বাভাবিক। আমাদের সরকারের উচিত ছিল এই রকম গুজবগুলোর বিপক্ষে জোরালো প্রচার চালানো। সত্যটাকে পরিষ্কার করা। সাধারণ মানুষ তেমনটাই চেয়েছিল।

কিন্তু দেখো, উলটো বরং প্রবাসী সরকার দেশে ফিরতে সময় নিয়েছে এক সপ্তাহর মতো। স্বাধীনতার বিপক্ষ শক্তিদের একটা বড় অস্ত্র হচ্ছে ভারত বিদ্বেষী প্রচারণা, প্রবাসী সরকার কি সেটাকে আরেকটু শক্তিশালী করে দিল না? দেশে ভারতের আর্মি কতদিন থাকবে, এটা নিয়েও তো নানা মহল থেকে প্রশ্ন উঠছে...

আমি জানি যুদ্ধের সময় সরকার প্রধান হিসেবে তাজউদ্দীন অনেকগুলো সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তবুও আমার মনে হয়, এই বিষয়ে তার সিদ্ধান্তটা প্রশ্নের উর্ধ্বে না। নিরাপত্তার ঝুঁকি হয়তো ছিল, তারপরেও স্বাধীন হবার সাথে সাথেই দেশে ফেরাটা হয়তো ভালো হতো আমাদের জন্যে।'

আলাউদ্দীন সম্মতি দেয় মাথা নেড়ে। 'এখন অবস্থা যেভাবে যাচ্ছে, সেভাবে যেতে থাকলে প্রবাসী সরকারের পক্ষে আর বেশিদিন দেশ চালানো সম্ভব হবে বলেও মনে হয় না। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবার আগেই আসলে উনাকে দরকার।' সামনে রাখা পত্রিকাটির একটি ছবিতে আলাউদ্দীন হাত দিয়ে ইঙ্গিত করে এ সময়। সেখানে করাচি এয়ারপোর্টে সামরিক অফিসার বেষ্টিত হয়ে থাকা একটি মানুষের ছবি।

এবং কোনো শব্দ উচ্চারণ না করেই পুরো সন্ধ্যায় প্রথমবারের মতো, উপস্থিত সকলেই তাৎক্ষণিকভাবে একমত হয়ে পড়ে এই বক্তব্যে। ওরা

প্রত্যেকেই উপলব্ধি করে, নানামুখী জটিলতার ঘোরালো ল্যাবিরিন্থ থেকে বাংলাদেশকে আলোয় নিয়ে আসতে হলে ঐ মানুষটির কোনো বিকল্প নেই।

কোথায় আছেন মানুষটি? স্বাধীন বাংলাদেশে কখন আসবেন তিনি? ওদের, আর বাংলাদেশের, প্রতীক্ষার প্রহর কাটে না।

বাংলাদেশ টলোমলো পায়ে এগোয়, আর ঘড়ি দেখে অপেক্ষা করে তাঁর জন্যে।

রুপালি কমেটের মিডাস

তিনি বিমানের জানালা দিয়ে আরো একবার নিচে তাকালেন। তাঁকে বড় অস্থির দেখাচ্ছে।

মানুষটির ভেতরে, তাঁর এলোমেলো হয়ে থাকা চুলে অথবা তাঁর কালো মোটা ফ্রেমের চশমায়, সম্মোহনী কিছু একটা আছে, থেকে থেকে এই কথা মনে হচ্ছে সহযাত্রী ফারুক চৌধুরীর। মানুষটির ওপর থেকে চোখ সরাতে পারছেন না ফারুক চৌধুরী। কালো-ধূসর স্যুটের উপরে কালো ওভারকোট পরা মানুষটিকে পত্রিকার ছবিতে যেমনটা দেখা যায়, সামনাসামনি তার চেয়ে কিছুটা কৃশকায় বলে মনে হচ্ছে। হয়তো দীর্ঘ বন্দিজীবন তাঁর কিছুটা ওজন কমিয়ে দিয়েছে।

'তিনি লন্ডনে!' দৈনিক সানডে টাইমস তাদের গতকালের প্রথম পাতার দুই-তৃতীয়াংশ জুড়ে থাকা বিশেষ প্রতিবেদনটির শিরোনাম করেছিল এইরকম। ঠিক একদিন আগে বিবিসির সকালের খবরের অনুকরণ যেন। আট তারিখ লন্ডনের হোটেল ক্ল্যারিজেসের দিকে বিস্ময় আর শ্রদ্ধা নিয়ে যে তাকিয়েছিল পুরো পৃথিবীই।

এই তাহলে সেই অদ্ভুত মানুষটি, যার ছায়া এতই দীর্ঘ, যে তাঁর অনুপস্থিতিতেও সেই ছায়াকে সামনে রেখে স্বাধীনতা নিয়ে এসেছে তাঁর দেশের মানুষ!

'অরা আমারে এক্‌বারে আলদা কইর‍্যা রাখছিল পৃথিবী থেইক্যা।' মানুষটি হঠাৎ অন্যমনস্ক স্বরে কথা বলে উঠলেন। 'কোনো বই দ্যায় নাই, পেপার দ্যায় নাই, রেডিও দ্যায় নাই। অরা চাইছিল আমারে পুরা অন্ধকারে রাখতে। ...ভুট্টো আবার আমারে আসবার আগে অনুরোধ করে, আম্‌গোর মাঝে য্যান একটা শিথিল কনফেডারেশন হইলেও থাকে। আমি বলছি আমার দ্যাশের মানুষের লগে কথা কবার আগে তোমাদের লগে কোনো আলোচনাতেই আমি নাই।'

আশপাশে বসে থাকা আবদুস সামাদ আজাদ, কামাল হোসেন, ফারুক চৌধুরীরা আগ্রহ নিয়ে মানুষটির কথা শুনতে থাকেন। কামাল হোসেন নিজেও বন্দী ছিলেন পাকিস্তানে। পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে ছুটে আসা অনুরোধ আর

জনমতের চাপ সইতে না পেরে তাদের দুইজনকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়েছেন ভুট্টো। পাকিস্তান থেকে লন্ডন, এরপর লন্ডন থেকে ঢাকার উদ্দেশে রওয়ানা দিয়েছেন তারা। অবশ্য খানিক আগে দিল্লিতে একবার যাত্রা বিরতি নিয়েছে বিমান, সেখানে ছোট্ট এক বক্তৃতায় এই মানুষটি ধন্যবাদ জানিয়ে এসেছেন ভারতকে।

'অরা আমারে মাইর‍্যাও ফেলতে চাইছিল!' বিমানের জানালা দিয়ে ঢোকা আলো ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে আনমনা মানুষটির মুখ, তিনি বলে যাচ্ছেন অন্ধকার সময়ের কথা। 'আমার সেলের পাশে অরা কবর খুঁইড়্যা রাকছিল, বুঝল্যা! ঈদের দিনেও বাইরয়া নামাজ পড়ব্যার দ্যায় নাই আমারে।... আমি খালি মনে মনে দোয়া করতাম আল্লার কাছে। ঠিক করছিলাম ফাঁসির মঞ্চে গিয়া কলেমা পড়ার পরে উঁচু গলায় বলবো, আমি বাঙালি, বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার ভাষা!'

ব্রিটিশ স্টুয়ার্ড হঠাৎ জানিয়ে যায়, বিমান উড়ছে ঢাকার আকাশে। মানুষটি খানিক উত্তেজিত হয়ে পড়েন এ কথা শুনে। সিট বেল্টে বেঁধে নিয়ে তিনি বারবার জানালা দিয়ে নিচে তাকান। কামাল হোসেনের তখন মনে পড়ে যায় লন্ডনে বসে ব্রিটিশ সাংবাদিক মাসকারেনহাসের 'দেশে ফিরে কী করতে চান' প্রশ্নের উত্তরে এই মানুষটি কী বলেছিলেন।

'আমার বাংলাদেশের প্রতিটা মানুষের মুখ, আমি দেখে আসতে চাই।'

মানুষটি তাই রানওয়ের উপরে ঘুরতে থাকা বিমানের জানালা দিয়ে নিচে জড়ো হওয়া জনসমুদ্রটি দেখেন। পুরো ঢাকা শহর বুঝি কেন্দ্রীভূত হয়েছে এখানে। তিনি জানেন না, সোনার বাংলার প্রতিটি অক্ষাংশ আর দ্রাঘিমাংশই যেন এখন বিমানবন্দর। টিভি পর্দা অথবা রেডিওর ধারাবিবরণীতে তাঁর জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে মানুষ। প্রতিটি অপেক্ষাই বুকে বেঁধে রেখেছে প্রশ্নের ডিনামাইট।

হায়দারের ক্র্যাক প্লাটুন প্রতীক্ষা করছে, অন্য সমস্ত মুক্তিযোদ্ধাদের মতোই, যুদ্ধের ময়দানে সত্যিই জীবন বাজি রেখে লড়েছে যারা তাদের দেয়া হবে যোগ্য মর্যাদা। কী করে সম্পৃক্ত করা হবে তাদের দেশ গড়ার কাজে?

আবদুল বাতেন ফিরে এসেছে নিজের ঢাকায়। কিন্তু ভারতের মাটিতে এখনো রয়ে গেছে বহু শরণার্থী। কখন আসবে তারা, কীভাবে সম্পন্ন হবে তাদের পুনর্বাসন?

জাহানারা ইমামদের অপেক্ষা রুমীদের জন্যে, পান্না কায়সাররা হারিয়েছেন শহীদুল্লাহ কায়সারদের। যে সব বাংলাদেশি দালাল পাকিস্তানিদের সাহায্য করেছে যুদ্ধাপরাধে, বিচার কীভাবে হবে তাদের? আদৌ হবে তো?

আবু জাফর শামসুদ্দীন ভাবছেন, নতুন রাষ্ট্রের প্রশাসনের অনেক অংশেই পাকিস্তানের নামের ওপরে বাংলাদেশের স্টিকার মেরে দিয়েছেন আমলারা; কিন্তু

যুদ্ধদিনে তাদের সমর্থন ছিল মিলিটারির পক্ষেই। এদের হাত ধরে ঠিকঠাক চলবে তো নতুন দেশের প্রশাসন?

তারেকুল আলম শঙ্কিত, সিক্সটিন্থ ডিভিশনের অস্ত্র কী করে আলাদা করা যাবে মুক্তিযোদ্ধার হাতের স্টেন হতে?

যুদ্ধদিনের রাজনীতি দুশ্চিন্তায় রেখেছে আলাউদ্দীনকেও। খন্দকার মোশতাক বিরোধিতা করে এসেছেন মন্ত্রিসভার আর মুজিব বাহিনীজনিত টানাপোড়েনে অসন্তুষ্ট শেখ মনিও। নতুন বাংলাদেশে কতটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে এই পুঞ্জীভূত ক্ষোভগুলো?

হাবিবুল আলম ভাবে, পাকিস্তানে আটকে আছে কয়েক লাখ বাঙালি। বাংলাদেশে অবস্থান করা বিশ লাখ বিহারিও আছে ঝুঁকিতে। এই অবস্থার অবসান ঘটবে কখন?

চিন্তাযুক্ত আবু সাইদ চৌধুরীও। স্বীকৃতি পেতে হবে সোভিয়েত ইউনিয়ন, আমেরিকা, চীনের মতো প্রভাবশালী রাষ্ট্রগুলো থেকে। গোলাকৃতির গ্লোবে বাংলাদেশের অবস্থান কী করে পাবে ভারসাম্য?

সৈয়দ নজরুল ইসলাম ভাবেন, বন্ধু ভারতের সৈনিকদের দ্রুত ফিরিয়ে দিতে হবে দেশ থেকে। বাংলাদেশের মানুষ কৃতজ্ঞ তাদের কাছে, কিন্তু কতদিন একটি ভিনদেশি বাহিনী জায়গা নেবে নিজেদের ভূখণ্ডে?

ব্যাংকের সমস্ত টাকা পুড়িয়ে দিয়ে গেছে পাকিস্তান, ধ্বংস হয়ে গেছে দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা, কারখানা সব বন্ধ। তাজউদ্দীন ভাবছেন, কী করে আবার নতুন করে গড়ে তোলা যায় বাংলাদেশকে?

...সাত কোটি মানুষ, সাথে সীমাহীন সংশয়মিশ্রিত প্রশ্ন। জবাব খুঁজে নিতে হবে প্রতিটিরই। মাটির পৃথিবীতে পরাবাস্তব এক আশা বুকে নিয়ে অপেক্ষা করছে সকলে, সব কিছুরই সমাধান নিয়ে আসবেন ওই মানুষটি।

কারণ বাংলাদেশের মানুষ জানে, যা কিছু অসম্ভব, যা কিছু অভাবনীয়, যা কিছু অভূতপূর্ব– সব কিছুই সম্ভব করতে পারে ওই পাঁচ ফুট সাড়ে এগারো ইঞ্চির মানুষটির তর্জনি। মানুষটি যেন বিংশ শতাব্দীর মিডাস, যার স্পর্শে সিরিল রেডক্লিফের কাঁটাকম্পাস থেকে কেটে যাওয়া ছাপ্পান্নো হাজার বর্গমাইল পরিণত হয়েছে বাস্তব সত্যে।

আসছেন, তিনি আসছেন! ঐ তো, বিকেলের ঘড়ির কাচে দৃশ্যমান হচ্ছে তাঁকে উড়িয়ে আনা বিমানের গায়ের রাজকীয় ব্রিটিশ সিলের ছায়া!

আসছেন, বাংলাদেশ রূপকথার মিডাস আসছেন! ঢাকার রানওয়েতে ঐ নামছে তাঁর রুপালি কমেট!

আসছেন, শেখ মুজিবুর রহমান আসছেন!

উত্তর খণ্ড

নতুন দিনের গান

তাজউদ্দীনের মনে হলো, আজকের সকালটা খুব সুন্দর। এ সপ্তাহে একবারও এমন ঝকঝকে নীল আকাশ দেখা যায়নি।

সকালবেলা কাজ শুরু করবার আগে মানুষ যদি একবার আকাশের দিকে তাকায়, তাহলে নিশ্চয়ই তার একটা নতুন কিছু করতে ইচ্ছে করবে। একঘেয়ে, নিয়ম মাফিক কিছু নয়, একদম নতুন কিছু। হয়তো একটা নতুন ডায়েরির পাতায় কিছু লেখা, হয়তো একেবারে নতুন কোনো বই পড়া, কিংবা একটা নতুন গান শোনা। প্রতিদিনের আকাশ নতুন, সে কি আর পুরাতন কিছু মনে করাতে পারে!

তাজউদ্দীন জানালা থেকে সরে গিয়ে টেবিলে বসেন। মন থেকে ভাবালুতা ঝেড়ে ফেলেন তিনি। এখন দেশকে প্রস্তুত করবার সময়, অবসর উপভোগের নয়। তার কাজ নৈমিত্তিকতার বাক্সে আটকানো হলেও দায়িত্ব পালন তাকে করতেই হবে। নিজেই যদি কাজে ছাড় দেন, তাহলে অন্যদের বেশি করে কাজ করতে বলবেন কী মুখে!

এক গ্লাস পানি খেয়ে তাজউদ্দীন কাজে মন দিলেন। প্রথমে তিনি জরুরি বলে আলাদা করে রাখা ফাইল আর অফিসিয়াল চিঠিগুলো নিয়ে বসলেন। একান্ত সচিব আবু সাইদ চৌধুরী দিনের শুরুতেই তাজউদ্দীনের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ ফাইলগুলো আলাদা করে রাখেন। তাজউদ্দীন নিজেও ফাইল দেখার সময় থাকেন খুব সজাগ। ফাইল দেখাটা তো আসলে এক ধরনের রেকর্ড, এখানে ভুল করলে চলে না। তার অসতর্কতার কারণে রাষ্ট্রীয় কাজে দীর্ঘসূত্রিতা হবে, এমনটা যেন জীবনে না হয়। তাজউদ্দীন তাই গভীর মনোযোগে ফাইল দেখতে থাকেন।...

প্রায় মিনিট চল্লিশেক একটানা কাজ করলেন মানুষটি। কিছু ফাইল দেখে তার মনে হলো গোলমাল আছে। এগুলো আবার তদন্তে পাঠানো দরকার। সে ফাইলগুলো আলাদা করে তিনি আবু সাইদ চৌধুরীকে ডেকে পাঠান।

'চৌধুরী সাহেব, বসেন।' সম্বোধন শুনে আবু সাইদ আবারো সংকুচিত বোধ করেন। কোনো এক অদ্ভুত কারণে তাজউদ্দীন তাকে সর্বদা চৌধুরী সাহেব বলে ডাকেন, কখনোই আবু সাইদ বা সাইদ সাহেব বলেন না। 'শুনেন, এই ফাইলগুলা একটু চেক করে নিয়েন তো আবার। দেখে মনে হচ্ছে ঠিক নাই, আপনি ভালো মতো দেখেন। সমস্যা থাকলে ফেরত পাঠায়ে দিয়েন।'

আবু সাইদ চৌধুরী মাথা ঝাঁকান। এরপর বলেন, 'স্যার, বাইরে বেশ কিছু লোক জমে গেছে। আপনি যদি অনুমতি দেন, তাহলে আস্তে আস্তে উনাদের পাঠাই।'

তাজউদ্দীন ঘড়ি দেখলেন, পৌনে দশটার মতো বাজে। দশটা থেকে একটা এই তিন ঘণ্টা দর্শনার্থীদের জন্যে বরাদ্দ। মানুষজন নানা রকমের সমস্যা নিয়ে আসে। এলাকার লোকজন, দাপ্তরিক কাজে সাহায্য চাইতে আসা মানুষ, দলের সদস্যরা। সবার ধারণা একবার মন্ত্রীকে নিজের সমস্যাটা বোঝাতে পারলেই কাজ হয়ে যাবে। ব্যর্থ হয়ে ফিরতে কেউই চায় না, লোকজনের ধৈর্যের বড় অভাব।

'এখন না, ঠিক দশটা থেকেই একজন একজন করে পাঠাবেন।' তাজউদ্দীন আবু সাইদ চৌধুরীকে বলেন। 'এর মাঝে যে কয়টা ফাইল পারি দেখে রাখি।'

আবু সাইদ চৌধুরী যথাসম্ভব সন্তপর্ণে ঘর থেকে বেরিয়ে যান। তিনি জানেন, অর্থমন্ত্রী বেলা একটায় লাঞ্চ সেরে সন্ধ্যা পর্যন্ত পুরো সময়টাই অফিসের ফাইলে মুখ গুঁজে থাকবেন। এরপরে হয়তো আবার প্রয়োজনে দর্শনার্থীদের দেখা দেবেন।

বেলা দশটায় অপেক্ষমাণ লোকেদের মাঝ থেকে প্রথমজনকে ভেতরে ঢুকিয়ে দিলেন আবু সাইদ চৌধুরী। বাকিদের বিষয় সুরাহা করতে তার অ্যাসিস্টেন্ট মাজহারুল ইসলামকে নির্দেশ দিয়ে তিনি নিজে বসলেন আরো কিছু ফাইল নিয়ে।

কাজ, কাজ, কাজ!

গত কয়েকটা সপ্তাহ যে কী ভীষণ চাপে কেটেছে, সেটা মনে করতেই দম বন্ধ করা একটা মনোভাব হয় সাইদ সাহেবের। বাজেট ঘোষণা করা হয়েছে কয়েক দিন আগে, সেটার কারণেই খাটুনিটা বাড়তির দিকে ছিল। একদিন তো মনে আছে অফিসে এসেছিলেন সকালে, আর বাড়ি গেছেন পরের দিন ভোরে ফজরের আযানের সময়!

আবু সাইদের চোখে ভাসে যুদ্ধ জেতার পরের কয়েকটা মাস। কী যে কষ্ট গেছে দিনগুলো! পুরো দেশ দেউলিয়া, কারখানা সব ধ্বংস হয়ে গেছে, বাজারে নিত্য দরকারি কোনো কিছু নেই, খাদ্য সরবরাহ সীমিত, লক্ষ লক্ষ রিফিউজি দেশে ফিরছে, বাড়াচ্ছে বেকারত্ব আর অভাবের তালিকা।

মনে মনে আবু সাইদ চৌধুরী একটা লম্বা শ্বাস ফেলেন। এখনো তো সব বিপদ কাটেনি, নতুন দেশের দিগন্তের অনেকটা জুড়েই তো এখনো ছড়ানো কালো কিউমুলাস। কিন্তু চেষ্টাও তো চলছে। চাপও কমে আসছে আস্তে আস্তে। এই তো, মাত্র কিছুদিন হলো সাপ্তাহিক ছুটি চালু হয়েছে সরকারি অফিসগুলোতে। প্রথম কয়েক মাস তো সেটাও ছিল না, টানা অফিস করতে হয়েছে।

তাজউদ্দীন আবু সাইদ চৌধুরীকে আবার ডেকে পাঠালেন দেড়টার দিকে। সাইদ সাহেব মনে মনে প্রস্তুতই ছিলেন, তাজউদ্দীন কেন তাকে ডাকছেন তা তিনি

আন্দাজ করতে পারেন। দুপুরবেলা বাংলাদেশ ব্যংক গভর্নর একটা দৈনিক রিপোর্ট পাঠান, আবু সাইদ ব্যাংক গভর্নরের পাঠানো সেই রিপোর্টটা নিয়েই স্যারের রুমে গেলেন। সাইদ সাহেবের হাতে রিপোর্টটা দেখে তাজউদ্দীন সামান্য মুচকি হাসলেন; তবে গম্ভীর হয়ে গেলেন পরক্ষণেই!

এই অনুভূতির লুকোচুরি খেলাটা আবু সাইদ চৌধুরী খুব উপভোগ করেন। মেজাজ খারাপ থাকলে তাজউদ্দীনের মুখ ভয়ানক গম্ভীর হয়ে থাকে, বেশ ভয়ই লাগে তখন তাকে দেখলে। আর মন ভালো থাকলে তাজউদ্দীন মিটমিট করে একটা হাসি দেন। সে হাসিটা বড় মিষ্টি!

প্রথমে বেশ দূরের মানুষ মনে হতো তাকে, এখন এই কয় মাস তার সাথে কাজ করার পর বলতে গেলে আবু সাইদ বেশ পছন্দই করে ফেলেছেন তাজউদ্দীনকে। এত নিয়মতান্ত্রিক আর কাজ নিয়ে মেতে থাকা মানুষ তিনি জীবনে আর দেখেননি। কাজ ছাড়া কিছুতে যেন আগ্রহ নেই মানুষটার। তবু কেন যেন আবু সাইদের মনে হয়, তাজউদ্দীনের আপাত নিস্পৃহ ঐ চেহারার আড়ালে একটা তীব্র কোমল হৃদয়ের নিবাস। সেই হৃদয়টা বাতাসের মতো হঠাৎ ঝাপটা মেরে যায় মাঝে মাঝে, তারপর মিলিয়েও যায় চট করে।

সেদিন বিকেলে একটা মজার ঘটনা ঘটল।

শেষ দুপুরে একটা ছোটখাটো ক্যাবিনেট মিটিঙে গেলেন তাজউদ্দীন। মিটিং শেষে তিনি আর পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান নুরুল ইসলাম, দুজনে মিলে অফিসে ফিরছেন হেঁটে হেঁটে। নিচতলার প্রবেশপথের পুলিশ নুরুল ইসলামকে ছেড়ে দিল, কিন্তু আটকে দিল তাজউদ্দীনকেই। 'দেখি, আপনার আইডি কার্ড দেখান। কার্ড কই?'

হতচকিত নুরুল ইসলাম তাড়াতাড়ি বলেন, 'আরে ভাই কী করো! উনি তো আমাদের অর্থমন্ত্রী!'

পুলিশ বেচারার মাথায় হাত। সে বারবার 'সরি' বলে বলে অস্থির হয়ে ওঠে, অথচ তাজউদ্দীনের কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। তিনি একটু হেসে কিছু না বলেই উপরে উঠতে থাকেন।

আড়চোখে তাজউদ্দীনের দিকে একবার তাকান নুরুল ইসলাম। পুলিশের আর কী দোষ। নিরাপত্তা রক্ষী বা আমলাদের কোনো জটলা নেই মানুষটিকে ঘিরে, তাজউদ্দীন যে একদম একা। তার পরনে একটা কালো প্যান্ট, পায়ে সাধারণ স্যান্ডেল, গায়ে একটা ইন না করা সাদা ফুলহাতা শার্ট। পুলিশ তো বিভ্রান্ত হতেই পারে! ...অর্থমন্ত্রীর মনে এখন কী চলছে, জানতে তাই নুরুল ইসলামের বড় ইচ্ছা হয়।

তাজউদ্দীনের মন কিন্তু খুব ফুরফুরে। অফিস ফিরে আলাভোলা বাতাসে এলোমেলো হয়ে যাওয়া চুল নিয়ে তিনি ফাইলের ফাঁকে ফাঁকে জানালাও দেখতে

থাকেন ঘন ঘন, আজকে তার সবকিছু ভালো লাগছে। সকালে অমন ঝকঝকে আকাশ দেখার পর কী আর মুখ ভার করে রাখা যায়!

সর্পিল সময়

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের গায়ে প্রায় গা লাগিয়ে পলাশীর মোড় থেকে বকশী বাজারতক ছড়িয়ে আছে অন্ত্যজ মানুষদের ছাপড়াঘর। আহসানউল্লাহ হলের ঠিক সামনে কুন্নু মিয়ার দোকানের খরিদ্দারদের আড্ডা প্রায়ই বাধা পায় সেই মানুষগুলোর দিনযাপনের শ্লীল-অশ্লীল শব্দে।

কুন্নু মিয়া পুরান ঢাকার লোক। তার দোকানে বনরুটি, ডিম বা চা এমনকি ধারেও পাওয়া যায় মুখচেনা হলে। তারেকুল আলম এদিকে এসেছিল তার বন্ধু নিজামের খোঁজে। নিজাম হলে নেই, তাই কুন্নু মিয়ার দোকানে সে ঢুকেছিল চা দিয়ে গলা ভেজাতে। কে জানত এখানে তার দেখা হয়ে যাবে আলাউদ্দীনের কলকাতা ফেরত বন্ধুদের সাথে!

তারেক এ মুহূর্তে সবার নাম মনে করতে পারে না, কেবল খোরশেদ আর মেসবাহকে চিনতে ভুল হয় না তার। খোরশেদ একটা সেদ্ধ ডিমের খোসা ছাড়াচ্ছিলো, তার মাঝেই তারেককে দেখে বেশ জোর গলাতেই সে ডাক দেয়, 'আরে, তারেক! তুমি এইখানে? ...আসো আসো, আরে বসোই না মিয়া। তারপর খোঁজখবর কীরকম বলো!'

সবার দৃষ্টি গায়ে নিয়ে তারেক বসে পড়ে বেঞ্চিতে। আড্ডায় পরে যোগ দেয়া অতিথির প্রচেষ্টা সচরাচর যা হয়, তেমন একটা হাসি দিয়ে সে বলে, 'আর খবর! এই তো আসছিলাম এক দোস্তোর লগে দেখা করতে। তোমাদের অবস্থা কী? অনেকদিন দেখা সাক্ষাৎ নাই। আলাউদ্দীন কই? তারে ছাড়াই আজকে আড্ডায় বসছো না কি ...'

গোলমুখের একটা ছেলে হেসে দিয়ে বলে, 'আলাউদ্দীন তো আজকাল বেজায় ব্যস্ত! দল ভাইঙ্গা তো দুই টুকরা। অয় বুজবারই পারতেছে না কোনদিক যাইবো! আমাগোর খোরশেদ কিন্তু সিদ্দিকী-মাখনের গ্রুপেই গেল!'

খোরশেদ সুরুৎ জাতীয় একটা শব্দ করে চায়ের কাপে চুমুক দেয়। বলে, 'এত দলফল বুঝি না-আমার কথা বাবা একটাই। শেখ সাহেব যেই পক্ষে, আমিও সেই পক্ষে। দাওয়াত তো দুই পক্ষই দিছিল, বঙ্গবন্ধু যখন সিদ্দিকী-মাখনেরটায় যোগ দিছেন; নিশ্চয়ই বুইঝাই দিছেন।'

দেশের ছাত্র রাজনীতির রাইড বড় উথালপাতাল গত কয় মাসে। ডাকসু নির্বাচন দিয়ে শুরু। লোকমুখে সিরাজুল আলম খান আর শেখ মনির যে ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্ব উড়ে বেড়াচ্ছিলো যুদ্ধের সময় থেকে, সেটাই যেন প্রকাশ পেয়ে গেল ডাকসু

নির্বাচনে। দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায় ছাত্রলীগের প্যানেল। নূরে আলম সিদ্দিকী আর আবদুল কুদ্দুস মাখন আশীর্বাদপ্রার্থী হলেন শেখ মনির। শাহজাহান সিরাজ আর আ স ম আবদুর রব ভিড়লেন সিরাজুল আলম খানের ক্যাম্পে। মজার বিষয়, ডাকসু নির্বাচনে ছাত্র ইউনিয়নের কাছে হেরে ভূত হয়ে গেল দুই পক্ষই, এমনকি অল্পদিন পরের রাকসু নির্বাচনেও।

দুই দলই এরপর নামে কেন্দ্রীয় শক্তি যাচাইয়ে। উভয় শিবিরের জাতীয় সম্মেলনের তারিখ ফেলা হয় একই দিনে। সিদ্দিকী-মাখন গ্রুপ সভামঞ্চ করে রেসকোর্সে আর সিরাজ-রবের ভেন্যু পল্টন ময়দান। দুই পক্ষের পোস্টারেই প্রধান অতিথি হিসেবে শোভা পাচ্ছিলো শেখ মুজিবের নাম, কিন্তু শেখ মুজিব হাজিরা দেন মনি গ্রুপের সভাতেই।

'স্বাধীনতা এনেছি, মুজিববাদ আনবো!' স্লোগানে আকাশ মাতিয়ে তোলেন সেদিন সিদ্দিকী-মাখনেরা। আর অন্যদিকে হতাশ, ক্ষুব্ধ রব-সিরাজেরা সম্মেলনের সূচনা করান শহিদ মুক্তিযোদ্ধা স্বপনের পিতাকে দিয়ে। মুজিববাদের বিপরীত স্লোগান হিসেবে তাদের গলায় শোনা যায় 'বিপ্লব, বিপ্লব, সামাজিক বিপ্লব!'

সেই কথা স্মরণ করেই হয়তো এখন কুন্নু মিয়ার দোকানে মেসবাহ বনরুটি খায়। মৃদুস্বরে বলে, 'পার্টি চয়েস করার অধিকার তো তোমার আমার সবারই আছে খোরশেদ। তবুও মনে হয় ছাত্রলীগের এত দ্রুত অর্ধেক হওয়াটা আমাদের জন্যে ভালো হলো না। এই দলের মুজিববাদ আর ওই দলের বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ, দুই ইজম মুখোমুখি দাঁড়ায়ে গেল দেশটা থিতু হবার আগেই। এম্নেই যা অবস্থা, এর মাঝে রাজনীতির গ্যাঞ্জাম...'

'দেশের থিতু হইতে দেরি আছে।' বলে ওঠে আরেকজন। 'খবরের কাগজ পড়ো না? গত আট-নয় মাসে হাজারখানেক ডাকাতি হইছে দেশে। চুরিদারির কথা তো হিসাবেই নিলাম না। পুলিশরে অসহায় বলবা, নাকি ঘুষখোর? স্বজনপ্রীতি-দুর্নীতি চলতেছে সব জায়গায়। লাইসেন্স দেয়া হইতেছে শুধু নিজেদের লোকেদের। রিলিফের মাল মাইরা খাইতেছে সরকারি অফিসাররাই। এত দুর্নীতিবাজ মানুষ দিয়ে দেশ চলে?'

চশমা পরা একজন বক্তার পিঠে চাপড় মেরে বলে ফেলে, 'আহা, এত ভান করছো কেন মাসুদ, বলেই ফেলো না, এই সরকারই দেশটাকে ডুবিয়ে দিচ্ছে? তোমাদের মতো বামদের হাতে ক্ষমতা দিলে সব ঠিকঠাকই চলতো!'

ছেলেদের হাসিটা বেশ জোরেই শোনা যায়। মাসুদ কিন্তু হাল ছাড়তে নারাজ। সে অভিযোগ করতেই থাকে। 'হাসো, আরো জোরে হাসো। কিন্তু কোন কথাটা মিথ্যা বলছি আমি, বলো?'

খোরশেদ উত্তর দেয়, 'আহা, দুর্নীতিবাজ লোক কোন দেশে, কোন সমাজে নাই বলো তো আমারে? তুমি বুকে হাত দিয়া কইতারবা যে সরকার কোনো

ব্যবস্থা নেয় না এগো লাইগা? রক্ষীবাহিনী করা হইছে। ঘোষণায় তো বলাই হইলো, কালোবাজারি-দুর্নীতি-ছিনতাই দমন-অস্ত্র উদ্ধার এইসব স্পেশাল কাজের জন্যেই এই বাহিনী...'

বেশ ব্যঙ্গাত্মক একটা হাসি দেয় মাসুদ। 'তোমার এইসব রূপকথা অন্য জায়গায় গিয়া শুনাইয়ো মিয়া। তুমি এখনো বিশ্বাস করো যে রক্ষীবাহিনী ওই জন্যেই তৈরি করা হইছে? ...চোখ খুলো। স্বীকার করো যে এই বাহিনী আসলে ইন্ডিয়াই কন্ট্রোল করতেছে। মুজিব বাহিনীর ট্রেনিং দিছিল যে ওবান, সেই ওবানই কিন্তু রক্ষীবাহিনীর ট্রেনিং দিতেছে, জানো তো? রক্ষীবাহিনীর কমান্ডারদের ট্রেনিং কই হইতেছে বলো তো? ইন্ডিয়া। ওদের ড্রেসের কালার দেখছো? জলপাই সবুজ। এইবার বলো, ইন্ডিয়ান আর্মির ড্রেসের কালার কী? সেইম না?

আমার কথা লিখ্যা রাখো। ইন্ডিয়ান আর্মি যাতে আমাগো দেশে গটগট কইরা ঢুইকা পড়তে পারে এইজন্যেই ড্রেসের কালার এক রাখা হইছে। তোমরা মানো আর না মানো, এইটাই বাস্তবতা।'

'মাসুদ, মাঝে মাঝে না, তোমার কথা শুনলে মাথায় রক্ত উঠে যায়। স্টুপিডিটির একটা সীমা থাকা দরকার।' মেসবাহ তার চরিত্রের সাথে বেমানান রকম ক্ষিপ্ত স্বরে বলে কথাটা।

'হ্যাঁ, রক্ষীবাহিনী নিয়ে, সেটার গঠন বলো বা কাজকর্ম, তর্ক করার অবকাশ আছে। কাদেরিয়া বাহিনী, মুজিব বাহিনী আর ইচ্ছুক মুক্তিযোদ্ধা যারা যারা আছে; বলা হলো তাদের নিয়ে জাতীয় মিলিশিয়া বাহিনী হবে। কিন্তু প্রথমেই তো ঝামেলা লেগে গেল। ট্রেইন্ড একটা বাহিনী, এখন যেটা বিডিআর, তার সাথে রক্ষীবাহিনীকে এক করার ডিসিশনটা হলো বুমেরাং। বিডিআরদের মাঝে অনেকে, আমি শুনেছি বিশেষ করে যারা মুক্তিযুদ্ধ করে নাই, তারা এই নতুন সদস্যদের একটা হুমকি মনে করে। মনে করে যে রক্ষীবাহিনী তাদের রিপ্লেস করতে এসেছে। শুরুতেই তাই পিলখানায় একটা গোলমাল বেঁধে গেল এই নিয়ে। মানুষ একটা নেগেটিভ ধারণা করে ফেলল ওদের সম্পর্কে।

...আমার মনে হয় প্রথম দিকের ওই ইম্প্রেশনটাই এখনো মানুষের মনে গেঁথে আছে। তারা রক্ষীবাহিনীকে পছন্দ করছে না। মনে আছে, ছয় দফাতেই কিন্তু একটা প্যারা মিলিশিয়া বাহিনী তৈরির ঘোষণা ছিল? ..আর ভারতের সেনাবাহিনীর ড্রেসের কালারের কথা বললা না? খুবই সিলি একটা কথা। জলপাই কালারের ড্রেস কিন্তু বার্মার সৈন্যদেরও ইউনিফর্ম!!'

মাসুদের কণ্ঠ স্তিমিত হয় মেসবাহর উত্তরে, কিন্তু সেটা থামে না। 'কিন্তু তুমি কি সত্যিই বিশ্বাস করো যে রক্ষীবাহিনী সবরকম বিতর্কের ঊর্ধ্বে? সবখানেই শোনা যাইতেছে আওয়ামী লীগ ছাড়া অন্য দলের লোকেদের উপরেই মহড়া নিচ্ছে

রক্ষীবাহিনী। মেইন টার্গেট করতেছে বামপন্থি ছেলেদের। ছেড়ে দিচ্ছে সরকারি দলের দুর্নীতিবাজদের...'

'দ্যাটস আ ভ্যালিড পয়েন্ট।' আরেকটা ছেলে বলে এবার। 'এই কথাটায় কিন্তু কিছুটা সত্যটা আছে, মানতেই হবে। মেইনলি করাপ্ট পলিটিশিয়ানেরাই এজন্যে দায়ী মনে হয়। এখন তো শুনি সরকারের পেটোয়া বাহিনী বলেও কেউ কেউ ডাকছে রক্ষীবাহিনীকে।'

'সেই সম্ভাবনা আমিও উড়িয়ে দিচ্ছি না।' মেসবাহ বলে। 'কিন্তু তাই বলে রক্ষীবাহিনীকে ভারত নিয়ন্ত্রণ করছে, এই ধরনের কথা মানতে যথেষ্টই আপত্তি আছে আমার। ভারতের সেনাদের যদি আমাদের দেশে ঢোকার ইচ্ছা এতটাই বেশি থাকবে, তাহলে ইন্দিরা গান্ধী কেন সব সৈন্য বঙ্গবন্ধুর মুখের কথায় প্রত্যাহার করে নেবে বলতে পারো!'

'একজ্যাক্টলি!' তারেকুল আলম আড্ডায় অংশ নিচ্ছিলো না এতক্ষণ, অর্ডার দেয়া চায়ে বিস্কুট ডুবিয়ে চুমুক দিচ্ছিলো কেবল। 'গত কয়েক মাসে দেশে অনেক কিছু ঘটে গেছে। শেখ সাহেব দেশে ফিরেই কিন্তু রেসকোর্সে বলছিলেন, তিন বছর তোমাদের কিছু দিতে পারবো না। অথচ এক বছর যাবার আগেই কেউ কেউ এখন সব কিছুর জন্যে শেখ সাহেবকে দায়ী করছে। তাকেই দোষী হিসেবে দেখাচ্ছে।

অথচ খেয়াল করো, নতুন জাতি হিসেবে আমাদের জন্যে যেটা খুবই বড় সমস্যা হয়ে উঠতে পারত; মানে আমাদের দেশে ইন্ডিয়ান আর্মির তাঁবু গেড়ে থাকাটা, এই বিশাল ব্যাপারটা কিন্তু খুব সহজেই মিটে গেছে। বঙ্গবন্ধুর মুখের কথাতেই ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশ থেকে তার সমস্ত সৈন্য প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। একটা দেশের সীমানা থেকে অন্য আরেকটা দেশের আর্মি, তারা যতই বন্ধুর মতো আচরণ করুক, এত সহজে চলে যাবে, এই ব্যাপারটা যে কী পরিমাণ অবিশ্বাস্য, সেটা কেউ ভেবে দেখছো? শেখ মুজিবের মতো পার্সোনালিটি ছাড়া এটা সম্ভবই ছিল না!'

'শুধু শুধু কী আর সৈন্য উঠায়ে নিছে নাকি! ২৫ বছর মেয়াদি যে চুক্তি হইছে বাংলাদেশ আর ভারতের মাঝে সেই চুক্তিতে কী লেখা হইছে, সেইটা তো আমরা কেউ জানি না। হয়তো এইটা এক ধরনের গোপন বোঝাপড়া!' মাসুদ তার তীব্র আওয়ামী লীগ বিরোধী ইমেজ অক্ষুণ্ন রাখে এবারও।

কাছেই বস্তিতে কী একটা শোরগোল ওঠে। সেই শব্দ চাপা পড়ার আগে খানিক কথা বন্ধ রাখতে হয় ওদের। খোরশেদ এই ফাঁকে কুন্নু মিয়াকে আঙুল দেখিয়ে আরো তিনটা চায়ের অর্ডার দেয়। সামনে রাখা বয়াম খুলে সে গোটা দুয়েক নানখাটাই বিস্কুট হাতে নেয়। তারপর কথা বলে।

'মাসুদের কথাবার্তা দেখি দিন দিন মওলানার মতো বেলাইনে চলে যাইতেছে!'

তারেকুল আলম বলে, 'মওলানার সব কাজই কিন্তু উড়িয়ে দেয়ার মতো না। খাবারের দাম যেভাবে বাড়তেছে; তাতে করে উনি যেই ভুখা মিছিল করলেন; সেটার প্রতি কিন্তু আমার সাপোর্ট আছে।'

'তা থাকুক।' খোরশেদ বলে। 'কিন্তু ইদানীং মওলানার মাঝে বিপজ্জনক সব কন্ট্রোভার্সি দেখা দিতাছে। আমার সাথে তো অল্প বিস্তর খাতির আছে, আমি ঠিকই বুঝতে পারি। তোমরা জানো কি না জানি না, যুদ্ধের শেষ দিকে ইন্দিরার কাছে চিঠি লিখে হুজুর ভারতের সাথে বাংলাদেশ ফেডারেশন গঠনের প্রস্তাব দিছিলেন। অথচ কী অদ্ভুত ব্যাপার দেখো, এখন উনিই মুসলিম বাংলা নামের নতুন ধুয়া তুলতেছেন।'

'এই মুসলিম বাংলা নামটা গত কয়েকদিন ধরে বেশ কানে আসতেছে কিন্তু। আমারে একটু খুইলা বলোতো বিষয়টা।' চশমাপরা ছেলেটা বলে।

'পেপার তো মনে হয় খুলেই দেখো না আজকাল।' মেসবাহ বলে। 'হক কথা'র নাম শুনেছো? মওলানা ভাসানী একটা সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করেছেন এই নামে; আর তাতে দেদারসে বর্তমান সরকারের দোষ গাওয়া হচ্ছে। তা হোক, গণতান্ত্রিক রীতিতে সরকারের দোষ নির্দেশ করাটা সুস্থ রাজনীতির জন্যেই দরকার। সমস্যা হচ্ছে, মওলানার অধিকাংশ প্রচারণা তীব্র ভারতীয় বিদ্বেষে ভরপুর। একটা বিশেষ সুরে যেন এই বিদ্বেষ ছড়ানো হচ্ছে, কিসের লক্ষণ এটা বুঝতেই পারো...

আর সেদিন পেপারে দেখলাম, অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দীন বলেছেন গত একমাস ধরে ঢাকা থেকে মনিটর করা পাকিস্তান রেডিওর বক্তব্য আর বেশ কিছু সাপ্তাহিক পত্রিকার বক্তব্য হুবহু একই। এটা যে একই মহলের কাজ, বুঝতে সমস্যা হয় না। এই সব লোকেরা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ব্যবহার করে আমাদের মাঝে বিভেদ তৈরি করতে চাচ্ছে। মুসলিম বাংলা কায়েমের চেষ্টা তারই অংশ।'

মেসবাহর গোছালো বক্তব্যে তারেকুল আলম মুগ্ধ হয়। তার মনে পড়ে, লন্ডনে থাকা বড় ভাই নুরুল আলমও তাকে এই রকম একটা কিছু বলেছিল। লন্ডন থেকে প্রকাশিত 'সংগ্রাম' নামের একটা পেপারও নাকি এই মুসলিম বাংলা নিয়ে জোর প্রচারণা চালাচ্ছে। তারেকুল আলম মনে মনে বেশ হতাশ হয়ে পড়ে। মওলানা ভাসানীর দেশপ্রেম নিয়ে তার সন্দেহ নেই। কিন্তু পাকিস্তানপন্থি যে রাজনীতিক দলগুলোর মূল উপড়ানো যায়নি, জামায়াতে ইসলামী-নেজামে ইসলাম-পিডিপি যেমন, তারা বেশ কৌশলে মওলানার ছায়ায় একত্রিত হচ্ছে এখন।

'কুন্নু মিয়া, আরেকটা চা দ্যাও! আর মোট কত হইছে কও।' খোরশেদ গলা ছেড়ে আদেশ দেয়। এরপর উঠতে উঠতে সে চশমাপরা ছেলেটির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'মামুন, হলিডে পত্রিকা পড়ো? জিয়াউদ্দীনের লেখাটা পড়ছো?'

মামুন কিছু বলার আগেই আবার মুখ খোলে মেসবাহ। 'ডিসগাস্টিং। সশস্ত্র বাহিনীতে চাকরি করা অবস্থায় কোনো দায়িত্বশীল লোকে এই রকম প্রবন্ধ লিখবে সেটা ভাবাই যায় না।'

মেসবাহর এই মন্তব্য আকর্ষিত করে অন্যদের। 'ক্যান, কী লিখা হইছে ওইখানে?'

'জিয়াউদ্দীন ঢাকা ব্রিগেডের কমান্ডার, র‍্যাঙ্কে লেফটেন্যান্ট কর্নেল। হিডেন প্রাইজ নামে উনি একটা প্রবন্ধ লিখেছেন কিছুদিন আগে। তার দাবি অনুযায়ী, ইন্দিরা-মুজিবের মাঝে যে ২৫ বছর মেয়াদি চুক্তি হয়েছে, তাতে নাকি অনেক গোপন শর্ত আছে। প্রবন্ধে আরো বলা হয়েছে, সদ্য স্বাধীন দেশে সবার মাঝে যে জাগরণের জোয়ার আসে, বাংলাদেশে সেটা না হয়ে হয়েছে উলটো। বাংলাদেশের স্বাধীনতা এখন দেশের জনগণের জন্যে বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানুষের এখন পেট বাঁচানোই দায়...

এখানেই শেষ না, জিয়াউদ্দীন তার প্রবন্ধের শেষ করেছেন শেখ মুজিবের দিকে একটা আক্রমণাত্মক মন্তব্য করে। লিখেছেন, উই ফট উইদাউট হিম এন্ড ওন। ইফ নিড বি, উই উইল ফাইট এগেইন উইদাউট হিম!'

'ইন্টারেস্টিং!' মামুন বলে। 'শেখ সাহেবের প্রতিক্রিয়া কী?'

খোরশেদ বিল মিটিয়ে দিয়ে সবাইকে উঠে পড়তে ইশারা করে হাত দিয়ে। 'আরে কী আজব! ভুইলা গেলা নাকি যে বঙ্গবন্ধু দ্যাশে নাই? উনি না গলব্লাডার অপারেশন করতে দেশের বাইরে গেলেন! উনি আসুক আগে। তারপর দেখা যাইবো।'

তারেকুল আলম তার চা তখনো শেষ করেনি পুরোপুরি। ঐ অবস্থাতেই সে উঠে পড়ে। তার মাথায় চিন্তার কালবৈশাখী। বর্তমান সেনাপ্রধান শফিউল্লাহর সাথে আলাউদ্দীনের খাতির আছে। সেই সুবাদেই ক্যান্টনমেন্টে প্রায়ই যাতায়াত করে আলাউদ্দীন। আর সে সূত্রে বেশ কিছু কথা কানে এসেছে তারেকের।

সেনাবাহিনীতে নানা কারণে চাপা বিক্ষোভ, অসন্তোষের উপস্থিতি আছে। কাকুলের মিলিটারি একাডেমিতে জিয়াউর রহমান আর শফিউল্লাহ কমিশন পেয়েছিলেন একসাথে, কিন্তু ফলাফলের কারণে সিনিয়রিটি পেয়েছিলেন জিয়াউর রহমান। তাকে বাদ দিয়ে জুনিয়র শফিউল্লাহকে সেনাপ্রধান করায় বেশ অবাক হয়েছে অনেকেই। আবার রক্ষীবাহিনীর ভারত থেকে আনা পোশাক, তাদের ট্রেনিং এ মেজর ওবানের উপস্থিতির কারণেও ক্ষিপ্ত একটা অংশ। জিয়াউদ্দীনের

এই প্রবন্ধ সেইসব সেনাক্ষোভের প্রথম বহিঃপ্রকাশ হতে পারে। তারেকুল আলম শুনেছে, জিয়াউদ্দীন তার আন্ডারে থাকা অফিসারদেরও মাঝেই মাঝেই উত্তেজিত করে তোলেন এসব প্রসঙ্গে কথা বলে।

তারেকুল আলমেরা এই মুহূর্তে যেটা জানে না, সেটা ইতিহাস জানবে অচিরেই। প্রবন্ধ লেখার দায়ে শেখ মুজিবের কাছে ক্ষমা চাইতে অস্বীকৃতি জানাবেন জিয়াউদ্দীন। তারপর আর্মি ছেড়ে যোগ দেবেন সিরাজ শিকদারের সর্বহারা পার্টিতে। সুশৃঙ্খল জীবন যাপনে অভ্যস্ত এক সেনা সদস্য, জুটে যাবেন সর্বহারাদের সাথে, গেরিলা আক্রমণে, থানা-পুলিশ ফাঁড়ি হামলা আর অস্ত্র লুটে স্বাধীন দেশের সরকারকে ব্যস্ত রাখছে যারা।

সেনাসদস্য জ্বালাময়ী প্রতিবেদন লিখছে জাতির জনকের বিরুদ্ধে, স্বাধীনতার শত্রুরা সংগঠিত হবার ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছে স্বাধীনতা নিয়ে আসা মানুষদের, এরকম সব কুহকী ঘটনায় অদ্ভুত দিন কাটছে বাংলাদেশের। এ এক সর্পিল সময় যেন। একালে বাংলাদেশের মানুষ প্রথম দেখছে অনেক কিছুই, বহু কিছুই পরে দেখবে না আর।

ডুয়েল যখন ম্যাকনামারা'য়

ম্যাকনামারা বেশ কিছু প্রশ্ন করলেন। জিজ্ঞাসা করলেন বাংলাদেশ কী কী চায়। জানতে চাইলেন বারে বারে; জাতীয়করণ আর সমজাতান্ত্রিক ধারণায় সমন্বয় ঘটাতে চাইছে বাংলাদেশ, সেখানে এই ঋণগুলো ব্যবহার হবে কী করে?

আবু সাইদ চৌধুরী বেশ স্বস্তির সাথে দেখলেন, তাজউদ্দীন সমস্ত প্রশ্নের জবাব দিলেন বেশ গুছিয়ে। বললেন, বিদ্যুৎ-কৃষি-পানি খাতে সাহায্য পেলে বাংলাদেশ এখনই তাদের কাজ শুরু করতে পারে। আর জাতীয়করণ ব্যবস্থার এমন একটা রূপরেখা তাজউদ্দীন দিলেন, যেটায় বলা হলো বৈদেশিক ঋণ ব্যবহার করে বাংলাদেশের অর্থনীতি প্রথমে পুনর্গঠিত হবে, তারপরে উঠে দাঁড়াবে নিজ পায়ে।

মিটিং শেষে ম্যাকনামারা যখন বেরিয়ে গেলেন, তার মুখ দেখে কিছুই আঁচ করা গেল না।

প্ল্যানিং কমিশনের সদস্য আর অর্থসচিবদের জন্যে বিশ্বব্যাংক একটা অফিশিয়াল ডিনার পার্টি দেয়। ম্যাকনামারার সাথে বৈঠক শেষে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে নুরুল ইসলাম আর মতিউল ইসলাম চলে গেলেন সেই ডিনারে যোগ দিতে। আবু সাইদ চৌধুরী আর তাজউদ্দীন রয়ে গেলেন হোটেলেই, সেখানে ততক্ষণে এসে জুটেছেন আবুল মাল আবদুল মুহিত।

মুহিত ওয়াশিংটনে আছেন অনেকদিন হয়ে গেল, তাজউদ্দীন তাই তাকেই বলেন, 'মুহিত সাহেব, ডিনারের অর্ডারটা আপনিই দিয়ে দেন। আপনি তো এখন প্রায় এই দেশি লোক!'

খাবার চলে আসে খানিক পর। তাজউদ্দীন রিচ ফুড বেশি খেতে পারেন না। তিনি স্যুপটা খেলেন, সাথে সবজিগুলো মোটামুটি মুখে তুললেন। ডিনার শেষ হয় প্রায় নিঃশব্দেই। এরপরে তারা অপেক্ষা করতে লাগলেন নুরুল ইসলাম আর মতিউল ইসলামের জন্যে।

'চৌধুরী সাহেব, কী মনে হয়, ঠিক মতো অনুদান পাওয়া যাবে?' অর্থমন্ত্রী যেন আবু সাইদ চৌধুরীকে নয়, নিজেকেই একটু জোরে প্রশ্ন করেন।

'ইনশাল্লাহ স্যার। আমরা আমাদের প্রয়োজনটা ঠিক মতোই ব্যাখ্যা করেছি। এখন দেখি, কী হয়।' সাইদ সাহেবের উত্তর শুনে তাজউদ্দীন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন।

আবু সাইদ চৌধুরীর মায়া হয় মানুষটির জন্যে। গত কমাসে তিনি তাজউদ্দীনকে যা চিনেছেন, তাতে বোঝা যায় বৈদেশিক সাহায্যের উপর তার আস্থা খুব উঁচু নয়। অর্থমন্ত্রীর দৃঢ় ধারণা তেমন সাহায্য দেশে নিয়ে আসে শোষণ আর পরনির্ভরতা। ঋণের শর্ত একসময় ভারী হয়ে এঁটে বসে দেশের ভেতরের রাজনীতির মাঝেও। কিন্তু আট নয় মাস আগের সেই একগুঁয়ে মানুষটি অনেকটা পালটে গেছেন এতদিনে। বাস্তববাদী তাজউদ্দীনকে আসলে বদলে দিয়েছে নতুন দেশের ভেঙে যাওয়া অর্থনীতির জটিল রসায়ন। বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে বিশ্বব্যাংক কী ধরনের ভূমিকা রাখতে পারে, বিশ্বব্যাংকের সাহায্য নিলে দেশ কীভাবে এগোতে পারে সেটার একটা ধারণা তাজউদ্দীন করে নিয়েছেন এতদিনে। বিশ্বব্যাংকের বার্ষিক সভায় যোগ দিতে এই ওয়াশিংটনের আসাটা সে কারণেই। বিশ্বব্যাংক প্রেসিডেন্ট ম্যাকনামারার সাথে সাক্ষাৎও তাদের সফরসূচির অংশ।

ম্যাকনামারার কথা মনে হতেই আবু সাইদ চৌধুরী একত্রে কৌতুক আর শঙ্কা বোধ করেন। তিনি জানেন, আজকের আগে তাজউদ্দীন আর ম্যাকনামারার প্রতিটি সাক্ষাৎপর্বই রূপ নিয়েছিল ডুয়েল ম্যাচে।

প্রথম ডুয়েল বছরের শুরুর দিকে, দিল্লিতে। রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসেবে ম্যাকনামারা আর তাজউদ্দীন, দুজনেই তখন ভারতের দিল্লিতে। মুঘল দিনের লাল কেল্লা যখন সাউন্ড অ্যান্ড লাইট শো'র জন্যে আলো ঝলমল, ইন্দিরা গান্ধীর দুই বিশিষ্ট অতিথি তাজউদ্দীন আর ম্যাকনামারা তখন পাশাপাশি আসনে বসে আছেন। ম্যাকনামারার সাথে কথা বলার জন্যে যেখানে উদগ্রীব হয়ে থাকেন দুনিয়া জোড়া রাষ্ট্রপ্রধানেরা, সেখানে আশ্চর্য ব্যাপার– তাজউদ্দীন ম্যাকনামারার

সাথে তো কথা বলেনইনি, উপরন্তু অনুষ্ঠানের পুরো সময়টাই মুখ ঘুরিয়ে রইলেন উলটো দিকে!

দ্বিতীয় দ্বৈরথ আরো নাটকীয়। দিল্লি থেকে ম্যাকনামারা সরাসরি চলে এলেন বাংলাদেশে। বাংলাদেশ তখনো বিশ্বব্যাংকের সদস্যপদ পায়নি, কী করে সেই প্রক্রিয়া তরান্বিত করা যাবে, বাংলাদেশ কীভাবে কত দ্রুত উপকৃত হতে পারে বিশ্বব্যাংক থেকে; ম্যাকনামারা তাই নিয়েই আলোচনা করতে চান। শেখ মুজিবের সাথে প্রাথমিক আলোচনার পরে ম্যাকনামারা তাজউদ্দীনকে নিয়ে আলোচনায় বসেন। উপস্থিত তৃতীয় ব্যক্তি নুরুল ইসলাম, তার কাছ থেকেই ঘটনাটা পরে জেনেছেন আবু সাইদ চৌধুরীরা।

'অর্থনৈতিক পুনর্বাসনে কী কী সাহায্য দরকার বাংলাদেশের?' ম্যাকনামারা প্রশ্ন করেন।

তাজউদ্দীন গম্ভীর স্বরে জবাব দেন, 'আমাদের যা দরকার তা আপনি দিতে পারবেন কি না; এই নিয়ে সন্দেহ আছে মিস্টার ম্যাকনামারা।'

ম্যাকনামারা অবাক স্বরে বলেন, 'মিস্টার মিনিস্টার, আপনি বলুন। আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করবো!'

তাজউদ্দীন গলার স্বর হিমাঙ্কে নামিয়ে বলেন, 'আমাদের প্রথম চাহিদা হচ্ছে গরুর দড়ি আর গরু। ... বুঝলেন না, আরে আমাদের উপর পাকিস্তান তো যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়ে খালাস। যুদ্ধের সময় কৃষকেরা সব পালিয়ে গেছে, তাদের গরুগুলো মারা গেছে, দড়ি ছিঁড়ে এদিক সেদিক পালিয়ে গেছে। এখন যুদ্ধ শেষে চাষিরা সব ফেরত এসেছে ঠিক, কিন্তু গরু তো নাই। কৃষিভিত্তিক দেশ আমরা, আমাদের তাই সবার আগে দরকার গরু আর সেই গরুগুলো বেঁধে রাখার জন্যে দরকার শক্তপোক্ত দড়ি!'

ম্যাকনামারা হতভম্ব!! আর নুরুল ইসলাম এই অদ্ভুত কথোপকথনে বাকহীন। তিনি কেবল মাথা চুলকে এদিক ওদিকে তাকান, গলা খাঁকারি দেন।

তাজউদ্দীন তখন নিজেই বলেন, 'অবশ্য বিশ্বব্যাংক তো আর গরুর দড়ি দিতে পারবে না, তাই অন্যান্য বিষয় নিয়েই আমাদের আলোচনা করা উচিত।'

এরপরে মিটিং চলে, শেষও হয়। বৈঠকের শেষে নুরুল ইসলাম তাজউদ্দীনকে জিজ্ঞাসা করেন, 'এমন কেন করলেন?'

তাজউদ্দীন নাকি দারুণ উত্তেজিত ছিলেন। গরম স্বরে বলেন, 'কেন করলাম বুঝেন না? এই লোকটা তো আমেরিকার ডিফেন্স সেক্রেটারি ছিল! আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে ধ্বংস করে দিতে চেয়েছে ওরা। সেভেন্থ ফ্লিট পাঠিয়ে আমাদের স্যাবোটাজ করতে চেয়েছে!'...

বর্তমানে ফিরে এসে আবু সাইদ চৌধুরীকে ভাবনায় ছেদ টানতে হয় এ সময়। পেছনে তাজউদ্দীনের হতাশ স্বর শোনা যাচ্ছে। 'চৌধুরী সাহেব, আমাদের

সমস্যা কী জানেন? সমস্যা হচ্ছে, কিছুতেই মানুষের প্রত্যাশার লাগাম টেনে ধরা যাচ্ছে না। প্রত্যাশা না কমালে কিছুতেই কিছু হবে না।'

জানালার পাশে দাঁড়িয়ে ওয়াশিংটনের ব্যস্ত সন্ধ্যা দেখতে থাকা তাজউদ্দীনের কথায় কেমন যেন আক্ষেপ ঝরে ঝরে পড়ে। সেই নিরানন্দ উচ্চারণে আবু সাইদ চৌধুরী নিজেকে তাজউদ্দীনের জায়গায় বসিয়ে দেখতে চান। তাজউদ্দীন মিশে ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের প্রতিটি স্রোতের সাথে, কাজেই মার্কিনদের ভূমিকার জন্যে তিনি যদি ম্যাকনামারার প্রতি বিরূপ ভাব পুষে রাখেন, সেই জন্যে তাকে আসামির কাঠগড়ায় তোলা কি যুক্তিসঙ্গত? ...আর ম্যাকনামারা, তার অবস্থানটাই বা কোথায়? তাজউদ্দীনের শীতল আচরণের কারণে কি তিনি প্রভাবিত করতে পারেন বিশ্বব্যাংক বা মার্কিনদের সাহায্য নীতি?

আবু সাইদ চৌধুরীর এই প্রশ্নের উত্তর দিতেই যেন দরজা ঠেলে ঘরে ঢোকেন নুরুল ইসলামেরা।

'স্যার, আপনি তো জাদু দেখায়ে দিলেন! ম্যাকনামারা তো তাজউদ্দীন বলতে পাগল হয়ে গেছে! আপনার সে কী প্রশংসা!' মতিউল ইসলামের স্বর নামতে চায় না আনন্দে।

তাজউদ্দীন, আবু সাইদেরা চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকান। মুহিত তো বলেই ফেলেন, 'বলেন কী! ম্যাকনামারা তো খুব রিজার্ভড টাইপ লোক। সহজে তো সে কারো প্রশংসা করতে চায় না।'

নুরুল ইসলামের গলায় উচ্ছ্বাস। 'আরে উনি যে কী ইম্প্রেসড স্যারের কথা শুনে। বললেন, বিশেষজ্ঞ অর্থমন্ত্রী না হয়েও মিস্টার তাজউদ্দীনের যে চিন্তাধারা আর সেই চিন্তার যেরকম স্মার্ট উপস্থাপন; উনি নিশ্চয়ই বাংলাদেশের জন্যে খুব ভালো অর্থমন্ত্রী হবেন।'

সফল সফরে ঈষৎ হর্ষ বোধ না করে পারে না কেউই, মুখের হাসি আপনা থেকেই চওড়া হয়ে যায় সকলের। তাজউদ্দীনের হাসি কিন্তু হ্রস্ব, সেই মিটমিটে রূপে। আবু সাইদের মনে হয়, তাজউদ্দীন আজকাল আগের চাইতে গম্ভীর হয়ে গেছেন, খুব বেশি তিনি হাসতে চান না।

মুকুট নামের মানুষ

আব্বুর ওইদিনের হাসিটা রিমিরও আজকাল বেশ মনে পড়ে। কেমন বুকের ভেতর থেকে উঠে আসা একটা আনন্দ মিশে ছিল ওই হাসিটায়! সেই বঙ্গভবন, সেই দরবার হলের ডানদিকের সামনের সারিতে ওদের বসে থাকা, সেই জানুয়ারির সকাল, রিমি সেগুলো ভোলে কী করে!!

আব্বু তো সেদিন বলতে গেলে অস্থির ছোট বাচ্চাদের মতোই এদিক-সেদিক ছুটে বেড়াচ্ছিলো। ঘুরে ঘুরে কথা বলছিল সবার সাথে। কেবল মাঝে মাঝে ওদের পাশে এসে বসছিল, তাও অল্প কিছু মুহূর্তের জন্যেই। যুদ্ধের মাঝে তৈরি হওয়া মন্ত্রিসভা পদত্যাগের পরে মুজিব কাকু যখন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন, তখন সাংবাদিকেরা যেন ঘিরে ধরল আব্বুকে। জিজ্ঞেস করল আব্বুর কী মনে হচ্ছে।

রিমির এখনো মনে পড়ে, আব্বু এক বুক গর্বের সুরে বলেছিল, 'আজ? আজ তো আমি পৃথিবীর মাঝে সবচাইতে সুখী মানুষ! ...আমরা পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র চেয়েছিলাম, আমাদের নেতা সেই পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র গ্রহণ করেছেন। আমাদের মুজিবনগর সরকার তো বঙ্গবন্ধুরই সরকার ছিল।'

পত্রিকার পাতা উলটে উলটে রিমি আজকাল আব্বুকে নিয়ে লেখা খবরগুলো বারবার পড়ে। পত্রিকা পড়তে খুব তার ভালো লাগে। বাসায় বেশ কয়েকটা পেপার আসে, রিমি সকালে স্কুলে যাবার আগে নিয়ম করে প্রত্যেকটার প্রথম পাতাটা দেখে যায়। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পত্রিকা পড়া হয় স্কুল থেকে ফেরার পর।

পত্রিকার পাতায় পরিচিত কাউকে নিয়ে লেখা খবর পড়াটাও এক অভিজ্ঞতা। একদম চেনাজানা মানুষকেও খবরের কাগজের বর্ণনায় অন্যরকম লাগে। অনেকটা যেন অন্য কারো পাওয়ারওয়ালা চশমা দিয়ে আয়নায় নিজেকে দেখার মতো। পত্রিকার খবর পড়ে রিমি প্রতিদিন তার আব্বুকে নতুনভাবে আবিষ্কার করে।

ঘুম থেকে আব্বু ওঠেন বেশ সকালে। এরপর পেপার পড়েন, মাঝে মাঝে ডায়েরিও লেখেন। গতবছর যুদ্ধের সময় মিলিটারিরা ওদের বাসার সব জিনিস নিলামে বিক্রি করে দিয়েছিল, যুদ্ধের পরে তাই হারিয়ে গেছে রিমি-রিপিদের অনেকগুলো বই। আব্বুর প্রিয় বইগুলো তো গেছেই, সাথে হাতছাড়া হয়েছে আব্বুর নিজ হাতে লেখা ডায়েরিগুলোও। এই অল্প কিছুদিন আগে আব্বুর একজন বন্ধু পল্টনের পুরাতন বইয়ের দোকান থেকে আব্বুর একটা ডায়েরি উদ্ধার করে এনেছেন। আঠারো বছর আগেকার ডায়েরি। বাকি ডায়েরিগুলোর আর খোঁজ পাওয়া যায়নি।

আব্বু এখন আসলেই অনেক ব্যস্ত থাকেন। সকালে উঠেই সেই যে অফিসে যান, ফেরেন একেবারে সন্ধ্যা পেরিয়ে যাওয়ারও অনেক পরে। দুপুরে ফেরেন খুব অল্প দিন। আব্বুকে আজকাল প্রায় পাওয়া যায় না বললেই চলে, রিমিরা শেষবার তাকে কয়েকদিনের জন্যে কাছে পেয়েছিল গ্রামের বাড়ি দরদরিয়ায়। সেটা মনে হয় ফেব্রুয়ারির ঘটনা।

সেবারই প্রথম গাড়িতে করে দরদরিয়ায় গেছিল রিমিরা। শীতলক্ষা নদীর পশ্চিম দিকে গোসিংগা বলে যে ঘাট আছে, সেদিক দিয়ে নদী পার হয়ে ওরা বাড়ি পৌঁছেছিল।

তখন আমের মৌসুম। রিমি-রিপির খুব মজা। ওরা লবণ জোগাড় করে কাঁচা আম পেড়ে খাচ্ছে, আর এদিক-সেদিক ঘুরোঘুরি করছে সমানে। যুদ্ধের সময় পাকিস্তানি আর্মিরা এদিকেও এসেছিল। যাবার আগে পুড়িয়ে দিয়ে গেছে ওদের দাদুর বাড়ির একদিক। টিনের বাড়িটা কেমন ভুতুড়ে দেখাচ্ছিলো।

আব্বুকে ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকা ভিড়ের মাঝ থেকে একজন হঠাৎ করে বলেছিল, 'আর চিন্তা কী! আমগো তাজু ভাই এখন মন্ত্রী হইছেন, পোড়া ভিটায় এইবার নতুন বাড়ি উঠবো!'

তখনই সাধারণ আলাপের স্বর থেকে গলাটা কেমন বদলে গিয়েছিল আব্বুর। 'কেন, মন্ত্রী হয়েছি বলেই নতুন ভিটা তুলতে হবে নাকি? শোনেন, যতদিন যুদ্ধে ঘর হারানো সব মানুষ মাথা গোঁজার ঠাঁই পাবে না, ততদিন এই ভিটায় কোনো বাড়ি উঠবে না...'

রিমিরা সে মুহূর্তে জানে না, তাজউদ্দীনের জীবনকালে এই আধপোড়া বাড়ির রূপ পাল্টাবে না। রিমিরা কেবল জানে, অপ্রস্তুত হয়ে যাওয়া গ্রামের মানুষদের সামনে আব্বু সেদিন আরো বলেছিলেন, 'মনে রাখবা, তাজউদ্দীন শুধু এই এলাকার মন্ত্রী না, সে বাংলাদেশের মন্ত্রী। তার দায়িত্ব বাংলাদেশের জন্যে কাজ করা। খালি স্বার্থপরের মতো কাপাসিয়ার উন্নয়ন দেখলেই আমার হবে না। পুরা দেশেই আমার কাজ করবার আছে।

বাড়িতে যখন মেহমান আসে, আপনারা তখন কী করেন? তারে আদর যত্ন করেন, সবচেয়ে ভালো খাবারটা তারে দেন, তার জন্যে নতুন বিছানার চাদরটা দেন। এরপরে যেটা থাকে, সেইটা নিজেরা নেন। দেশকেও আপনাদের নিজের বাড়ির মতন দেখতে হবে। দেখবেন, তাহলে আর এই এলাকা এমনিতেই পিছায়ে থাকবে না।'

কাপাসিয়ার লোকেরা তাদের প্রিয় তাজু ভাইকে সেদিন গণসংবর্ধনা দেয়, তার উপাধি দেয়া হয় 'বঙ্গতাজ'।

তাজ মানে যে মুকুট, সেটা রিমি অনেক আগেই জানে। আব্বুকে রিমি মনে মনে তাই মুকুট বলেও ডাকে মাঝে মাঝে। আব্বুর সততা, কখনো অন্যায়ের সাথে আপস না করা, এইসব গুণের কারণে তাকে মুকুটের মতো রাজকীয় একজন মানুষ ভেবে রিমি মনে মনে গর্বিত না হয়ে পারে না।

পত্রিকা পড়তে পড়তে রিমি হালকা একটা সুগন্ধ পায়। খানিক পরেই ব্রাইল ক্রিমের গন্ধটা চিনে ফেলে সে। আব্বুর বিলাস বলতে তো ঐটুকুই, চুলে ব্রাইল ক্রিম দিতে তিনি খুব পছন্দ করেন। সকালে আব্বু যখন সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে যায়, এই সুগন্ধটা তখন আলাভোলা বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে।

সব চিন্তা ফেলে রেখে রিমি আবার পত্রিকায় মন দেয়। ইত্তেফাক পত্রিকার কচিকাঁচার আসরে সেদিন রিপির একটা গল্প ছাপা হয়েছিল। এক শহিদ

মুক্তিযোদ্ধা আর তার মাকে নিয়ে গল্প। রিপির আনন্দ সেদিন দেখে কে! বাড়িতে কেউ এলেই রিপি তাকে সেই পেপার কাটিং দেখিয়ে বেড়ায়। আম্মা মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, 'এই সেদিনের রিপি, এত্তোটুকু বাচ্চা ছিল, সেও আজকে লেখিকা হয়ে গেল!'

...যা খুঁজছিল, রিমি সেটা পেয়ে গেল পত্রিকার মাঝের দিকে। আব্বুর ওয়াশিংটন সফরের একটা বড়সড় বর্ণনা এসেছে অর্থনীতির খবরে। রিমি কাঁচি দিয়ে সুন্দর করে সেটা কাটতে শুরু করে। কেউ জানে না, রিমির একেবারেই নিজস্ব একটা খাতা আছে। আব্বুকে নিয়ে যা যা খবর আর ছবি উঠে আসে পেপারে, রিমি সেগুলো আলাদা করে সেঁটে রাখে সেই খাতায়। রিমির ইচ্ছে, বড় হয়ে সে এই খাতা দিয়ে একটা বই বের করে ফেলবে। বইয়ের নামটাও সে ঠিক করে রেখেছে মনে মনে। মুকুট নামের মানুষ।

গভীর মনোযোগে রিমি পত্রিকার পাতায় কাঁচি চালাতে থাকে।

মঞ্চের নয়া কুশীলব

হলের বড় ভাইদের মুখে শোনা, এক সময় নাকি এখানে বিছানায় শুয়েই রেলগাড়ি চলার আওয়াজ কানে আসত। কু-ঝিকঝিক, কু-ঝিকঝিক। তারপর ফুলবাড়িয়া স্টেশন বন্ধ হয়ে গেল, উঠে গেল রেললাইনটাও। এখন তাই রাতে বেশ শুনশান থাকে, মাঝে মাঝে পলাশীর দিক থেকে হয়তো ক্ষণিকের জন্যে [illegible] শোরগোল ভেসে আসে, তবে সেটা অস্পষ্টই থাকে।

তারেকুল আলম বিছানায় শুয়ে আড়মোড়া ভাঙল, গোসল করতে যেতে আজ ইচ্ছে করছে না। কাল গভীর রাত পর্যন্ত বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিয়েছে হলের ক্যান্টিনে, আজ বিকেলের আগে তাই সে বেরোবে না। তবে তার বেশ ক্ষুধা পেয়েছে। আবার ঘুমোবার আগে সে নাস্তা খেয়ে আসবে ঠিক করল।

দাঁত মাজা সেরে মুখ ধুয়ে তারেকুল আলম যখন নিচে নামছে, তার চোখ তখন গেল হলের সামনের প্রাঙ্গণে। সাদা রঙের গাড়িটা দেখে সে বুঝে যায় গাড়ির মালিক ধারেকাছেই কোথাও আছে এবং মানুষটির সন্ধানে একটু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আশপাশে নজর করতেই তাকে খুঁজে পাওয়া যায়। সিরাজুল আলম খান ১৬৫ নাম্বার রুমের দরজার বাইরে মাথা দিয়ে মেঝেতে ঘুমাচ্ছেন।

অল্প ক'দিন হলো, স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম বিরোধী দল আত্মপ্রকাশ করেছে। জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল বা জাসদ ডাক দিচ্ছে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের দেশ গড়ার। জাসদের মূল নেতাদের মধ্যে আ স ম রব, শাহজাহান সিরাজ ছাড়াও আছেন রিটায়ার্ড আর্মি পার্সন মেজর জলিল। কিন্তু একটু খোঁজখবর যারা রাখে, তারা জানে, জাসদের মূল তাত্ত্বিক গুরু সিরাজুল আলম খান। লম্বা চুল আর

গোঁফ দাঁড়িতে তাকে দেখায় কার্ল মার্কসের মতোই। ভাবশিষ্যরা সিরাজুল আলম খানকে ডাকে দাদা নামেই।

সিরাজুল আলম খান নিজে গণিতের ছাত্র, কাগজে কলমে ঢাকা হলের। তবু প্রায়ই তাকে এস এম হলে থাকতে দেখা যায়। সলিমুল্লাহ হলে ছেলেদের খালি গায়ে রুমের বাইরে যাবার ব্যাপারে একটা অলিখিত নিষেধাজ্ঞা থাকলেও সিরাজুল আলম খান সেটাকে খুব বেশি পাত্তা দেন না। খালি গায়ে তোয়ালে চাপিয়ে সিরাজুল করিডোর পেরিয়ে গোসলে যাচ্ছেন, এমন দৃশ্য তারেকদের কাছে খুব দুর্লভ নয়।

নাস্তা শেষ করে তারেক রুমের দিকে ফিরছে, এমন সময় সে শুনতে পায় সিরাজুল আলম খানের ডাক। 'এই তারেক! আরে এই তারেক! দেখেও না দেখার ভান করতেছো ক্যান? আরে এইদিক আসো।'

তারেক এগিয়ে যায় নিতান্ত অনিচ্ছায়। এই মুহূর্তে বিছানায় গিয়ে সটান গড়াগড়ি দেয়াটাই তার কাছে সবচেয়ে কাম্য। 'দাদা, কেমন আছেন?'

'আমি আছি ভালোই। তোমার খবর কী? ... তোমরা যুদ্ধফেরত ইয়াং ম্যান, দেশের কাজে এখন আগায়ে যাবা, মানুষের দাবি দাওয়ার পালস বুঝে সেটা আদায় করে নিবা, সব তো এখন তোমাদেরই করতে হবে। সব কিছু দেখো না কেমন পাল্টায়ে যাচ্ছে?'

স্বল্পভাষী সিরাজুলকে যেন বক্তৃতার নেশায় পেয়েছে আজ, সে বলেই চলে। 'কাজেই আমরা যারা একসাথে মুক্তিযুদ্ধ করছি, অন্তত তাদের তো এক হইতে হবে। নতুন পার্টিতে তোমাদের মতো ছেলেদেরই তো আমরা চাই। আমরাও চাই নতুন দেশকে তৈরি করতে। তোমরা আমাদের দিকে আসবা, এইটা তো তোমাদের কাছে আমাদের একরকম দাবি।'

তারেকুল আলম মাথা চুলকায়। ঘুমোতে যেতে বড় ইচ্ছে করছে তার, এমন সময় সিরাজুলের কাছ থেকে এ জাতীয় একটা প্রস্তাব আশা করেনি সে। তদুপরি সে পার্টি পলিটিক্সেও আগ্রহী নয়, বন্ধুদের মাঝে কেবল আলাউদ্দীনেরই ওদিকটায় ঝোঁক। সেই আলাউদ্দীন আপাতত নিখোঁজ, কোনদিকে সে যাবে তা বোঝা যাচ্ছে না। এমতাবস্থায় সিরাজুল তাকে জাসদে যোগ দেবার দাওয়াত দেবে এটা সে আঁচ করেনি।

'না মানে, পলিটিক্স তো আমরা কখনো অ্যাকটিভলি করি নাই দাদা। কিন্তু আপনাদের বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের স্লোগানটা অবশ্য আমার কাছে বেশ ক্যাচি লাগছে। কথা হইলো কী দাদা, শেখ মুজিবের প্রতি এখনো আমার দৃঢ় আস্থা আছে। নতুন দেশ, উনার নানা রকম ভুল হইতেই পারে। তারপরেও আপনারা কেন আসলে উনাদের সাথে না থেকে একটা নতুন কিছু ট্রাই করতেছেন, আমি ঠিক বুঝতে পারতেছি না।'

সিরাজুল ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন। 'তারেক, তোমরা মুক্তিযুদ্ধ করা ছেলেপিলে। তোমাদের মুখে কিন্তু এই কথা মানায় না। সিস্টেমে পচন ধরলে সিস্টেম বদলাতে হবে নিজেকেই। মিরাকলের জন্যে বসে থাকে শুধু বোকারা। ...এই যে, তুমি এইটা খেয়াল করো।' হাত দিয়ে ঘরের কোনার টেবিলটা নির্দেশ করেন সিরাজুল। 'এই যে টেবিলটা, এইটার কয়টা পায়া? চারটা। এখন তুমি বলো, যদি চারটার বদলে এই টেবিলের একটা বড় পায়া থাকত; তখন সেইটা বেশি স্টেবল হইতো, না এখনকারটা বেশি স্টেবল? অবশ্যই চার পা'ওয়ালা টেবিলই বেশি স্থির থাকবে!

এখন খেয়াল করলে দেখবা, জাতীয়তাবাদ-ধর্মনিরপেক্ষতা-সমাজতন্ত্র-গণতন্ত্র, এই চারটা মূলনীতির মাঝে শেখ মুজিব কেবল একটাকে, জাতীয়তাবাদকেই বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন। তাহলে কি সিস্টেমটা টেকসই হচ্ছে, তুমিই বলো?'

চমকপ্রদ এই উদাহরণে মুহূর্ত নিশ্চুপ থাকে তারেক, তার জানার কথা নয় কদিন আগে একই এক্সাম্পলে সিরাজুল ক্ষোভ ঝেড়ে এসেছেন স্বয়ং শেখ মুজিবকেও।

'আসলে কী দাদা, আমি এই মুহূর্তে ঠিক করতে পারি নাই কোনো দল করবো কি না। তবে আপনার কথা আমার ভালো লাগছে। যদি সামনে কোনো পার্টিতে যোগ দিবার বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করি, তাইলে দাদা অবশ্যই আপনার কথা খেয়াল থাকবে। আর আমার ফ্রেন্ড আলাউদ্দীনকে তো চিনেন, ও হয়তো আপনার কথায় এখনই ইন্টারেস্টেড হবে। আমি ওরে বলে দেখবো।'

সিরাজুল আলম খানকে প্রত্যাখ্যানে হতাশ দেখায়। 'আচ্ছা, বইলো। বইলো একটু সময় পাইলে যেন আমার সাথে দেখা কইরা যায়।'

অতএব এস এম হলের এই তাৎক্ষণিক আলাপচারিতা শেষে সিরাজুলের উদ্দেশ্য সাধন হয় না।

কিন্তু জাসদের উদ্দেশ্য আকৃষ্ট করে অনেককে। আওয়ামী লীগের নানামুখী ব্যর্থতায় অনেকের কাছে একটি আকাঙ্ক্ষিত অপশন হয়ে আসে জাসদ। কারো কাছে এটি কেবল আওয়ামী লীগের দলভাঙা অংশ, কারো কাছে এটি নতুন পথে দেশ গড়ার বাহন। বহু তরুণ মুক্তিযুদ্ধের পর দিশা পায়নি কী করে দেশকে গড়বে, বেশুমার মানুষ সরকারে আস্থা হারিয়েছে হিসাবের জাবেদা খাতা মেলেনি বলে। মশাল প্রতীক নিয়ে এইসব সাগরে ভাসা মানুষের কাছে নতুন জেগে ওঠা চর হয়ে আসে জাসদ। তাদের কেউ হয়তো মুজিব বিরোধী, কেউ বা হয়তো ভারত বিদ্বেষী, কেউ হয়তো ঘোরতর বুর্জোয়া কিন্তু মুখে সমাজতন্ত্রের মন্ত্র জপছে। কিন্তু এটাও সত্যি, অনেকেই জাসদে যোগ দেয় দেশ গড়ার স্বপ্ন নিয়ে।

সব মিলিয়ে বাংলাদেশের রাজনীতির মঞ্চে নতুন আগত জাসদ হয়ে ওঠে এক গুরুত্বপূর্ণ কুশীলব। ইতিহাসের যাত্রাপালায় তাদের তাৎপর্য স্পষ্ট করে দেবে সময় নামের অপেরা চালক।

দিকে দিকে সংশয়

শেখ মুজিবুর রহমান সকালে এক কাপ চা খান। সাতটা থেকে সাড়ে সাতটার মাঝে চা খেতে খেতে পত্রিকাগুলো একনজর দেখে যান তিনি। কাপে চুমুক দেন অতি ধীরে। হেডলাইনগুলোতে চোখ বুলাতে যেটুকু সময় লাগে, তার চা খেতেও সময় লাগে ততটুকুই। শেষ খবরের কাগজটা নামিয়ে রাখার সময় তিনি চায়ের কাপে একটা দীর্ঘ চুমুক দেন।

দিনের এই সময়ের পুরোটাই শেখ মুজিব ছোট ছেলে রাসেলের জন্যে বরাদ্দ করেছেন। রাসেল সকালের ঘুম চোখে নিয়ে বিছানায় শুয়ে থাকে, মুজিব তার গা ঘেঁষে পেপার পড়েন। কখনো কখনো ফজিলাতুন্নেসাও থাকেন। সকালে সব কিছু এত পবিত্র লাগে যে সে সময় কাছের মানুষদের ভালোবাসার নামে ডাকতে ইচ্ছা করে। শেখ মুজিব চায়ের কাপ হাতে নিয়ে ফজিলাতুন্নেসাকে মাঝে মাঝে গাঢ় স্বরে 'রেনু' বলেও ডাকেন।

...পত্রিকা পড়ে শেখ মুজিবের মনটা খারাপ হয়ে গেল। বাংলাদেশের কোথাও যেন ভালো কিছু ঘটছে না। সবখানে যেন অন্ধকার, দুর্নীতি, অভাবের হাহাকার। আজকের চা-টা ভালো ছিল, শেখ মুজিবের ইচ্ছা করছে না মন খারাপ করা খবরে মাথা ভারি করে রাখতে। তিনি বিছানা ছেড়ে বারান্দায় গেলেন। বারান্দায় হাসিনার ছেলে জয়কে নিয়ে ফরিদ দাঁড়িয়ে ছিল, তাকে দেখতে পেয়েই মুজিবের ঠোঁটে একটা হালকা হাসি ফুটে ওঠে। ৩২ নম্বরের মাত্র দুই বাড়ি পরেই হাসিনা থাকে, জয়কে তাই প্রায়ই কেউ না কেউ নিয়ে আসে এই বাড়িতে। শেখ মুজিব বারান্দায় চেয়ারে বসে জয়কে দুই হাতে উপরে তুলে ধরেন। জয় হেসে ওঠে, আর শেখ মুজিব সেই নিঃশব্দ হাসি দেখে ভরাট গলায় হাসেন, বলেন, 'ওই রাসেল, কই গ্যালা! দেখো, তোমার ভাইগনা কেমন কইর‍্যা হাসে!!'

খানিক হাসাহাসির পরে জয় নেমে আসে মাটিতে। এবার তাকে কাতুকুতু দেয়ার পালা। শেখ মুজিব খানিক সুড়সুড়ি দেন নাতিকে, এরপর তাকে কৃত্রিম রাগে চোখ পাকিয়ে ঘুষি দেখান। জয় দায়িত্ব পালন করে যায় সমানে সমানে। প্রথমে হাসে, এরপর সেও বঙ্গবন্ধুকে পাল্টা জবাব দেয় ঘুষি উঁচিয়ে।

শেখ মুজিব মনে মনে হেসে ফেলেন। আজকাল সব ব্যাটাই তাকে ঘুষি দেখাচ্ছে, জয়ও আর বাদ যাবে কেন?

রব, সিরাজ, সব সেদিনের ছেলেপিলে; এই ব্যাটারাও আজকাল যা তা বলে বেড়াচ্ছে তার নামে। আ স ম আবদুর রব তো দুইদিন আগেই এক জনসভায় বলে আসল, শেখ মুজিবের সরকার নাকি পাকিস্তানিদের চেয়েও বেশি অত্যাচারী হয়ে উঠছে! এমন মেজাজ খারাপ হয়েছিল তার কথাটা শুনে। এই ব্যাটা রব যতদিন না রাজনীতি করে, তার চেয়ে বেশি সময় শেখ মুজিব জেলেই কাটিয়েছেন। নতুন দেশে একের পর এক সমস্যা দেখা দিচ্ছে দিকে দিকে,

সেইগুলা সমাধান করার জন্যে কোনো নাম-গন্ধ নাই; পারে কেবল সমালোচনা করতে। স্বাধীনতা পেয়ে এখন সব ব্যাটাই রাজা। শেখ মুজিব চেষ্টার কোনো ত্রুটি রাখছেন না, কিন্তু একদিকের ঝামেলা মেটানোর আগেই অন্যদিকেও গোল বেঁধে যাচ্ছে।

শেখ মুজিব ভাবনা আরো এগিয়ে নেয়ার চেষ্টা করলে তাতে বাধা দেয় মহিউদ্দিন। কখন সে বারান্দায় এসেছে কে জানে। মহিউদ্দিন বলে, 'স্যার, ডাক্তার সাহেব আসছেন।ড্রয়িংরুমে আরো একজন আছে, তারে চিনি না।'

নাতিকে মহিউদ্দিনের হাতে দিয়ে শেখ মুজিব নিচে নেমে গেলেন।

একান্ত নিজস্ব ডাক্তার হিসেবে নুরুল ইসলাম কয়েকদিন পরপর এসে দেখে যান বঙ্গবন্ধুকে। তিনি অপেক্ষা করছেন ড্রয়িংরুমে। সেখানে বসে আছে আলাউদ্দীনও, শেখ মুজিবের সাথে দেখা হচ্ছে, এই ভেবেই মনে মনেই রোমাঞ্চিত সে!

অথচ এমনটা নয় যে এই প্রথম মুজিবের সাথে সাক্ষাৎ হচ্ছে আলাউদ্দীনের। সেই '৭০ সালে নভেম্বরের বন্যায় যখন দক্ষিণাঞ্চল ভেসে গিয়েছিল, মানুষের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে রিলিফের ট্রলার নিয়ে যখন এস এম হল থেকে ওরা গেল বরিশাল, সেইবার ত্রাণ দিয়ে ফিরে আসার সময় তাদের সাথে দেখা হয়েছিল বিপরীতমুখী আরেকটা ট্রলারে থাকা শেখ মুজিবুর রহমানের। বঙ্গবন্ধু ওদের সাথে পরিচিত হয়ে জানতে চেয়েছিলেন দুর্গত মানুষের অবস্থা, উনারাও রিলিফ নিয়ে যাচ্ছিলেন তখন। সেই রিলিফটুকু প্রতুল হবে কি না, এই নিয়ে শেখ মুজিব সামান্য আলোচনা করেছিলেন ওদের সাথে।

কিন্তু শেখ মুজিব তো তখনো বঙ্গবন্ধু, প্রধানমন্ত্রী হননি এখনকার মতো! এত বড় একজন মানুষ এখন তার কথার গুরুত্ব দেবে কি না, এই নিয়ে সংশয় কাটে না আলাউদ্দীনের।

বঙ্গবন্ধু ঘরে ঢুকলে আলাউদ্দীনের আগেই সালাম দিলেন নুরুল ইসলাম। শেখ মুজিব চশমা খুলে 'আরে ডাক্তার সাব, কেমন আছেন?' বলে ভরাট গলায় কুশল বিনিময়টাও প্রথমে করলেন ডাক্তারের সাথেই। এরপর তিনি আলাউদ্দীনের দিকে ফিরে এক মুহূর্তের জন্যে ভুরু কোঁচকালেন। হঠাৎ করেই বললেন, 'কী রে, তর নাম আলাউদ্দীন না? কেমন আছোস? ...তুই কি অখনো আমার দলই করোস, না জাসদে যোগ দিছোস?'

আলাউদ্দীন হতভম্ব হয়ে গেল। শেখ মুজিবুর রহমানের কিংবদন্তি স্মরণশক্তির কথা সে শুনেছে, তবে এর বিস্তৃতি তাকে বিমূঢ় করে ছাড়ে! সে-ই কবে কয়েক মিনিটের জন্যে দেখা, শেখ মুজিব এতদিন পরেও সেই কথা মনে রেখেছেন! বিস্ময়ের ঠেলা সামলাতে খানিক সময় নিয়ে আলাউদ্দীন বলে, 'স্যার,

আমি ভালো আছি। ...এখনো স্যার কোনদিকে যোগ দিবো বুঝতে পারতেছি না। আরো কয়েকদিন দেখবো বলে ঠিক করছি।'

শেখ মুজিব আলাউদ্দীনের হতচকিত ভাবটি বেশ উপভোগ করেন। মুচকি হেসে বলেন, 'আইচ্ছা, চিন্তা ভাবনা কইর‍্যা শেষ পর্যন্ত আমার দলেই যোগ দিবি কিন্তু! অখন বয়। তোর কথা পরে শুনমু, আগে ডাক্তার সাবের সাথে কথা কইয়্যা নিই।'

নুরুল ইসলাম বিশেষ কোনো কারণে আসেননি, রুটিন চেকাপই তার উদ্দেশে। 'স্যার, গত কিছুদিন আসতে পারি নাই, তাই ভাবলাম আপনাকে দেখে যাই আপনাকে। এখন স্যার শরীর কেমন? প্রেশার মাপতেছেন তো [illegible]?'

'ডাক্তার সাব, প্রেশার ফেশার নিয়া আর কী চিন্তা! শরীর নিয়া ভাবি না, যা অবস্থা আজকাল দেখলেন না, তোপখানা রোডে কী হইলো সেদিন... ', শেখ মুজিব গম্ভীর স্বরে বলেন।

নুরুল ইসলাম মাথা ঝাঁকালেন। তিনি শুনেছেন। সপ্তাহ দুয়েক আগে, উনিশশো তিয়াত্তর বছরটা শুরুতেই নিয়ে এসেছে বিক্ষোভ। সেদিন তোপখানা রোডে ছাত্র ইউনিয়নের ছেলেরা মার্কিন তথ্যকেন্দ্রের সামনে ভিয়েতনামের বিপ্লবী সরকারকে স্বীকৃতি দেয়ার স্লোগান দিচ্ছিলো। অসহিষ্ণু পুলিশ এক পর্যায়ে গুলি চালানো শুরু করলে দুইজন সাথে সাথেই মারা যায়। মর্মান্তিক এই ঘটনার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল বের করে ছাত্ররা, ইউনিয়ন সভাপতি মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম আবার শেখ মুজিবের ডাকসু সদস্যপদ বাতিল ঘোষণা করে সেটা জনসমক্ষেই ছিঁড়ে ফেলেন।

শেখ মুজিবের গলা দিয়ে খুব বিষণ্ন একটা স্বর বেরোয়। 'আমি কিন্তু সাথে সাথেই ঘটনা তদন্তের নির্দেশ দিছি, বুঝলেন ডাক্তার সাহেব? তারপরেও অরা কইতাছে আমার নির্দেশেই এমন হইছে।

ডাক্তার সাহেব, আমি বিশ্বাস করি ভালোবাসা দিয়া সব কিছু করন যায়। এই যে মহিউদ্দিনেরে দ্যাখলেন, ঢাকা ভার্সিটি এলাকায় সে সবের উপর চোটপাট করত। অরে সবাই ভয় পাইতো। আমি অরে নিয়া আসলাম আদর কইর‍্যা, উপদেশ দিলাম, ভালোবাসা দিলাম। এই মহিউদ্দিন আর সেই মহিউদ্দিনে বিশাল ফারাক ডাক্তার সাহেব। আমি যদি অরে গুলিও খাইবার কই, মহিউদ্দিন ঐটাই করবো। ভালোবাসায় সব সম্ভব ডাক্তার সাহেব। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ এই কথাটা বুঝবার চাইতেছে না ডাক্তার সাহেব, আমি অগোরে বুঝাইবার পারতাছি না। কারো মাঝে ছাড় দেবার মানসিকতা নাই। সবদিকেই অরা কেবল পাইতে চায়...'

নুরুল ইসলাম কী বলবেন বুঝে উঠতে পারেন না। নতুন দেশে শেখ মুজিবের পথে অলিম্পাস ছোঁয়া সমস্যার পাহাড়। নুরুল ইসলাম আর থাকেন না

বেশিক্ষণ, টুকটাক দুয়েকটা কথা বলেই বিদায় নেন। শেখ মুজিব এরপরে ফিরে তাকান আলাউদ্দীনের দিকে।

'এইবার তুই ক, ক্যান আইসোস? কী দরকার তর? কী চাস? আমার কাছে সবাই তো কিছু না কিছু চাইতেই আসে...'

আলাউদ্দীন লাজুক একটা হাসি দেয়, অতঃপর গম্ভীর হয়ে বলে, 'স্যার, কোনো কিছুর জন্যে আসি নাই। খালি আপনারে একটা খবর দিতে আসছি। কিছু গোপন কথা বলার আছে।'

শেখ মুজিব অবাক হয়ে বলেন, 'কী গোপন কথা তর?'

'স্যার, আপনি যখন লন্ডনে গেছিলেন ডাক্তার দেখাইতে, তখন স্যার কিছু উড়াকথা কানে আসছে। আমি স্যার ক্যান্টনমেন্টে রেগুলার যাই তো, তখন শুনছি। আপনি যখন বাইরে থাকবেন, তখন নাকি একটা আর্মি ক্যু হইবো। এখন স্যার আপনি চইলা আসছেন, আল্লায় দিলে কিছুই হয় নাই। তারপরেও আমার স্যার মনে হইলো আপনাকে জানানো দরকার। হয়তো খুব উঁচু লেভেলে কোনো কন্সপাইরেসি হইতেছে...'

শেখ মুজিব খুব গম্ভীর হয়ে যান এই কথা শুনে। দেশে এখন প্রচুর গুজব, প্রতিদিনই নিয়ম করে এগুলো শুনতে হয় তাকে। আর তিনি দেশের বাইরে থাকলে কানকথার গতিটা যেন খানিক বেশিই থাকে। অপারেশনের পরে দেশে ফিরেই তিনি শুনেছেন যে শহরে গুজব ছড়িয়েছিল তিনি মৃত্যুপথযাত্রী। তার জায়গায় নাকি পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাজউদ্দীন পাকাপাকি হয়ে গেছে।

'তরে এইগুলান ভাবতে হইবো না। সব কথায় কান দিলে হয় না।' শেখ মুজিব একটু রুক্ষ স্বরে বলেন আলাউদ্দীনকে, এই উড়োকথাগুলোর রাশ টেনে ধরা দরকার। 'আমারে কইছোস, ভালা করছোস, আর কাউরে কইছ না। আর অহনই উঠিস না, চা খায়া যা। আজকে বাড়ির চা ভালা হইছে।'

আলাউদ্দীন চায়ের আমন্ত্রণ গ্রহণ করবার আগেই আরো একজন অতিথি এসে পড়েন, প্রাক্তন মুজিবনগর সরকারের স্বাস্থ্য সচিব ডাক্তার টি হোসেন। শেখ মুজিবুর রহমান তাকে দেখেই উচ্চকণ্ঠ হয়ে পড়েন।

'আরে ডাক্তার, আইসা পড়ছো! তোমার কামের কথাটা তো আমি ভুইল্যাই গেছিলাম! ঐ ফাইলটা তো মনে হয় এখন তাজউদ্দীনের অফিসে আছে। দাঁড়াও, অরে একটা ফোন দিই।... ওই মহিউদ্দিন, আরে দুই কাপ চা দিবার ক এইদিকে!'

অতএব আলাউদ্দীন আর টি হোসেন অপেক্ষা করেন চায়ের জন্যে। এই অবসরে শেখ মুজিব ফোন করেন তাজউদ্দীনের বাসায়। তাজউদ্দীনকে বাসায় পাওয়া যায় না, তিনি বেরিয়ে গেছেন সকালেই। শেখ মুজিব এরপরে ফোন

করেন অর্থমন্ত্রীর অফিসে। জানা যায় তাজউদ্দীন অফিসেই আছেন, ফাইল ওয়ার্কে ব্যস্ত, শেখ মুজিবকে লাইনে রেখে ওপাশে ছুটোছুটি পড়ে যায়।

গলা নামিয়ে শেখ মুজিব তার দুই অতিথিকে বলেন, 'দ্যাখলা, তাজউদ্দীন এই সাত সকালেই অফিসে চইল্যা গেছে। কাজ নিয়া লোকটা কত সিরিয়াস, অথচ কাল রাতেই পোলাপান ওরে নিয়া কত কিছু কইয়া গ্যালো!'

ভাগ হয়ে যাওয়া আদর্শের কোনদিকের পাল্লা সে ভারী করবে, আলাউদ্দীন তা নিয়ে আরো সংশয়ে পড়ে যায় শেখ মুজিবের এই ফিসফিস কথায়।

ফাইলের দিন, রাজনীতির আলাপ

রিকশার ফুরফুরে বাতাসে বাজার করার ক্লান্তিটা উবে যাচ্ছে আবু সাইদ চৌধুরীর। পুরো সপ্তাহটা কাজ করেছেন, ছুটির দিনেও অফিসের ঝামেলা ঘাড়ে নিতে ইচ্ছে করে কারো? কিন্তু স্যারের উপর আসলে রাগ করে থাকা যায় না।

গতকাল রাতে যখন সচিবালয় থেকে তারা দুইজন বেরুচ্ছেন, তাজউদ্দীন তখন হুট করে বললেন, 'চৌধুরী সাহেব, আমি গাড়িতে কিছু ফাইল নিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। কালকে কিছু কাজ করতে চাই। আপনি একটু কষ্ট করে যদি কাল সকালে আমার বাসায় আসেন, খুব ভালো হয়।'

বেশ উষ্ণ স্বরেই আবু সাইদ চৌধুরী বলেছিলেন, 'স্যার, আমারও তো একটা সংসার আছে। পুরাটা উইক স্যার কাজ করলাম, একদিনও নয়টা-দশটার আগে বাসায় যাই নাই। এখন কালকের দিনেও যদি অফিস ওয়ার্ক করতে হয়...'

তাজউদ্দীন নরম স্বরে বললেন, 'একটু কষ্ট করেন না কাল। অনেকগুলো জরুরি ফাইল, কতজনের কাজ জমে আছে।' এইটুকু বলে স্যার একটা বিরতি নিয়েছিলেন, তারপর মুখ খুলেছিলেন আবার। 'চৌধুরী সাহেব, আই অ্যাম সরি। সারা সপ্তাহ অফিস করার পরে আপনাদের উইকেন্ডেও কাজ করাতে আমার খারাপ লাগে। কী করবো বলেন। সব অফিসার যদি আপনার মতো দায়িত্ব পালন করত, তাহলেই তো গাদা গাদা ফাইল ওয়ার্ক এখন জমে থাকতো না।'

এত কথার পরে কী আর রাগ করে থাকা যায়? আবু সাইদ চৌধুরী তাই বেশ সকালের দিকে ঘুম থেকে উঠে বাজার সেরে নিয়েছেন। সেটা বাসায় পৌঁছে দিয়েই রিকশা নিয়েছেন হেয়ার রোডের দিকে। সাইদ সাহেব আগেও সে বাড়িতে গেছেন কয়েকবার।

অর্থমন্ত্রীর বাসভবনে পৌঁছে সাইদ সাহেব দেখলেন তাজউদ্দীন ইতোমধ্যেই দোতলার বারান্দায় বসে ফাইল দেখা শুরু করেছেন। বাড়ির ভেতরে চা দেয়ার কথা বলে তাজউদ্দীন একগাদা ফাইল দিয়ে বসিয়ে দিলেন আবু সাইদকে। তারা দুইজনে ধীরে সুস্থে কাজ করতে লাগলেন।

বেশ কিছু ফাইল দেখা হয়ে গেছে ততক্ষণে, আবু সাইদ চৌধুরী চোখ বুলিয়ে যাচ্ছেন হাতের ফাইলটায়। এমন সময় সচকিত হয়ে ওঠেন তিনি। তাজউদ্দীন বেশ গলা উঁচিয়ে ডাকছেন তার মিসেসকে। 'লিলি, লিলি!! একটু শুনে যাও এদিকে!'

জোহরা তাজউদ্দীন চুলায় মাত্র রান্না চড়িয়েছেন, মুখের ঘাম মুছতে মুছতেই তিনি এলেন। 'আরে সাইদ সাহেব, কখন আসলেন? ... ভালো আছেন? বাসার সব ভালো? চা দিয়েছে তো আপনাকে?'

অতিথির সাথে বাতচিৎ শেষে জোহরা স্বামীর দিকে তাকান। 'হ্যাঁ, বলো এইবার। ডাকতেছো ক্যান?'

তাজউদ্দীন একটা চওড়া হাসি দিয়ে বললেন, 'তেরো নম্বর রোডের ঐ ভদ্রলোকের প্রমোশন কেসটা পাস করায়ে দিলাম। বুঝলা না, আরে যেহেতু এই কেসের সাথে তোমার একটা সম্পর্ক আছে তাই তোমাকে জানায়ে নিলাম আরকি!'

'তুমি বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রী, তুমি তোমার আওতার মধ্যে কাকে প্রমোশন দিবা, কাকে দিবা না, এইটা তো তোমার ব্যাপার। এইটা আবার আমাকে বলতে হবে কেন...', জোহরা তাজউদ্দীন দ্রুত ভেতর ঘরে চলে যান। মেয়েরা রান্নায় একবার মন বসালে আর অন্যদিকে খেয়াল করতে চায় না।

মিসেস তাজউদ্দীন বেরিয়ে গেলে আবু সাইদ চৌধুরী প্রশ্ন চোখে অর্থমন্ত্রীর দিকে তাকান। 'স্যার, কিছুই তো বুঝলাম না। ম্যাডামের সাথে প্রমোশনের কেস কীভাবে রিলেটেড, মাথায়ই ঢুকলো না।'

তাজউদ্দীন হাসতে হাসতেই ফাইলটা এগিয়ে দেন। সাইদ সাহেব সেটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেন। একজন ট্যাক্স অফিসারের ফাইল, পদোন্নতির সুপারিশপ্রাপ্ত। তবে বলা হয়েছে, স্বাধীনতা যুদ্ধে তার বিতর্কিত ভূমিকার বিষয়টা বিবেচ্য। আবু সাইদ এসিআরগুলোতে চোখ বোলান। চাকুরি জীবনের রেকর্ড ভালো, সেগুলো অনুযায়ী তার পদোন্নতি পাওয়াই উচিত। ফাইলের শেষে তাজউদ্দীন লিখেছেন, মুক্তিযুদ্ধের সময় এই অফিসারের ভূমিকা প্রশ্নবিদ্ধ ছিল বলা হচ্ছে, কিন্তু এর স্বপক্ষে কোনো সুর্নিদিষ্ট অভিযোগ উত্থাপন বা প্রমাণ দাখিল করা হয়নি। কেবল সন্দেহ বা অনুমানের ভিত্তিতে কাউকে বঞ্চিত করা নিরর্থক। তার চাকুরি জীবনের নথি অনুযায়ী পদোন্নতি তার প্রাপ্য, আমি সেই পদোন্নতি অনুমোদন করলাম।

আবু সাইদ চৌধুরী ফাইল পড়া শেষে বলেন, 'স্যার, এখনো বুঝলাম না ম্যাডামকে আপনি ওই কথা বললেন কেন, এই ফাইলের সাথে তার সম্পর্কই বা কী!'

এবার তাজউদ্দীন খানিক গম্ভীর হয়ে যান। বলেন, 'চৌধুরী সাহেব, এই লোকটার কারণে আমার পরিবারের খুব বড় ধরনের ক্ষতি হয়ে যেতে পারত।

আপনি তো জানেন, ২৫ মার্চের রাতে আর্মি আমার বাসায় আসবার আগেই আমি বাড়ি ছেড়ে বের হয়ে গেছিলাম। লিলি আর বাচ্চারা কিন্তু যেতে পারে নাই। সেই মুহূর্তে লিলি বাড়ির ভাড়াটিয়া সেজে আর্মিদের কাছ থেকে বেঁচে গেছিল। আশ্রয়ের জন্যে সে এরপরে আমার ছোট দুই বাচ্চাকে নিয়ে এই লোকের বাসায় গিয়ে উঠে। উনি সেই সময় বাড়িতে ছিলেন না, ফিরে আসার পরে লিলির থাকাটা উনি হয়তো পছন্দ করলেন না। ঐ রাতের কারফিউয়ের মধ্যেই উনি লিলিকে বললেন, আমার বাড়িটাতো রাস্তার পাশে, যেকোনো সময় আর্মি চলে আসতে পারে। আপনাদের আমি আমার পরিচিত এক বাড়িতে রেখে আসবো চলেন।

এই বলে উনি লিলিদের বাড়ির বাইরে নিয়ে গেলেন। একটু পরে মাঝরাস্তায় গিয়েই বললেন যে উনি চাবি ফেলে এসেছেন, চাবি নিয়ে আসতে হবে। সেই যে উনি চাবি আনতে গেলেন, আর আসলেন না। লিলি এরপর উনার বাড়ির দরজায় গিয়ে বেল বাজালো, কড়া নাড়ালো, কিন্তু দরজা আর কেউ খুললো না। ওই কারফিউ এর মাঝে লিলি সারারাত বাচ্চাদের নিয়ে বসে রইল খোলা রাস্তায়, আশ্রয় নিল গাদা করে রাখা কিছু ইটের পেছনে।...

তো এই হলো গিয়ে ঘটনা। এখন কেউ হয়তো শুনছে যে যুদ্ধের সময় আমার পরিবারের সাথে তার এমন কিছু ঘটেছে, তাই হয়তো ফাইলে যুদ্ধকালীন বিতর্কিত ভূমিকার কথা লিখে দিয়েছে। কিন্তু আমার মনে হয় উনার ব্যক্তি জীবনের কোনো কারণে চাকরিক্ষেত্রে উনি বঞ্চিত হবেন, এইটা ঠিক না। কাগজের রেকর্ড অনুযায়ী উনার প্রমোশনটা প্রাপ্য, তাই অনুমোদন না দিয়ে পারলাম না।'

আবু সাইদ চৌধুরী কিছু সময় থম মেরে বসে রইলেন। তার মনে হলো গল্পে উপন্যাসে এতদিন তিনি মহত্ত্ব আর উদারতার যে সব উদাহরণ পড়েছেন, এই ঘটনাটি সেগুলোকে ধরে ফেলেছে। ব্যক্তিগত ক্রোধ, ঈর্ষা অথবা প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছা, এগুলোকে উপেক্ষা করে থাকার ক্ষমতা সাধারণ মানুষের থাকে না। এমন নৈর্ব্যক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের থাকে অত্যন্ত বিরলপ্রজ কিছু মানুষের, তার সামনে বসে থাকা চশমা পড়া মানুষটিও সেই দলে পড়েন।

বিস্মিত একান্ত সচিব তাই গাঢ় স্বরে কেবল বললেন, 'স্যার, ইউ আর আ গ্রেট ম্যান! ইউ আর আ গ্রেট ম্যান!! '

অথচ সেই সময়ের বাংলাদেশ, প্রিয় বাংলাদেশ হায়, এক একটি দিনে নতুন থেকে নতুনতর পথে তার স্বর্ণসন্তানদের উপহার দিতে থাকে হতাশার বুমেরাং। গ্রেট ম্যানদের ফুটো হয়ে যাওয়া পকেট থেকে হারিয়ে যেতে থাকে তাদের

প্যাণ্ডোরার বাক্স। তাজউদ্দীনও তাই হয়ে পড়তে থাকেন কোণঠাসা। গ্রেট ম্যানের সেইসব রিগ্রেটফুল মুহূর্তেরও সাক্ষী হয়ে থাকেন আবু সাইদ চৌধুরী।

একদিন অফিসে গিয়ে আবু সাইদ দেখতে পান আষাঢ়ের মেঘ মুখে নিয়ে তাজউদ্দীন ফাইল দেখছেন। আবু সাইদ আগ বাড়িয়ে কিছু বলেন না, অপেক্ষা করেন স্যার কখন মুখ খুলবেন তার জন্যে। অর্থমন্ত্রী মুখ খোলেন খানিক পর, 'চৌধুরী সাহেব, আজকের পেপার দেখেছেন?'

আবু সাইদ নিচু স্বরে বলেন, 'লালবাহিনীর খবরটার কথা বলছেন তো স্যার? আমি দেখেছি।'

আওয়ামী লীগের শ্রমিক সংগঠন শ্রমিক লীগের আবদুল মান্নান তখন পতাকা উড়াচ্ছেন লালবাহিনীর। বাছাই করা শ্রমিকদের মাথায় লাল রঙা ফেট্টি বেঁধে এই শ্রমিক নেতা লালবাহিনী বানিয়েছেন। শেখ মুজিব যখন যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে গড়ে তুলতে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় লড়ছেন প্রাণপণে, তখন উগ্রপন্থি কেউ কেউ দলের ভেতরে থেকেই বেআইনি একনায়কতন্ত্র কায়েম করতে চাইছেন পেশিশক্তির বলে। লালবাহিনী যখন তখন কুচকাওয়াজ করে বেড়ায় রাজপথে, কারখানার কাজ থাকে বন্ধ। মাঝে মাঝে আবার কাউকে আটকও করে এই লালবাহিনী, আজকের পত্রিকায় ফলাও করে এসেছে তেমনই একটি সংবাদ। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামি সিএসপি অফিসার ফজলুর রহমানকেও নাকি ধরে নিয়ে গেছে তারা।

'তা পড়ে কী মনে হচ্ছে? আপনার প্রতিক্রিয়া কী?' তাজউদ্দীনের প্রশ্ন থাকে সাইদ সাহেবের প্রতি।

'স্যার আমার কথা খুব সহজ।' আবু সাইদ বলেন। 'সরকারি কর্মকর্তাদের মরাল ভেঙে দিলে আসলে দেশ চালানো যাবে না। ফজলুর রহমান সাহেবের মতন লোকও যদি এরকম হেনস্তা হন...'

তাজউদ্দীন হাত তুলে থামিয়ে দেন সাইদ সাহেবকে। 'ঠিক। এই কথাটাই আমি আশা করেছিলাম।'

টেবিলে রাখা লাল টেলিফোনটা থেকে তাজউদ্দীনের ফোন চলে যায় বঙ্গবন্ধুর অফিসে। 'মুজিব ভাই, দেশে এগুলা কী হচ্ছে? মানুষ সরকারে আস্থা রাখবে কী করে? ... না না, এই কথা তো ঠিক হইলো না মুজিব ভাই। আপনার আশপাশে যারা ঘুরছে তারা আপনাকে ঠিক চিত্র দেখাচ্ছে না। তারা দেশটাকে শেষ করে ফেলার সব ব্যবস্থা করেছে আর আপনাকে বুঝাচ্ছে উল্টাটা...

আমি কিন্তু আপনাকে বারবার সাবধান করেছি মুজিব ভাই, আপনি শোনেন নাই। আমি এখনি আপনার কাছে যাচ্ছি। হ্যাঁ, এই বিষয়ে সামনাসামনিই কথা বলতে চাই আমি। একটা বোঝাপড়া করা দরকার।'

সেই সামনাসামনি বোঝাপড়াটা চোখে দেখা হয় না আবু সাইদের, সেটা প্রত্যক্ষ করেন বঙ্গবন্ধুর একান্ত সচিব ড ফরাসউদ্দীন। বলা ভালো অর্ধেকটা প্রত্যক্ষ করেন।

বঙ্গবন্ধুর রুমে ঢুকেই তাজউদ্দীন দেখতে পান সেখানে বসে রয়েছেন লালবাহিনীর আবদুল মান্নান, তার সাথে শেখ মনিও রয়েছেন। কঠিন মানুষ ঐ তাজউদ্দীন। স্পষ্ট স্বরেই বঙ্গবন্ধুকে তিনি বলেন, 'মুজিব ভাই, এদের অন্য ঘরে যেতে বলেন। এদের সামনে আমি আপনার সাথে কোনো কথাই বলতে চাই না।'

শেখ মনি আর আবদুল মান্নান নতমুখে বেরিয়ে যান। দরজা আটকে কথা বলা শুরু করেন তাজউদ্দীন আর শেখ মুজিব। কী কথা হয় তাদের মাঝে জানা যায় না, কেবল লালবাহিনীর দৌরাত্ম্য অনেকটা বন্ধ হয়ে যায় এরপরে। মুক্তি পেয়ে ফিরে আসেন ফজলুর রহমানও।

এইভাবেই ফাইলের দিন আর রাজনীতির মোড়কে বাংলাদেশ নিয়ে কথোপকথনে দিন কাটতে থাকে তাজউদ্দীনের। কিন্তু সে সময় বড় রাক্ষুসে। গ্রিক পুরাণের হাইড্রার মতো একদিকের নৈরাজ্য বধ করতে না করতেই অন্য প্রান্তে মাথা তোলে আরো দুর্নীতি, আরো দুর্বিনীতরা।

গ্রেট ম্যানেরা হাঁটি হাঁটি পা পা পদক্ষেপে পেছাতে থাকেন খাদের কিনার অভিমুখে।

লালন কী জাত সংসারে...

'গল্পগুচ্ছ' বইটা বাসায় পড়ে ছিল অনেকদিন। রিমির আগে ধারণা ছিল, রবীন্দ্রনাথ শুধু বড়দের লেখাই লিখেছেন। কিন্তু সাহস করে গল্পগুচ্ছ পড়া শুরু করার পর থেকে সেই অনুমানটা বদলাতে তার সময় লাগেনি। সব গল্পই যে সে পরিষ্কার বুঝেছে তা নয়, তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে স্বাদ নিতে তার আটকায়নি। বিশেষ করে 'গুপ্তধন' আর 'মাস্টারমশাই' গল্প দুটো'তো তার খুবই পছন্দ হয়েছে। স্কুলের বন্ধুদের সাথে ঐ গল্প নিয়ে আলোচনাও করেছে রিমি।

সত্যি বলতে কি, শিলাইদহ ঘুরে আসার পরেই রিমির রবীন্দ্রনাথ শুরু করার ইচ্ছাটা জাঁকিয়ে বসেছিল। সামনাসামনি যখন কিছু একটা দেখা হয়, তখন বইতে পড়া বর্ণনার সাথে সেটার কোনো তুলনাই হয় না অবশ্য। শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথের কতরকম স্মৃতিচিহ্ন ছিল!

একদিনের বেশি অবশ্য থাকা হয়নি সেখানে। তিনদিনের শেষদিন কেটেছে শিলাইদহে, এর আগের দিনটা, মানে রাতটা, কেটেছে গান শুনে! রাত জেগে ছেউড়িয়া গ্রামে ঐ লালনের গান শোনাটা রিমির জীবনে একটা বলবার মতো অভিজ্ঞতা!

লালনের নাকি ১৯৯তম জন্মবার্ষিকী ছিল সে সময়। তা নিয়েই আয়োজন ছিল রাতভর লোকগীতির অনুষ্ঠানের। রিমি বসেছিল একদম আব্বুর গা ঘেঁষে, আব্বু চোখ বন্ধ করে গান শুনছিলেন। পাঞ্জাবি পরা বাউল একতারা হাতে গাইছিলেন, সব লোকে কয় লালন কী জাত সংসারে ...

তবে শিলাইদহ বা লালন উৎসব নয়, রিমিদের বেড়াতে যাবার আসল উপলক্ষ ছিল মেহেরপুর। মুজিবনগর সরকারের আনুষ্ঠানিক শপথ গ্রহণের দুই বছর পূর্তি উপলক্ষে ওরা মেহেরপুর গিয়েছিল। এর মধ্যে ঢাকা থেকে কুষ্টিয়া পর্যন্ত রিমিরা গিয়েছিল হেলিকপ্টারে! রিমি আগে বিমানে চড়েছে, কিন্তু খট খট শব্দ করা হেলিকপ্টারে ওঠা ওর এই প্রথম।

কুষ্টিয়া থেকে মেহেরপুরের মুজিবনগরের দিকে রিমিরা গিয়েছিল মাইক্রোবাসে। যুদ্ধের পরে আব্বু ওদের মুজিবনগর নিয়ে গল্প করেছেন বেশুমার, সেইসব গল্পের পটভূমি নিজের চোখে দেখে আসার সুযোগ পেয়ে রিমিরা পুরো রাস্তায় কেবল বকবক করে গেছে। অবাক ব্যাপার হচ্ছে, মাইক্রোতে ওদের সাথে ছিলেন সংস্থাপন সচিব নুরুল কাদের, রিমিরা পুরো রাস্তা এত কথা বলল, কিন্তু উনি ওনার হাতের ইংরেজিতে লেখা মোটকা বইটার উপর থেকে চোখই সরালেন না! উনার স্ত্রী তারিন কাকির সাথে অবশ্য পরে ওদের খুব ভাব হয়ে গেছে। ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম আর উনার ওয়াইফ লীলা কাকির সাথে তো আরো আগেই ওদের চেনাজানা, মাইক্রোতে তারাও ছিলেন।

মুজিবনগর দেখে তাৎক্ষণিকভাবে রিমিদের মনে হয়েছে, আব্বু মোটেই বাড়িয়ে বলেননি। জায়গাটা যে কী সুন্দর দেখতে! চারপাশে আমবাগান দেয়া ঘেরা, শুধু সবুজ আর সবুজ। একদিকে রেস্ট হাউজ তৈরি করা হচ্ছে, বালি আর সিমেন্টের আস্তরণ দেয়া কাঠামোটার রং করা হয়নি তখনো। চারপাশে প্রচুর মানুষের ভিড়। আর মঞ্চের উপরে নজরুল চাচা, মনসুর চাচা, কামারুজ্জামান চাচার সাথে আব্বু বসে আছেন। মুজিব কাকু অবশ্য ছিলেন না। কিন্তু অনুষ্ঠানে একেকজন বক্তার কথা শুনে মানুষের মধ্যে কী ভীষণ আবেগ দেখা গেল সেদিন! মনে হচ্ছিলো ওই মানুষগুলোর মন যেন ফিরে গিয়েছে ওই যুদ্ধের সময়ে। সবার সামনে তখন জয়ের প্রত্যাশা। নতুন করে কাজ করার ইচ্ছা।

সেই মুজিবনগরে গিয়ে আব্বু কেমন স্মৃতিকাতর হয়ে গেলেন। রিমি-রিপিদের বারবার বলতে লাগলেন মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস কীভাবে সংরক্ষণ করতে হবে। আব্বুর ইচ্ছা, সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে একটা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর হবে। যেখানে পাকিস্তানি আর্মি সারেন্ডার করেছিল, সে জায়গা ঘিরে থাকবে অনেক দেয়ালচিত্র। আর ২৪ বছর ধরে বাংলাদেশের মানুষের স্বাধীনতার সংগ্রামের একটা ধারাবাহিক চিত্রও পাওয়া যাবে ওইসব দেয়ালের লেখায়, ছবিতে।

ইতিহাস যাতে লোকে ভুলে না যায়, এই বিষয়টা নিয়ে আব্বুকে সবসময় চিন্তিত দেখা যায়। এমনকি আব্বু নিজে মুক্তিযুদ্ধের ২৫শে মার্চ থেকে ১৭ এপ্রিল কী করেছেন, সেটাও তিনি গত বছরেই ডিকটেশন দিয়ে লিখিয়ে রেখেছেন। রিমি-রিপি সাথে ছিল, তবে পুরো ঘটনাটা আসলে টুকে নিয়েছেন আবদুল আজিজ বাগমার। মাঝে মাঝে আব্বুকে দেখিয়েও নিয়েছেন টুকটাক ভুল শুধরে নিতে।

...রিমি ঘড়ির দিকে তাকাল। এইসব এলোমেলো ভাবতে কখন যেন বিকাল হয়ে গেছে। গল্পগুচ্ছটা টেবিলে নামিয়ে রেখে রিমি জানালার জানালার কাছে এসে দাঁড়ায়, লনের উপর সূর্যের আলো নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। সাইকেল নিয়ে নিচে খানিকক্ষণ চক্কর দেয়া যায়।

সিঁড়ি বেয়ে রিমি নিচে নেমে যায়। সাইকেলটা সিঁড়িঘরের পেছনে রাখা, সেটা বের করতে গিয়েই তার কানে ভেসে আসে ড্রইংরুমের কথোপকথন। আড়াল থেকে উঁকি মেরে রিমি দেখতে পায় আম্মার সাথে কথা বলছেন একজন সাংবাদিক। উনার নামটা এখন মনে পড়ে না, তবে মুখটা বেশ পরিচিত লাগে রিমির কাছে। দুইজনের আলোচনায় 'বঙ্গবন্ধু' শব্দটা শুনেই কান বাড়িয়ে দেয় রিমি!

ইস্টার্ন নিউজ এজেন্সি, এনা'র কূটনৈতিক সংবাদদাতা সৈয়দ মোহাম্মদ উল্লাহ তখন আলাপে মত্ত জোহরা তাজউদ্দীনের সাথে। 'বুঝলেন ম্যাডাম, বঙ্গবন্ধু আমাদের বসতে দিলেন তখন। এরপরে বললেন, দেখো, ইলেকশন দিলাম, তবে আমার কিন্তু একটা প্ল্যান আছে। তাজউদ্দীনদের হাতে ক্ষমতা দিয়ে আমি কিন্তু বাইরে থাকবো। যদি ওরা ঠিক মতো দেশ চালাতে না পারে, তখন লোকজন আমার কাছে আসবে। আমি থাকবো আল্টিমেট আদালতের মতো...

আমি কিন্তু ম্যাডাম বলতে চাইছিলাম যে, স্যার, এইটা খুব ভালো হবে। কিন্তু আমার সাথের অন্য কয়েকজন সাংবাদিক বসা থেকে প্রায় লাফ দিয়ে উঠল। আর বলা শুরু করল, না স্যার, এইটা দেশের জন্যে খুব ক্ষতিকর হবে। এই ডিসিশন ঠিক হবে না... হ্যানো ত্যানো...'

রিমি এরপর আলোচনা শুনবার আগ্রহ হারায়। আব্বু আর মুজিব কাকুর সম্পর্কটা কখনো কখনো পরিবারের বাঁধনেরও চেয়ে শক্ত, সেটা সে ভালোভাবেই জানে। তবুও আশপাশের লোকজনের কথা থেকে সে বোঝে, ইদানীং কোথাও যেন কোনো কিছু ঠিক আগের মতো নেই। কেউ কেউ নাকি আব্বুকে নিয়ে বানানো কথা বলে মুজিব কাকুর কানভারি করে। ক্ষমতার লোভে আব্বু নাকি চাননি যে পাকিস্তানের জেলখানা থেকে মুজিব কাকু ফিরে আসুক। আব্বু নাকি চিরদিনের জন্যে প্রধানমন্ত্রী থেকে যেতে চেয়েছিলেন।

লোকমুখে এসব শুনে আব্বু কেবল চুপ করে থাকেন। কিন্তু রিমি বোঝে, রিমিরা বোঝে, আব্বু মনে মনে অসম্ভব কষ্ট পান। আব্বু অপেক্ষা করেন, হয়তো

মুজিব কাকু একদিন তাকে ডাকবেন। পাশে বসিয়ে শুনবেন যুদ্ধের দিনগুলোতে কী হয়েছিল, কারা ছিল বন্ধু, কারা ভারী করেছিল শত্রুপক্ষ। কিন্তু মুজিব কাকু এত ব্যস্ত, সেই সময় তার হয়ে ওঠে না।

ড্রইংরুমের আলোচনা শুনে তাই রিমির ভালো লাগে। বোঝাই যাচ্ছে, মুজিব কাকু আসলে মন থেকে এখনো আব্বুকে বিশ্বাস করেন, আব্বুর ওপর আস্থা রাখেন। সত্যটা আবিষ্কার করে রিমি মনে মনে খুব খুশি হয়ে ওঠে।

রিমি সাইকেল নিয়ে বাইরের লনে বেরিয়ে আসে। সে আর রিপি, দুজনেই ভালো সাইকেল চালায়। এই বাসায় এসে তাই ওদের খুব সুবিধা, যখন তখন কয়েক পাক ঘুরে আসতে পারে লনে। রিমির আবার এমনই নেশা যে সুযোগ পেলেই গাড়ির পেছনে সাইকেল তুলে সে বনানীতে কাকুর বাসায় চলে যায়। বনানী এলাকা এত ফাঁকা, যে সেখানে সাইকেল চালানোর মজাই আলাদা।

কিছুদিন আগে আব্বুও একটা সাইকেল কিনেছেন। আব্বুর মতো কেউ সাইকেলে চড়ছে, এই দৃশ্য দেখে রিমি-রিপির বেশ মজা লাগে। প্রয়োজনে চব্বিশ ঘণ্টাই সরকারি গাড়ি পাওয়া যায়, তবু সেই সাইকেলে চড়েই আব্বু যেন মাঝে মাঝে হাওয়া হয়ে যায়। কোথায় যায় কে জানে!

সাইকেলে চড়া দেশ

সাইকেল পাশে নিয়ে হাঁটতে থাকা মানুষটির দিকে তাকিয়ে আবদুল বাতেন ছোটখাটো একটা ধাক্কা খেল। মানুষটিকে চোখে দেখার প্রায় দুই বছর হয়ে গেছে, এর মাঝে কেবল পত্রিকার পাতায় অস্পষ্ট কিছু ছবি ছাড়া তার কাছে যাবার ভাগ্য হয়নি বাতেনের। আর যাই হোক, এই শেষ বিকেলে নিউমার্কেটের কাঁচাবাজারের মাঝে সাইকেল নিয়ে মন্ত্রী তাজউদ্দীনকে সে চোখে দেখবে, এটা বাতেন ভাবেনি কখনো।

বাজারের দিকে চোখ রেখে হাঁটতে থাকা তাজউদ্দীনের পাশে গিয়ে বাতেন ফিসফিস করে বলে, 'স্যার, স্লামাইকুম স্যার! আপনি এইখানে?'

তাজউদ্দীন চমকে ফিরে তাকান, অতঃপর সতর্ক দৃষ্টিতে বাতেনকে যাচাই করে বলেন, 'ওয়ালাইকুম সালাম। তুমি আমাকে চিনতে পারছো?'

'কী বলেন স্যার, ' আবদুল বাতেন গলা তুলতে যায়।'মনে নাই ওই যে মেহেরপুরের মিটিং-এর দিনে স্টেজ সাজাইলাম আমরা...'

'আস্তে কথা বলো, ' তাজউদ্দীন চট করে একটা হাত চেপে ধরেন বাতেনের, 'বুঝো না, লোকজন চিনে ফেললে সমস্যা তো! আমি তো আসছি বাজার দেখতে। দোকানিরা মানুষের কাছে কীরকম দাম চায়– সেটা নিয়ে বহু কথা শুনতেছি আজকাল। নিজের চোখে দেখতে আসলাম।

তা, তুমি চিনে ফেলাতে ভালোই হয়েছে। সাথে সাথে থাকো। তোমার কাছ থেকেও অনেক কিছু জানা যাবে।'

আবদুল বাতেন একটু সহজ হয়। 'অ, বাজার দেখতে আইছেন? বাজারের কথা আর কী কমু স্যার। সবটির দাম আগুন। তেল কন, চিনি কন, পিঁয়াজ কন, দাম বাড়তাছে সবটির। মানুষজন স্যার কী খাইবো কন...'

তাজউদ্দীন মাথা নাড়েন। তিনি জানেন এসব। সাইকেল কেনার পর গত কিছুদিন ধরে তিনি ঢাকা শহরের কাঁচাবাজারগুলোতে একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছেন। সাধারণ মানুষদের সাথে মিশে চেষ্টা করছেন তাদের দুর্ভোগগুলো কোথায় তা জানার।

নিত্যপণ্যের দাম নিম্নবিত্ত আর মধ্যবিত্তের নাগালের আওতায় নেই। দুর্নীতি তো বলবার বাইরে। মূলত ব্যবসায়ীরা দায়ী, দায়ী স্বজনদের লাইসেন্স পারমিট বিলিয়ে বেড়ানো সরকারি কর্মচারীরাও। আর ওদের সাথে যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতির কাদাপানির আড়ালে নতুন করে মাঠে নেমেছে এমন কিছু লোক, যারা বাংলাদেশ চায়নি। তাজউদ্দীনের ভাবনা যন্ত্রণাদায়ী হয়ে ওঠে।

'মাইনষে কইতাছে, ' আবদুল বাতেন আবার বলে। 'শেখ সাহেবরে ভোট দিয়া লাভ হইলো কী! যে-ই লাউ আছিলাম, সে-ই কদু। কইতাছে পাকিস্তান আমলেই ভালা আছিল।'

তাজউদ্দীন আরো একটু মুষড়ে পড়লেন। দেশে ভোগ্যপণ্যের অভাব আছে, তার সাথে জোট বেঁধেছে ভারতীয় আর বাংলাদেশি স্মাগলাররা। সরকারের ভেতরের সৎ কর্মচারীরা সংখ্যায় কম, অধিকাংশ সরকারি চাকুরের অভিজ্ঞতাও স্বল্প। দেশের মানুষই মাথায় করে দেশের পণ্য সীমান্তের ওপারে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সাধারণ মানুষ, শিক্ষিত আর অশিক্ষিত দুই দলই, বলছে স্বাধীনতাই এর জন্যে দায়ী। এই অভিযোগ অবশ্য সাধারণ মানুষের ভেতরে অযথা ছড়াচ্ছে না, কেউ এদের উসকে দিচ্ছে। পরিস্থিতি আয়ত্তে আনা যাচ্ছে না কিছুতেই।

'শোনো, ' গম্ভীর গলায় তাজউদ্দীন বলেন। 'এসব কথায় কান দিবা না। বরং যেখানেই শুনবা লোকে এইসব বলতেছে, সেখানেই বাধা দিবা। দেশে দুর্নীতি আছে ঠিকই, কিন্তু পাকিস্তান আমলের সাথে সেটার তুলনা কইরো না। পাকিস্তানিরা তোমারে মানুষ বলেই ভাবতো না। তুমি কি বিশ্বাস করো যে শেখ সাহেব চুরি করবেন? জিনিসপত্রের দাম বাড়ায়া দিবেন যাতে মানুষ খাইতে না পায়?'

আবদুল বাতেন মাথা চুলকে বলে। 'তা তো স্যার করি না, কিন্তু আর কারে দোষ দিমু কন। শেখ সাহেব ছাড়া তো আমরা কাউরে চিনিও না। আর সরকার পার্টির ম্যালা লোক তো আসলেই চুরি করতাছে...'

তাজউদ্দীন একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলেন। আত্মসমালোচনা না করে তিনি নিজেকেই ঠকাচ্ছেন। সত্যিই তো, অসৎ সরকারি কর্মচারীদের সাথে দুর্নীতিবাজ বেশ কিছু দলীয় কর্মীও আছে। তাদের আটকাতে কী করছেন সরকার? মুজিব ভাই সামনে শক্ত না হলে বিপদ। তিনি অতিরিক্ত ক্ষমাশীল, সেটার সুযোগ নিয়েই মানুষ তাকে ঠকাচ্ছে। মুজিব ভাইয়ের চারপাশে ঘিরে থাকা কিছু মানুষকেও মনে মনে দায়ী করেন তিনি। বলতে গেলে একরকম জনবিচ্ছিন্ন করে রেখেছে তারা প্রধানমন্ত্রীকে।

সাইকেলটাকে ঠেলে নিয়ে তাজউদ্দীন একটা টং দোকানের পাশে রাখলেন। সাজিরে রাখা বেঞ্চগুলোর মাঝে কোনার দিকে একটাতে বসলেন। 'আসো, চা খাই। তোমার নামটা ভুলে গেছি ভাই। কী করো তুমি?'

মন্ত্রীর সাথে চা খাবার আমন্ত্রণে আবদুল বাতেন মহা খুশি। সোৎসাহে সে শ্রোতাকে তার ঠিকুজি জানায়। বাংলা একাডেমির কাজটা সে ছেড়ে দিয়েছে, এখন বাতেন হোটেল পূর্বাণীতে ম্যানেজারের ফাই ফরমাশ খাটে। সপ্তাহে দুই দিন তাকে এদিকে আসতে হয় তার মেসের সদাই করতে।

হাতলভাঙা কাপে করে সর ভাসা চা আসে, চিনি কম দেয়া তাতে। তাজউদ্দীন তাতে চুমুক দেন, বাতেনের সাথে কথাবার্তা বলার ফাঁকে চারপাশে লোকে কী বলছে তা শুনবার চেষ্টা করেন। এখানে সারি বেঁধে চার পাঁচটা টং দোকান, সেগুলোকে ঘিরেই মোটামুটি বিশ তিরিশটি নানা বয়েসের লোকে কথা বলছে। ছাত্রজীবনের অভিজ্ঞতা থেকে তাজউদ্দীন জানেন, এসব চায়ের দোকান আর সস্তার ভাতের হোটেলগুলোতেই রাজনীতি নিয়ে সবচেয়ে বেশি কাটাছেঁড়া হয়।

'ভোট তো আমি নৌকারেই দিতাম!' তাজউদ্দীনের কানে আসে কথাগুলো। 'নৌকা ছাড়া ভোট দেয়ার আর ছিল কী আমগো। কিন্তু চুরিদারি করবার দরকারডা কী আছিল অহনতরি বুঝবার পারলাম না!'

'এই কাজটা আসলেই ঠিক হইলো না।' বিজ্ঞভাবে মাথা নেড়ে আরেকজন বলে। 'এমনিতেও শেখ সাহেব বেশি হইলে বিশটা সিটেই হারতেন। তবুও পার্টির লোকেরা বেশি বেশি দেখাইতে গিয়া এখন ইলেকশনটারে একটু ইয়া বানায়া দিল।'

আবদুল বাতেনও বেশ আগ্রহ নিয়ে এই আলাপগুলো শুনছিল। তাজউদ্দীন চোখে প্রশ্ন নিয়ে তার দিকে তাকান।

'স্যার, মানুষ সবজায়গায় এইটিই বলাবলি করতাছে।' স্বর নামিয়ে বলে বাতেন। 'আমি স্যার আমার নিজের গ্রামে দেখছি ভোট দিতে কীরাম ভিড় হইছিল। ব্যাকটি কইতাছিল, আমি তো নাওয়ে ভোট দিমু। তারপরেও স্যার

টিভিতে দেখলাম, পেপারে দেখলাম শেখ সাহেবের পার্টির কিছু লোকে চুরি করছে ইলেকশনে। কন তো স্যার, এইডার কোনো দরকার আছিল?'

তাজউদ্দীন মাথা নিচু করে ফেললেন। কী বলবেন তিনি? মুজিব ভাই নিজে নির্বাচনের আগে ডিসিদের ডেকে নির্দেশ দিয়েছিলেন সরকারি আর বিরোধীদলীয় প্রার্থীদের মাঝে কোনো বৈষম্য না করতে। কিন্তু পার্টির লোকেদের বেশ কয়েকজন সে নির্দেশ অমান্য করে ব্যক্তিগত প্রভাব খাটিয়ে অনিয়ম করেছে। তিনি নিজেও তো এমন দুয়েকটা ঘটনার সাক্ষী।

এককালের মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান এবার ইলেকশনে নেমেছিলেন স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে। ইলেকশনের দিন সকালে তিনি ফোন করলেন, তার সমর্থকদের নাকি ভোট দিতে দেয়া হচ্ছে না। আওয়ামী লীগের লোকেরা বিভিন্ন ভোটকেন্দ্রে গোলমাল করছে। তাজউদ্দীন সাথে সাথে ওই এলাকার ইলেকশন অফিসারকে ফোন করে ব্যবস্থা নিতে আদেশ দিলেন। বাড়তি সতর্কতা হিসেবে একজন বিদেশি জার্নালিস্টকে কয়েকজন দেশি সাংবাদিকসহ পাঠিয়েও দিলেন ওই এলাকায়।

সব মিলিয়ে তিনশো আসনের মাঝে দুইশো একানব্বইটি আসনেই জিতেছে আওয়ামী লীগ। তাজউদ্দীন এই ফলাফল নিয়ে নানা বিশ্লেষকের সাথে আলাপ করেছেন। তাদের কথাবার্তায় মনে হয়েছে, সব বিরোধী দল একত্রে আরো কিছু সিট সহজেই পেতে পারত।

তাজউদ্দীন জানেন, দেশের ভঙ্গুর এই অবস্থায় কিছু সংশয় নির্বাচন নিয়ে থাকবেই। তবু ভয় হয় জবাবদিহিতার দায় না থাকলে সরকার স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠে। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় শক্ত বিরোধী দল তাই একান্তভাবে কাম্য হওয়া উচিত সকলের। কিন্তু পার্টির বেশ কিছু সদস্য মনে হয় তার মতো করে চিন্তা করে না। ইলেকশনটা সেসব সদস্যের কাছে এসেছিল যার যার 'জনপ্রিয়তা' দেখানোর সুযোগ হিসেবে। নিজের প্রেস্টিজ রক্ষার্থে ইলেকশনে 'বিশাল ব্যবধানে জিতে' ওইসব পার্টি সদস্য বঙ্গবন্ধুর ইমেজকেই মানুষের সামনে প্রশ্নবিদ্ধ করে ফেলেছেন। মুজিব ভাই এখনো তুমুল জনপ্রিয়, তাজউদ্দীন জানেন। কিন্তু এই ছোট বিষয়গুলোকে এখন উপেক্ষা করে গেলে যে সামনে মুজিব ভাই তথা আওয়ামী লীগের জনবিচ্ছিন্নতার সূচনা হতে পারে, সেটাও উপলব্ধি করেন অর্থমন্ত্রী।

'তোমারে কীভাবে বুঝাবো বলো, বাতেন মিয়া।' তাজউদ্দীনের গলার স্বরে গাঢ় বেদনা। 'সবখানেই তো ভালো মানুষ-খারাপ মানুষ থাকে। শেখ সাহেবের পার্টিতেও আছে। নানা লোকে শেখ সাহেবের নাম ভাঙায়ে চুরি করে যাইতেছে। বঙ্গবন্ধু একজন মানুষ, তার পক্ষে তো সবদিকে সমান মন দেয়া সম্ভব না...'

'কী কন স্যার!' আবদুল বাতেনের কণ্ঠে তীব্র অবিশ্বাস। 'আপনারা এত বড় মন্ত্রী, আপনাদেরই তো কাম বঙ্গবন্ধুরে বুঝ মানানো। বঙ্গবন্ধু একা না পারলে আপনারা তা বলবেন। আপনারা বঙ্গবন্ধুরে দেখায়ে দিবেন কেডা চুরি করতাছে...'

এই অকাট্য সরল যুক্তিতে তাজউদ্দীনের মন খারাপ হয়ে গেল। হাতঘড়ি দেখে তিনি উঠে দাঁড়ান, হাতলভাঙা চায়ের কাপ ফেরত দিয়ে দাম মিটিয়ে দিলেন। শুকনো হেসে বললেন, 'এইটা অবশ্য ঠিক বলছো বাতেন মিয়া। দোষ তো আমাদেরও আছে। আমরা যদি নিজে কিছু করতে না পারি, তাহলে অন্যের দোষ ধরে কী লাভ, তাই না? আসি ভাই, সন্ধ্যা হয়ে গেছে। আজকে আর সময় নাই। তোমার সাথে কথা বলে খুব ভালো লাগল।'

অভিভূত আবদুল বাতেনকে পেছনে ফেলে তাজউদ্দীন আবার সাইকেলে উঠলেন।

প্যাডাল মারতে মারতে তাজউদ্দীন ভাবতে থাকেন বাতেনের কথা। সাধারণ মানুষের বিশ্লেষণ সবসময়ই এমন সরল। কিন্তু রাজনীতির পরিস্থিতি তো এতটা সোজাপথে হাঁটে না। মুজিব ভাইয়ের চারপাশে ঘিরে আছে চাটুকারের দল, ভিড় ঠেলে তাজউদ্দীনেরা ছুঁতে পারেন না ওই বটবৃক্ষকে। মুজিব ভাইও তো আগ বাড়িয়ে কখনো জিজ্ঞাসা করলেন না ওই দশ মাসের কূটনীতির বিস্তারিত। নইলে কী আর খন্দকার মোশতাকের মতো লোকেদের তিনি পাশে রাখেন ...

মোশতাকের কথা মনে হতে তাজউদ্দীনের মন বিষিয়ে গেল। ইলেকশনের প্রাথমিক ফলাফলে খন্দকার মোশতাক নিশ্চিতভাবে পরাজিত হচ্ছিলেন। শোনা যাচ্ছে এরপরে ভোট চুরি করে তিনি রেজাল্ট পালটে দিয়েছেন। এগুলো মেনে নিতে তাজউদ্দীনের খুব কষ্ট হয়। কিন্তু তিনি নিরুপায়। আজকাল নিজেকে তার যুদ্ধের দিনগুলো থেকেও একাকী মনে হয়।

তাজউদ্দীন নিজে কিন্তু আপনা থেকে ইলেকশনের মনোনয়নপত্র জমা দেননি, তিনি অপেক্ষা করছিলেন শেখ মুজিবের আদেশের। মজার ব্যাপার হচ্ছে কাপাসিয়া তার অঞ্চল বলে সেখানে অন্য কোনো প্রার্থীও আবেদন করেনি। শেষ পর্যন্ত শেখ মুজিব যখন দেখলেন ঐ এলাকায় কেউ আবেদন করেনি তখন তিনি অবাক স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তাজউদ্দীন, আশ্চর্য, তুমি অ্যাপ্লিকেশন করো নাই?' এরপরেই কেবল তাজউদ্দীন আবেদনপত্র জমা দিলেন। তাজউদ্দীন সবদিক থেকেই এভাবে খন্দকার মোশতাকের সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী চরিত্র।

তাজউদ্দীনের প্যাডেলের চাপে যেমন এগোচ্ছে সাইকেল, বাংলাদেশের রাজনীতিও আজকাল তেমন অদ্ভুত এক সাইকেলে সওয়ার। তাজউদ্দীন চাইছেন একদিকের চাকা হয়ে সামনে এগিয়ে নিতে ক্ষয়িষ্ণু রাজনীতিকে। অন্য আরেকটি চাকা হয়তো পুঁজি করেছে শঠতা আর মিথ্যাকে।

একটি সাইকেলের দুইটি চাকা, ঘুরতে চাইছে দুইদিকে। অপেক্ষায় তাই অনিবার্য সংঘর্ষ।

শিকারি গুজব, সহযাত্রী সরীসৃপ

যুদ্ধের একেবারে শেষ দিকে শোনা যাচ্ছিলো পাকিস্তান বাজার থেকে তাদের এক টাকার নোট বাজেয়াপ্ত করে ফেলবে। সেই জরুরি সময়ে বাংলাদেশ সরকার ভারতের সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেসে এক টাকার প্রায় ত্রিশ কোটি নোট ছাপতে দিয়েছিলেন। সেই নোট আস্তে ধীরে বাজারে ছাড়া হচ্ছে গত কয়মাস ধরে, সাথে পাকিস্তানি নোটও তুলে নেয়া হচ্ছে। কিন্তু এর মাঝেই বাজারে গুজব শুরু হয়েছে।

অর্থ সচিব মতিউল ইসলাম প্রায়ই লোকমুখে শুনতে পাচ্ছেন ইন্ডিয়াতে নাকি বাংলাদেশের অর্থনীতি ধ্বংস করে দেবার জন্যে কোটি কোটি টাকা ছাপানো হচ্ছে। ডুপ্লিকেট নোট বাজারে ছেড়ে ভারত নাকি বাংলাদেশের টাকা সরিয়ে নিচ্ছে। পেপারেও আজকাল এইসব বিষয় খুব ফলাও করে আসছে।

তাজউদ্দীন হাসিমুখে পত্রিকার প্রথম পাতা দেখিয়ে বলেন, 'মতিউল সাহেব, দেখেন, পেপারে ছবি দিছে। একই নম্বরের দুইটা নোট।'

খানিকক্ষণ সেই ছবি খুঁটিয়ে দেখে মতিউল ইসলাম বিরস স্বরে বলেন, 'স্যার, একই নোটের ছবি দুইবার দিলে নম্বর তো একই হবেই। কিন্তু এই ঝামেলা স্যার সহজে মিটবে না, আমাদের পার্মানেন্ট কোনো ব্যবস্থা নিতে হবে।'

তাজউদ্দীন খানিক ভাবেন। 'আচ্ছা, লন্ডনে আমরা যে নোট ছাপতে দিছিলাম, সেটা তো এখন রেডি তাই না? ...এক কাজ করি বরং। বলে দেই যে আগামী দুই মাসে বাজার থেকে ভারতে ছাপানো টাকা তুলে নেয়া হবে। আমরা নতুন টাকা ছাড়বো।'

মতিউল ইসলামের কাছে ব্যবস্থাটা ভালোই লাগে। অতএব সেই কথা, সেই কাজ। অর্ডার ইস্যু করা হয় খুব দ্রুত। ভারতীয় নোট তুলে নিতে সময় বেঁধে দেয়া হয় দুই মাস। কিন্তু বাজারে অচিরেই উড়তে থাকে আরো খবর। ভারত থেকে এই দুই মাসেই নাকি কোটি কোটি টাকা পাচার হয়ে আসবে, সেখানে বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে ডুপ্লিকেট টাকা তৈরির হার। গুজবের টেলিগ্রাফ বার্তায় ছেয়ে যায় দেশের মানুষ।

পরিস্থিতি এমন ঘোলাটে হয়ে আসে যে শেষতক বিবৃতি পর্যন্ত দিতে হয় তাজউদ্দীনকে। তাজউদ্দীন বলেন, 'বাংলাদেশের ব্যাংকের কাছে হিসাব রয়েছে আমরা কত কোটি এক টাকার নোট বাজারে ছেড়েছি। আমি নিশ্চয়তা দিচ্ছি, সম্পূর্ণ টাকা বাজার থেকে তুলে নেবার সময় যদি এক টাকাও বেশি আমরা জমা পাই, তাহলে আমি ব্যর্থতার দায় নিয়ে পদত্যাগ করবো।'

সময়সীমা পূরণের আর দশদিন বাকি থাকতে মতিউল ইসলাম বঙ্গবন্ধুরও ডাক পান। 'মতিউল, বর্ডার এলাকা থেইক্যা তো আমারে লোকে ওয়ার্নিং দিতাছে। কোটি কোটি ট্যাকার নোট নাকি ইন্ডিয়া থেইকা ঢুইক্যা পড়তাসে। এইটা তো বন্ধ করন দরকার। ...তুমি কি কও?'

সরকারি কর্মকর্তা মতিউল এবারও আস্থা রাখেন তাজউদ্দীনে। 'স্যার, ওরা ভুলভাল বলতেছে। প্যানিকড হয়ে বলতেছে এইসব। এক টাকার নোটে কোটি টাকা পাচার করা এত সহজ ব্যাপার না। আপনি টেনশন কইরেন না। সময় শেষ হইতে দ্যান।'

এরপর দশদিন শেষ হয়। জমা পড়া টাকার হিসাব দেয় বাংলাদেশ ব্যাংক। দেখা যায় মোট ছাপানো টাকার চাইতে প্রায় আধা কোটি কম টাকা জমা হয়েছে। সকলে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। তাজউদ্দীনকে কিন্তু খুব শান্ত দেখায়, তিনি বেশি উত্তেজিত হন না কখনোই।

ভারতকে সুবিধা দিচ্ছেন, এমন প্রচারণা এভাবে সবসময়ে তাড়া করে বেড়ায় তাজউদ্দীনকে।

তাজউদ্দীন হয়তো নুরুল ইসলামদের নিয়ে ভারতে গেছেন ডেলিগেশনের কাজে, পত্রিকায় লেখা হয়ে গেল কর্মসূচি প্রস্তুত করার আগে পরিকল্পনা কমিশন গেছে ভারতের আশীর্বাদ নিয়ে আসতে। অথচ তাজউদ্দীনকে ঝগড়া করতে দেখা যায় ভারতের সাথে। ফার্টিলাইজার কেনা কিংবা আন্তর্জাতিক পাট বাজার, দেশের স্বার্থে তাজউদ্দীন খাতির করেন না ভারতকে। 'তোমরা কেন পাট চাষ করবা? পাট চাষ বন্ধ করে তোমরা বরং আমাদের কাছ থেকে পাট কিনো। তোমাদের তো পাট উৎপাদনের খরচ বেশি। আমরাই তোমাদের কাছে পাট রপ্তানি করব।'

রাজনীতির ময়দানে গুজবের বুলেট ছোড়া হয় অর্থমন্ত্রীর দিকে। বলা হয় যুদ্ধের সময় নাকি গোপন চুক্তি করে তিনি ভারতের কাছে বেচে দিয়েছেন দেশ। তাজউদ্দীন ফাইল বের করে দিয়ে সহকর্মীদের দেখান ইন্দিরার সাথে তার নোট বিনিময়। সেখানে কেউ খুঁজে পায় না কত দামে বিকিকিনি হলো নতুন রাষ্ট্রটি। পরের চারটি দশকেও কেউ কেউ রাজনৈতিক সুবিধা লাভের আশায় প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে তাজউদ্দীন বিক্রি হয়েছেন। কিন্তু তারা সফল হয় না।

শিকারি গুজবের বাহুল্যে হয়তো মাঝে মাঝে উপদ্রব বোধ করেন তাজউদ্দীনের চারপাশের মানুষ। আবু সাঈদ চৌধুরী যেমন ইতস্তত করে তাকে মাঝে মাঝে বলেন, 'স্যার, বাজারে আপনাকে নিয়ে একটা গুজব খুব চালু। আপনি নাকি ভারতঘেঁষা। বাংলাদেশকে নাকি আপনি বিক্রি করে দিয়েছেন!'

তাজউদ্দীন কেবল মিটমিট করে হেসে যান এ কথা শুনে। কিন্তু একদিন বলে বসেন, 'চৌধুরী সাহেব, তাজউদ্দীনের একটা ভয়ানক দুর্বলতা আছে। সারা জীবন সে নীতির হিসেবে কারো সাথে বেইমানি করে নাই। কেউ কোনোদিন বলতে পারবে না তাজউদ্দীন তার সাথে বেইমানি করেছে। কারো সাথে শক্ত ব্যবহার হয়তো করেছি, কাউকে হয়তো মুখ খারাপ করে বহু কিছু বলেছি রাগের মাথায়, কিন্তু বেইমানি কখনো করি নাই।

...চৌধুরী সাহেব, আপনি জানেন না হয়তো, আমি জানি '৭১এ কী পরিস্থিতিতে আমি ভারতে আশ্রয় নিয়েছিলাম, কীভাবে বাংলাদেশের স্বাধীন মুখ দেখার ভাগ্য হয়েছে আমাদের। সেই দুঃখের দিনে ভারত আমাদের এক কোটি রিফিউজিকে এক বছর ধরে খাইয়েছে, সেই কারণে তাদের জন্যে আপনার কোনো কৃতজ্ঞতা থাকবে না? আমার কিন্তু আছে। এই কৃতজ্ঞতাবোধ থাকায় কেউ যদি বলে আমি প্রো-ইন্ডিয়ান, তাইলে তাই। কিন্তু আর কেউ না জানলেও আপনি তো জানেন চৌধুরী সাহেব, বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব বা অধিকার ক্ষুণ্ন হয়, এমন কোনো ব্যাপারে কিন্তু আমি ভারতকে একবিন্দু ছাড় দেবো না।

দেশ তার সার্বভৌমত্বের বিনিময়ে কারো প্রতি কৃতজ্ঞ থাকতে পারে না। যেমন নারী তার সতীত্ব বিসর্জন দিয়ে কৃতজ্ঞতার প্রতিদান দিতে পারে না।'

আবু সাইদ চৌধুরীর মাথা নিচু হয়ে যায়। 'স্যার, আমি আপনার সেক্রেটারি। আমার ভূমিকা সামান্য, কিন্তু আপনার ইমেজ অনেক বড়। নিজের সন্তুষ্টি দিয়ে আমি আপনার ইমেজ বদলাতে পারবো না।'

তাজউদ্দীন হাসেন। বলেন, 'সেটা না করলেও চলবে। আপনাকে কেবল একটা অনুরোধ, কোনো অপ্রিয় কথা যা আমার জানা দরকার, সেটা আপনি আমার কাছে লুকাবেন না। নির্লজ্জ প্রশংসার চেয়ে কটুবাক্য মানুষের কাজে লাগে বেশি।'

অন্য কারো মুখে এই কথা শুনলে আবু সাইদের হয়তো বাগাড়ম্বর মনে হতো, তাজউদ্দীনের ক্ষেত্রে তা হয় না। কারণ তিনি দেখেছেন কেউ তোষামুদে মনোভাব নিয়ে এলেই তাজউদ্দীন কয়েক কথার পরেই তাকে থামিয়ে দিয়েছেন। কাটা কাটা স্বরে বলেছেন, 'আপনার কী দাবি সেইটা বলেন। এইসব কথা আমারে বলার দরকার নাই, অন্য জায়গায় গিয়ে বলবেন।'

অনাবশ্যক প্রশংসা আর শিকারি গুজবকে উপেক্ষা করে গেলেও তাজউদ্দীন কিন্তু নির্লিপ্ত থাকতে পারেন না জনৈক ভাইপোর প্রতি। আবু সাইদ একদিন প্রত্যক্ষ করেন সে ঘটনাও।

পাকিস্তান আমলে কয়েক হাজার টাকা খন্দকার মোশতাক ঋণ নিয়েছিলেন ব্যাংক থেকে। সেই ধার মাফ করতে অনুরোধ করছেন মন্ত্রী মোশতাক, আর ফাইল ঘুরে ঘুরে এসে পৌঁছেছে অর্থ মন্ত্রণালয়ে। তাজউদ্দীন সেই দরখাস্ত পড়েন। এমন আদেখলাপনা তার নাপছন্দ হয়। অতএব তিনি ফোন করেন খন্দকার মোশতাককে।

'মোশতাক ভাই? শুনেন, আপনার লোন মাফ করে দেবার দরখাস্তটা নিয়ে ফোন করেছিলাম। ভাই, টাকাটা তো তেমন বড় অঙ্কের না। একজন মন্ত্রী হিসেবে আরেকজন মন্ত্রীর লোন মাফ করে দেয়াটা কেমন বিব্রতকর, এইটা কি আপনি বুঝেন না?

... না না, আপনি সাধারণ মানুষ হলে তো কোনো সমস্যা ছিল না। আপনি তো বাংলাদেশ সরকারের একজন মন্ত্রী, তাই না? তাহলে আপনি নিজেও তো বুঝেন যে এই কারণে আপনার সমালোচনা হতে পারে।'

ফোন রেখে দেয়ার পরেও তাজউদ্দীনকে বিরক্ত দেখায়। আবু সাইদ চৌধুরী বলেন, 'স্যার মোশতাক স্যার মনে হয় বিষয়টা ঠিক পছন্দ করলেন না, তাই না?'

তাজউদ্দীন খুব অপ্রসন্ন মুখে বলেন, 'দেখেন চৌধুরী সাহেব, এই আবেদন আমি হলে তো জীবনেও করতাম না। প্রথম বিষয় হচ্ছে অ্যামাউন্টটা খুব বড় না। তারপরে ধরেন মুক্তিযুদ্ধে আমাদের সবারই কম বেশি ক্ষতি হয়েছে। আমার গাড়ি চুরি গেছে, দেশের বাড়ি পুড়ায়ে দেয়া হইছে। এখন এইজন্যে কী আমি সরকারের কাছে কোনো ক্ষতিপূরণ বা ঐরকম কিছু চাইছি?'

আবু সাইদ চৌধুরী মাথা চুলকে বলেন, 'তারপরেও স্যার, যেহেতু সবদিক থেকে রেকমেন্ড হয়ে আসছে বিষয়টা, আবার উনিও একটু রাগ মতো করেছেন, আপনি ভেবে দেখেন। উনাকে এইটুকু সুবিধা দেয়া গেলে খারাপ কী...'

তাজউদ্দীন সই দিয়ে দিলেন ফাইলে। এরপর হঠাৎ, যা কখনো করেন না সচরাচর, তেমনই একটি তীর্যক মন্তব্য করে বসেন তিনি। 'চৌধুরী সাহেব, আপনারা কেউ ওই লোকটাকে চিনতে পারেন নাই। কিন্তু ওই লোকটা একটা ভাইপার। আমি জানি, সাপের চেয়েও বিষাক্ত ঐ মানুষটা।'

অভিজ্ঞতা এভাবেই তাজউদ্দীনকে ফিসফিসিয়ে বলে যায়, সামনের দিনে শিকারি গুজবের চাইতেও এই সহযাত্রী সরীসৃপেরাই অধিক অনিষ্টকর হয়ে উঠবে দেশের জন্যে। কিন্তু অদৃষ্ট জানে, আতশ কাচের তলায় ফেলে ভাইপারদের চিহ্নিত করার অবসর তাজউদ্দীনের মতো হাতে গোনা কিছু মানুষ ছাড়া অন্যদের হয়ে উঠছে না। বর্ণ পালটানো গিরগিটির মতো মোশতাক নিজেকে ধীরে ধীরে শেখ মুজিবের সামনে নতুন করে উপস্থাপন করছেন, আর পুরনো বিষদাঁত নিয়ে প্রস্তুত হচ্ছেন সুযোগের অপেক্ষায়।

ম্যাজিশিয়ান মুজিবের যত প্রতিপক্ষ

জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনের একেকজন ভিভিআইপি লম্বা করতালি দিতে জোট বেঁধেছিলেন ইয়াসির আরাফাতের পরিচিতি পর্বের সময়। কিন্তু বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানকে পরিচয় করিয়ে দেবার পর সম্মেলন কক্ষে এক অভূতপূর্ব দৃশ্যের দেখা মিলল। পাজামা-পাঞ্জাবির উপর কালো কোট চাপিয়ে আসা ঐ মানুষটি স্মিত হাসি নিয়ে মঞ্চে দাঁড়াতেই পুরো সম্মেলন কেন্দ্রই যেন উঠে দাঁড়াল হাততালির শব্দ সমেত। কক্ষের এপ্রান্ত থেকে ওমাথা, ঘাড় ঘুরিয়ে সবাই দেখার চেষ্টা করতে লাগলেন মুজিবকে, অগণিত নাইট ক্লাব আর ক্যাবারের

নগরী এই আলজিয়ার্সের একমাত্র ইংরেজি দৈনিক যাকে নিয়ে গতকাল ফেঁদেছে এক পৃষ্ঠার বিশেষ প্রতিবেদন, যার শিরোনাম 'দি লিডার উইদাউট বিয়ার্ড, হু নিদার ভিজিটেড অ্যানি নাইট ক্লাব নর টাচড ড্রিঙ্কস ইন হিজ লাইফ!'

পুঁজিবাদ আর সমাজতন্ত্রের ডুয়েলে পৃথিবী টলছে, আর দুইয়ের মাঝে পড়ে চ্যাপ্টা বাংলাদেশকে সোজা রাস্তায় আনতে শেখ মুজিবকে আশ্রয় করতে হয়েছে নিজের জাদুকরী ব্যক্তিত্বকেই। এই সম্মেলনে যোগ দিতে আলজেরিয়ার রাজধানীতে ছুটে আসাও সে কারণে। বাংলাদেশের দরকার বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রগুলোর স্বীকৃতি, মাটিতে মিশে যাওয়া অর্থনীতিকে দাঁড় করাতে বাংলাদেশের প্রয়োজন সাহায্য। দেশের অভ্যন্তরীণ শত সমস্যা মাথায় রেখেও শেখ মুজিবকে তাই ছুটে বেড়াতে হচ্ছে কমলালেবু পৃথিবীর ওপর নিচ।

'বিশ্ব কেবল দুই ভাগে বিভক্ত, শাসক আর শোষিত!' শেখ মুজিব তার উদাত্ত ভাষণে বলেন। 'আমাদের বাঁচাতে হবে শোষিত বিশ্বকে।'

মুজিবের আড়ম্বরহীন ভাষণ প্রভাবিত করে দর্শক সারির মার্শাল টিটো, ফিদেল ক্যাস্ট্রো, শ্রীমাভো বন্দরনায়েকে, আনোয়ার সাদাত, ইন্দিরা গান্ধীদের। শেখ মুজিব ভেসে যান তাদের অবিমিশ্র প্রশংসায়। কিন্তু মুজিবের দায়িত্ব কেবল এই হাততালি অর্জন করাতেই থেমে থাকে না। তাকে আদায় করতে হবে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতি সমীহ। বিশেষ করে দুনিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম জনসংখ্যা অধ্যুষিত বাংলাদেশের প্রতি মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর বৈরী ভাব ছিঁড়ে ফেলতে হবে তাকে। মুজিব তাই বৈঠকে বসেন ইসলামী দেশগুলোর রাষ্ট্রপ্রধানদের সাথে।

প্রথমেই রোদে ঝলসানো রুক্ষ চেহারার কর্নেল গাদ্দাফির সাথে মোলাকাত করেন বাংলাদেশের নদীর গন্ধ বুকে বয়ে আনা শেখ মুজিব। প্রথমজন বিশ্বাস করেন সদাশয় একনায়কতন্ত্র আর দ্বিতীয়জনের নিষ্ঠা গণতন্ত্রে। আলোচনা চলে। হাসিঠাট্টায় পরিবেশও শুরুতে বেশ লঘু বোধ হয়।

প্রেসিডেন্ট গাদ্দাফি হঠাৎ করেই নিয়ে আসেন ছন্দপতন। 'এক্সেলেন্সি, আমি চাই আপনার সাথে আন্তরিক বন্ধুত্ব পাতাতে। আমি চাই আপনি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মুসলিম দেশগুলোর নেতৃত্ব দিন। সেক্ষেত্রে আপনি আমার সমর্থন পাবেন, আমি চাই মধ্যপ্রাচ্যের নেতৃত্ব দিতে। কিন্তু, মাই ডিয়ার মুজিব, আপনাকে আমি প্রথমেই অনুরোধ করবো আপনার দেশের নামটা বদলে দিতে। আপনি নামটা 'ইসলামী প্রজাতন্ত্র বাংলাদেশ' করে দিন।'

শেখ মুজিব বুঝি পাইপের ধোঁয়ায় চারপাশ আচ্ছন্ন করে দেন কিছুটা। বিনয়ী স্বরে বলেন, 'কিন্তু এ প্রস্তাব মেনে নেয়া যে আমার পক্ষে সম্ভব নয়! আপনার লিবিয়ায় অমুসলিম লোক নেই বললেই চলে। আমার বাংলাদেশে কিন্তু প্রায় এক

কোটি অমুসলিম আছে, তাদের কথাও তো মাথায় রাখতে হবে। মহান আল্লাহ তো শুধু আল মুসলেমিন নন, তিনি তো রাব্বুল আলামিন!'

অকাট্য যুক্তিতে বেঁকে যায় গাদ্দাফির ভ্রূ যুগল। কুঁচকানো ভ্রূ নিয়েই তিনি বলেন, মুজিবের সরাসরি বাতচিৎ আর ব্যক্তিত্ব মুগ্ধ করেছে তাকে, কিন্তু তার সমস্ত কথার সাথে একমত হতে পারেননি তিনি। অতএব, বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার বিষয়টা নিয়ে আরো ভাববে লিবিয়া, এই কথা দিয়ে গাদ্দাফি শেষ টানেন বৈঠকের। শেখ মুজিবের মনে হয়, কোথায় যেন ফাঁক রয়ে গেল!

মুজিব এরপরে আলোচনায় বসেন সৌদি বাদশাহ ফয়সালের সাথে। অনেকটা যেন ক্রুসেডের সেই সিংহ হৃদয় রাজা রিচার্ড আর সুলতান সালাদিনের মতোই প্রেক্ষিত তাদের ঘিরে, ব্যক্তিত্বের ভারে দুইজনে পাল্লা দিচ্ছেন সমানে, কিন্তু মতামত তাদের দুই মেরুতে।

বাদশাহ ফয়সাল বলেন, 'আপনার বাংলাদেশ কি কোনো সাহায্য চায় আমাদের থেকে? আগেই বলে রাখি, সাহায্যের জন্য কিন্তু আমাদের কিছু পূর্বশর্ত আছে!'

মুজিব উত্তর দেন গমগমে গলায়। 'এক্সেলেন্সি, বেয়াদপি মাফ করবেন। বাংলাদেশ তো ফকির মিসকিন নয়, যে সাহায্যের জন্যে হাত পেতে রয়েছে। বাংলাদেশ একটি মুসলিম দেশ। সে দেশের মুসলমানেরা চায় আল্লাহর ঘর কাবা শরীফে হজ করতে। মুসলিম ভাইদের হক আদায় করতেও কি আপনাদের শর্ত পূরণ অপরিহার্য? যদি তা না হয়, তবে কেন আপনার দেশ আমাদের স্বীকৃতি দিচ্ছে না?'

ফয়সাল এবার সরাসরিই দাবি রাখেন। 'আপনি মুসলমান, আপনাকে খোলাখুলিই বলি। দ্রুত স্বীকৃতি চাইলে আপনার দেশের নাম পালটে ইসলামিক রিপাবলিক অফ বাংলাদেশ করুন।'

'আপনাদের দেশটার নামও কিন্তু ইসলামিক রিপাবলিক অব সৌদি অ্যারাবিয়া নয়, সেটা কিংডম অব সৌদি অ্যারাবিয়া, এক্সেলেন্সি! আমরা কিন্তু সেই নামে আপত্তি করিনি।' চটজলদি উত্তর দেন মুজিব।

এরপরে উদ্ভট এক দাবি তোলেন বাদশাহ ফয়সাল। 'এক্সেলেন্সি, সৌদি আরব আর পাকিস্তান, এই দুই দেশ পরস্পরের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। অবিলম্বে পাকিস্তানের সব যুদ্ধবন্দীকে ছেড়ে দিন আর দেশের নাম পালটে ফেলুন। আশা করি তারপর বাংলাদেশের জন্যে সাহায্যের অভাব হবে না।'

কোনো গন্তব্যের দিকে না যাওয়া আলোচনাটা মুজিবই শেষ করেন এরপর। মাথা নোয়াতে নারাজ তিনি তখনো। 'এক্সেলেন্সি, যুদ্ধবন্দির বিষয়টা বাংলাদেশ আর পাকিস্তানের দ্বিপাক্ষিক ব্যাপার সেটা আমাদের মাঝেই থাক। কেবল পবিত্র

কাবা শরিফে বাংলাদেশের মুসলমানেরা হজ করতে প্রবেশাধিকার পায় না কেন, এ বিষয়টা আপনার বিবেচনার জন্যে রেখে গেলাম।'

সফরের শেষ ভাগে শেখ মুজিব মুখোমুখি হলেন ফিদেল ক্যাস্ট্রোর। বুলেটপ্রুফ লিমুজিনে চেপে কড়া নিরাপত্তা বলয়ের মাঝে আসেন ক্যাস্ট্রো, কিন্তু মুজিবকে দেখে যেন সমস্ত সতর্কতা ভুলে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন শিশুর মতোই। তবে আলোচনা যখন শুরু হয়, শাণিত পর্যবেক্ষণে ওই গেরিলা মানুষটি কেবলই চমকে দিতে থাকেন মুজিবকে।

'ডিয়ার মুজিব, আপনার সময় শেষ। দ্রুতই সামলে না উঠলে আপনার অবস্থা চিলির প্রেসিডেন্ট আলেন্দের মতোই হতে যাচ্ছে।'

চশমার আড়ালে শেখ মুজিবের চোখ জোড়ায় চিন্তা ফুটে উঠল। বিদেশি টাকাপয়সার মদতে চিলির পরিস্থিতি এখন ভয়াবহ। একদিকে সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী আলেন্দে, অন্যদিকে মার্কিন প্রশাসন আর সিআইএ'র সমর্থনপুষ্ট কিছু সামরিক জেনারেল। গুরুতর পরিস্থিতির কারণে প্রেসিডেন্ট আলেন্দে এই সম্মেলনে পর্যন্ত আসতে পারলেন না। মুজিব তাই উদ্বেগ নিয়ে আসেন গলায়। 'ভূমিকা না করে আসল কথাটাই বলুন না এক্সেলেন্সি!'

'আপনি যুদ্ধে হেরে যাওয়া একটা প্রশাসনকে এখনো চেয়ারে রেখেছেন, ডিয়ার মুজিব। আপনার পরিণতি শুভ হবে না।'

'কিন্তু বাংলাদেশ পুনর্গঠনের জন্যে যে আমার অভিজ্ঞ বুরোক্রেট দরকার!' মুজিব বলেন।

'কিসের অভিজ্ঞ ঐ বুরোক্রেটেরা? এত অভিজ্ঞতা নিয়ে তো এরা পাকিস্তানকেই বাঁচাতে পারল না!' ক্যাস্ট্রোর গলায় ঝাঁজ। 'কমরেড মুজিব, আপনি সাংবাদিক-আইনজীবী-ইঞ্জিনিয়ার-শিক্ষক, যাকে খুশি এনে প্রশাসনে বসান। এরা ভুলের পরে ভুল করবে, কিন্তু ষড়যন্ত্র করবে না। ঈশ্বরের দোহাই, ঐসব আমলাদের উপর ভরসা রাখবেন না। তার চেয়ে আপনার মুক্তিযোদ্ধাদের বেশি করে কাজে লাগান।'

'আপনি বলে যান এক্সেলেন্সি, আমি আরো শুনতে চাই।' মুজিব গম্ভীর স্বরে বলেন।

'আমার দেহরক্ষীদের দেখুন।' ক্যাস্ট্রো অঙ্গুলিহেলনে নির্দেশ করেন। 'মিলিয়ন ডলার দিয়েও ওদের কেনা যাবে না। কারণ যুদ্ধের সময় আমরা এক বাঙ্কারে থেকে যুদ্ধ করেছি। এদের আমি জীবনের চেয়েও বেশি বিশ্বাস করি। কিন্তু আপনি কাদের উপর আস্থা রাখলেন কমরেড? দুনিয়ার কোথাও পরাজিত প্রশাসনের লোকেদের নতুন রাষ্ট্রের দায়িত্ব দেয়া হয় না। ভয় হচ্ছে, আপনার অবস্থাও ঐ আলেন্দের মতোই হবে এক্সেলেন্সি। সাবধান না হলে আপনি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবেন!'

অদূরে ভূমধ্য সাগরের সৈকতে তখন শেষ বিকেলের রোদ। নিঃসঙ্গ গাংচিল ডাকছে মাঝে মাঝে। এমন পরিবেশে ফিদেল ক্যাস্ট্রো বিদায় নেন। বলে যান, 'কমরেড মুজিব, আই লাভ ইউ। আই লাভ বাংলাদেশ!' পেছনে রেখে যান চুরুটের ধোঁয়া, আর মনের ভেতর পুড়তে থাকা শেখ মুজিবকে।

যেখানেই গেছেন, প্রাণখোলা হাসি আর প্রবল পার্সোনালিটিতে শেখ মুজিব মুগ্ধ করেছেন মানুষকে। কিন্তু কূটনীতির কালোজাদুতে পূর্ণ আধুনিক পৃথিবীতে শেখ মুজিবের মতো প্রাচীন জাদুকর যেন বা বেমানান। মার খেয়েছেন, জেল খেটেছেন, মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছেন তিনি। তবুও এমন পরিস্থিতি অসহনীয় ঠেকছে তার কাছে। তার পিতাসুলভ বকুনি দেয়া শাসন কাজে লাগছে না সদ্যোজাত দেশটির ভেতরের রাষ্ট্রীয় সমস্যা নিয়ন্ত্রণে। আর বহির্বিশ্বের মোড়লদের একের পর এক বিপরীতমুখী ইঙ্গিতে বাংলাদেশের মাথার উপরে বটগাছ হয়ে ছায়া দিয়ে যাওয়া মানুষটি যেন বিভ্রান্ত।

পাকিস্তানের অপপ্রচারে বিভ্রান্ত মুসলিম দেশগুলো এখনো স্বীকৃতি দিচ্ছে না বাংলাদেশকে। যুদ্ধবন্দি আর যুদ্ধাপরাধীদের নিয়েও পাকিস্তানের মিত্র পরাশক্তিগুলো বেকায়দায় ফেলে দিচ্ছে রুগ্‌ণ শিশুর মতো দেশটিকে। মুজিব ম্যাজিক কি কাজ করবে এখনো?

রাজ মুকুটের দাগ

লাল টেলিফোনটা যখন বেজে উঠল আবু সাইদ চৌধুরী তখন তাজউদ্দীনের সাথে ছোটখাটো একটা আলাপের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। আবু সাইদের হাতে কয়েকটা ফাইল, তাজউদ্দীন হাতে কলম নিয়ে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন তাকে, এমন সময়েই ফোনটা বেজে ওঠে। কোন টেলিফোনে রিং হচ্ছে, সেটা খেয়াল হতেই আবু সাইদ সচকিত হয়ে ওঠেন। 'স্যার, প্রাইম মিনিস্টার ফোন করেছেন!'

তাজউদ্দীন কলমটা নামিয়ে রেখে দ্রুত হাতে রিসিভার তোলেন। 'হ্যালো, তাজউদ্দীন বলছি...'

ফোন কানে চেপে অপর পাশের বক্তব্য শুনতে থাকেন তাজউদ্দীন। আবু সাইদ চৌধুরী ভাবতে থাকেন, এত সকালে শেখ মুজিব কী ভেবে ফোন দিলেন। আজ তো কোনো গুরুত্বপুর্ণ মিটিংও নেই!

'হ্যাঁ হ্যাঁ, শামসুল আলমের দরখাস্তটা। হ্যাঁ, ওইটা আমিই ফেলেছি...' তাজউদ্দীন বলেন এপাশ থেকে।

চট করে আবু সাইদ যেন বিষয়টা কিছুটা আঁচ করতে পারেন। খুব সম্ভব জেড এম শামসুল আলমের কথা হচ্ছে। ছয় দফার বিরুদ্ধে আর অখণ্ড পাকিস্তানের দাবিতে এই লোক পেপারে প্রচুর লেখালেখি করেছিল। এমনকী যখন

মুক্তিযুদ্ধ চলছে, সে সময়েও এই লোক আর্টিকেল লিখে গেছে পাকিস্তানিদের পক্ষে।

যুদ্ধের পর বাংলাদেশ সরকার শামসুল আলমের নাগরিকত্ব বাতিল করে। সেই ব্যাটা তখন ওয়াশিংটনে। পাকচক্রে আবু সাইদেরা যখন ওয়াশিংটন গেছেন, তাদের খোঁজ পেয়ে শামসুল আলম তখন দেশে ফিরবার আবেদন করেন অর্থমন্ত্রীর কাছে। তাজউদ্দীন প্রচণ্ড রাগারাগি করেন লোকটার সাথে, কিন্তু দেশে ফিরে লোকটির দেয়া দরখাস্তটি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে ঠিকই পৌঁছে দেন তিনি। বঙ্গবন্ধু হয়তো আজ সে বিষয়েই ফোন দিয়েছেন। সত্যি বলতে কী, একজন দালালের দরখাস্ত তাজউদ্দীন কেন সুপারিশ করেছেন, সে বিষয়টা ঠিক স্পষ্ট নয় তার একান্ত সচিবের কাছে। বিশেষত যেখানে মুক্তিযুদ্ধের কথা উঠলেই তাজউদ্দীন প্রচণ্ড ইমোশনাল হয়ে যান, সেখানে এরকম একটা ঘটনা বড় অদ্ভুত লাগে।

আবু সাইদ হয়তো আরো খানিক ভাবতেন কিন্তু ফোনের এপাশে তাজউদ্দীনের গলা শুনে তিনি কান খাড়া করেন।

'...না না মুজিব ভাই, এই বিষয়ে আপনার কাছে আমার কিছু কথা ছিল। প্রথম কথা হচ্ছে, এই লোক বাংলাদেশের নাগরিক। আমাদের কোনো অধিকার নাই যেই লোক বাংলাদেশে জন্মেছে তার নাগরিকত্ব বাতিল করার। এটা ঠিক না। দ্বিতীয় বিষয় হইলো, এইসব দালালেরা যদি বাইরেই থাকে, তাহলে আমরা এদের বিচার করবো কী করে? তার দরখাস্ত জমা পড়েছে, তাকে দেশে নিয়ে আসেন, এরপর তার বিচারের ব্যবস্থা করেন।'

শেখ মুজিব হয়তো ফোনের অন্যপাশে কিছু বলেন এই পর্যায়ে। তাজউদ্দীন খানিক সেটা শুনে আবার বলেন। 'সেটা হয় না মুজিব ভাই। গোলাম আযমদের মতো সবাইকেই দেশে ফিরিয়ে আনতে হবে। এইসব লোকে বিদেশে থাকলে তো তাদের শাস্তি হলো না। দেশের মানুষ তো জানিতেই পারল না এরা কী জঘন্য অপরাধ মুক্তিযুদ্ধের সময় করেছিল। সুতরাং ওদের দেশে আনতে হবে, এনে বিচার করতে হবে। বিচারে যে রায় হয়, সেটাই তারা পাবে।'

অপরপ্রান্তে শেখ মুজিব আরো কিছুক্ষণ কথা বলেন। তাজউদ্দীন সেটা শুনে ফোন নামিয়ে রাখেন ধীরে। তাকে দেখে আবু সাইদের মনে হয়, এই মুহূর্তে মানুষটির মন দূরে কোথাও চলে গেছে। চশমার আড়ালে তাজউদ্দীনের শূন্য দৃষ্টি দেখে আবু সাইদ নীরব থাকেন কিছুক্ষণ।

তাজউদ্দীন আসলে ভাবছেন। দেশের কোষাগার আর বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ প্রায় শূন্য, টালমাটাল অর্থনীতিকে সোজা করতে হলে আর অন্য কোনো দিকে বিন্দুমাত্র মনোযোগ দিলে চলে না এ মুহূর্তে। কিন্তু এইসব শিক্ষিত দালালেরা, যারা নৃশংসতায় প্রায়ই ছাড়িয়ে গেছে পাকিস্তানি আর্মির গণহত্যাকেও,

তাদের বিচার নিয়ে তিনি নির্বিকার থাকেন কী করে! এদের ছেড়ে দিলে ইতিহাস তো তাদের ক্ষমা করবে না!

তবে কাজটা সহজ নয়, তাজউদ্দীনের মনে হয়। দেশ স্বাধীন হবার ঠিক পরপর তার মূল লক্ষ্য ছিল মুজিব ভাইকে ফিরিয়ে আনা। সে মুহূর্তে দালালদের বিচার করবার মতো পরিস্থিতি ছিল না। সত্যি বলতে কী, পাকিস্তানের মিত্র রাষ্ট্রগুলো এখনো সেই কাজ যথেষ্ট দুরূহ করে রেখেছে। এই তো, মাস কয়েক আগে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী উইলিয়াম রজার্সের কথা শুনেও তাজউদ্দীনের সেটাই মনে হয়েছে।

তারা ওয়াশিংটন গিয়েছিলেন আন্তর্জাতিক অর্থ ব্যবস্থা সংস্কার কমিটির মিটিং-এ। খাদ্য সরবরাহ আর ঋণের বোঝা ভাগ করে দেয়ার প্রাসঙ্গিক কথাবার্তার পর হঠাৎ করেই উইলিয়াম রজার্স কথা তুললেন যুদ্ধবন্দীদের বিচারের। 'মিস্টার তাজউদ্দীন, আশা করি বাংলাদেশ সরকার যুদ্ধবন্দীদের বিচার নিয়ে নমনীয় হবেন। দেখুন না, নাইজেরিয়া কেমন বায়াফ্রার যুদ্ধাপরাধীদের মাফ করে দিয়েছে!'

মুহূর্ত পরেই তাজউদ্দীন মুখর হয়ে ওঠেন এই কথার প্রতিবাদে। 'মাফ করবেন, আপনার বক্তব্য ঠিক মানতে পারলাম না। বায়াফ্রায় একটা সংখ্যালঘু গোষ্ঠী ফেডারেশনের বিপক্ষে যুদ্ধ করে ব্যর্থ হয়েছে। বাংলাদেশে কিন্তু সংখ্যালঘুরাই ছিল ক্ষমতাশালী আর তারা সংখ্যাগরিষ্ঠের ওপর পাশবিক অত্যাচার চালিয়েছে। তাদের গণহত্যার বিবরণ তো আপনাদের মার্কিন সাংবাদিকেরাই কাগজে লিখেছে!'

বিব্রত রজার্স আর কথা বাড়াতে চাননি এ প্রসঙ্গে। কেবল বলেছেন, 'আমাদের সম্পর্ক যেহেতু এখন ভালো, আপনার সাথে দেখা হওয়ায় খুব ভালো লাগছে।'

তাজউদ্দীন উত্তরে অবশ্য খোঁচা দিতে ছাড়েননি। 'আপনাদের সহায়তা পেয়ে আমাদেরও খুব ভালো লাগছে, ধন্যবাদ। তবে আমেরিকার মানুষ আর সংবাদ মাধ্যমের সাথে আমাদের সম্পর্ক কিন্তু সবসময়ই ভালো ছিল।'

'স্যার, ' তাজউদ্দীনের শূন্য দৃষ্টি ঘরে ফিরে আসে আবু সাইদের মৃদু স্বরের প্রশ্নে। 'কিছু ভাবতেছেন?'

অর্থমন্ত্রী জোর করে একটু হাসার চেষ্টা করেন। 'নাহ, তেমন কিছু না। বুঝলেন চৌধুরী সাহেব, ভাবতেছিলাম যে যুদ্ধাপরাধী আর যুদ্ধবন্দীদের বিচার করাটা খুব সহজ হবে না আমাদের জন্যে।'

এতক্ষণ মনের ভেতরে যে প্রশ্নটা ঘুরে বেড়াচ্ছিলো আবু সাইদের, এ কথা শুনে সেটাই বেরিয়ে আসে তার মুখ দিয়ে। 'স্যার, তাই বলে আপনি গোলাম আযমদের দেশে ফেরত নিতে বলবেন?'

তাজউদ্দীনের স্বর একটু উঁচু হয়। 'অবশ্যই গোলাম আযম বাংলাদেশে ফিরবে, সে ফিরবে বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে। তারপর আমরা যুদ্ধাপরাধের জন্যে তার বিচার করবো। সবচেয়ে বড় কথা, তার দেশের মানুষ জানবে তার অপরাধ কী ছিল। তারা অপরাধীকে ঘৃণা করবে, তাদের মাঝে দেশপ্রেম বাড়বে। ...দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কথা খেয়াল করেন। জার্মান যে যুদ্ধাপরাধীরা ছিল, তাদের কি নাগরিকত্ব বাতিল করা হয়েছে? হয় নাই! ট্রাইব্যুনালে তাদের বিচার হয়েছে। আদালতে যে শাস্তি তারা পেয়েছে, সেটাই তাদের দেয়া হয়েছে।'

আবু সাইদ চৌধুরী এক দৃষ্টিতে তাজউদ্দীনের দিকে চেয়ে থাকেন খানিকক্ষণ। খুব সম্ভবত তিনি এই মানুষটিকে বুঝতে পারছেন। মাথা গরম করে আবেগের বশে কিছু তাজউদ্দীন বলছেন না। তাজউদ্দীন ঠান্ডা মাথায় জানাচ্ছেন আইনের প্রতি তার আস্থাশীলতার কথা। ভবিষ্যৎ বংশধরদের সামনে মাথা উঁচু করে যেন আজকের ইতিহাস কথা বলতে পারে, তাজউদ্দীন দূরদৃষ্টিতে সেই নকশা দেখাচ্ছেন।

ধীরে ধীরে আবু সাইদ চৌধুরী বলেন, 'স্যার, আপনি যা বলছেন, সেটা আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু দেশের ভেতর এত রকম সমস্যা, এত রাজনৈতিক অর্থনৈতিক গোলমাল; শুনতেছি বঙ্গবন্ধুর উপরও নানা দিক থেকে বিচার বন্ধ করার প্রেশার দেয়া হচ্ছে। এসবের মাঝে আমরা ঐ লোকগুলার বিচার করতে পারবো তো ঠিকঠাক?'

তাজউদ্দীন জানালার দিকে তাকান। দূরের কোনো কার্নিশে চোখ রেখে তিনি বলেন, 'চৌধুরী সাহেব, বই পড়েন। বই পড়েন, ইতিহাস পড়েন। পড়লে বুঝবেন, সশস্ত্র যুদ্ধ করার পর একটা দেশের অবস্থা কী হয়। অন্য অনেক দেশেই এমন হয়েছে। আমাদের দেশেও এখন যে অস্থিতিশীল অবস্থা, এটা সাময়িক। দেখবেন, এর থেকে আমরা নিশ্চয়ই বের হয়ে আসবো। তবে সব কিছুই নির্ভর করবে আমাদের উপরে। আমাদের ঠিক সিদ্ধান্ত নেয়ার উপরে।'

হতাশ হওয়া তাজউদ্দীনের ধাঁতে নেই। তাজউদ্দীন তাই নিয়ত আশা দিয়ে যান আশপাশের মানুষদের। কিন্তু রথে চড়া সিংহাসন যদি ছুটে যায় অশান্ত যুদ্ধক্ষেত্রে বাড়িয়ে রাখা ধারালো সব তলোয়ারের মাঝ দিয়ে, রাজমুকুট কি তখন আঁচড়হীন থাকতে পারে? যুক্তি বলে, মুকুটেও এতদিনে জমে গেছে অজস্র আঘাতের দাগ। কিন্তু রথের চারপাশের নিশ্চল মানুষরা সে দাগ চোখে দেখে না।

অপপ্রচারের অস্ত্র, অসন্তোষের আগুন

আবদুল গাফফার চৌধুরীর হাতে একটা লাল রঙের কলম, সামনের টেবিলে রাখা একতাড়া কাগজের ওপর তিনি সেটা মাঝে মাঝে নামিয়ে আনছেন। লেখা কাঁটাছেঁড়া করার সময়টুকু বাদ দিলে গাফফার চৌধুরী খুব অস্থিরভাবে তার আসন নাড়াচ্ছেন। কখনো কখনো নড়াচড়া এত বেড়ে যাচ্ছে যে টেবিলের অন্য প্রান্তে বসে থাকা আলাউদ্দীন ভয় পাচ্ছে, রিভলভিং চেয়ারের দুয়েকটা পায়া খুলে না আসে!

স্থান দৈনিক জনপদের সম্পাদকের ঘর, সময়টা শেষ বিকাল। আলাউদ্দীন এই প্রথম গাফফার ভাইয়ের অফিসরুমে ঢুকল। সত্যি বলতে, গাফফার ভাইয়ের সাথে দেখাও হলো প্রায় সপ্তা তিনেক পর। শেষ সাক্ষাতে সে গাফফার ভাইকে কথা দিয়েছিল উনার দৈনিকে টুকটাক কন্ট্রিবিউটরের কাজ করবে বলে। আজ আলাউদ্দীন একটা স্বল্পদৈর্ঘ্য ফিচার নিয়েই এসেছে সাথে।

'মনির! এই মনির!' গাফফার চৌধুরী গলা তুলে চেঁচান হঠাৎ। 'যা তো, এই লেখাটা নিউজ ডেস্কে দিয়া আয়।'

ছোটখাটো একটা ছেলে এসে গাফফার চৌধুরীর সামনে থেকে কাগজটা নিয়ে যায়। সম্পাদক এবার আলাউদ্দীনকে নিয়ে পড়েন, 'কী ব্যাপার আলাউদ্দীন মিয়া? তোমারে কত করে বললাম ডিসেম্বরের ফার্স্ট উইকে আসো, তুমি মিয়া আসলা প্রায় তিন হপ্তা পরে। মানে হয়!'

আলাউদ্দীন মাথা চুলকে আক্রমণ এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে। 'না, মানে, গাফফার ভাই, ছাত্র মানুষ কোন দিকে কখন দৌড়ানি লাগে ঠিক নাই তো কোনো...

তবে আসতে দেরি হইলেও আপনার দেয়া কাজ ভুলি নাই। দেখেন, সাথে করে প্রথম লেখাও নিয়া আসছি!'

গাফফার চৌধুরী ছোঁ মেরে কাগজের তোড়াটা নিয়ে নেন আলাউদ্দীনের কাছ থেকে। 'দেখি কী আনলা!'

আলাউদ্দীন মনে মনে হাসে। ফিচারটা গাফফার ভাইয়ের পছন্দ হবে। সে লিখেছে আবাহনী ক্লাব নিয়ে, ধানমণ্ডির ঐ প্রাক্তন ইকবাল স্পোর্টিং ক্লাবের দিকে তার নিয়মিত আসা যাওয়া। শেখ কামালের প্রতিষ্ঠা করা ক্লাবটির মাঠের কোনায় একটা ছোট্ট টিনের ঘর আছে। নামীদামি ফুটবলারেরা প্রায়ই আড্ডা দেন সেখানে। কামাল ভাই আবার ব্যান্ড সংগীতেরও পৃষ্ঠপোষকতা করেন একটু একটু, মাঝে মাঝেই ঐ টিনের ঘরে গিটার-ড্রাম-ফ্লুটসহ গানের আসর বসে। আলাউদ্দীন লিখেছে সেসব নিয়েই।

যা ভেবেছিল, তাই হয়। গাফফার চৌধুরী সোৎসাহে লেখাটা ধরে নাড়াতে থাকেন। 'বেশ ভালো হইছে। এইটা আগামী শুক্রবারে দিয়া দিবো বুঝলা। ক্যারি অন, এইভাবেই হবে।... ঐ মনির! দুইটা চা দে!'

চায়ের কথা বলেই গাফফার চৌধুরীর যেন কিছু মনে পড়ে যায়। 'শেখ কামালের খবরটা শুনছো?'

মাথা নাড়ে আলাউদ্দীন, সে শুনেছে। শেখ কামাল বড় উদ্ভট পরিস্থিতিতে জড়িয়ে গেছেন।

বিজয়দিবসের ঠিক আগে আগে ঢাকায় গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল, সিরাজ শিকদার আর তার সর্বহারা পার্টি শহরে নামছে। তারা লিফলেট ছড়াবে, দেয়ালে চিকা মারবে, অতর্কিতে পুলিশের উপর হামলা করবে নাকি। ১৫ ডিসেম্বর রাতে তাই ঢাকার পুলিশ বাড়তি সতর্ক, টহল দিচ্ছিলো তারা শহর জুড়ে। ওদিকে শেখ কামাল তার জনাকয় বন্ধু নিয়ে মাইক্রোবাসে করে একই রাতে বেরিয়ে পড়েছিলেন ঢাকার রাস্তায়, তাদের লক্ষ্যও সিরাজ শিকদার। গভীর রাতে টহলরত স্পেশাল পুলিশের একটি দলের মুখোমুখি হয় কামালের মাইক্রোবাস। স্পেশাল পুলিশ গুলি চালায় মাইক্রোবাসে, শেখ কামালের গায়েও লাগে বুলেট। পরিচয় দেয়ার পরে দ্রুতই তাকে নেয়া হয় হাসপাতালে। মুক্তিযুদ্ধে প্রধান সেনাপতি ওসমানীর এডিসি হিসেবে কাজ করেছিলেন শেখ কামাল, কিন্তু এই ঘটনার পরে শহরে ভোজবাজির মতো প্রচার হয়ে যায় ব্যাংক ডাকাতি করতে গিয়ে গুলিবিদ্ধ হয়েছে সে।

'স্যাড স্টোরি।' গাফফার চৌধুরী মাথা নেড়ে বলেন। 'শেখ মুজিব কিন্তু পুলিশ টিমটার সার্জেন্টের খুব প্রশংসা করছেন। শুনলাম, রাগ কইরে নাকি উনি কামালকে হসপিটালে দেখতেই যান নাই কয়েকদিন।'

'ঠিকই শুনছেন।' আলাউদ্দীন বলে। 'আমি দুই দিন পরে কামাল ভাইরে দেখতে গিয়া দেখলাম বঙ্গবন্ধু বইসা আছেন বেডের পাশে। কামাল ভাইরে রাগ কইরে বলতেছেন, বাপের বদনাম কুড়াইস না কামাল, তার আগে আমারে গুলি কইরা মার!'

'অথচ ট্রাজেডিটা কী দেখো,' গাফফার চৌধুরী বলেন। 'লোকে বলতেছে শেখ মুজিবের ছেলে ব্যাংক ডাকাতি করতে গিয়া গুলি খাইছে।'

'প্রোপাগান্ডা খুব সাংঘাতিক জিনিস গাফফার ভাই।' আলাউদ্দীন বলে। 'আসল ঘটনা নিয়া কিন্তু মর্নিং নিউজ পত্রিকায় একটা খবর পর্যন্ত ছাপা হইছিল, কিন্তু মানুষ সেইটা ভুইলা গেছে। বেশ কিছু লোক আসলে শেখ সাহেবের পেছনে একদম উঠে পড়ে লাগছে। দেশের মানুষরে তার উপরে খেপায়ে দিতেছে তারা ...'

কথার বিঘ্ন ঘটিয়ে চা চলে আসে এসময়। গাফফার ভাইয়ের ইঙ্গিতে আলাউদ্দীন একটা কাপ হাতে নেয়। গাফফার ভাই বেশ আওয়াজ করেই চায়ের কাপে চুমুক দিতে থাকেন। আলাউদ্দীন ইতস্তত করে বলে, 'আর ইয়ে, লোকজন আস্তে আস্তে এমনেই খেপে উঠতেছে। যুদ্ধাপরাধীদের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার পরে অনেকেই খুব আঘাত পাইছে...'

গাফফার চৌধুরী একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলেন। বঙ্গবন্ধু গত মাসের শেষে কোলাবরেটরদের জন্যে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছেন। অবশ্য খুন, অগ্নিসংযোগ, অপহরণ, ধর্ষণ ইত্যাদি অভিযোগ যাদের বিরুদ্ধে রয়েছে তাদের জন্যে এই সাধারণ ক্ষমা প্রযোজ্য নয়। গাফফার চৌধুরীর মনে পড়ে, স্বয়ং শেখ মুজিব যখন তাকে এই ঘোষণার খসড়া তৈরি করতে বলেছিলেন, তখন, কোনোদিন যা করেননি, তাই করেছিলেন তিনি; সে অনুরোধ অগ্রাহ্য করেছিলেন।

বিস্মিত স্বরে গাফফার চৌধুরী শেখ মুজিবকে বলেছিলেন, 'বঙ্গবন্ধু, যারা পাকিস্তানিদের ভয়ে বাধ্য হয়ে তাদের সাথে হয়ে কাজ করেছিল, তাদের আপনি ক্ষমা করুন, আপত্তি নেই। কিন্তু যারা বুঝে শুনে অপরাধ করেছে তাদের ছেড়ে দিবেন কেন!'

মনে পড়ে, শেখ মুজিব তখন কিং লিয়ারের মতন অদ্ভুত এক পরিহাসের হাসি হেসে বলেছিলেন, 'তা হয় না চৌধুরী, সবাইরেই ছাইড়্যা দিতে হইবো। আমার জায়গায় থাকলে তোমারেও তাই করতে হইতো। আমি একটা ছোট, অনুন্নত দেশের নেতা। চাইরপাশে সব বড় শক্তির চাপ। ইচ্ছা থাকলেই কি আমরা সব করবার পারি?'

চায়ের পেয়ালায় আরেকটা সশব্দ চুমুক দিয়ে গাফফার চৌধুরী নিজেকে শেখ মুজিবের জায়গায় কল্পনা করেন।

বাংলাদেশের বেশিরভাগ জায়গায় এখনো যৌথ পরিবার প্রথা। দালাল আইনে আটক হাজার হাজার লোকের হয়ে তাদের আত্মীয়েরা সুপারিশ করেছে। পরিবারে এক ভাই মুক্তিযোদ্ধা তো আরেক ভাই শান্তি কমিটির নেতা, মুক্তিযোদ্ধাটি হয়তো সুপারিশ করেন তাঁর ভাইয়ের জন্যে। আটককৃত লোকেদের পোষ্যদের জীবনযাপন মানবেতর, পত্রিকায় বিরূপভাবে লেখা হয় এসব নিয়ে। একদিকে আইনের জটিলতায় দ্রুত বিচার সম্ভব হচ্ছিলো না অনেক ক্ষেত্রে, অন্যদিকে ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে দুর্নীতিবাজ কোনো রাজনীতিক হয়তো নিরপরাধ শত্রুকে ফাঁসিয়ে দিচ্ছিলেন দালাল আইনে।

এর বাইরে আছে রাজনৈতিক পুনর্বাসন। মুক্তিযুদ্ধের সময় দল পরিত্যাগ করে পাকিস্তানিদের কাছে চলে যাওয়া মশিউর রহমান যাদু মিয়াকে ফুলের মালা পরিয়ে বরণ করেন কাজী জাফর আর রাশেদ খান মেননরা, স্বাধীনতার বিরোধিতা করা মওলানা মতিনের মতো কেউ কেউ ঠাঁই পায় জাসদে। প্রধানমন্ত্রী তো রক্ত

মাংসের মর্ত্যের মানুষ, একা মোমবাতি হাতে শেখ মুজিব আর কত লড়বেন দেশের সমস্ত কালো ছায়া দূর করতে?

'বাদ দাও ওইসব কথা।' গাফফার চৌধুরী যেন জোর করে মাথা থেকে এসব চিন্তা দূর করতে চান। 'তুমি এখন কোন দিকে গেলা সেইটা বলো। আওয়ামী লীগেই আছো তাইলে? জাসদে যাও নাই?'

'এখনো কোনো দিকে যাই নাই গাফফার ভাই।' আলাউদ্দীন চা শেষ করে বলে। 'দুই দলের অনেকের লগেই আমার খাতির। কিন্তু কারোর কাজেকর্মেই ভরসা পাইতেছি না। দেখি, ভাবতেছি টুকটাক দুই দিকেই ঘুরাঘুরি করবো। আমার তো পলিটিক্সটা নেশা, লাভ লোকসানের আশায় তো করি না...'

আলাউদ্দীন আর বেশি সময় থাকে না। সন্ধ্যায় কোন দিকে যেন টিউশনি পড়াতে যাবে সে। বিদায় নিয়ে সে তাই বেরিয়ে আসে। আর গাফফার চৌধুরী বসে বসে ভাবেন যুদ্ধে স্বজন হারানো মানুষেরা কতটা আঘাত পেয়েছেন সাধারণ ক্ষমায়। কী পাথরে বুক বেঁধেছেন জাহানারা ইমাম, পান্না কায়সার, সারা মাহমুদেরা।

...জাহানারা ইমাম অবশ্য নিজেকে ডুবিয়ে রেখেছেন কাজের মাঝে। জামী ঢাকা কলেজ থেকে পাস করে বেরিয়ে যাচ্ছে কিছুদিন পর, সব ঠিক থাকলে সামনের মার্চেই আমেরিকার মিশিগান স্টেটে তাকে পড়তে পাঠিয়ে দেবেন জাহানারা ইমাম। তার বড় ছেলের মতো এই ছেলেটাও এক্সট্রা কারিকুলারে ভালো, ইয়াং পেগাসাসের হয়ে বোলিং ওপেন করে জামী। ক্রিকেট আর মাকে ছেড়ে বাইরে চলে যেতে যে জামীর খুব কষ্ট হবে, এটা জাহানারা ইমাম বোঝেন। কিন্তু নিজের কষ্ট তিনি চেপে রাখেন জামীর কাছ থেকে, যুদ্ধাপরাধের বিচার পুরোপুরি শেষ না হওয়ায় জাহানারা ইমাম বড় ব্যথা পেয়েছেন মনে।

ভেতরের সেই কষ্ট যখন অসহ্য হয়ে ওঠে, জাহানারা ইমাম তখন তার ডায়েরি নিয়ে বসেন।

সাংকেতিক ভাষায় একাত্তরের অনেক কিছুই তিনি তার ডায়েরিতে তুলে রেখেছেন। মিলিটারি হঠাৎ এসে সার্চ করলেও যাতে ওটাকে হিজিবিজি লেখা বলেই ভাবে, সেজন্যেই ডায়েরিটা ওভাবে লেখা হয়েছিল তখন। আজকাল ডায়েরিটা নিয়ে জাহানারা ইমাম মাঝে মাঝে সেই দিনগুলো মনে করেন। পুরনো কথা মনে পড়লে রুমীর স্মৃতি একরকম পাগল করে দেয় তাকে, তবু জাহানারা ইমাম ঠিক করেছেন সাংকেতিক এই ডায়েরি তিনি একদিন শেষ করবেন বই হিসেবে। রুমীদের কথা সবাইকে জানাতেই হবে। শুধু তার একার জন্যে নয়, বাংলাদেশের ত্রিশ লক্ষ শহিদের জন্যে হলেও রুমীদের কথা পৌঁছে দিতে পরের প্রজন্মের কাছে।

তিনি আশা রাখেন, সাধারণ ক্ষমার আওতার বাইরে থাকা গোলাম আযমদের মতো সেই ঘৃণ্য যুদ্ধাপরাধীদের বিচার একদিন নিশ্চয়ই হবে। মানুষ ভুল করতে পারে, মানুষ বেইমানি করতে পারে। কিন্তু বাংলাদেশে মাটি নিশ্চয়ই তার শহিদদের রক্তের সাথে বেইমানি করবে না।

জাহানারা ইমাম আশা করে যান আর দুঃখের আগুনে পুড়ে পুড়ে প্রতিজ্ঞা করেন, একদিন তিনি ঠিক ঠিক রুমীর কথা লিখে রেখে যাবেন।

দাবার বোর্ড

'তোমাদের খুব মিস করি বুঝলা, ঢাকায় তো খুব বেশি যাইবার সুযোগ পাই না। গেলেই চেষ্টা করি তোমাদের সাথে দেখা করার। আর পোলাপাইনও ক্যামনে যেন জাইনা যায় আমি ঢাকায় আসছি বুঝছো, দেখা করে আইসা। কিন্তু এই দিকে লোকজনে আসতে চায় না...', মেজর হায়দারের পরনে ফ্লানেলের ফুলহাতা শার্ট আর ট্রাউজার। তার হাতে ধরা চায়ের কাপটা প্রায় খালি, মুখে আক্ষেপের চিহ্ন।

তারেকুল আলম অল্প হাসার চেষ্টা করে। 'কী করবো বলেন হায়দার ভাই, ঢাকার বাইরে আসা হয় কম। তাও তো আপনি কুমিল্লায় আছেন। চাইলেই লোকে আপনেরে দেখে যাইতে পারে।'

'তা অবশ্য ঠিক। পোস্টিং হবার পর এখনো পর্যন্ত মনে করো প্রায় দশ বারো জন দেখা করতে এই কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টেও চইলা আসছিল! খুব ভালো লাগে বুঝলা!' মেজর হায়দারের মুখে গর্বের হাসি।

'অবাক হবার কী আছে, আপনি তো জানেন হায়দার ভাই, পোলাপান আপনেরে কী পরিমাণ পছন্দ করে।' একটু একটু শীত করতে থাকা বাতাসে তারেকুল আলম হাসতে হাসতে বলে।

কুমিল্লার পল্লি উন্নয়ন একাডেমিতে ঘুরতে এসেছিল তারেক। বন্ধুরা ফিরে গিয়েছে ট্যুর শেষ করে, সে ভেবেছে হায়দার ভাইয়ের সাথে এক রাত গল্প করে যাওয়া যাক। ক্যান্টনমেন্টে চলে আসা সে কারণেই। যুদ্ধদিনের স্মৃতিচারণ করতে করতে কখন যে ঘণ্টা দুই পার হয়ে গেছে, খেয়ালই করেনি সে!

'যাক, ঢাকার অবস্থা কী বলো দেখি তারেক। খালি পেপার পড়ে তো পরিষ্কার কিছু বুঝা যায় না, তোমার মুখ থেকেই শুনি। অবস্থা তো হঠাৎ কইরা খুব খারাপ হয়ে পড়ল দেখি...'

'ঠিকই শুনছেন।' তারেক চারপাশের মশা তাড়াতে তাড়াতে বলে। 'সরকার আসলে ভালোমতো হ্যান্ডেল করতে পারতেছে না সিচুয়েশনটা। বিশেষ করে জাসদ খুব ঝামেলা করতেছে সরকারের জন্যে। গভর্মেন্ট নিয়মিত ১৪৪ ধারা দিতেছে, কিন্তু লাভ হইতেছে না। জাসদ সেই ধারা ভাইঙ্গে মিছিল ডাকতেছে,

সারা দেশেই নিয়মিত বিক্ষোভ করতেছে। সেদিন তো সারাদেশেই দিনভর পুলিশে সাথে জাসদ কর্মীদের সংঘর্ষ চললো।'

'রক্ষীবাহিনী কিছু করতে পারতেছে না? তাদের তো দেখলাম কয়েকদিন আগে এমনকি বিনা পরোয়ানাতেই যে কাউরে গ্রেপ্তার করার ক্ষমতা দেয়া হইছে!' হায়দার ভাই বলেন।

'হ্যাঁ, বিরোধী দলীয় কর্মীরা আবার এর প্রতিবাদে সংসদ থেকে ওয়াকআউটও করছে। কী জানেন হায়দার ভাই, রক্ষীবাহিনী অলরেডি অনেক বেআইনি অস্ত্র উদ্ধার করছে, কালোবাজারি-চোরাচালানি আটক করতেছে, কিন্তু তাদের উপর মানুষের আস্থা নাই বলতে গেলে। আর যাদের উপরে আস্থা নাই, তাদের দিয়া দেশের মানুষের মনে শান্তি আনবেন কীভাবে?'

তারেক খানিক বিরতি নেয়। তারপর ইতস্তত করে হায়দারকে বলে, 'ইয়ে, মেজর ডালিমের ঘটনাটা শুনছেন হায়দার ভাই?'

মেজর হায়দারের একটু কাঠ হয়ে যান যেন। 'হ্যাঁ, কানে আসছে।'

দিন কয়েক আগে এক বিয়ের অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে ঘটে যাওয়া কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা অবশ্য এখন সবার মুখেই মুখেই ঘুরছে, মেজর হায়দারের তা না জানার কোনো কারণ নেই। আওয়ামী লীগের প্রভাবশালী নেতা, রেডক্রস চেয়ারম্যান গাজী গোলাম মোস্তফা উপস্থিত ছিলেন বিয়েতে। উপস্থিত ছিল মেজর শরিফুল হক ডালিমসহ আরো সামরিক অফিসার। ডালিমের স্ত্রী নিম্মিকে নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য ছুড়ে দেয় গোলাম মোস্তফার ঘনিষ্ঠ এক আত্মীয়। ডালিমের শ্যালক বাপ্পির লম্বা চুল ধরে টান মারে গোলাম মোস্তফার ছেলে। বেধে যায় তর্ক। ডালিম নাকি চড় মেরে বসেন উত্ত্যক্তকারীকে। কলহের এক পর্যায়ে গোলাম মোস্তফার গুণ্ডাবাহিনী যোগ দেয়, সস্ত্রীক মেজর ডালিমকে তারা কিডন্যাপ করার চেষ্টায় গাড়িতেও তুলে নাকি। আর ওদিকে ডালিমের বন্ধু আর সহকর্মীদের মাঝে কয়েকজন মেজর নূর, মেজর হুদা ক্যান্টনমেন্ট থেকে ট্রাকভর্তি সৈন্য নিয়ে তছনছ করে আসে গোলাম মোস্তফার বাসা।

ডালিমকে নিয়ে যাওয়া হয় শেখ মুজিবের কাছে। তার নামে অভিযোগ মারামারি করার। ডালিম পালটা নালিশ করেন তার স্ত্রীকে অপমান করা হয়েছে বলে। শেখ মুজিব একটা মীমাংসা করে দেন দুই পক্ষের মাঝে, জানান পরে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

কিন্তু সামরিক বাহিনীতে শৃঙ্খলাই শেষ কথা। সেই শৃঙ্খলা ভাঙার অভিযোগে বাধ্যতামূলক অবসর বা চাকরিচ্যুতি হয় ডালিমদের কয়েকজনের। চাকরি যাওয়ায় প্রচণ্ড আহত হন এই অফিসারেরা। শোনা যাচ্ছে, শেখ মুজিবের ওপর তারা ব্যক্তিগতভাবে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়েছেন।

সামরিক বাহিনীতে চাকরি করেন বলেই হয়তো মেজর হায়দার এ ঘটনাগুলো আলোচনা করতে চান না। শার্টের হাতা আরেকটু উপরে টেনে তিনি দ্রুত প্রসঙ্গ পালটান। 'তোমাদের স্যার তো দেখি প্রেসিডেন্ট থাকতে চাইলেন না আর, কী কও? ...আরে আবু সাঈদ চৌধুরীর কথা কই। স্যার ঐদিকে রিজাইন দিলেন, আর এদিকে মোহাম্মদ উল্লাহ রাষ্ট্রপতি হয়া গেল!'

তারেকুল আলম কাঁধ ঝাঁকায়। 'স্যার আসলে বঙ্গভবনে মানায় চলতে পারতেছিলেন না, হায়দার ভাই। প্রেসিডেন্টের স্পেশাল অফিসার মাহবুব তালুকদার সাহেবরে আমি যুদ্ধের সময় থেকে চিনি, উনি মুজিবনগরের তথ্য বিভাগে ছিলেন। উনার কাছ থেকে আবু সাঈদ স্যারের কিছু কথা শুনলাম...

মানে, স্যার আসলে বঙ্গভবনে একলা পইড়া থাকতেন। উনি দায়িত্ব নেয়ার সময় ভাবছিলেন মন্ত্রীরা বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে তার কাছে আসবেন মাঝে মধ্যে, কিন্তু দেখা গেল কেউ সেইরকম আসেন না। উনি রাষ্ট্রের প্রধান, কিন্তু দেশের পরিস্থিতি নিয়া তার কোনো বক্তব্য থাকতেছে না। আবার উনার যা পার্সোনালিটি, এবং বঙ্গবন্ধুর প্রতি তার যে শ্রদ্ধা এই দুইটার সাথে ওনাদের চেয়ারের পজিশন আসলে মিলতেছিল না। এইসব নানা কারণেই তাই আবু সাঈদ স্যার রিজাইন দিলেন।'

'বুঝলাম। তা, নতুন প্রেসিডেন্ট কেমন মানুষ শুনছো নাকি?' মেজর হায়দার প্রশ্ন করেন।

'যা শুনলাম, ভদ্রলোক খুবই অন্তর্মুখী টাইপ। উনি তো আগে সংসদে স্পিকার ছিলেন। তবে সাঈদ স্যারের মতো গ্ল্যামারাস পার্সোনালিটি উনার নাই।'

মেজর হায়দার কী একটা শব্দ করে চুপ হয়ে যান, কথা বলার কিছু সাহস পান না মনে হয়। তারেক বলে, 'খালি তো ঢাকার কথাই শুনে যাইতেছেন হায়দার ভাই, এদিককার কথা কিছু বলেন। দেশের অবস্থা নিয়া আর্মির মুক্তিযোদ্ধাদের ভাবনা চিন্তা কী?'

তারেকের প্রশ্ন শুনে হায়দার একটু হাসার চেষ্টা করেন। সব কথা তারেককে ভেঙে বলা যায় না। আর্মির ভেতরের অবস্থা ঠিক স্থিতিশীল নয়। মাসখানেক আগে পাকিস্তানে আটকা পড়া কয়েক হাজার অমুক্তিযোদ্ধা অফিসার আর জোয়ানদের দেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। যুদ্ধের আগে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে কাজ করা এসব সদস্যদের সেনাবাহিনী-নৌবাহিনী-বিমানবাহিনীতে নিয়োগ দেয়া হয়েছে তেমন কোনো যাচাই বাছাই করা ছাড়া। ইতোমধ্যে গভমেন্ট থেকে সরকারি চাকরিজীবী মুক্তিযোদ্ধারা দুই বছরের সিনিয়রিটি পেয়ে গেছেন। সরাসরি কিছু না বললেও বোঝা যাচ্ছে, মুক্তিযোদ্ধা সদস্যদের এই সিনিয়রিটি মেনে নিতে পারছেন না স্বদেশ প্রত্যাগত অমুক্তিযোদ্ধাদের অনেকেই। দাবার বোর্ডের সাদা-

কালো ঘুঁটির মতো সামরিক বাহিনীর দুই দলে ভাগ হয়ে যাওয়া নিয়ে পরিচিত অনেকের ভেতরেই এ নিয়ে হালকা টেনশনের অস্তিত্ব টের পেয়েছেন তিনি।

নানা মাত্রার ক্ষমতা সম্পন্ন ঘুঁটি আজকাল বিপরীত শিবিরের আদলে ছড়িয়ে গিয়ে ক্রমশ অতিকায় এক দাবার বোর্ডের জন্ম দিচ্ছে যেন।

মেজর হায়দার আলোচনার মোড় ঘোরাতে চান এ মুহূর্তে। হালকা গলায় বলেন, 'আরে আর্মির মুক্তিযোদ্ধারা কি দেশের বাইরে নাকি মিয়া? নগর পুড়লে দেবালয় কি এড়ায়? দেশের অবস্থা দেইখা তোমাদের যে রকম লাগতেছে, আর্মির লোকেদের অবস্থাও সেই রকম। সবাই খবর রাখতেছে কী হয় না হয়। চলো, চলো, ম্যালা রাইত হইছে। ঘুমাইতে যাওয়া লাগবো। নাকি আরেক কাপ চা খাবা, দিতে বলবো?...'

একলা লড়াই

শাহবাগের রেডিও অফিস থেকে ফিরতে ফিরতে রিমির প্রায় রাত আটটা বেজে গেল। আব্বু সেদিন পার্টির দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিলে যে বক্তৃতাটা দিয়েছিলেন, সেটার কোনো কপি পাওয়া যাচ্ছিলো না। টেপরেকর্ডার আর খালি ক্যাসেট নিয়ে রিমিকে তাই আব্বুর আদেশে যেতে হলো রেডিও অফিসে।

বক্তৃতাটা প্রায় আড়াই ঘণ্টার! এত লম্বা ভাষণ আব্বু আগে আর কখনো দিয়েছে কি না রিমির জানা নেই। কিন্তু সত্যি বলতে কী, রেডিও অফিসে বসে রেকর্ড করবার সময় আব্বুর এই বক্তৃতা শুনতে শুনতে রিমি বেশ তন্ময় হয়ে গিয়েছিল। আব্বুর প্রতিটা কথায় এমন আকুতি ছিল! তিনি যেন বলতে গেলে অনুনয় করছিলেন চারপাশের মানুষের কাছে। দেশটাকে বাঁচান প্লিজ, সমাজটাকে ঠিক করেন! আব্বু নিশ্চয়ই খুব হতাশ বোধ করছেন চারপাশের সবকিছু দেখে। নইলে কেউ প্রকাশ্য সভায় এইরকম বলে?

বাড়ি ফিরে হাত মুখ ধুতে গিয়েও রিমির মাথায় আব্বুর সেই বক্তৃতাই ঘুরতে লাগল। "*... সবাই বলে চোর, চোর। কিন্তু চুরিটা করে কে? ঐ পল্টন ময়দানে বক্তৃতা করে যে বলে বেড়াচ্ছে দুর্নীতি ধরতে হবে, বাসায় এসে সে বলে, তাজউদ্দীন ভাই আমার খালু ধরা পড়েছে, ওরে ছেড়ে দেন। যদি বলি, তুমি না বক্তৃতা করে এলে? তখন উত্তর দেয়, বক্তৃতা করেছি তো পার্টির জন্যে এখন আমার খালুকে বাঁচান।*

... যুবকদের সম্বন্ধে বঙ্গবন্ধুকে কিছু বলে যাই। বঙ্গবন্ধু আপনি হুকুম দিন, ঢাকায় এক মাইল লম্বা আধ মাইল প্রশস্ত একটা জায়গায় ছেলেদের খেলার ব্যবস্থা করে দিবেন। নিষ্কলুষ আনন্দ লাভের সুযোগ করে দিন, না হলে এরা ফুটপাতে

ঘুরে বেড়াবে। আর এভাবে ঘুরে বেড়ালে কী হবে? চিন্তা করে দেখুন, হাত শুধু পকেটেই যাবে না, নানান দিকে যাবে!"

খাবার টেবিলে বসে রিমি তাই আম্মা আর রিপিকে বেশ আগ্রহ নিয়ে আব্বুর ভাষণটা সম্পর্কে বলল। আব্বুর কথাগুলো যে খুব জোরালো, রিমি সেটা আব্বুর কণ্ঠ নকল করে করে বোঝাতে লাগল শ্রোতাদের। রিপি শুনে যতই উৎসাহ দেখায়, রিমি যেন তত বেশি বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলে বক্তৃতাটা নিয়ে। আর আব্বু ওদিকে ওদের দুইজনের কাণ্ড দেখে মিটিমিটি হাসেন। শেষ পর্যন্ত খাওয়ার পরে আব্বু বললেন, 'আচ্ছা, রিমি যেহেতু অলরেডি বক্তৃতাটা শুনে ফেলছে, রিপি মামণিই তাহলে আজকে রাতে ভাষণটা লিখে রাখো। যতটুকু পারো, ততটুকুই লিখো। তোমাদের আজিজ কাকুকে দিয়ে পরে আমি বাকিটা লেখাবো।'

সে রাতে শোবার সময় রিমি একটা গল্পের বই নিয়ে বিছানায় গেল। আর একই ঘরে রিপি বসল টেপ রেকর্ডারটা নিয়ে। রিপি একটু একটু করে ক্যাসেট চালায়, আর বক্তৃতাটা লিখতে থাকে।

'রিমি, ঘুমাইছিস?' রিপি একটু পরে জিজ্ঞাসা করে।

'বলো। আমি জেগেই আছি।'

'কালকে কি আব্বুকে বলে ফেলবো?' রিপির গলায় একটু যেন দ্বিধা।

'কী বলবা আব্বুকে?' রিমি বই সরিয়ে অবাক গলায় প্রশ্ন করে।

'ওই যে, তোকে বলছিলাম না, শান্তিনিকেতনের কথাটা?'

রিমির চট করে মনে পড়ে গেল। কিছুদিন ধরে রিপি বলছে সে শান্তিনিকেতনে পড়তে চায়। কিন্তু আব্বুর কাছে কীভাবে প্রস্তাবটা করবে, তা সে বুঝতে পারছে না। 'বলো না, বলে ফেলো কালকে।' রিমি সাহস দেয়। 'কালকে তো ছুটির দিন। আব্বু অফিসে গেলেও মনে হয় দুপুরের দিকে যাবেন। তুমি যখন সকালে ভাষণটা লিখে জমা দিবা, তখনই বইলো আব্বুকে।'

এই উপদেশ শুনে রিপির কী মনে চলে, তা ঠিক বোঝা যায় না। একটা অস্পষ্ট শব্দ করে রিপি আবার অনুলিখনের কাজে মন দেয়। আর রিমি এদিকে শুয়ে শুয়ে ভাবতে থাকে শান্তিনিকেতনের কথা।

সেই যে গোলোক মজুমদার, আব্বু যখন একাত্তরে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে প্রথম ভারতে যান, তখন যিনি ভারতের সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর আইজি ছিলেন। কিছুদিন আগে তার ছোট মেয়ে বাসন্তীদির বিয়ে হয়ে গেল। মুক্তিযুদ্ধের সময়ের সেই পরিচয়টাকে আব্বু আর গোলোক বাবু, দুইজনে পরবর্তীতে বন্ধুত্বে রূপ দিয়েছেন। গোলোক বাবুর বড় মেয়ে জয়ন্তীদির বিয়েতে ওরা দাওয়াত পেয়েছিল, নিমন্ত্রণ পেয়েছে এবারের বাসন্তীদির বিয়েতেও।

আসানসোলের বউভাত অনুষ্ঠানের পরে গোলোক বাবু রিমি আর রিপিকে শান্তিনিকেতন নিয়ে গেছিলেন। আহ, কী যে সুন্দর ছিল জায়গাটা! গাছের নিচে

ক্লাস বসেছে, ছাত্রীরা শাড়ি পরে সাইকেল চালাচ্ছে, গান গেয়ে গেয়ে লাল সুরকির রাস্তায় হেঁটে চলেছে ছাত্ররা। এমন জায়গায় পড়ার ইচ্ছে হওয়াটা তো খুবই স্বাভাবিক।

সে রাতে ঘুমের ভেতরে রিমি বারবার চলে গেল শান্তিনিকেতনে।

পরদিন সকালে আম্মাই মনে হয় রিপির কথাটা আব্বুকে জানালেন। আব্বু নাস্তার পরে চা হাতে করে চলে গেলেন বারান্দায়। এরপর আম্মাকে পাশে বসিয়ে রিপিকে ডাকলেন। পিতা ও কন্যা মুখোমুখি বসল বারন্দায় পেতে রাখা চেয়ারে।

তাজউদ্দীন স্মিত হেসে বললেন, 'রিপি, শুনলাম তুমি নাকি শান্তিনিকেতনে পড়তে চাও?'

রিপি মাথা নিচু করে বলে, 'জ্বি আব্বু। শান্তিনিকেতন আমার খুব পছন্দ হয়েছে। আর তাছাড়া ওখানে কত নামকরা মানুষ পড়াশোনা করেছেন।'

'খুব ভালো।' তাজউদ্দীন চায়ে চুমুক দিয়ে বলেন। 'সত্যিই তো, শান্তিনিকেতনে পড়াশোনা করা তো খুব সৌভাগ্যের ব্যাপার।'

কিন্তু হঠাৎ করেই গলাটা কঠিন হয়ে যায় তাজউদ্দীনের। 'কিন্তু মা, দুঃখের বিষয় হলো, আমি তো তোমাকে শান্তিনিকেতনে পাঠাতে পারবো না। দেশের অবস্থা এখন ভালো না, রাজনীতির অবস্থা আরো বেশি খারাপ। এই সময় আমার মেয়ে ভারতে পড়তে যাবে, এটা তো মা ঠিক হবে না।'

রিপি কোনো কথা বলে না। খানিক পর অস্ফুট স্বরে 'ঠিক আছে আব্বু' বলে সে উঠে চলে যায়। তাজউদ্দীন দেখেন, মেয়ের চোখের কোনায় পানি টলমল করছে।

তাজউদ্দীন মন খারাপ করে চায়ে আরেকটা চুমুক দেন। তার বড় মেয়েটা খুব অভিমানী হয়েছে। মেয়েটা কথাবার্তা বলে কম, সারাক্ষণ নিজের মতো পড়াশোনা নিয়েই থাকে। তাকে আরেকটু নরম করে বুঝিয়ে বললেই পারতেন। এত রুক্ষ ভাবে না বললেও হতো। কী করা, তাজউদ্দীনের হাত পা বাঁধা।

মন খারাপ ভাব কাটানোর জন্যে তাজউদ্দীন পাশে বসে থাকা স্ত্রীর দিকে তাকান। 'রিপির পড়াশোনার কী অবস্থা বলো তো?'

জোহরা তাজউদ্দীন এতক্ষণ নীরব বসে বাবা-মেয়ের এই নাটক দেখছিলেন। কথা বলতে পেরে এতক্ষণে তিনি একটু হাঁফ ছাড়েন। 'ভালো তো, বেশ ভালো। তুমি তো কোনো খবর রাখো না, রিপি তো বাসায় বসে নিজে নিজে রাশিয়ান ভাষা শিখে ফেলেছে। ভালোই পড়তে পারে আজকাল। সোভিয়েত লিটারেচারে ওর বেশ আগ্রহ। সেদিন তো 'ছোটদের টলস্টয়' নামে ওর একটা প্রবন্ধও ছাপা হলো পেপারে।'

তাজউদ্দীন খুশি হন শুনে। বলেন, 'বাহ, ভালো তো। লেখিকা মার লেখিকা মেয়ে!'

কথাটা বলেই কিন্তু তাজউদ্দীন চকিতে নীরবে চোখাচোখি করেন জোহরার সাথে। কিছু একটা বুঝে নিয়ে জোহরাও কেমন যেন এড়িয়ে যান মন্তব্যটা। বলেন, 'তোমার চা দেখি শেষ। দাও, কাপটা নিয়ে যাই।'

জোহরা উঠে গেলেও তাজউদ্দীন বসে থাকেন বারান্দায়। বাগানের গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে তাজউদ্দীন আনমনা হয়ে যান। জোহরা কেন উঠে গেলেন, তা তিনি বুঝতে পেরেছেন।

মুক্তিযুদ্ধের বহু ঘটনা নিয়ে 'উদয়ের পথে' নামে একটা স্মৃতিকথা লিখছিল জোহরা। ধারাবাহিকভাবে প্রায় এক বছর ধরে সে লেখাটি প্রকাশিত হচ্ছিলো দৈনিক বাংলায়। এরপরে সেই লেখা পড়ে কয়েকজন বোধহয় কিছু বিষয়ে অসন্তুষ্ট হয়। সেই অসন্তোষ জানার পরে জোহরা তাই স্মৃতিকথা লেখা বন্ধ করে দিয়েছে। জোহরাকে এ বিষয়ে কিছু বলেননি তিনি, কিন্তু তাজউদ্দীনের মনে হয়, ভালোই হয়েছে। সমকালীন সময়ে ইতিহাস লেখা ঠিক না। এতে জীবিত ব্যক্তিদের সাথে ইতিহাসের সংঘর্ষ ঘটতে পারে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যে সেটা ভালো হবে না।

কিন্তু ইতিহাসের চাকা তো এই দেশে উলটো ঘুরছে তাজউদ্দীন ভাবেন। যাদের ক্ষমতা ছিল এই সময়কে নিয়ন্ত্রণ করার, যাদের কাছ থেকে ত্যাগ প্রত্যাশা ছিল সময়ের, তারা সবাই তো ব্যস্ত ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্যে। যুদ্ধের নায়কেরা দলাদলি করছে নিজেদের মাঝে। আর সময় বুঝে যারা ছিল স্বাধীনতার শত্রু, যারা কামড়ে ধরেছিল যুদ্ধের অগ্রগতি, তারাই এখন শক্তিশালী হয়ে উঠছে ধীরে ধীরে। ঘরের আর বাইরের শত্রুদের প্রভাবে মুক্তিযুদ্ধের খাঁটি মানুষেরা কোণঠাসা হয়ে যাচ্ছেন। অ্যাকিলিসের গোড়ালি খেয়ে ফেলছে অ্যাকিলিসকেই।

একটু একটু করে হতাশ হতে থাকা তাজউদ্দীনের মনে হয়, সামনে হয়তো এমন দিনও আসবে, যেদিন যুদ্ধ করার অপরাধে রাজাকারেরা ঘর থেকে টেনে বের করে হত্যা করবে মুক্তিযোদ্ধাদের। একলা মতের মানুষেরা সেই অপস্রোতে ভেসে যাবেন খড়ের কাকতাড়ুয়ার মতো।

একটি রাজনৈতিক আলাপচারিতা

হোটেল পূর্বাণী ইন্টারন্যাশনালের জলসাঘর প্রায় খালি আজকে। অল্প কিছু বিদেশিকে কোনার দিকে দেখা যাচ্ছে সিগারেট খেতে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে বাঙালি যে কজন আছেন, তাদেরও বেশিরভাগই উঠতে যাচ্ছেন। দরজার পাশে দাঁড়িয়ে থেকে পুরো ঘরের উপর চোখ বুলিয়ে আবদুল বাতেন একটা ছোট্টো হাই তুলল। তার শিফট শেষ হবে ঠিক মাঝরাতে, এখনো বাকি ঘণ্টা দেড়েক। কাজ না থাকলে সময় কাটানো বড় কষ্ট!

তাড়াহুড়ো করে বাতেনকে পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢোকা লোকটা হঠাৎ করেই একটা চাঞ্চল্য এনে দিল পরিবেশে। এদিক সেদিক তাকিয়ে লক্ষ্য স্থির করে মানুষটা সোজা চলে গেল শেষের দিকের একটা টেবিলে। আলো-আঁধারির মাঝে আবদুল গাফফার চৌধুরীকে চিনতে বাতেনের কিছু সময় লেগে যায়! কলকাতার মেস জীবনে মেসবাহ ভাই-মাসুদ ভাইদের সাথে এই মানুষটিকে বহুবার আড্ডা দিতে দেখেছে সে। যদিও এতদিন পর গাফফার চৌধুরী তাকে চিনতে পারবেন বলে বোধ হয় না বাতেনের। গাফফার ভাই যে টেবিলে যোগ দিয়েছেন, সেখানে বসে থাকা মানুষটি দীর্ঘক্ষণ ধরে এক কাপ কফি নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল। বাতেন দেখতে পায়, গাফফার ভাইয়ের সাথে আলোচনা করে মানুষটি হাত নেড়ে ডাক দেয় তার উদ্দেশে।

'আমার জন্যে একটা স্যান্ডউইচ খালি।' বাতেন টেবিলের পাশে গিয়ে দাঁড়াবার পর খাবারের অর্ডার দেয় গাফফার ভাইয়ের সঙ্গী। 'আর গাফফার ভাই কী খাবেন? স্যুপটা নেন, এখানকার স্যুপটা ভালো ... ওকে। তাহলে আগে স্যুপ দাও দুইজনের। এরপরে দুইটা স্যান্ডউইচ দুইজনের জন্যে।'

অর্ডার নিয়ে বাতেন বেশ দ্রুতই সার্ভ করতে ফিরে আসে। স্যুপ বাটিতে ঢেলে দিতে দিতে সে খেয়াল করে গাফফার ভাই বেশ উত্তেজিত। '... প্রথমে কথাটা শুনে আমি বিশ্বাস করতে পারি নাই বুঝলেন। ছাব্বিশ মার্চের স্বাধীনতা দিবসে বিশেষ সংখ্যা যাবে, সেটার সরকারি বিজ্ঞাপনে নাকি পাকিস্তানি বর্বরতা শব্দ দুইটা মুছে ফেলতে হবে! পাকিস্তানের অত্যাচার, পাকিস্তানের পরাজয় এই শব্দগুলোও নাকি থাকতে পারবে না! বুঝেন অবস্থাটা!

আর তারচেয়েও খটকার যে বিষয়টা, সেটা হইলো বঙ্গবন্ধুর সাথে আমার দুইদিন আগেও কথা হইছে; উনি কিন্তু আমাকে বিন্দুমাত্র ইশারা দেন নাই যে তথ্য আর বেতার মন্ত্রণালয় থেকে এই ধরনের কোনো ঘোষণা আসবে। কাজেই মনি সাহেব, এই তাহের উদ্দিন ঠাকুর গং নিয়ে আপনি একটু সাবধান থাইকেন। মুজিবনগরে এদের কন্সপিরেসিগুলা চাপা পড়ে গেছিল, এখন দেশের অবস্থা খারাপ দেখে ওরা আবার একটু একটু মাথা নাড়াচাড়া করতেছে।'

বাতেন আড়চোখে গাফফার ভাইয়ের সঙ্গীর দিকে একটু চায়। ইনিই তাহলে শেখ মনি! তার সম্বন্ধে অনেক শুনেছে সে। কথোপকথনের আরো কিছু শুনবার আশা নিয়ে বাতেন সরে গিয়ে টেবিলের কাছেই দেয়াল ঘেঁষে এক কোণে দাঁড়িয়ে পড়ে।

স্যুপের বাটি টেনে নিয়ে শেখ মনি মাথা নিচু করে বসে থাকেন কিছু সময়। বলেন, 'তাহলে আপনার ধারণা আপনার পত্রিকার পেছনে লাগাটা ঠাকুর গ্রুপের ইচ্ছাকৃত?'

'আমার নয়, বলতে পারেন মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে যারা ছিল লং টার্মে এটা তাদের বিপক্ষেই ওদের একটা চাল। জনপদে সরকারি বিজ্ঞাপন বন্ধ করে দেয়াটাও এরই অংশ। আমি জনপদে লিখেছি যে আওয়ামী লীগের ভেতরে ডানপন্থিরা জোট পাকাচ্ছে, মোশতাক সাহেব যে তাহের উদ্দিন ঠাকুর আর মাহবুবুল আলম চাষিকে নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ বানচাল করতে চেয়েছিলেন সেটাও আমি লিখেছি। তাই জনপদের ওপরে ওদের এত ক্ষোভ।

... যা হোক, এখন বলুন এত রাতে আপনি কী মনে করে ডাকলেন আমাকে?'

শেখ মনি অযথাই কেশে গলা পরিষ্কার করেন একটু। বলেন, 'আমাদের, মানে বঙ্গবন্ধুর সমর্থকদের অবস্থান এখন কোথায় জানেন? খাদের একেবারে কিনারায়। একটু এদিক ওদিক হলেই শেষ। এই অবস্থায় আপনার মতো লিখিয়েরা আমাদের সাহায্য করতে পারেন। লিখে বঙ্গবন্ধুর প্রগতিশীল সমর্থকদের সাহায্য করতে পারেন।'

'আচ্ছা! বঙ্গবন্ধুর তাহলে একদল প্রতিক্রিয়াশীল সমর্থকও আছে?' গাফফার চৌধুরী হেসে ফেলেন। 'শুনুন মনি সাহেব, আজ কিছু কথা স্পষ্ট করে বলে নেয়া ভালো। আমার মনে হয় আওয়ামী লীগ আজ নীতিগত দ্বন্দ্ব নয়, ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বে ভাগ হয়ে গেছে। আপনারা, আওয়ামী লীগের প্রগতিশীল অংশও এক থাকতে পারছেন না। আপনি যুবলীগ নিয়ে বামে ঝুঁকছেন, আবার ছাত্রলীগে তোফায়েল আহমেদের প্রভাব বাড়ছে, উনি ঝুঁকছেন ডানদিকে। তাজউদ্দীন সাহেব নিঃসন্দেহে আওয়ামী লীগের প্রগতিশীল নেতাদের একজন। কিন্তু মনে হচ্ছে অন্য অনেকের উচ্চাকাঙ্ক্ষার জন্যে তাকে দলের ভেতর হেয় হতে হচ্ছে। তাজউদ্দীনকে দুর্বল করতে গিয়ে আওয়ামী লীগের প্রগতিশীল অংশটাকেই দুর্বল করে ফেলা হয়েছে...'

'আপনার কথা ঠিক না।' শেখ মনির গলায় কাঠিন্য। 'তাজউদ্দীন বঙ্গবন্ধুকে সরিয়ে দিয়ে দেশের নেতা হতে চান।'

'সে কথা আমি বিশ্বাস করি না। আওয়ামী লীগ গণতান্ত্রিক একটা দল, বঙ্গবন্ধুর পর দেশের নেতা কে হবেন, সেটা গণতান্ত্রিক রীতির চর্চাই ঠিক করে দেবে। যাই হোক, আপনাদের প্রগতিশীল অংশের এই ল্যাং মারামারি মাঝখান থেকে শক্তিশালী করে দিচ্ছে প্রতিক্রিয়াশীলদের। মোশতাক গ্রুপ হয়ে উঠছে ক্ষমতাশালী।' বলেন গাফফার চৌধুরী।

শেখ মনি চারপাশে তাকিয়ে হাত তুলে ইশারা করেন বাতেনকে। 'স্যান্ডউইচ দিয়ে যাও।' বাতেন দ্রুত এগিয়ে এসে স্যুপের বাটিটা সরিয়ে নিয়ে যায়। কিচেনে গিয়ে স্যান্ডউইচ নিয়ে আসতে তার মিনিট কয়েক লেগে যায়। এর মাঝে আলোচনা অন্যদিকে মোড় নিয়েছে ।

গাফফার ভাই গলা তুলেছেন খানিক। '... এটা তো অবশ্যই সিআইএ'র সেট প্যাটার্ন। পপুলার কোনো গভমেন্টের জনপ্রিয়তা ধ্বসানোর জন্যে ওরা এইসবই ফলো করে। শ্রমিক ধর্মঘট উস্কে দেয়, ধর্মীয় বিভেদ ছড়ানোর চেষ্টা করে। আপনারাও কিন্তু না বুঝে সেই ফাঁদে পা দিচ্ছেন। রুহুল আমিন ভুঁইয়া আর আবদুল মান্নানের ঝগড়ায় শ্রমিক লীগ শুধু ধ্বংসই হয় নাই, মানুষের কাছে সেটা এখন এক ঋণাত্মক নাম। এর নেতারা বর্তমানে শুধু লুটপাট আর দুর্নীতির জন্যেই পরিচিত। এরপরে এখন ছাত্রলীগ আর যুবলীগের মাঝে অন্তর্দ্বন্দ্ব। সবশেষে আসবে আওয়ামী লীগের পালা।

সিআইএ'র টাকা খাওয়া গুপ্তচরেরা তখন মানুষকে বোঝাবে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্যেই কিছু পরিবর্তন প্রয়োজন। তারপর ধীরে ধীরে মিলিটারির মাঝ থেকে ওদের বাছাই করা লোকটিকে বসাবে ফ্যাসিস্ট একনায়কের ভূমিকায়। চিলিতে দেখুন, আলেন্দেকে সরিয়ে ওরা পিনোশেকে বসালো। ইন্দোনেশিয়ায় সুকর্ণকে সরিয়ে বসালো সুহার্তোতে। কঙ্গোতে লুমুম্বাকে মেরে বসিয়েছে মবুতুকে। কাজেই বঙ্গবন্ধুকে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে, সাথে আপনাদেরও। নইলে বিপদ কিন্তু অবশ্যম্ভাবী!'

গাফফার ভাইয়ের কথা শুনে বুকের ভেতরে কেমনটা দুরু দুরু ঠেকে আবদুল বাতেনের। আসলেই কি অবস্থা এতটা সংকটময় তলে তলে? বঙ্গবন্ধু কি সত্যিই অত বড় বিপদের মধ্যে আছেন?

শেখ মনি খেতে ইশারা করেন গাফফার ভাইকে, নিজেও স্যান্ডউইচ নিয়ে চিবুতে থাকেন। খাবার সময়টা মোটামুটি নীরবেই কাটিয়ে দেন দুইজনে। খাওয়া শেষে শেখ মনি বেশ ক্ষুব্ধ গলায় বলেন, 'দেশ জুড়ে এত সমস্যা, জাসদ যখন তখন মিছিল-ঘেরাও-বিক্ষোভ করছে, এই সেদিন মন্ত্রী মনসুর আলী সাহেবের বাড়ি পর্যন্ত ওরা ঘিরে ধরলো; আর আপনি কেবল চোখে দেখছেন আওয়ামী লীগের দলীয় সমস্যাকে। ...যাক, আজকে রাত হয়ে গেছে। কথা আর না বাড়াই। আপনার সাথে আমার আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকল তাহলে।'

গাফফার চৌধুরী মুখ মুছতে মুছতে হেসে বলেন, 'জাসদের মিছিলে পুলিশের গুলিতে নিহতদের কথা যেমন লিখেছি, তেমনি জাসদের জ্বালাও পোড়াও রাজনীতি নিয়েও তো জনপদে আমি লিখেছি।

দেশের ভালো চাই বলেই বলছি, আপনি নিজের দল ঠিক করুন। পরগাছা আর সুবিধাবাদীদের সরান। প্রগতিশীলদের ঐক্যবদ্ধ করুন।'

এরপরে আলোচনা হয় না আর। গাফফার চৌধুরী বিদায় নেন শেখ মনির কাছ থেকে। শেখ মনি হাত নেড়ে বিল আনার আদেশ দেন বাতেনকে। আবদুল বাতেন চলে যায় বিল আনতে।

শেখ মনিকে কিন্তু খুব অন্যমনস্ক দেখায়, তিনি গভীর কোনো ভাবনায় ব্যস্ত। গাফফার চৌধুরী তাকে বড় চিন্তায় ফেলে গেছেন। আবদুল বাতেনের নিয়ে আসা বিলের দিকে চোখ নিবদ্ধ রেখেও শেখ মনির মাথায় কেবল খানিক আগে শোনা সতর্কবাণীই ঘুরতে থাকে।

হিসাবে কি কোনো বড় ধরনের ভুল হয়ে গেল তবে?

চা-চক্রের আলাপ

বাড়ির গেটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা বাচ্চাদের উল্লাস ধ্বনি বেশ জোরে শোনা গেল হঠাৎ। তাজউদ্দীন ঘাড় ঘোরাতেই দেখলেন, কালো কোটসহ মুজিব ভাইয়ের লম্বা গড়নটা দেখা যাচ্ছে বাচ্চাদের ভিড়ের ভেতর। তাজউদ্দীনের মুখে একটা মৃদু হাসি দেখা গেল। মুজিব ভাই এত কাজের মাঝেও তার এই ছোট্ট পারিবারিক আয়োজনের জন্যে সময় বের করেছেন ভেবে তাজউদ্দীন মনে মনে আরেকবার দীর্ঘদেহী মানুষটির প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ করেন।

আজ তাজউদ্দীনের ভাইপো দলিলউদ্দীনের বউভাত। মৃত বড় ভাইয়ের এই ছেলেটিকে তাজউদ্দীন বড় পছন্দ করেন। সেদিনের সেই দলিল, বুকে পিঠে করে তিনি তাকে মানুষ করলেন, তার নাকি আজ বউভাত! তাজউদ্দীন ঈষৎ কৌতুক বোধ করেন। মানুষের জীবন কত ক্ষুদ্র!

দলিলউদ্দীন পেশায় ইঞ্জিনিয়ার, কাজের দরকারে সে থাকে টঙ্গী। তবে গায়ে হলুদ, বিয়ে সব অনুষ্ঠানই সারা হয়েছে এই বাড়িতেই। বাচ্চারা খুব এনজয়ও করেছে। তবে সেই আনন্দের প্রকাশ যাতে মাত্রা না ছাড়ায়, সেদিকে তাজউদ্দীন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছিলেন। দেশের অবস্থা খুব ভালো না, এমন সময় সামাজিকতা রক্ষাটাও হতে হবে পরিমিত। অর্থনীতির অবস্থা খারাপ, অর্থমন্ত্রী নিজেই যদি কৃচ্ছ্রতা সাধন না করেন, তাহলে তা নিয়ে সভা সমাবেশে বড় বড় কথা বলা চলে না।

আজ বিকালেও তাজউদ্দীন একরকম ঘরোয়া আয়োজনই করেছেন। কোনো রকম বড় অনুষ্ঠান না করে শুধু টি-পার্টি দিয়েই মেহমান বিদায় করা হয়েছে আজ। অনুষ্ঠান বলা চলে একরকম শেষ, শেখ মুজিব হাজির হয়েছেন একদম অন্তিম মুহূর্তে।

মানুষকে আপন করে নেয়ার এক অদ্ভুত ক্ষমতা রয়েছে শেখ মুজিবের। এবারও তার ব্যতিক্রম দেখা গেল না। প্রথমে তিনি খানিক ছোটদের সাথে দরাজ গলায় হাসলেন, তারপর দলিলের সাথে রসিকতা করে হাসালেন বাকি সবাইকে। এরপরে বর, কনে আর সস্ত্রীক তাজউদ্দীনের সাথে দাঁড়িয়ে ছবিও তুললেন শেখ

মুজিব। গমগমে গলার স্বরে সবাইকে একরকম মাতিয়ে দিয়ে শেখ মুজিব সেই বিকালটা বহুদিনের জন্যে স্মরণীয় করে রাখলেন অন্যদের কাছে।

সন্ধ্যা নেমে এলে, বিদায় নেয়ার আগে পাইপ টানবার ছলে মুজিব ভেতরে চলে এলেন তাজউদ্দীনের সাথে। বাংলাদেশকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসা দুইজন মানুষ বসলেন মুখোমুখি, অর্ধেক খোলা জানালা পথে ঢোকা বাইরের আলো ছায়া সাদা কালো রঙে ধারণ করল এই দৃশ্য।

নীরবতা ভাঙেন প্রথমে তাজউদ্দীন। 'মুজিব ভাই, চালের দর হঠাৎ করে খুব তাড়াতাড়ি বাড়তেছে। সরকারি খাদ্য মজুদও বেশ কমে গেছে। ফসল ভালো না হলে এইবার চাষিদের খুব সমস্যা হবে। একটু নজরে রাখা দরকার বিষয়টা...'

'চিন্তা কইরো না, সব ব্যবস্থা নিতাছি।' শেখ মুজিব পাইপ টানতে টানতে বলেন। 'ফলনে একটু ঘাটতি আছে, তয় কোনো সমস্যা হইবো না ইনশাল্লাহ। বাইরে থেইকাও সাহায্য আসতেছে।'

'ইনশাল্লাহ।' তাজউদ্দীনও আশাবাদী হন। 'কিন্তু পেপার-টেপারগুলাতে খুব লেখালেখি হইতেছে...'

'এই ব্যাটারা যা খুশি তাই লিইখ্যা যাইতেছে।' শেখ মুজিবের গলা খানিক উষ্ণ। 'ব্যাটারা ওইদিন লিখলো বর্ডার দিয়া নাকি চাইলের বস্তার পর বস্তা পাচার হয়্যা যাইতাছে। কিন্তু কই? বর্ডারে আর্মি বসাইলাম। আর্মি আমারে বাজেয়াপ্ত মালের যেই লিস্টি দিছে তাতে চাউলের নাম ছয় না সাত নাম্বারে। এই সাংবাদিকগুলা আমারে জ্বালায়া খাইলো...'

মুজিব হঠাৎ থেমে যান। তার মনে পড়ে গেছে, এমনকি শেখ মনির পত্রিকা বাংলার বাণীর সম্পাদকীয়তেও সমালোচনার শিকার হয়েছেন তিনি। নির্দিষ্ট করে কোনো নীতি বা কাজের জন্যে নয়, বাংলার বাণী লিখেছে জাতীয় পরিকল্পনা কমিশনের নেতৃত্ব অযোগ্য, এই কমিশন দিয়ে কোনো কাজ হবে না। অথচ শেখ মুজিব স্বয়ং এই কমিশনের চেয়ারম্যান! সম্পাদকীয়টি বলেছে, হার্ভার্ড অক্সফোর্ড পাস করা উচ্চশিক্ষিত লোকেদের দেয়া থিওরি বাংলাদেশের ক্ষেত্রে খাটবে না, এজন্যে দরকার দেশি হাকিমি দাওয়াই। পরিকল্পনা কমিশনের নুরুল ইসলাম সেই লেখা দেখে ক্ষুব্ধ হয়ে তা দেখাতে নিয়ে এসেছিলেন মুজিবের কাছে। মুজিব তার ভাগ্নের ওপর মহা বিরক্ত হয়েছেন এতে।

তবে মনির লেখার প্রসঙ্গটা মুজিব এ মুহূর্তে তুললেন না। মনি আর তাজউদ্দীনের ভেতর পরস্পর সম্পর্কে একটা টেনশান কাজ করে, প্রধানমন্ত্রী তা জানেন।

'মুজিব ভাই, কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলি।' হঠাৎ বলে বসেন তাজউদ্দীন। 'রাগ কইরেন না। কিন্তু আপনার ভালোর জন্যেই কিছু কিছু বিষয়ে আপনার কঠোর হওয়া দরকার।'

‘কী কইবার চাও?’ মুজিব সচকিত হন।

‘আপনার মনে আছে, সেইদিন পেপারে একটা খবর দেখে আপনারে ফোন দিছিলাম? ওই যে, আর্মি যে আমাদের আওয়ামী লীগের এক এমপির বাড়ি থেকে রিলিফের জিনিসপত্র উদ্ধার করল, মনে নাই?

মুজিব ভাই, আপনি আর্মি নামাইছেন দুর্নীতি ঠেকাইতে, ইটস ফাইন। কিন্তু শুধু এমপি বলে আমরা ওই দুর্নীতিবাজদের ছেড়ে দিবো? হাতে নাতে ধরা হইলো, সে কি তবে নির্দোষ? যদি তাই হয়, তবে নিশ্চয়ই আর্মিদের বিচার করতে হয় সম্মানিত একজন মানুষকে হেয় করার জন্যে! আপনি বলেছিলেন এই ঘটনার একটা সুরাহা করবেন মুজিব ভাই, কিন্তু এখনো কিছুই হয় নাই। এইসব ঘটনা এখনই সামাল না দিলে পরে কিন্তু অনেক বড় কিছু হয়ে যাইতে পারে মুজিব ভাই। আপনি একটু বুঝেন...’

শেখ মুজিব নীরবে সব কিছু শুনে যান। এরপর পাইপ টানা শেষ হলে শুকনো গলায় ‘আসি তাজউদ্দীন, কাল পরশু অফিসে আইসো একবার।’ বলে উঠে যান।

তাজউদ্দীন শেখ মুজিবের চলে যাওয়ার দিকে অপলকে তাকিয়ে থাকেন খানিক। মুজিব ভাই যে এভাবে নিজের অজান্তেই সেনাবাহিনীকেও খেপিয়ে দিচ্ছেন!

কে জানে কেন, মুজিব ভাইয়ের সাথে আজকাল প্রায়ই মতে মিলছে না তাজউদ্দীনের। সত্যি বলতে, আজকাল কিছুই যেন মিলছে না তাজউদ্দীনের প্রত্যাশার সাথে। বিশেষ করে বঙ্গবন্ধু দেশে না থাকলেই নানা রকম গণ্ডগোল দেখা যায় এমনকি পার্টির ভেতরেও। গত মাসেই বঙ্গবন্ধু যখন মস্কো গেলেন, সূর্যসেন হলে ছাত্রলীগের সাতটা ছেলে খুন হয়ে গেল। খোদ ছাত্রলীগেরই সাধারণ সম্পাদক শফিউল আলম প্রধানসহ আরো কয়েকজন গ্রেপ্তার হয়েছে। কিন্তু এটা কেমন ধারার ছাত্ররাজনীতি! এর জন্যে তো বাংলাদেশ স্বাধীন করেননি তারা! বুকের মাঝে এমন লোভ আর রক্ত পিপাসা নিয়ে দেশকে কী করে ভালোবাসবে মানুষ!

তাজউদ্দীনের চোখে ভাসে, ওআইসি সম্মেলনে যাওয়া নিয়েও মুজিব ভাইয়ের সাথে ঠিক মতৈক্য হয়নি তার। পাকিস্তানের সেই সম্মেলনে বঙ্গবন্ধুর যাওয়া নিয়ে তাজউদ্দীনের আপত্তি ছিল। তার যুক্তি ছিল, ভুট্টোর সাথে কূটনৈতিকভাবে ঘনিষ্ঠ হলে পাকিস্তানের সাথে অমীমাংসিত সমস্যাগুলোর সমাধান করতে আরো দেরি হবে। আর শেখ মুজিব লাহোরে গেলে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানাতেই হবে ভুট্টোকে, সেক্ষেত্রে এখন গা ঢাকা দিয়ে থাকা পাকিস্তানিদের ধামাধরারা আবার সংগঠিত হবার চেষ্টা করতে পারে। মুজিব ভাই এই যুক্তি অগ্রাহ্য করে লাহোর রওয়ানা দেন। অবশ্য সে সম্মেলনেই পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে।

বলা ভালো দিতে বাধ্য হয়েছে। তাজউদ্দীন পরে জেনেছেন, সম্মেলনের ঠিক আগে আগে কুয়েত-মিশর-ইন্দোনেশিয়া-লিবিয়ার মতো বেশ কিছু দেশ উপমহাদেশের পরিস্থিতি দ্রুত স্বাভাবিক করতে চাপ দিয়েছে বাংলাদেশ আর পাকিস্তানকে।

মাঝে মাঝে শেখ মুজিবের প্রতি প্রচণ্ড অভিমান হলেও সময়ে সময়ে মানুষটির জন্যে অসম্ভব মায়া হয় তাজউদ্দীনের। এত চেষ্টা করেও আন্তর্জাতিক চাপে শেষ পর্যন্ত ওই ১৯৫ জন পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীর বিচারটাও করতে পারলেন না মুজিব ভাই। বিনিময়ে অবশ্য শেখ মুজিব মধ্যপ্রাচ্যর বন্ধুত্ব এনেছেন, পাকিস্তানে আটকা পড়া বাঙালিদের ফেরত এনেছেন, এনেছেন জাতিসংঘের স্বীকৃতি।

গত মাসের এক ত্রিপক্ষীয় চুক্তিতে পাকিস্তানও অঙ্গীকার করেছে তার যুদ্ধাপরাধী নাগরিকদের বিচার সে করবে, তবু তাজউদ্দীনের মাঝে মাঝে বড় হতাশ লাগে। পাকিস্তানিদের তিনি বিশ্বাস করেন না। ভবিষ্যতের জন্যে এই বিচার কাজটা ঝুলিয়ে রেখে তারা ইতিহাসে অমোচনীয় কোনো দাগ ফেলে দিলেন কি না, কে বলবে!

বাংলাদেশকে নিয়ে তাজউদ্দীনের হতাশা আর কাটতে চায় না। দিনে দিনে সেটি আরো বাড়ে।

সপ্তাখানেক পরে বাংলাদেশের জন্যে আরো একটি অপ্রত্যাশিত দুঃসংবাদ আসে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের কাছ থেকে। বন্ধুরাষ্ট্র কিউবার কাছে চটের থলে বিক্রি করায় বাংলাদেশকে খাদ্য সাহায্য দেবে না আমেরিকা। তাজউদ্দীন তখনো জানতেন না, এই দুঃসংবাদের বীজটি শিকড় বহুদূর ছড়িয়ে ঘোর অমানিশার অরণ্য হয়ে উঠবে আর কয়েকমাস পরেই।

বিষণ্ন বর্ষার বিকেলে

গত কয়েকদিন ধরে অঝোরে বৃষ্টি হচ্ছে। শহর জীবনে বৃষ্টি সময়ে সময়ে উপভোগের না হয়ে যন্ত্রণার হয়ে ওঠে। মাসের প্রথম সপ্তাহটা যেরকম ভ্যাপসা গরম ছিল, সে গরম নামিয়ে দিতে মানুষ প্রতীক্ষা করছিল বৃষ্টির। কিন্তু তারপরের টানা বর্ষণে সেই স্বস্তিটা উবে যেতে সময় লাগেনি। আকাশের কোথাও যেন ফুটো হয়ে গেছে, পরিকল্পনা কমিশন সদস্য নুরুল ইসলামের মনে হয়।

নুরুল ইসলাম বসে আছেন প্রধানমন্ত্রীর অফিসরুমের বাইরে। প্রধানমন্ত্রী কারো সাথে আলাপে ব্যস্ত, নুরুল ইসলাম তাই অপেক্ষা করছেন বসে। এসি'র গুঞ্জন ছাপিয়ে মাঝে মাঝেই বাইরে থেকে মুষলধারে বৃষ্টি পতনের শব্দ ভেসে আসছেন। নুরুল ইসলামের শরীরের নিচের দিকটাও ভিজে গেছে খানিক। তিনি খুব সংকুচিত হয়ে আছেন। কারণ থেকে থেকে মনে হচ্ছে, তার ভেজা মোজা

থেকে বাজে কোনো গন্ধ বেরোচ্ছে! প্রধানমন্ত্রীর অফিসে এই অবস্থায় ঢোকাটাই বিরাট বোকামি হয়েছে।

হঠাৎ করেই অফিসরুমের দরজাটা খুলে গেল। খন্দকার মোশতাক বেরিয়ে এলেন ভেতর থেকে। নুরুল ইসলাম ও মোশতাক প্রায় একই সময়ে একে অন্যের মুখের দিকে তাকালেন।

সব সময়ের মতোই মোশতাক দ্রুত নিয়ে নেন আলাপচারিতার দায়িত্ব। তার মুখে সেই ট্রেডমার্ক একান-ওকান হাসি। 'আসসালামু আলাইকুম নুরুল ইসলাম সাহেব, কী অবস্থা? কেমন আছেন, এইখানে হঠাৎ কী মনে কইরা আসলেন?'

'ওয়ালাইকুম সালাম। এইতো স্যার, আছি ভালোই। আপনি ভালো? ...এই তো, প্রাইম মিনিস্টারের সাথে কিছু আলাপ করতে আসলাম।'

'অবশ্যই আসবেন, অবশ্যই আসবেন। হে হে।' মোশতাকের হাসি যেন থামতেই চায় না। 'আপনারা না এলে আর কারা আসবে? আপনারা হলেন কাজের মানুষ, দেশের নীতি নির্ধারক সব!...'

হাসতে হাসতেই বিদায় নেন আচকান পরা অবয়বটি। নুরুল ইসলাম আবার বসে পড়েন, অপেক্ষা করতে থাকেন প্রধানমন্ত্রীর ডাকের জন্যে। মোশতাক সাহেবকে দেখে তার ভারত সফরের কথা মনে পড়ে গেছে। এই তো, গত মাসেই প্রধানমন্ত্রীর সাথে ভারতে গিয়েছিলেন নুরুল ইসলাম। খন্দকার মোশতাকও ছিলেন সাথে। আর সেই রাষ্ট্রীয় সফরেই মোশতাককে ঘিরে দুটি অদ্ভুত মন্তব্য করেছিলেন শেখ মুজিব।

প্রথমবার ঘটনাটা ঘটেছিল খাবার টেবিলে। হঠাৎ করেই মোশতাকের পিঠে এক চাপড় মেরে শেখ মুজিব হাসতে হাসতে ইন্দিরা গান্ধীকে বলেন, সমস্ত কাছের মানুষদের মাঝে মোশতাকের সাথেই তার সম্পর্ক সবচেয়ে মধুর। কারণ মোশতাক তার শ্যালক! শেখ মুজিব হাসতে হাসতে এরপর বিহ্বল ইন্দিরাকে ব্যাখ্যা করেন বাংলাদেশে শ্যালকেরা কতটা কাছের মানুষ হন।

দ্বিতীয় ঘটনার অবতারণা ফেরবার পথে, বিমানে। মুদ্রাস্ফীতি নিয়ে আলোচনা করছিলেন নুরুল ইসলাম আর মোশতাক। শেখ মুজিব চকিতে সেই আলাপে অংশ নিয়ে জানালেন, গত রাতে তিনি অদ্ভুত এক স্বপ্ন দেখেছেন। সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাকে স্বপ্নে আদেশ দিয়েছেন, হজরত ইব্রাহিম(আ.)-এর মতন তার সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তিকে কোরবানি দিতে। শেখ মুজিব তা দেখে ঠিক করেছেন, তিনি মোশতাককেই কোরবানি দেবেন। কারণ, যেমনটা আগে তিনি বলেছিলেন, মোশতাকই তার সবচেয়ে কাছের মানুষ।

খন্দকার মোশতাকের মুখ দেখেই বোঝা গেছিল, তিনি শেখ মুজিবের ঐ মন্তব্যগুলো সহজভাবে নিতে পারেননি। এমনকি অসন্তোষ গোপনের বাহ্যিক কোনো চেষ্টাও ছিল না মোশতাকের। শেখ মুজিব আর মোশতাকের সম্পর্কে কি

তবে ফাটল ধরেছে? নাকি শেখ মুজিব কোনো আশঙ্কা করছেন? এই নিয়ে পরে অনেক ভেবেছেন তিনি, কিন্তু কোনো সিদ্ধান্তেই পৌঁছতে পারেননি নুরুল ইসলাম।

... প্রধানমন্ত্রীর ঘর থেকে এ সময় ডাক আসে নুরুল ইসলামের। ভেজা মোজা নিয়ে কিঞ্চিৎ বিব্রত মুখে অফিসরুমে ঢোকেন তিনি। দেখতে পান, শেখ মুজিবের মুখে হাসি নেই। রিভলভিং চেয়ারে বসে আনমনে এদিক ওদিক দুলছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। ঘরের ঠিক মাঝখানে জ্বলতে থাকা বাতিটা বাইরের বর্ষাজনিত অন্ধকারকে যেন আরো ফুটিয়ে তুলেছে কামরার প্রান্তে, শেখ মুজিবের মুখমণ্ডলে।

'বসেন নুরুল ইসলাম সাহেব। কী কইবেন কন।' শেখ মুজিব বিষণ্ন স্বরে বলেন।

সময় নষ্ট না করে তাই নুরুল ইসলাম সরাসরি চলে যান কাজের কথায়। 'স্যার, আমাদের দুশ্চিন্তার অনেকগুলা কারণ আছে। যে রকম বৃষ্টি হচ্ছে, তাতে বন্যা হবার চান্স খুব বেশি। বৃষ্টিতে পাটের খুব ক্ষতি হচ্ছে, আবার সামনে আমনের চাষ শুরু করতেও প্রবলেম হবে। খাদ্য ঘাটতি ঠেকাতে যে স্থানীয় কমিটিগুলা করা হইছিল, সেগুলা দিয়েও খুব বেশি কাজ হয় নাই। ঘাটতির আশঙ্কায় বরং লোকে ব্যক্তিগত মজুদ বেশি করে করছে।'

'তো আপনাগো সাজেশান কী?' জানতে চান প্রধানমন্ত্রী।

'স্যার, ' ইতস্তত করে বলেন নুরুল ইসলাম, 'আমার মনে হয় সামনে যদি দুর্ভিক্ষ ঠেকাইতে চাই আমরা, তাহলে জনমত আমাদের পক্ষে আনতে হবে। পরিস্থিতিকে জাতীয় দুর্যোগ ঘোষণা করা উচিত।

আমার ধারণা স্যার, আপনি সারা দেশে ঘুরে ঘুরে কৃষক, ব্যবসায়ী, মজুদদারদের উদ্বুদ্ধ করতে পারেন। কেউ ওদের বোঝাতে পারলে স্যার, আপনিই পারবেন। আপনার উপরে সবার বিশ্বাস এখনো অটুট আছে...'

শেখ মুজিব চেয়ার ঘোরানো বন্ধ করে উঠে দাঁড়ান। দুই হাত পেছনে একত্র করে ধীর পায়ে হেঁটে তিনি জানালায় চোখ রেখে দাঁড়ান। আকাশের অবিশ্রান্ত বর্ষণেও তার ভেতরটা যেন আর হালকা হয় না।

বাংলাদেশ ব্যর্থ করে দিচ্ছে শেখ মুজিবের সমস্ত প্রচেষ্টাকে, কিছুতেই কিছু হচ্ছে না যেন। নুরুল ইসলাম যে ছেলেমানুষি আবেদন করেছেন, তাতেও কোনো ফল হবে না, প্রধানমন্ত্রী অভিজ্ঞতা দিয়ে তা অনুধাবন করছেন। মুজিব কোটের পকেটে বরং জমবে আরো কিছু হতাশা।

হতাশা অবশ্য গত কয়েকদিন থেকেই শেখ মুজিবের বুকে জমাট বেঁধে রয়েছে।

সাবেক প্রেসিডেন্ট আবু সাঈদ চৌধুরী যেদিন নালিশ নিয়ে আসলেন, যে তার টাঙ্গাইলের পৈতৃক বাড়িটা দখল করেছে আব্দুল লতিফ সিদ্দিকী, সেদিন

থেকেই হতাশা গ্রাস করেছে তাকে। একটা স্বাধীন দেশে সাবেক একজন রাষ্ট্রপতির বাড়ি দখল করে নেবে একজন সাংসদ, এটাও কি সম্ভব? বাংলাদেশের মানুষ কি তবে এত অচেনা হয়ে গেছে বঙ্গবন্ধুর?... রক্ষীবাহিনীকে দিয়ে সেই বাড়ি উদ্ধার করে আবু সাঈদ চৌধুরীকে তা ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে রাতারাতি, কিন্তু শেখ মুজিব এই শেলের আঘাত ভুলতে পারছেন না। এতটাই তবে বদলে গেছে তার দেশ?

শেখ মুজিবের মনে পড়ে, পবিত্র কুরআন পড়ার সময় তিনি আসহাবে কাহাফের কথা জেনেছিলেন একসময়। মূর্তিপূজারি বাদশাহের রাজত্ব পরিত্যাগ করে এক গুহায় আশ্রয় নিয়েছিল কয়েকজন যুবক। ঘুম ভেঙে গুহা থেকে বেরিয়ে এসে তারা দেখে বাইরের দুনিয়া পালটে গেছে, সেখানে এখন প্রতিষ্ঠিত সৎ লোকের শাসন। যুবকদের ঘুমের মাঝে যে পেরিয়ে গেছে কয়েকশো বছর!

মাঝে মাঝে শেখ মুজিবের বোধ হয়, তার দশমাসের কারাবন্দির জীবনকালে কয়েকশো বছর পেরিয়ে গেছে এই ব-দ্বীপ অঞ্চলেও। আর এই আগাগোড়া বদলে যাওয়া বাংলাদেশে শেখ মুজিব নামের পেছনে পড়ে যাওয়া মানুষটির কোনো জায়গা নেই।

জবাবের জন্যে অপেক্ষমাণ নুরুল ইসলামের দিকে ফেরেন শেখ মুজিব। আলো অন্ধকার ঘরে গমগম করে ওঠে তর্জনি দিয়ে স্বাধীনতা লেখা মানুষটির কণ্ঠ। 'বাংলাদেশের মানুষ খুব অদ্ভুত, বুঝলেন নুরুল ইসলাম সাহেব। সারা জীবন আমি বাংলাদেশের মানুষের সাথে কাজ করছি। কিন্তু তারা অসম্ভব আবেগী। ব্যর্থতার কোনো ক্ষমা অগো কাছে নাই।...

মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, আমি বুঝি একা একা একটা অচেনা রাস্তায় হাঁটতাছি। কোথায়ও কেউ নাই। ঘুইরা ঘুইরা আমি আইসা পড়তাছি খালি এক জায়গায়। চাইরপাশে প্রচুর বৃষ্টি-বাদলা। ঝড়ে কিছুই দেহন যায় না। আমি এতকিছুর মাঝে সেই রাস্তায় কোনো দিশা পাই না।...'

নুরুল ইসলাম ঘন মেঘে ঢাকা আকাশজনিত অন্ধকারের মাঝে বঙ্গবন্ধুর মুখ দেখতে পান না। পুরো পৃথিবী বাংলাদেশকে চেনে যেই ক্যারিশম্যাটিক চেহারাটা দিয়ে, অন্ধকারে সেটি বড় ম্লান হয়ে থাকে।

একটা রয়েল বেঙ্গল টাইগারের গায়ে যতগুলো ডোরা কাটা থাকে, বাংলাদেশের মানুষ, বর্তমানে আর ভবিষ্যতের গর্ভে শেখ মুজিবের বর্ণনা দিতে পারে ঠিক তত ভাবে। কিন্তু তার সবচেয়ে বড় সমালোচকটিও, সজ্ঞানে অথবা বিস্মৃত হয়ে, কোনো অবস্থাতেই দাবি করতে পারে না এখনো পারবে না কখনোই, শেখ মুজিবের চেয়েও কেউ বেশি ভালোবাসতে পারে বাংলাদেশকে। অথচ এই অদ্ভুত দেশটির পিঠে চেপে থাকা অক্টোপাস দুঃসময় যেন কালি ছুড়ে

বিভ্রান্ত করে দিচ্ছে সেই শেখ মুজিবকে। বাংলাদেশ রূপকথার মিডাসকে তাই বড় অসহায় দেখায় নুরুল ইসলামের সামনে।

বাইরে তখনো অঝোর ধারায় ঝরছে আকাশ। বাংলাদেশের কান্না যেন থামতেই চায় না।

মরু সফর

গতকাল থেকেই মনে হচ্ছিলো, কোথাও যেন একটা সমস্যা আছে। এয়ারপোর্টে তাদের রিসিভ করতে আসার কথা ছিল কুয়েতের অর্থমন্ত্রীর, অথচ পাঠানো হলো দুইজন জুনিয়র অফিসারকে। তা দেখে আবু সাইদ চৌধুরী খানিকটা হতাশ হয়েছিলেন, অর্থ সচিব কফিলউদ্দিন মাহমুদও। তাজউদ্দীন সাহেবকে দেখে অবশ্য তার মনোভাব বোঝা গেল না। বরং, 'আমাদের মিনিস্টারের একজন নিকটাত্মীয় মারা গেছেন, এই মুহূর্তে উনি তাই আসতে পারেননি।' জুনিয়র অফিসারদের এই কৈফিয়ত শুনে তাজউদ্দীন বেশ নরম স্বরে বললেন, 'ঠিক আছে। ওনার সাথে তো আমার মিটিং-এর সময়েই দেখা হবে। ওনার শোক কিছুটা কমে আসার জন্যে দরকারে আমরা দুই একদিন বেশি থাকলাম।'

আজ সকালে যখন কুয়েতের অর্থমন্ত্রী সময় দিলেন আসর আর মাগরিবের নামাজের মাঝের সময়টুকুর জন্যে শুধু, বোঝা গেল, যতটা কম সময় দেয়া যায়, তা দিয়েই দায় সারতে চাচ্ছেন তারা। আবু সাইদ আর কফিলউদ্দিন এই নিয়ে নিজেদের মাঝে কথা বললেন। দুজনে ধারণা করলেন সম্ভবত বাংলাদেশ বিরোধী পাকিস্তানের নানা রকমের অপপ্রচারের কারণেই এরকম ব্যবহার পাচ্ছেন তারা। সেই সন্দেহ সত্যি করে দিল আলোচনায় বসার পরে কুয়েতি মিনিস্টারের প্রথম প্রশ্নটিই। 'তোমরা কেন পাকিস্তান থেকে আলাদা হলে?'

প্রশ্ন শুনেই আবু সাইদ চৌধুরী তাজউদ্দীনের দিকে ফিরলেন। স্যার না জানি কীভাবে রিঅ্যাক্ট করেন এখন!

তাজউদ্দীন কিন্তু এমন ভাব করলেন, যেন কূটনৈতিক প্রটোকলে প্রশ্নটা একেবারেই সাধারণ। 'দেখুন, মূল বিষয়টা অর্থনৈতিক শোষণ। আপনি আমি দুজনেই অর্থমন্ত্রী, কাজেই আশা করি আপনাকে সহজেই বোঝানো যাবে।...'

এরপরে তাজউদ্দীন বলতে থাকেন, পাকিস্তান রাষ্ট্র ভাঙার পেছনে ধর্মের হাত নেই; বরং হাত আছে পাকিস্তানের অশ্লীল রাষ্ট্রীয় শোষণের। কিন্তু কুয়েতের মন্ত্রী যেন তা মানতেই চান না, তিনি বারবার কথা বলেন পাকিস্তানের পক্ষেই। সাফাই শুনতে শুনতে এক পর্যায়ে উত্তেজিত হয়ে পড়েন শ্রোতা কফিলউদ্দিন। বলেন, 'এক্সেলেন্সি, এই শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে বসে অনেক কিছুই বলা যায়। কিন্তু কোন অত্যাচারের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে, সেটা আপনার জানা

থাকলে আপনি এভাবে বলতে পারতেন না। ...শুনে রাখুন, আমি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়া খাঁটি মুসলমান। আমাদের ডেলিগেশনের সকলেই ইসলামের সমস্ত নিয়ম পালন করেন। কিন্তু পাকিস্তানিরা ইসলামের নামে কী করেছে তা আপনি জানেন?...'

তীব্র ক্ষোভ ঝরতে থাকে অর্থসচিবের কথায়। সে বক্তব্য শুনতে শুনতে মুখে নুন পড়া জোঁকের মতোই চুপসে যান কুয়েতি মন্ত্রী। 'ব্রাদার, আই এম সো সরি!' বলতে বলতে আরবের কায়দায় তিনি প্রশমন করতে চান বাংলাদেশের অতিথিদের।

আড়চোখে তাকিয়ে আবু সাইদ দেখেন, তাজউদ্দীন মিটিমিটি হাসছেন। কফিলউদ্দিনের পুরো বক্তব্যের সময় তাকে একটুও বাধা দেননি অর্থমন্ত্রী। তিনি রাজনীতিবিদ, জানেন কখন কীভাবে চুপ করে থাকতে হয়, অন্যদের বলার সুযোগ দিতে হয়। তবে সময়ের প্রয়োজনে তাজউদ্দীন নিজেই অনেক সময় প্রটোকলের বাইরে গিয়ে সরব হয়ে ওঠেন। কয়েক মাস আগে সেরকম একটা ঘটনা তো ঘটেছেই! আবু সাইদের স্মরণ হয়।

এডিবি'র সেই সভাতে যোগ দিতে কুয়ালালামপুরে তাজউদ্দীনের সাথে গিয়েছিলেন কফিলউদ্দিনও। সাহায্য চায় বাংলাদেশ, কিন্তু নানা রকম মেমো আর ফাইলপত্র দেখিয়েও সেখানে ঠিক সন্তুষ্ট করা যাচ্ছে না দাতাগোষ্ঠীকে। এর মাঝে তাজউদ্দীন হঠাৎ করেই দাঁড়িয়ে গেলেন, কাগজ গোছগাছ করে শুরু করলেন ফিতা দিয়ে ফাইল বাঁধার কাজ। বললেন, 'এক্সেলেন্সিজ, আমি আপনাদের সামনে কতবার পুনরাবৃত্তি করবো যে বাংলাদেশের সহজ ঋণ প্রয়োজন? আপনারা কি চান, আমি হাঁটু গেড়ে বসে সেই ঋণ প্রার্থনা করি?'

স্তব্ধ হয়ে গেল সমস্ত কূটনৈতিক আচরণবিধি। কয়েক ঘণ্টায় যথেষ্ট ছিল না যা সুরাহা করবার জন্যে, তাজউদ্দীনের ওই এক কথায় তা হয়ে গেল পনেরো মিনিটেই। তার আচরণ আর বাচনভঙ্গিতে মুগ্ধ হয়ে গেছিলেন সকলে।

এই মুহূর্তে মরু শহরের বুকে তাজউদ্দীন মুচকি হেসে প্রত্যক্ষ করতে থাকেন কুয়েতের অর্থমন্ত্রীর বদলে যাওয়া আচরণকে। কফিলউদ্দিনের ক্ষোভের কিছু প্রশমন ঘটলে খানিক পর কূটনৈতিক স্বরে তাজউদ্দীন বলেন, 'বাংলাদেশ চেষ্টা করবে উপমহাদেশের পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার। আমরা ওআইসি সম্মেলনে গিয়েছি, পাকিস্তানের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের পথেও আছি।...'

মিটিং শেষে গাড়ি চেপে হোটেলে যাবার সময়ও তাজউদ্দীনের মাথায় কিন্তু এই বিষয়টাই ঘুরতে থাকল। বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর কাঁধে এখনো পাকিস্তানের ভূত চেপে আছে। আর সব পরাজিত শক্তির মতোই নীরবে ঠিক সময়ের জন্যে অপেক্ষা করছে ওরা। পাকিস্তানের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের অবসরে সেই গোষ্ঠীর কেউ কেউ হয়তো আবার সক্রিয় হয়ে উঠবে।

মুক্তিযুদ্ধের সময় তাজউদ্দীনকে ভারতের দালাল ত্যাজারাম বলে প্রচারণা চালিয়েছিল যারা, সেই পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ভুট্টো প্রথমবারের মতো স্বাধীন বাংলাদেশ ঘুরে গেছে কিছুদিন হলো। ভুট্টোর ঢাকা আসবার পূর্বে পাকিস্তান সরকারের তরফ থেকে অনুমতি চাওয়া হয়েছিল একটি অগ্রগামী দল পাঠানোর। বঙ্গবন্ধু সরল মনে সেই অনুমতি দিয়েছিলেন; কিন্তু বিভিন্ন সূত্র থেকে পরে জানা গেছে সফর ব্যবস্থাপনা করা ছাড়াও ওই দলটি পিডিপি, মুসলিম লীগ, জামাতে ইসলামী এইসব পাকিস্তানপন্থিদের সাথে গোপনে যোগাযোগ করেছিল। এর পেছনে কাজ করেছে ভুট্টোর একরকমের প্রতিশোধ- স্পৃহা, তাজউদ্দীনের মনে হয়।

লাহোরে ওআইসি সম্মেলনে গিয়ে মুজিব ভাই সেখানকার মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অভিবাদন পেয়েছিলেন, তাজউদ্দীন শুনেছেন। সেই ঘটনা হয়তো ভুট্টোকে ক্রুদ্ধ করে থাকবে, পাল্টা হিসেবে তাই বাংলাদেশ ভ্রমণের সময় সেরকম অনুগত কিছু মানুষের প্রয়োজন পড়েছিল ভুট্টোর। সেই ইচ্ছামাফিক ঢাকার বিমানবন্দরে প্রচুর বিহারি আর কতিপয় পাকিস্তানপন্থি দলের লোকেরা ভুট্টোকে স্বাগতম জানিয়ে এক কৃত্রিম দৃশ্যের জন্মও দিয়েছে। তাজউদ্দীনের আশঙ্কা তাই বাড়ছেই, অমানুষগুলো আবার না জোট বাঁধতে শুরু করে।

বারংবার বাংলাদেশকে তাচ্ছিল্য করার চেষ্টা প্রকাশ পেয়েছিল ভুট্টোর পুরো সফরে, তাজউদ্দীন মনে করে দেখেন। প্রথমে সে বেঁকে বসে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে যাবে না বলে। তার ভাব এমন, যে বাংলাদেশের বহু মানুষ তো এখনো পাকিস্তানে বিশ্বাস করে দেখলে না একটু আগে কীভাবে স্বাগতম জানাল আমাকে! তাহলে আর শহিদ বাংলাদেশিদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাব কেন? ...কিন্তু শেখ মুজিব ভুট্টোর এই আচরণ সহ্য করেননি। সরাসরি জানিয়ে দিয়েছেন, জাতীয় স্মৃতিসৌধে না গেলে তৎক্ষণাৎ আলোচনা বাতিল করে পাকিস্তানে ফিরে যেতে হবে ভুট্টোকে। ভুট্টো তাই গেলেন স্মৃতিসৌধে, তবে কূটনৈতিক শিষ্টাচারের চূড়ান্ত অপমান করে মাথায় রেখেছিলেন রংচঙে গলফ খেলার টুপি।

বঙ্গভবনের সভায় '৭১এর মার্চ সম্পর্কে ভুট্টো অবলীলায় যখন বলেন, 'ঐ সময় একটু শক্তিপ্রয়োগ আসলে অপরিহার্য আর যুক্তিসংগত ছিল।' শেখ মুজিব সামনে থেকেই প্রতিবাদ করেন তখনও। বলেন, 'ব্যক্তিগত স্বার্থে কাউকেই ইতিহাস বিকৃত করতে দেয়া হবে না!'

মুজিব ভাইয়ের সেই তাৎক্ষণিক জবাব মনে করে হৃদয়ে বেশ আলোড়িত হন তাজউদ্দীন। কিন্তু বাইরে মরুর বুকে ঝলমলে আলোর শহরটিকে একটু দেখতেই বিষাদ ভর করে তার মাঝে। দরিদ্র একটা দেশের দারিদ্র্য আরো খোলতাই করে দিয়েছে সাম্প্রতিক পরিস্থিতি। দুর্ভিক্ষের দিকেই যাচ্ছে বাংলাদেশ। এ মুহূর্তে প্রচুর বৈদেশিক সাহায্য দরকার। কুয়েতের পরে ছুটতে হবে সৌদি আরব,

ইরাকেও। যেখান থেকে যা অনুদান পাওয়া যায়, গুরুত্বপূর্ণ তার প্রতি পাই-পয়সাটাও।

মানুষ তার সমস্ত কিছু পেছনে ফেলে যেতে পারে, স্মৃতি, পেশা বা পরিবার। শুধু ক্ষুধা কখনো সে ত্যাগ করতে পারে না। এই তাড়না বড় পাশবিক। একটু যারা চিন্তা করেন দেশ নিয়ে, বাংলাদেশের হা করে থাকা মুখগুলো আজকাল কেবল পীড়া বাড়িয়ে যাচ্ছে তাদের।

অগণিত ক্ষুধার্ত মানুষে বোঝাই বাংলাদেশের মুখপাত্র হয়ে ক্যারিশম্যাটিক শেখ মুজিব যখন এক নিঃশব্দ অন্ধকারে পথ হাতড়ে বেড়াচ্ছেন দুনিয়ার এমাথা-ওমাথায়, তার তুখোড় ডেপুটি তাজউদ্দীনও তখন পার্সোনালিটির সাথে বেমানান ভিক্ষার থলি রুপি ফাইল হাতে ছুটছেন ক্রমাগত। কিন্তু হতাশার অমানিশা এমন প্রগাঢ় হায়, সেটা দূর করতে আলোকের এই দুই অনন্তধারাও বড় অকিঞ্চিৎ!

ক্ষুধার্ত বাংলাদেশ

প্যাকেটের শেষ দুটো শুকনো বিস্কুট একটা বাচ্চাকে বাড়িয়ে দিল আবদুল বাতেন। তার চামড়া বাচ্চাটির হাতের স্পর্শে শিউরে উঠল। মনে হলো, যেন এক টুকরো মোম ঘষে দিয়েছে কেউ। এত রুগ্ণ বাচ্চাটা, চোখে দেখেও বিশ্বাস হতে চায় না।

আবদুল বাতেন দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে একটা। এরকম একটা বাচ্চা তো নয়, শতশত – না, ভুল হলো – হাজার হাজার বাচ্চা না খেতে পেয়ে কোনোক্রমে একটা কঙ্কাল সম্বল করে দাঁড়িয়ে আছে। গত মাসখানেক ধরে যা হচ্ছে, তাতে যুদ্ধের সেই শরণার্থী শিবিরের দৃশ্যগুলো বারবার মনে পড়ে যাচ্ছে বাতেনের। ক্ষুধা যেন নিজেই সর্বগ্রাসী ক্ষুধা পেটে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে বাংলাদেশের মানুষের ওপর।

বাতেন দাঁড়িয়ে আছে মীরপুরের একটা বন্যা শরণার্থী শিবিরে। লোহার গেটের সামনে বন্দুক নিয়ে পাহারা দিচ্ছে কয়েকজন সিপাই, বাইরে বহু মানুষ। বলা ভালো, ওরা মানুষের চামড়ায় ঢাকা আকৃতি। তাদের অপেক্ষা, যদি কিছু খেতে পাওয়া যায়!

ভিড় করে থাকা মানুষদের অনেকেই জীবনে হয়তো প্রথমবার পা রেখেছে রাজধানীতে। খাবারের জন্যে এখন হন্য হয়ে মানুষ পায়ে হেঁটে চলে আসছে পাবনা, ময়মনসিংহ কি সেই সুদূর রংপুর থেকে। ভাত তো নাই, কেঁদে কেঁদে ঢাকার রাস্তায় রুটি খুঁজে এই মানুষেরা। রুটিদাতারাও দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়ায়, আজকাল ভাতের ফ্যান খেতে চায় সাহায্যপ্রার্থীরা। সে আবেদন নিষ্ফল হয়ে ফিরে আসে শহরের অলিগলিতে। প্রায়ই কোনো গলিতে হয়তো সহাবস্থান করে ক্ষুধার্ত

ভিখারি আর তারই মতো কারো মৃতদেহ। রাজধানীর নাগরিকেরাই বা কজনকে সাহায্য করবে? এমনকি মধ্যবিত্তদেরও এখন চাল কেনার সামর্থ্য নাই, তারাও রুটি খায়।

যুদ্ধের পরের বছর গেল খরা, তারপরে গেল বন্যা, আবদুল বাতেন ভাবে। আর এবারের বন্যা তো আরো ভয়ানক। খেতে ফসল নাই, বাড়ি ভেসে গেছে, বাজারে যা চাল আছে তার দাম দেড় বছরে বেড়েছে চারগুণ। চোরাচালান আর মজুদদার তো সবসময়েই থাকে। সবকিছুর যোগফলে বাংলাদেশের মানুষ নেমে এসেছে পশুর কাতারে।

নিরন্ন মানুষের মিছিল পথে নেমেছে ঢাকা যাবে বলে। পরনের কাপড় বিক্রি করে গম কিনছে মানুষ, ক্ষুধায় কারো মৃত্যু হলে তাকে পথেই ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে তার স্বজনেরা। বাঁচতে তো হবে আগে!

আবদুল বাতেন এখন পথে পথে ঘুরে বেড়ায়, খাটে লঙ্গরখানা আর শরণার্থী শিবিরগুলোতে। তার সামর্থ্য কম, সে ছোট কাজ করে। কিন্তু বাতেন অর্থের অভাবটা পুষিয়ে দিতে চায় শারীরিক শ্রমে। এই শরণার্থী কেন্দ্রে কিছুক্ষণ আগে খিচুড়ি দেয়া হয়েছে। প্রায় আড়াই হাজার মানুষের পাত দেয়া বাতেন তদারক করেছে। বিদেশি সাংবাদিকেরা এসে ছবি তুলেছে ফটাফট। কিন্তু আবদুল বাতেন ওসব নিয়ে ভাবে না। তার চিন্তা আগামীকাল কী করে যাবে তাই নিয়ে। খাবার শেষ হয়ে এসেছে, বড়জোর আরেক বেলার খিচুড়ি পাকানো যাবে সবার জন্যে। এরপরে কী হবে কেউ জানে না। বিদেশি কিছু বিস্কুট আসবার কথা, সেগুলো কখন আসবে কে জানে!

কাগজে পড়েছে বাতেন, বাংলাদেশে খাবার পাঠানোর দুটি চালান বাতিল করে দিয়েছে আমেরিকা। কিউবার কাছে কয়েকটা চটের ব্যাগ বিক্রি করায় নাকি বাংলাদেশ আইন ভেঙেছে আমেরিকার। অথচ পেপারেই এসেছে, কিউবার কাছে তুলা রপ্তানি করে মার্কিনদের বন্ধু রাষ্ট্র মিশর, কিন্তু তাদের জন্যে আমেরিকার সাহায্য বন্ধ হয়নি। রাজনীতির এইসব মারপ্যাঁচ খুব বোঝে না বাতেন, সে কেবল বুঝে নিয়েছে, বিপদে গরিবের কোনো বন্ধু থাকে না।

ক্ষুধার জ্বালায় বিপর্যস্ত বাংলাদেশের মানুষ, তাদের রক্ষার জন্যে অন্যান্য দেশগুলোর কাছে সাহায্যের আবেদন করে বেড়াচ্ছেন শেখ মুজিব। দেশি-বিদেশি বেশ কিছু পত্রিকা এই সুযোগে বিষোদ্‌গার করে চলেছে ব্যক্তি মুজিবের, কিন্তু আবদুল বাতেন শুনেছে বঙ্গবন্ধু নিজেও ভাতের বদলে রুটি খেয়ে আছেন আজকাল। বলেছেন, আমার মানুষ ভাত পাইতাছে না, আমি ভাত খামু কোন অধিকারে!

পুরো বাংলাদেশকে 'অরা আমার মানুষ' বলে পিতৃসুলভ আবেগে সম্বোধন করাটা কেবল শেখ মুজিবেরই সাজে, কিন্তু সমস্ত দেশ যখন ক্ষুধার্ত হয়ে ওঠে,

ভাত না পেলে মানচিত্রও তখন খাদ্য হয়ে ওঠে তার কাছে। শেখ মুজিবের কথা ভেবে বাতেন তাই বড় বিমর্ষ হয়ে ওঠে।

বিমর্ষ দেখাচ্ছে তখন আরো একজন মানুষকে। তাজউদ্দীন।

দুর্ভিক্ষের সর্বগ্রাসী কালেই কমনওয়েলথ, বিশ্বব্যাংকের মিটিং ছাড়াও সোভিয়েত ইউনিয়নসহ বেশ কিছু পূর্ব ইয়োরোপীয় দেশে রাষ্ট্রীয় সফরে যেতে হয় তাজউদ্দীনকে। অর্থের দরকার, সাহায্যের দরকার। যাত্রায় বেরোবার আগেই আবু সাইদের কাছে আক্ষেপ করে তাজউদ্দীনকে বলতে শোনা যায়, 'চৌধুরী সাহেব, আর পারা গেল না। এই দলের সাথে আর থাকা যাবে না। পার্টির বেশিরভাগ মানুষই অমানুষ হয়ে গেছে...'

সেই পার্টির মাঝে নতুন কোনো বিরোধীপক্ষ যেন তৈরি না হয়, সেজন্যে সফরসঙ্গী হিসেবে অর্থমন্ত্রী কেবল সাথে নেন ঐ একান্ত সচিব আবু সাইদকেই। ট্যুর জুড়ে আবু সাইদ বারবার হতাশার কথাই শুনতে পান তাজউদ্দীনের কণ্ঠে। বিমানে বসে পাশাপাশি আলোচনায় তাজউদ্দীন এক একটা ইস্যু তোলেন, জানতে চান আবু সাইদের মতামত। একান্ত সচিবের মনে হয়, এই ভ্রমণ তাজউদ্দীনের নিজের সাথে নিজের তর্ক করবার একটা রাস্তামাত্র। ভাবে-গতিকে মনে হয় তাজউদ্দীন যেন আবু সাইদ না, যুক্তি শাণিয়ে তুলছেন নিজের মনের বিপক্ষেই। ধীরে ধীরে এক একটি বিষয়ে তাজউদ্দীন 'চৌধুরী সাহেব' বলে শুরু করেন, আর বোঝাপড়া করে যান নিজের অথবা আবু সাইদের সাথে।

সফরের এক পর্যায়ে দুইজন পৌঁছেছেন মস্কোতে, থাকছেন সেখানকার রাষ্ট্রদূত শামসুর রহমান খানের বাসায়। রাতের টেবিলে হঠাৎ ফোন আসে বাংলাদেশ থেকে, শেখ মুজিব কথা বলবেন অর্থমন্ত্রীর সাথে।

কিছু আলাপের পর গলা যেন খানিক উষ্ণ হয়ে যায় তাজউদ্দীনের। 'মুজিব ভাই, আমার যা বলার ছিল তা তো আমি বলেই দিয়েছি। এটা তো শুধু আপনারই সিদ্ধান্ত!...'

আবু সাইদ আর অন্যান্যরা আগ্রহ নিয়ে শুনতে চেষ্টা করেন এই কথোপকথন, অববধারিতভাবে গলা শোনা যায় কেবল তাজউদ্দীনেরই। 'না, আমি তো আপনাকে বারবার মানা করতেছি। আপনি আমেরিকা যাবেন, ভালো কথা। আপনি কেবল জাতিসংঘে অ্যাসেম্বলিতে অ্যাটেন্ড করে ফিরে আসেন। কিন্তু ওইভাবে ওয়াশিংটন যাবেন কেন? আপনার রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসেবে যাবার ব্যবস্থা হলে যাবেন, না হলে যাবেন না... '

ফোন রাখার পরেও তাজউদ্দীনের আক্ষেপ কমে না। ভারী গলায় বলেন, 'চৌধুরী সাহেব, বঙ্গবন্ধু দাওয়াত ছাড়াই আমেরিকার প্রেসিডেন্টের সাথে দেখা করতে চাচ্ছেন। আমি মানা করলাম, কিন্তু উনি মনে হয় শুনবেন না। ...এভাবে

খুব খারাপ লাগে বুঝলেন। বঙ্গবন্ধু বুঝতে চান না তার মর্যাদায় এতটুকু দাগ পড়লে সেটা বাংলাদেশের জন্যে কতবড় আঘাত!'

কিন্তু শেখ মুজিব এক জাদুকরের নাম। জাতিসংঘের সদস্যপদ পেয়ে সাধারণ অধিবেশনে প্রথমবারের মতো বাংলায় ভাষণ দেন মুজিব, আর কালো কোট পরিহিত মানুষটির প্রবল প্রতাপান্বিত পার্সোনালিটিতে ভেসে যান বিশ্বের তাবৎ মহারথীরা। তবু তাজউদ্দীনের আশঙ্কা সত্য করে সেই ইমেজে দাগ ফেলে দেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফোর্ড। নিক্সন প্রশাসনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন করে নিয়েছেন শেখ মুজিব, এত সহজে আমেরিকা ভুলে যাবে সেটা? খাদ্যের চালান ফিরিয়ে নিয়ে তারই একটা সবক দিয়েছে তারা কিছুদিন আগে। এবারের অপমান হয় আরেকটু সূক্ষ্ম। দর্শনপ্রার্থী শেখ মুজিবের জন্যে মাত্র ১৫ মিনিটের সময় বরাদ্দ করেন প্রেসিডেন্ট ফোর্ড, সাক্ষাৎ খুব একটা ফলপ্রসূ হয় না।

বিশ্বব্যাংকের সভার জন্যে তাজউদ্দীনেরাও তখন আমেরিকায়। বিশ্বব্যাংক প্রেসিডেন্ট রবার্ট ম্যাকনামারার সাথে মুজিবের বৈঠকের সমস্ত আলোচ্য বিষয় আর কাগজপত্র ঠিক করতে হয় তাজউদ্দীনকেই। শেখ মুজিবের ছবি সামনে রেখে স্বাধীনতার যুদ্ধ সংগঠন করা মানুষটি এর মাঝেই আবু সাইদকে বারংবার তার মর্মপীড়া প্রকাশ করতে ছাড়েন না। ব্রিটিশ টেলিভিশনে পাশাপাশি দেখানো হয়েছে বাংলাদেশে অনাহারে মৃত মানুষদের ছবি আর বেআইনিভাবে নব্য ধনী সম্প্রদায়ের বিলাসী জীবনচিত্র। এই দুই বিপরীত দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে আরো মুষড়ে পড়েন মানুষটি।

তাজউদ্দীন আবার যখন বাংলাদেশে ফেরেন, পৃথিবী তত্দিনে সূর্যকে গুনেছে আরো সাঁইত্রিশ বার। দুর্ভিক্ষপীড়িত দেশটির সাংবাদিকেরা বিমানবন্দরেই ঘিরে ধরে অর্থমন্ত্রীকে। দেশের এই অবস্থায় কী বলবেন দেশপ্রেমিক মানুষটি, আদৌ কিছু বলবার আছে নাকি তার।

'জাতীয় দুর্যোগের সময় উটপাখির মতো বালিতে মাথা গুঁজে থাকলে চলে না।' বক্তব্য দিতে গিয়ে চড়তে থাকে তাজউদ্দীনের কণ্ঠ, 'মাটি আর মানুষ নিয়ে দেশ। বাংলাদেশের মাটি এখন কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। কিন্তু মানুষ যখন মরে যাচ্ছে তখন নীরব দর্শক হয়ে বসে থাকা যায় না। পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে যারা ব্যর্থ হবে, তাদের নির্বিশেষে ছাঁটাই করা দরকার। আমি ব্যর্থ হলে আমাকেও বাদ দেয়া দরকার।...'

বিমানবন্দরে সমবেত সাংবাদিকদের সাথে অল্পস্বল্প ফিচার লেখা আলাউদ্দীনও শুনতে থাকে তাজউদ্দীনের কথা। ক্ষুধার্ত বাংলাদেশে মুকুট নামের মানুষটির ডুবতে থাকা স্বপ্নের বর্ণ তখন বড় আবছা দেখায়।

নতুন বিপ্লবের নেশা আর প্রফেটিক এক উচ্চারণমালা

বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে খাদ্যমন্ত্রী আবদুল মোমিন পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন দুর্ভিক্ষে মৃত মানুষের সংখ্যা। অনাহারে মারা গেছে সাতাশ হাজার মানুষ। উপমহাদেশের ইতিহাসে এত অকপট হয়ে কেউ কখনো উন্মুক্ত করেনি খাদ্যাভাবে মৃত মানুষের টালিখাতা।

ডুবতে থাকা বাংলাদেশকে উদ্ধার করতে শেখ মুজিব এবার ভাবেন কোনো মৌলিক পরিবর্তনের কথা। দুনিয়াজুড়ে সমাজতন্ত্র আর পুঁজিবাদের দাবা খেলা। কোনো দলেই যোগ না দিয়ে মুজিব এতদিন চেয়েছেন সেই লড়াই পাশ কাটিয়ে চলতে। কিন্তু অফুরন্ত সমস্যার পাহাড় তাকে বাধ্য করে কঠোর কোনো সিদ্ধান্ত নিতে। দলের সদস্যদের সাথে নিয়মিত আলোচনা করেন শেখ মুজিব। তার মনো-কম্পাসের কাঁটা এদিক ওদিক দুলে স্থির হয়ে যায় একদলীয় শাসনব্যবস্থার দিকে। সমস্ত দল বিলীন হয়ে যাবে একটি পার্টিতে, প্রধানমন্ত্রী না হয়ে শেখ মুজিব হবেন প্রেসিডেন্ট। মিশ্র অর্থনীতির বদলে চালু হবে সমাজতন্ত্র।

কিন্তু ইতিহাসে রাতারাতি বদলে যাবার এরকম উদাহরণ নেই কোথাও। দীর্ঘদিনের পরিক্রমায় সমাজতন্ত্র কায়েম হয়েছে সোভিয়েতে, চীনে। কিন্তু ঘোষণা দিয়ে এভাবে সমাজতন্ত্র চালু করার মতো কৃত্রিম পথ কি টেকসই হতে পারে? ...হ্যাঁ, পারে। শেখ মুজিবের তাই বিশ্বাস। চিরকালীন আত্মবিশ্বাসী মুজিব জানেন এখনো এক ডাকে বাংলাদেশের বেশিরভাগ মানুষকেই পথ নির্দেশ করতে পারেন তিনি। নতুন এই বিপ্লবে সকলকে সামিল করে দেশকে ঠিক রাস্তায় আনতে চান বঙ্গবন্ধু।

তবে একদলীয় শাসনব্যবস্থার বিপক্ষে যুক্তি দেন তাঁর দলের অনেকেই। আমীর-উল ইসলাম বলেন, 'বঙ্গবন্ধু, প্রেসিডেন্শিয়াল আর পার্লামেন্টারি সিস্টেমের পক্ষে বিপক্ষে অনেক তাত্ত্বিক যুক্তি আছে। আমি সেগুলোর ভেতরে না যাই। সহজ একটা হিসাব দেই যে পৃথিবীতে যত ক্যু হইছে আর হচ্ছে, বেশিরভাগই কিন্তু প্রেসিডেন্টের বিপক্ষে। প্রধানমন্ত্রীর বিপক্ষে কিন্তু ক্যু এর সংখ্যা নগণ্য।'

শেখ মুজিব গম্ভীর হয়ে যান। 'আমি তোমাগো সব কথা খুইল্যা বলতে পারবো না। ষড়যন্ত্র শুরু হয়্যা গেছে, ক্যান্টনমেন্টে যাওয়া আসা শুরু হইছে। অরা যখন আসবো তখন আমারে স্যালুট দিবো। কিন্তু অগো হাতে স্টেন থাকবো, আর তোমাগো কারো মাথা থাকবো না...'

বঙ্গবন্ধুর এরকম ইঙ্গিত নিয়ে সন্ধ্যায় আমীর-উল ইসলাম আলোচনায় বসেন তাজউদ্দীনের সাথে। 'তাজউদ্দীন ভাই, আমার মনে হয় আর্মি হয়তো দেশের অবস্থা দেখে কোনো রাজনৈতিক ক্ষমতার ভাগ চেয়েছে আর বঙ্গবন্ধু সেটা জেনে

গেছেন। হয়তো উনি ভাবতেছেন যে আর্মি, আমলাতন্ত্র, পার্টির লোকজন সবাইরে এক করে ফেললে একটা সমাধান আসবে। সবাই মিলে পলিসি ঠিক করা যাবে।'

তাজউদ্দীনের গায় একটা হালকা ফতুয়া। তিনি সেটার একটা কোণ ধরে আনমনে টানতে টানতে বলেন, 'দেশ চালাতে একটা সত্যিকারের বিরোধী দল দরকার, বুঝলেন। সৎভাবে, ভালোভাবে দেশকে আগায়ে নিতে হইলে স্ট্রং একটা বিরোধী দল মাস্ট।'

আমীর-উল ইসলাম মাথা নাড়েন। দলীয় বৃত্তে আবদ্ধ থাকতে চান না বলেই হয়তো বঙ্গবন্ধু গতবছর আওয়ামী লীগ, মোজাফফর ন্যাপ আর কম্যুনিস্ট পার্টিকে নিয়ে গঠন করেছিলেন গণ ঐক্যজোট। কিন্তু প্রায় এক বছর কেটে যাওয়ার পরেও সেই সংগঠন এখনো কোনো ভূমিকা রাখতে পারেনি রাজনীতিতে। থেকে গেছে কাগুজে দল হয়ে। বরং বহুদলীয় গণতন্ত্রের পথ রুখে দিয়েছে অনেকাংশে।

তাজউদ্দীন তাই সে ঐক্যজোট নিয়ে খুব আশাবাদী নন, আমীর-উল ইসলাম জানেন। তার সামনেই কমিউনিস্ট পার্টির মণি সিংহকে তাজউদ্দীন বলেছিলেন, 'দাদা, আপনারা কিন্তু ত্রিশূল হয়ে আসলেন। এক শূল দিয়ে আপনারা মারবেন বঙ্গবন্ধুকে, এক শূল দিয়ে আমাদেরকে। আর তিন নাম্বার শূল দিয়ে বাংলাদেশকেই মেরে ফেলবেন!'

'অফকোর্স! কিন্তু একদলীয় প্রেসিডেনশিয়াল ফর্ম চালু করলে তো অপোজিশন পার্টিই একেবারে নাই হয়ে যাবে তাজউদ্দীন ভাই।' আমীর-উল ইসলাম বলেন। 'ইয়ে, শুনলাম বঙ্গবন্ধু নাকি আপনার বাসায় আসছিলেন? কী নিয়ে কথা হইছে?'

তাজউদ্দীন এক দৃষ্টিতে আমীর-উল ইসলামের দিকে তাকান। মুজিব ভাই গতকাল বাসায় এসেছিলেন। তাজউদ্দীন তখন গোসলে ছিলেন, অপেক্ষা করতে মুজিব ভাই এসে বসেছিলেন এই বারান্দাতেই। যে চেয়ারে এখন আমীর-উল ইসলাম বসে আছে, সেই চেয়ারেই তখন বসেছিলেন বঙ্গবন্ধু। লিলি তখন নিচে পিঠা বানাচ্ছিলো। মুজিব ভাইয়ের আসার খবর পেয়ে লিলি যখন ওপরে আসে, তখন তিনি আর মুজিব ভাই একরকম তর্কই করছিলেন বলা চলে।

মুজিব ভাইয়ের সাথে তর্কের কথা মনে করে তাজউদ্দীনের মনটা আরেকটু ভার হয়ে যায়। নীতিগতভাবে দুজন মানুষের মাঝে ব্যবধান বেড়ে গেলে তো তর্ক ছাড়া আর রাস্তাও থাকে না। একদলীয় শাসনের বিপক্ষে কালকে তিনি মুজিব ভাইকে কড়া কিছু যুক্তি দিয়েছেন। কিন্তু এ আলোচনা তো কেবল বদ্ধ ঘরের ভেতরে হয়েছে। সাক্ষী বলতে শুধু লিলি। হয়তো তার বড় মেয়ে রিপিও শুনেছে কিছু কিছু। অন্য কারো সামনে তার আর শেখ মুজিবের আলোচনার প্রাইভেসি তাজউদ্দীন এই মুহূর্তে ফাঁস করতে চান না।

'হ্যাঁ, মুজিব ভাই আসছিলেন।' তাজউদ্দীন মৃদু স্বরে আমীর-উল ইসলামকে বলেন। 'এই তো টুকটাক কথা হইলো। তেমন কিছু না। পরে বলবো আপনাকে।'

আমীর-উল ইসলাম বুঝতে পারেন, তাজউদ্দীন এ মুহূর্তে কিছু বলতে চাচ্ছেন না। এ মানুষটিকে চেনেন বলেই তিনি আর বেশি জোরাজুরি করেন না। বিদায় নেন আরো কিছু আলাপ সেরে।

কিন্তু সেই চিন্তা সন্ধ্যা আর এপাশ-ওপাশ করা রাতে তাজউদ্দীন সুস্থির হতে পারেন না কিছুতেই। তার মনে এসে জমা হয় নানা প্রশ্ন। বহু আশঙ্কা।

বামপন্থি দলগুলো, সর্বহারা পার্টি কিংবা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের জাসদের কাছে এই একদলীয় শাসন কিসের সংকেত নিয়ে যাবে? ওসব দলের অস্তিত্বের জন্যেই যদি হুমকি হয়ে ওঠেন মুজিব ভাই, তখন কী পথ খোলা থাকছে তাদের সামনে?

পাকিস্তানপন্থি দলগুলোই বা কী করবে? একদলীয় শাসন তো তাদের জন্যে অশনি সংকেত। কোণঠাসা করে মুজিব ভাই হয়তো তাদের ঠেলে দেবেন চরমপন্থার দিকে।

পুঁজিবাদী দেশগুলোও কি মেনে নেবে এই আরোপ করা সমাজতন্ত্রের দিকে পা বাড়ানো দেশটিকে? আমেরিকা বারবার বুঝিয়ে দিচ্ছে বাংলাদেশের ওপর সুদৃষ্টি নেই তার। মুজিব ভাইয়ের এই পদক্ষেপ তো তারাও ঔদ্ধত্য হিসেবে নিতে পারে!

তাজউদ্দীনের ঘুম আসে না শত ভাবনায়। পরদিন অফিসে ঢুকেই তিনি ডাক দেন একান্ত সচিব আবু সাইদ চৌধুরীকে। 'চৌধুরী সাহেব, আমি একটা টেলিফোন করবো। আপনি দাঁড়ান, আপনাকে সাক্ষী রেখেই আমি কথা বলতে চাই।'

আশ্চর্যান্বিত আবু সাইদ বলেন, 'স্যার, আমি একজন সরকারি কর্মচারী, আমাকে সাক্ষী রেখে কী লাভ? আপনি তো স্যার আপনার দলের বিশ্বস্ত কাউকেই সাক্ষী মানতে পারেন...'

মাথা নাড়েন দূরদর্শী তাজউদ্দীন। 'না, আপনিই থাকেন।' এই বলে লাল টেলিফোন ঘোরান অর্থমন্ত্রী।

'মুজিব ভাই? শোনেন, আপনাকে আমার খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিছু বলার আছে। ...না না, আপনার চারপাশে আজকাল যেরকম লোকজন থাকে, ওদের মাঝে বসে এরকম কথা বলার সুযোগ আমার হবে না। এই জন্যে টেলিফোনেই বলতেছি...

একটা চূড়ান্ত মত দিবার জন্যে আপনাকে আজকে ফোন করছি মুজিব ভাই। আপনি একদলীয় শাসনব্যবস্থা চালু করতে যাচ্ছেন, কিন্তু এর সাথে আমি একমত না।'

ফোনের অপর পাশ থেকে শেখ মুজিব কিছু বলেন হয়তো। তাজউদ্দীন সে কথা শুনে উত্তর দেন, 'না মুজিব ভাই, আপনার যুক্তিতে আমি কনভিন্সড হলাম না। আমরা ওই রকম ম্যাচিউরড হয়ে উঠি নাই এখনো। দুই নম্বর কথা হচ্ছে, আপনার কাছে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সব ধরনের ক্ষমতা আছে। আপনার কাছেই যেহেতু সমস্ত ক্ষমতা, সেহেতু একদলীয় শাসনের কোনো যৌক্তিকতাই নাই!

...আর মুজিব ভাই, সবচেয়ে বড় কথা, আপনি আমি মিলে গত ২৫ বছর ধরে বাংলাদেশের প্রতিটা মাঠে ময়দানে গেছি। আমরা সবসময় প্রচার করছি গণতন্ত্রের কথা, আপনি ভাষণে সবসময় বলছেন একটা সুখী-সমৃদ্ধ দেশের কথা, স্বপ্ন দেখাইছেন সেই দেশটার ভিত্তি হবে গণতন্ত্র। এতদিন যেই গণতন্ত্রের কথা আমরা বললাম, আপনি আজকে কলমের এক খোঁচায় সেই ডেমোক্রেসি শেষ করে দিয়ে একদলীয় শাসন চালু করতে চাইতেছেন। এটা তো ঠিক হবে না মুজিব ভাই। আমি এর সাথে জোরালোভাবে দ্বিমত পোষণ করি।'

আবু সাইদ চৌধুরী ফোনের এপারে থেকেই বুঝতে পারেন, শেখ মুজিব ওদিকে রেগে গেছেন। তার চিৎকারের শব্দ ভেসে আসছিল দূরালাপনীর এদিকেও। তাজউদ্দীনও এদিকে গলা তুলে ফেলেন। 'আমার সমস্ত জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে বলতেছি মুজিব ভাই, মানুষের কিন্তু অন্য উপায় থাকবে না। ভবিষ্যতে কেউ আপনাকে ক্ষমতা থেকে সরাইতে চাইলে আপনি গণতান্ত্রিকভাবে সেটা করার সব রাস্তা বন্ধ করে দিচ্ছেন। তখন আপনাকে সরানোর একটাই রাস্তা থাকবে সেটা হইলো বন্দুক!'

আবু সাইদের এক মুহূর্তের জন্যে মনে হলো, এ তিনি কী শুনলেন! এমন অশনি সংকেত দেয়া ভবিষ্যদ্বাণী তাজউদ্দীন করলেন কী করে!

কিন্তু পরক্ষণেই তাজউদ্দীন যা বললেন, পরবর্তী দিনের ইতিহাস প্রত্যক্ষ করে আবু সাইদের মনে হয়েছিল, এ উচ্চারণকে প্রফেটিক ছাড়া আর অন্য কোনোভাবেই বিশেষায়িত করা যায় না। গলায় আকুতি ঢেলে মানুষটি বললেন, 'বাই টেকিং দিস স্টেপ, ইউ আর ক্লোজিং অল দ্য ডোরস টু রিমুভ ইউ পিসফুলি ফ্রম ইওর পজিশন! আর সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা কী ঘটবে, জানেন মুজিব ভাই? ...বন্দুকের গুলিতে শুধু আপনি মারা যাবেন না, আমরাও মরবো। আর দেশের ভয়ানক কোনো ক্ষতি হয়ে যাবে!'

তাজউদ্দীন নিজেও যদি সে মুহূর্তে জানতেন, কী অমোঘ রক্তঝরার আভাস দৈব বলিয়ে দিয়েছে তার মুখ দিয়ে!

জানত হয়তো বরেন্দ্রর লাল মাটি আর সাঙু নদীর নীল জল। উত্তুরে হাওয়া আর দখিনা সমুদ্ররা হয়তো জানত। ঘাই মেরে যাওয়া জলের মাছ আর বাতাস কেটে যাওয়া ধানের শীষেরাও হয়তো আঁচ করেছিল সে দৈবের সম্ভাবনা।

কিন্তু, তারা মৌন রয়ে গেল।

অথচ অর্থমন্ত্রীকে আজকে সকালে বড় নির্ভার দেখাচ্ছিলো।

মাঝের নীরব, নিস্তরঙ্গ কয়েকটা দিনের পর আবু সাইদ চৌধুরীর মনে হচ্ছিলো টেলিফোনের ওই ক্রুদ্ধ আলাপ যেন অন্য কোনো জন্মের স্মৃতি। একান্ত সচিব ভেবেছিলেন, মতের অনৈক্য চুকে গেছে অর্থমন্ত্রী আর প্রধানমন্ত্রীর মাঝে, অথবা তাদের মাঝে কোনো বোঝাপড়া হয়ে গেছে গত কয়েকদিনে। মাঝে তাজউদ্দীনও তো আর অফিসিয়াল প্রসঙ্গের বাইরে অন্য কোনো বিষয়ে আলাপ করেননি।

আজ যখন অর্থমন্ত্রী অফিসে ঢুকলেন, তখন কিন্তু বেশ ফুরফুরে মেজাজেই ছিলেন তিনি। অন্তত আবু সাইদের তাই মনে হয়েছিল। কিন্তু অফিসে এসেই তাজউদ্দীন বলেছিলেন, 'চৌধুরী সাহেব, আজকে আমার যত অ্যাপয়নমেন্ট আর শিডিউল আছে, সব বাদ দিয়ে দেন। কারো সাথেই আজকে দেখা করবো না। আমি নিচে যাচ্ছি, প্ল্যানিং কমিশনের নুরুল ইসলামের রুমে থাকবো। ইম্পর্ট্যান্ট কোনো ফোন আসতে পারে। ডেকে দিয়েন তখন।'

তাজউদ্দীন কি তবে কিছু আঁচ করতে পেরেছিলেন?

সেটা আবু সাইদ জানেন না, তবে তিনি খেয়াল করেছিলেন সকাল থেকে অফিসের এদিক ওদিক কানাঘুষা চলছে। বিমানবন্দরে দেয়া অকপট ভাষণের কারণে প্রধানমন্ত্রী নাকি বেশ অসন্তুষ্ট অর্থমন্ত্রীর ওপরে। সেক্রেটারিয়েটের চারপাশে নাকি সাদা পোশাকে ঘুরে বেড়াচ্ছে গোয়েন্দা পুলিশের দল, আবার এদিকে কাজপাগল তাজউদ্দীনের হঠাৎ করেই ছুটির আমেজে দিন শুরু।সব ইঙ্গিতই তো আর উড়িয়ে দেবার মতো কিছু ছিল না। মনে হচ্ছিলো, আজ একটা কিছু ঘটবেই।

তবুও যখন ক্যাবিনেট সচিব এইচ টি ইমাম আর যুগ্মসচিব হাবিবুল হক মলিনমুখে একজোড়া অফিসিয়াল খাম নিয়ে আসেন, আর এসে খোঁজ করেন তাজউদ্দীনের, আবু সাইদের বুকের ভেতর তখন কেমন যেন ঢাক বেজে ওঠে একটা। কেন এই আগমন সে প্রসঙ্গে নিজমুখে কিছু বলতে না চেয়ে আগত দুইজন চলে যান অর্থমন্ত্রীর সন্ধানে, আর মিনিট দশেক পরে তাজউদ্দীন অফিসকক্ষে ফিরেও আসেন অতিথিদের নিয়ে। তাজউদ্দীন ইতস্তত করে একটা চিঠি এগিয়ে দেন অর্থ সচিব কফিলউদ্দীন মাহমুদের দিকে। কফিলউদ্দীনের গা ঘেঁষে এসে বাংলাদেশ সরকারের মনোগ্রাম সম্বলিত ছোট্ট আদেশটা পড়তে থাকেন আবু সাইদও।

প্রধানমন্ত্রী স্বাক্ষর দেয়া এই আনুষ্ঠানিক চিরকুটটি বলছে–

"প্রিয় তাজউদ্দীন আহমদ, বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে আপনার মন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত থাকা সমীচীন নয় বলে আমি মনে করি। তাই আপনাকে আমি মন্ত্রী পদে ইস্তফা দেয়ার জন্যে আহ্বান জানাচ্ছি।..."

চিরকুট পড়া শেষ করে সাথে সংযুক্ত পদত্যাগপত্রটি দেখে কেমন যেন উদ্ভ্রান্ত হয়ে পড়েন অর্থ সচিব। 'ইয়া আল্লাহ, ইয়া খোদা!' এই বলে দাপ্তরিক নির্লিপ্ততার খোলস ভেঙে ছেলেমানুষের মতো শব্দ করে কেঁদে ওঠেন কফিলউদ্দীন।

হ্রস্বদৈর্ঘ্যের চিরকুটটি কেন যেন বিচলিত করতে পারে না তাজউদ্দীনকে। নিরুদ্বিগ্ন স্বরেই তিনি বলেন, 'এখন তো তাহলে সব গোছগাছ করতে হয়।'

তাজউদ্দীন কাজ সারেন চটপট করে, টাইপ করা পদত্যাগপত্রে স্বাক্ষর করা হয়। পদত্যাগপত্রটি, যেটা জমা নেবার অপ্রিয় কাজটি সারতে এসেছেন বলে ক্ষমা চেয়ে চলে যান এইচ টি ইমামরা, বলে যায়,

"মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৮ (১)(ক) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আমি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মন্ত্রীপদ হইতে ইস্তফা দিলাম। আমার এই পদত্যাগপত্র মাননীয় রাষ্ট্রপতি সমীপে পেশ করিলে বাধিত হইবো।"

অর্থমন্ত্রীর পদ থেকে তাজউদ্দীন সরে দাঁড়ালেন ২৬শে অক্টোবর, ১৯৭৪ সালে। দুপুরের ঘড়িতে তখন বারোটা বেজে বাইশ মিনিট।

পদত্যাগপত্র বুঝিয়ে দিয়ে তাজউদ্দীন হাসতে হাসতে তার সদ্য প্রাক্তন একান্ত সচিবকে বলেন, 'চৌধুরী সাহেব, কষ্ট করে আমার বন্ধু আরহাম সিদ্দিকীকে একটা ফোন দেবেন? ওর গাড়িটা একটু দরকার। সরকারি গাড়ি তো এখন ব্যবহার করা যাবে না। ...আর মন্ত্রণালয়ের সবাইকে একটু ডাকেন, যাবার আগে একবার দেখা করে যাই!'

এই অনুরোধ করেই তাজউদ্দীন ব্যস্ত হয়ে যান ফোন নিয়ে। ডায়াল করেন তার সরকারি বাসভবনে। 'কে, লিলি? ...হ্যাঁ, শুনো, খবর আছে একটা। আমি মাত্র মন্ত্রিসভা থেকে রিজাইন করছি। ...আরে হ্যাঁ, এই ধরো পাঁচ মিনিট আগে!'

ফোন রেখে তাজউদ্দীন চারপাশে তাকান। তাকে ঘিরে তখন দাঁড়িয়ে আছেন অনেকেই। সকলেই নির্বাক, কারো কারো চোখ ভেজা একটু একটু। তাজউদ্দীন ছলছল চোখের দুয়েকজনের দিকে করমর্দনের জন্যে হাত বাড়িয়ে বলেন, 'আরে, এত ভেঙে পড়ছেন কেন! টেইক ইট ইজি। দেখবেন, বঙ্গবন্ধু নিশ্চয়ই এরপরে আমার চেয়ে যোগ্য কাউকেই এই চেয়ারে বসাবেন। আপনারা শুধু নিজের কাজটা ঠিক মতো করে যান...'

সচিবালয়ের প্রশাসনিক দপ্তরে যখন অশ্রু হয়ে উঠছে দাপ্তরিক সম্পর্কের উর্ধ্বে উঠে প্রিয় মানুষ হয়ে ওঠা মন্ত্রীটির জন্যে বিসর্জিত চোখের জল, থমথমে গণভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের হঠাৎ ডাকা প্রেস কনফারেন্সে তখন সমান্তরাল একটি নাটকের দর্শক হয়ে রইলেন অনেকে।

খানিক আগেই শেখ মুজিবের ডাক পেয়ে তাবৎ সিনিয়র সাংবাদিকেরা ছুটে এসেছেন প্রেসক্লাব থেকে। বঙ্গবন্ধু নাকি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘোষণা দিতে যাচ্ছেন। সাংবাদিকেরা গম্ভীর মুখে বসতে শুরু করেছেন গণসংযোগ অফিসারের নির্দেশনায়। প্রধানমন্ত্রী এসে বসেছেন তার জন্যে নির্ধারিত জায়গায়। সেখানেই রেডিওর মহাপরিচালক এম আর আখতার মুকুলের সামনে গোয়েন্দা পুলিশের প্রধান নিচু স্বরে শেখ মুজিবকে বললেন, 'স্যার, তাজউদ্দীন সাহেব তো পদত্যাগপত্রে স্বাক্ষর করতে গড়িমসি করতেছেন। উনি বরং তার কিছু লোক নিয়ে এখন মিটিংয়ে বসে গেছেন!'

প্রখর ব্যক্তিত্ব শেখ মুজিবের। হুংকার দিয়ে তিনি বলেন, 'কী কও এইগুলা! আপনারা শুইনা রাখেন, আমি তাজউদ্দীনেরে স্বেচ্ছায় পদত্যাগপত্রে দস্তখত করতে বলছি। সে যদি তা না করে, তাইলে আমি তারে এখনই মন্ত্রিসভা থেকে বরখাস্ত করবো।'

কথাগুলো বলেই উত্তেজিত মুজিব জোরে একটা টান দেন পাইপে। এরপর ঘাড় ঘুরিয়ে দরজার দিকে তাকাতেই এইচ টি ইমামকে চোখে পড়ে তার। 'কী ব্যাপার, তুমি এইখানে দাঁড়ায়া ক্যান? তোমার হাতে ওইটা আবার কিসের ফাইল?'

স্বল্পভাষী ইমাম সাহেব উত্তর দেন, 'স্যার, আমি তাজউদ্দীন সাহেবের কাছে আপনার অর্ডার নিয়ে যাওয়া মাত্র উনি পদত্যাগপত্রে সাইন করে দিয়েছেন। সেটা আপনাকে দেখানোর জন্যেই আমি এখানে দাঁড়ায়ে আছি।'

ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী সাংবাদিকেরা তখন একে অন্যের মুখের দিকে তাকাচ্ছেন। গোয়েন্দা প্রধানের রিপোর্ট বলছে তাজউদ্দীন পদত্যাগপত্রে স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করেছেন, আর এদিকে ক্যাবিনেট সেক্রেটারি বঙ্গবন্ধুর সামনে স্বয়ং তাজউদ্দীনের রিজাইন লেটার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। বড় উদ্ভট সব ব্যাপার ঘটছে আজকাল এই বাংলাদেশে!

সাংবাদিক সম্মেলনে শেখ মুজিব এরপর দেশের বিপর্যস্ত অর্থনীতি প্রসঙ্গে সরকার নতুন যা ব্যবস্থা নিতে যাচ্ছে, তার কিছু বর্ণনা দিলেন। বক্তব্যের পরে শেখ মনি, তাহের উদ্দিন ঠাকুর, তোফায়েল আহমেদ, খন্দকার মোশতাকেরা একে একে এসে হাত মিলিয়ে গেলেন প্রধানমন্ত্রীর সাথে।

ভুলও হতে পারে, কিন্তু বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার প্রধান জাওয়াদুল করিমের মনে হলো, ম্লান হয়ে থাকা শেখ মুজিবের সাথে হাত মেলানোর সময় একটু বেশিই যেন জেলা দিল খন্দকার মোশতাকের হাসিটা। 'যা করতে চেয়েছিলাম দেখলে, তাই করে ফেলেছি!' এই যেন বার্তা দিচ্ছে হাসিটা। রাজার কোমর থেকে শাণিত তরবারি ছিটকে যাবার পরে উজিরের এই হাসির তাৎপর্য স্পষ্ট করবে ভবিষ্যৎ।

হাসতে হাসতে ততক্ষণে বাড়ি ফিরে এসেছেন তাজউদ্দীনও। হেয়ার রোডের সরকারি বাসভবনের প্রাঙ্গণে গাড়ি থেকে নেমেই তিনি খোঁজ করেন পিয়নের। 'আমির হোসেন কোথায় গেলা! ও আমির হোসেন!'

তাজউদ্দীনের ডাকে ছুটে আসে পিয়ন আমির। দোতলা থেকে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে দৌড়ে নিচে নামে রিমিও। তাজউদ্দীন বলেন, 'আমির হোসেন, ছাদ থেকে পতাকাটা নামায়ে ফেলো।'

'স্যার!' বিস্মিত আমির হোসেনের গলা একটু যেন কেঁপে যায়।

'বললাম, পতাকাটা নামায়ে ফেলো। আমি এখন আর মন্ত্রী নাই, মাত্র পদত্যাগ করে আসলাম।' এই বলে তাজউদ্দীন চারপাশে তাকান। দেখেন, দরজায় দাঁড়িয়ে আছে লিলি। একটু দূরেই অবাক চোখে তাকিয়ে আছে রিমিও।

কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে তাজউদ্দীন রিমির মাথায় হাত রাখেন। হাসতে হাসতে বলেন, 'পতাকা তোলা খুব সহজ কাজ রে মা, অনেকেই সেটা পারে! কিন্তু পতাকা খুব ভারী, সেইটা বেশিক্ষণ তুলে রাখা সবার পক্ষে সম্ভব না।'

সেই এক মুহূর্তে অনেকটা বড় হয়ে যাওয়া রিমি দেখে, তাজউদ্দীন হাসছেন। দুপুরের রোদে হাস্যোজ্জ্বল তাজউদ্দীনের চোখের কোণে কী যেন চিকচিক করছে।

আলোকের অতীত থেকে বিহ্বল বর্তমানে

খানিকের মধ্যেই নানা রকম মানুষে ভরে উঠল বাড়িটা। প্রায় সকলেই হতচকিত, কেউ কেউ একটু বেশিই আলোড়িত। অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দীনের পদত্যাগ!

বাংলাদেশের স্বল্প সময়ের ইতিহাসে বহু অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেছে ইতোমধ্যেই, কিন্তু এরচেয়ে বেদনাদায়ক কিছু ঘটেছে কি না, সেটা স্মরণ করতে পারে না অনেকেই। তাজউদ্দীন, যিনি মুক্তিযুদ্ধের সময় পার্টির দলাদলির কাদা থেকে সযতনে আড়াল করে গেছেন স্বাধীন বাংলাদেশের সিংহাসনটিকে মুজিব ভাই ফিরে এসে সে আসনে বসবেন বলে, এক হাতে কাপড় ধুয়ে অন্য হাতে ফাইল লিখে যিনি সমস্ত অপপ্রচারের ধুলো নিন্দার কাদা মেখে সরকার চালিয়ে গেলেন শেখ মুজিবের নামে; সেই তাজউদ্দীনের বাড়ির ছাদে আর উড়বে না বাংলাদেশের পতাকা! আর এত রাতারাতি, এত নাটকীয় হবে সেই তাজউদ্দীনের অপসারণ!

দলে দলে তাই মানুষ আসতে থাকে। ভরে যায় নিচতলার অফিসের সামনের লাগোয়া বারান্দাটা। মানুষ দেখা যায় বাড়ির লনেও। সাংবাদিকেরা আসেন, আসেন পুরনো রাজনৈতিক বন্ধুরা, আসে একেবারেই সাধারণ কেউ কেউ। তবে মন্ত্রিসভার সদস্যদের মধ্যে ড. কামাল হোসেন ছাড়া আর কাউকে খুঁজে পাওয়া যায় না আগতদের মাঝে।

আলাউদ্দীন অবশ্য বারান্দার আশপাশেই ঘোরাফেরা করছে। গাফফার ভাই তাকে অ্যাসাইনমেন্ট দিয়েছেন, পারলে যেন তাজউদ্দীনের একটা ইন্টারভিউ নিয়ে যায় সে। দুয়েকবার তাজউদ্দীন সাহেবের সাথে কথা বলতে গিয়েও ভিড়ের চাপে সে সরে এসেছে। আলাউদ্দীন ঠিক করেছে, লোকজন একটু কমার পরে সে আবার চেষ্টা করবে। তবে এত সহজে মানুষ চলে যাবে বলে মনে হচ্ছে না। প্রত্যেকেই কৌতূহলী হয়ে অন্যদের কাছ থেকে শোনার চেষ্টা করছে। কিন্তু ভেতরের খবর কেউই জানে না বলে নিরেট কোনো উত্তর পাচ্ছে না কেউই, সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে কানকথা নিয়ে।

সাংবাদিকেরা স্বভাবতই একটু বেশি উৎসুক যেন। তারা বারবার জানতে চাচ্ছে তাজউদ্দীন কেন রিজাইন দিলেন। অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে আলাউদ্দীন জানে, তাজউদ্দীন মানুষটি অসম্ভব ভদ্র। সাংবাদিকদের কাছে একই প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি শুনেও তিনি যেভাবে হেসে চুপ করে যাচ্ছেন, তাতে পুরনো ধারণাটা আরো পোক্ত হয় আলাউদ্দীনের। অর্থনীতির অবস্থা, দুর্ভিক্ষ কতটা কাটিয়ে উঠেছে বাংলাদেশ, এইসব বিষয়ে প্রশ্ন করলে তাজউদ্দীন সংকোচহীন উত্তর দিতে থাকেন। কিন্তু, কেন পদত্যাগ করলেন, এ জাতীয় প্রশ্নের উত্তরে স্মিত হাসি ছাড়া তাজউদ্দীনের মুখ থেকে কিছু আসে না।

এক সাংবাদিক প্রশ্ন করে, 'স্যার, আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী? আপনি কী করবেন?'

তাজউদ্দীন বলেন, 'আমি রিজাইন দিয়েছি, কিন্তু আমার প্রিন্সিপালের তো কোনো পরিবর্তন হয় নাই। আমি যা ছিলাম তাই থাকবো।'

অন্য কেউ জিজ্ঞেস করে, 'স্যার, আপনি কি এখনি নতুন কোনো পার্টি খুলবেন?'

'পাগল!' তাজউদ্দীন হেসে উড়িয়ে দেন প্রশ্ন আর সম্ভাবনা। 'তাই কী হয়! আর যেখানে আমার বিন্দুমাত্র কোনো পদক্ষেপে, কোনো কথাতে শেখ সাহেব বা আওয়ামী লীগের ক্ষতি হতে পারে, এমন অ্যাকশন আমি কখনোই নেবো না।'

ভিড়ের মাঝে পেছনে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে আলাউদ্দীনের প্রচণ্ড তেষ্টা পেয়েছে। কাউকে ডেকে যে পানি দিতে বলবে, সে অবস্থা এখানে নেই। সবাই তার মতো উদ্‌ভ্রান্ত হয়েই ঘোরাঘুরি করছে। কাগজ কলম হাতে আলাউদ্দীন একটু পেছনে সরে এসে চেষ্টা করে অন্দরমহলে উঁকি দেয়ার। সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে উপরের দিকে তাকায় আলাউদ্দীন। সেখানে বসে আছে রিমি, চোখ বড়বড় করে ঘটে যাওয়া সব কিছু দেখে চলেছে সে।

তাজউদ্দীন সাহেবের পরিবারকে সে দুয়েকবার দূর থেকে দেখেছে, কিন্তু কারো সাথে পরিচিতি নেই আলাউদ্দীনের। এই মেয়েটি তাজউদ্দীন স্যারের

মেয়েই হবে এই ভেবে আলাউদ্দীন সরাসরি অনুরোধ করে বসে কিশোরীটিকে। 'বুবু, আমার জন্যে এক গ্লাস পানি আনতে পারবা?'

কিশোরীটি তার কথার কোনো উত্তর না দিয়েই ভেতরে চলে যায়। আলাউদ্দীন একটু অস্বস্তিতে পড়ে যায়। সে কি এখানে পানির জন্যে অপেক্ষা করবে না চলে যাবে এই নিয়ে খানিকক্ষণ দ্বিধায় ভোগে।

মিনিট তিনেক পরে রিমি ফিরে আসে। তার এক হাতে পানিভর্তি গ্লাস, অন্য হাতে পানির বোতল। আলাউদ্দীনের দিকে গ্লাস এগিয়ে দিয়ে রিমি বলে, 'নেন। পানি নেন।'

'থ্যাঙ্কিউ।' আলাউদ্দীন পুরো গ্লাসটা গলায় চালান করে এক চুমুকে। তারপর আরেক গ্লাস চায়।

দুই গ্লাস পানি খেয়ে আলাউদ্দীন বেশ ঠান্ডা বোধ করে ভেতরে ভেতরে। রিমি আলাউদ্দীনের বাড়িয়ে দেয়া গ্লাস ফেরত নিতে নিতে ইতস্তত করে বলে, 'আপনি কি পুলিশ?'

আলাউদ্দীন একটু অবাক হয়। 'কেন, আমাকে দেখে কি পুলিশ মনে হয়?'

'না, ওরা বলতেছিল সাদা পোশাকের পুলিশ বাড়ির আশপাশে ঘুরে বেড়াইতেছে।' রিমি মৃদু স্বরে বলে। 'নজর রাখতেছে নাকি সবার উপরে। আপনি ভিতরের দিকে উঁকি দিতেছিলেন বলে জিজ্ঞেস করলাম।'

'কারা বলতেছিল?'

'ঐ তো, বলতে শুনলাম।' রিমি অনির্দিষ্টভাবে কোথায় যেন ইঙ্গিত করে। 'তাইলে আপনি পুলিশ না?'

'না, আমি পুলিশ না। নজরদারিও করতেছি না।' এই বলে আলাউদ্দীন নিজেকে এই কিশোরীটির জায়গায় বসাতে চায়। বুঝতে চায় তার মনের ভেতরে কী চলছে। খানিক চেষ্টার পরে ব্যর্থ হয় সে। মৃদুস্বরে বলে, 'ভিতরে যাও বুবু। বাইরে আইসো না। অনেক লোকজন ঘোরাঘুরি করতেছে।'

আলাউদ্দীন আবার বেরিয়ে আসে বারান্দার দিকে। অফিস ঘরের সামনে মানুষের ভিড় একটু কমে গেছে মনে হলো। ভেতরে উঁকি দিয়ে আলাউদ্দীন দেখল প্রাক্তন অর্থমন্ত্রীর সামনে বসে আছেন মতিউর রহমান। যুদ্ধের সময়ে তাজউদ্দীনের একান্ত সচিব ছিলেন এই লোকটি। থিয়েটার রোডে নিয়মিত যাওয়া আসার কারণেই তাজউদ্দীন আর মতিউর রহমানের সাথে বেশ ভালো একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল আলাউদ্দীনের। এদিকে তাজউদ্দীনও কথার মাঝে মুখ তুলে তাকিয়ে আলাউদ্দীনকে খেয়াল করেন। ইঙ্গিতে বসতেও বলেন একদিকে।

তাজউদ্দীন বলতে থাকেন, 'আজকেই কী মনে করে আসলেন?'

মতিউর রহমান বলেন, 'আজকে না এসে পারলাম না স্যার। এমন একটা খবরের পর আপনার সাথে দেখা না করে ক্যামনে যাই বলেন...'

'বিপদে পড়বেন মতিউর সাহেব। দেখা হইলো, এখন তাড়াতাড়ি চলে যান। চারপাশে এনএসআই'এর লোক ঘোরাফেরা করতেছে...'

'আপনার সাথে দেখা করতে এসে বিপদে পড়লে পরোয়া করি না! ...' বেশ যেন উত্তেজিত হয়ে পড়েন মতিউর রহমান। 'আপনাকে কেন পদত্যাগ করাবে! বঙ্গবন্ধুর অবদানের চেয়ে আপনার অবদান তো কিছু কম না!'

তাজউদ্দীন রীতিমতো গর্জন করে উঠেন সে কথা শুনে। 'শাটাপ! এই ধরনের কথা কখনও বলবেন না। আমার একমাত্র পরিচয় হইলো আমি বঙ্গবন্ধুর প্রতিনিধি। সবকিছুর পরেও আমি উনার সাথেই থাকবো! ...বঙ্গবন্ধু ছাড়া এই দেশ যে কখনো স্বাধীন হইতো না, এইটা কক্ষনো ভুলে যাবেন না মতিউর রহমান। আমরা শুধু স্বাধীনতার কাজে সাহায্য করেছি, স্বাধীনতা আনি নাই। আপনার কথা বিন্দুমাত্র ঠিক না।'

আলাউদ্দীন এক দৃষ্টিতে মানুষটির দিকে চেয়ে থাকে। মুক্তিযুদ্ধের সময় যাবতীয় অর্জনে তাজউদ্দীন শেখ সাহেবকেই ঠেলে দিয়েছেন সামনে, ভুলেও কখনো নিজেকে আনেননি প্রচারের আলোতে। সেই মানুষটি স্বাধীন বাংলাদেশে এভাবে বিদায় নেবেন, কোনো মানে হয়!

কোনো মানে হয় কি না, সে প্রশ্নের জবাব খুঁজছে রিমিও। তার মনে পড়ে, আব্বু মুক্তিযুদ্ধের সময় একটা কথা প্রায়ই বলতেন আম্মুর কাছে, 'শোনো লিলি, বারবার শুধু নিজের সমস্যার কথা বলবা না। এখন খালি নিজেকে নিয়ে ভাবার সময় নাই। ...আমরা এখন ইতিহাস লিখতেছি। এমনভাবে সেটা লিখতে হবে, যাতে পরে কোনো ঐতিহাসিক যখন এই ইতিহাস নিয়ে কাজ করবে তখন যেন আমাদের খুঁজে পাইতে তার কষ্ট হয়!'

কেন এমন হলো, সে প্রশ্নের উত্তর রিমিরা জানে না, জানে না আলাউদ্দীনেরাও। সবাই কেবল দেখে, দুষ্টুমি করার বড় অদ্ভুত নেশা ইতিহাসের। যুদ্ধদিনের আলোকোজ্জ্বল অতীতের তিনটি বছর না পেরোতেই তাজউদ্দীন নিজেই কেমন ইতিহাস হয়ে গেলেন, ভবিষ্যতের ইতিহাসবেত্তাদের বহু বহুদিন তাড়িয়ে বেড়াবে এই গল্প।

প্রতিক্রিয়া

শরীফ মিয়ার ক্যান্টিনে আজকাল আড্ডা তেমন একটা জমে না। লোকজন আসা কমে গেছে, শরীফ মিয়ার মাঝেও ব্যবসা গুটিয়ে দেবে দেবে ভাব লক্ষ করা যায়। খোরশেদ, আলাউদ্দীন, মেসবাহরা আজকাল সান্ধ্য বা বৈকালিক আড্ডা সরিয়ে এনেছে টিএসসি'র দিকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েদের সাংস্কৃতিক

কাজের পরিধি যুদ্ধের পরে বেশ বেড়ে গেছে। পথ নাটক, কবিতা আবৃত্তি নানা রকম আয়োজনে এই জায়গাটা গত দু'তিন বছরে নতুন করে জমে উঠেছে যেন।

অনেক দিন পরে আজকে জমে উঠেছে ওদের আড্ডাটাও। সবাই ওরা রাজনীতি নিয়ে অল্পবিস্তর খবর রাখে, তাজউদ্দীনের হঠাৎ অপসারণ ঠিক স্বাভাবিক মনে হয়নি ওদের কারো কাছেই। পক্ষে বিপক্ষে সবারই যেন কিছু বলবার আছে।

পত্রিকার ফিচারের জন্যে তাজউদ্দীনের সাক্ষাৎকার আনতে ব্যর্থ হয়েছে আলাউদ্দীন, কিন্তু তারপরেও প্রাক্তন অর্থমন্ত্রীর সমর্থনে তার গলাটা বেশ জোরালো। 'না, এটা কিছুতেই মানতে পারলাম না। দেখো, যুদ্ধের সময় থিয়েটার রোডে তো রেগুলার গেছি! নিজের চোখে দেখছি মানুষটা মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কী রকম সিনসিয়ার! বিশ্বাস করবা, মানুষটা একটা বুশ শার্ট পরে সারাদিন কাজ করতেন, আর রাতে সবাই চলে গেলে সেই শার্ট নিজেই কাইচে শুকাইতে দিয়া পরের দিন আবার গায় দিতেন! এই রকম সিনসিয়ার একজন মানুষকে এইভাবে সরানোটা কি উচিত হইলো? ...

আর পত্রিকাগুলা কী লেখলো? বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে পদত্যাগ! আরে, এইভাবে সলিড লোকগুলারে সরায়ে দিলে জাতির স্বার্থ আর কয়দিন টিকবে?'

তারেকুল আলম মাত্র শেভ করে এসেছে। মসৃণ গালে হাত বোলাতে বোলাতে সে বলে, 'আমারও মনে হচ্ছে বঙ্গবন্ধু এইটা একটা ভুল করে ফেলছেন। যুদ্ধের দিনগুলায় বঙ্গবন্ধু ছিলেন না। সে সময় কিন্তু দেশের ম্যাস পিপল বলো, ফ্রিডম ফাইটার বলো, আর আর্মির লোকজন বলো– সবার মাঝেই একটা পরিবর্তন হয়ে গেছে। নিজে প্রেজেন্ট ছিলেন না বলে সেই চেঞ্জগুলা বঙ্গবন্ধুর পক্ষে ধরা একটু কঠিন হবে। বঙ্গবন্ধুর হয়ে সেই গ্যাপগুলা ফিল আপ করতে পারেন নজরুল সাহেব, তাজউদ্দীন সাহেব এরা। এদের যে কাউকে দূরে সরায়ে দেয়া মানে গভর্মেন্টের সাথে মানুষের একটা ডিসট্যান্স ক্রিয়েট করে ফেলা...'

'রাইট।' আলাউদ্দীন সায় দেয়। 'তবে লোকমুখে শুনছি, ভেতরে ভেতরে তাজউদ্দীন আর বঙ্গবন্ধুর মাঝে একটু একটু মন কষাকষি হইতেছিল আজকাল। কিন্তু তাই বলে এরকম কিছু ঘটবে, এটা আন্দাজ করা যায় নাই।'

মাসুদ তার হাতের সিগারেটটা দূরে ছুড়ে ফেলে বুকপকেট থেকে আরো একটা প্যাকেট বের করে। বলে, 'শেখ সাহেব তাজউদ্দীনরে সরায়া দিলেন, কিন্তু খন্দকার মোশতাকের মতো বদমাইশের বাচ্চা তার আশপাশে ঘুইরা বেড়ায়। মিয়ারা, আমার কথা লিইখ্যা রাখো, সামনে খারাপ কিছু ঘটবোই।'

খোরশেদের মতো সক্রিয় সরকার দলীয় কর্মীও মিইয়ে যায় এ কথা শুনে। 'এই বিষয়টা ম্যালাদিন ধইরে আমরাও খেয়াল করছি, বুঝলা।' খানিক দূরে রাস্তার একপাশে যে পথ নাটকটি হচ্ছিলো, সেখানে হাততালির জোর শব্দ একটু আনমনা করে দেয় তাকে। আওয়াজ কমে এলে মৃদুস্বরে সে বলে, 'যখনই ৩২

নম্বরে যাই, গিয়া দেখি বঙ্গবন্ধুর পাশে মোশতাক বইসা মুচকি মুচকি হাসতেছে। আর সুযোগ পাইলেই গলা নামায়া দুঃখী দুঃখী ভাব কইরা বলতেছে, মুজিব ভাই, আপনি না আসলে দেশের যে কী হইতো! যারা চেয়ারে বসছিল, তারা তো ভাবতেছিল তারাই সারাজীবন রাজত্ব কইরা যাইবো।

শুয়োরের বাচ্চার অভিনয় দেখলে মনে হয় কইষ্যা একটা থাপ্পড় মারি গালে!'

মাসুদের প্যাকেট থেকে হাত বাড়িয়ে একটা সিগারেট নেয় তারেক। 'শুনলা! বঙ্গবন্ধুও তো মানুষ। যতই ক্ষমাশীল হোন না ক্যান, কানের কাছে সারাক্ষণ যদি কেউ এরকম বলতে থাকে, তাইলে তো উনার মন বিষায়ে যাওয়াই স্বাভাবিক...'

'কিন্তু তাজউদ্দীন সাহেবও তো শেষের দিকে বেশ মুখ খুলছিলেন সরকারের বিপক্ষে।' খোরশেদ একটু দৃঢ় হয়। 'উনি নিজে সরকারের অর্থমন্ত্রী, কিন্তু পেপারকে বলে বেড়াচ্ছেন ভ্রান্ত নীতি অনুসরণ করায় অর্থনৈতিক অবস্থা গোল্লায় যাচ্ছে। অথচ নিজেও উনি সরকারের অংশ, এই অবস্থায় কি তাইলে ইকোনমির দুরবস্থার দায় তাজউদ্দীন এড়াইতে পারেন? উনার চেয়ারে বসে কি পাবলিকলি সরকারের সমালোচনা করা কারো সাজে?'

'গুড পয়েন্ট।' মেসবাহ অনেকক্ষণ ধরে বাদাম খাচ্ছিলো ধীরে সুস্থে। শেষ বাদামটার খোসা রাস্তার উপরেই ফেলে দেয় সে। 'এবং স্পেশালি তাজউদ্দীনের মতো পরিষ্কার চিন্তাধারার মানুষের এই রকম করাটা সাজে না। তাহলে? ... আমার ধারণা, তাজউদ্দীন শেষ দিকে নিজেই ক্যাবিনেটের বাইরে আসতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু শেখ সাহেবের প্রতি লয়্যালিটির কারণে সেটা স্পষ্ট করে বলতে তার আটকাচ্ছিলো। শেখ সাহেবই যেন তাকে রিজাইন করতে বলেন, এ জন্যেই হয়তো শেষ দিকে উনি বেশ মুখ খুলে সরকারের সমালোচনা করছিলেন। মনে হচ্ছে, হি ওয়াজ আস্কিং টু বি স্যাকড্।

তবে আমার ভুলও হতে পারে। আরেকটা ফ্যাক্টর থাকতে পারে। সেটা হলো, আমেরিকার প্রেশার। দেশের এখনো সাহায্য দরকার, শোনা যাচ্ছে সামনে নাকি কিসিঞ্জারও আসতে পারে বাংলাদেশে। কিন্তু সেদিন পেপারে ছবি উঠল তাজউদ্দীন সোভিয়েত অ্যাম্বেসেডরের সাথে আলোচনা করছেন। কাজেই শেখ মুজিবকে হয়তো আমেরিকা চাপ দিয়েছে কিসিঞ্জার আসার আগেই তাজউদ্দীনকে সরিয়ে দিতে।'

সান্ধ্য আড্ডা আর থামতে চায় না। বিশ্লেষণ হয় নানা দিক থেকে, কিন্তু সত্য কথা হলো তাজউদ্দীনের অপসারণে একটা সাড়া পড়ে যায় দেশের রাজনীতিমনস্ক মানুষদের মাঝে। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও দেখা যায় প্রাসঙ্গিক প্রতিক্রিয়া।

মালয়েশিয়ায় নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত জমিরুদ্দীন আহমেদ শেখ মুজিবকে পৌঁছে দিলেন টেংকু আবদুর রহমানের বার্তা। মুক্তিযুদ্ধের প্রধানমন্ত্রীকে সরিয়ে দেয়াটা ভালো মনে করছেন না তারা।

শেখ মুজিব ভুরু নাচিয়ে জানতে চান, 'আমি কারে মন্ত্রী রাখি না রাখি সেইটায় অগো কী রে?'

জমিরুদ্দীন উত্তর দেন, 'স্যার, এটা তো অন্য কেউ না, এটা তাজউদ্দীন। আমাদের দেশ গরিব, যে কয়দিন অর্থমন্ত্রী ছিলেন শুধু ভিক্ষাই করতে হয়েছে তাজউদ্দীনকে। কিন্তু ভিক্ষুকেরও যে আত্মসম্মান থাকতে পারে, তাজউদ্দীন সেটা দেখিয়ে গেছেন সবাইকে। প্রতিক্রিয়া তো ওরা জানাবেই!'

দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ তাজউদ্দীনের অপসারণে তাই প্রশ্নবোধক চিহ্নের ঢেউ আছড়ে পড়ে সর্বত্র। সেই প্রশ্নবোধকের নির্দিষ্ট কোনো উত্তর আসে না। কিন্তু অল্প কদিন পরের একটি অদ্ভুত ঘটনা হয়তো আলো জ্বালায় কারো কারো মনে।

তেজস্ক্রিয় আণবিক আক্রমণও ঠেকাতে পারে, এমন গাড়ি চড়ে বাংলাদেশ সফরে ঘুরে বেড়ান মার্কিন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা হেনরি কিসিঞ্জার। তার দুই দিনের ভ্রমণসূচিতে অন্তর্ভুক্ত থাকে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও। কিসিঞ্জার জানান তার স্ত্রী প্রাচ্যের সংগীতের সমঝদার। রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রসংগীত নেই কেন, বলে শেখ মুজিব চোখ লাল করতেই আয়োজকেরা ছুটে গিয়ে নিকটবর্তী রেডিও সম্প্রচার ভবন থেকে ধরে আনেন আলুথালু বেশের এক কিশোরীকে, যিনি একসময় পাপিয়া সরোয়ার হবেন।

শ্রীমতি ন্যান্সি কিসিঞ্জার যখন সংগীতে বুঁদ, জনাব কিসিঞ্জার তখন ধীরপায়ে হাঁটা দেন ওয়াশরুমের দিকে। আর হঠাৎ করেই, যেন-বা পূর্ব নির্ধারিত সাক্ষাতের আদলেই ওয়াশরুমের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসেন বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক। দুই কূটনৈতিকের দেখা করার এই নাটকীয়তা যেন হার মানায় স্পাই থ্রিলারকেও! মোশতাক বা কিসিঞ্জার জানেন না, তাদের দুজনের করমর্দনের অবাক সাক্ষী হয়ে থাকা সৈয়দ নাজমুদ্দীন হাশেম ভবিষ্যতে তার 'অশ্লেষার রাক্ষসী বেলায়' নামের স্মৃতিচারণে তুলে ধরবেন এই ঘটনা।

এই মুহূর্তে, মোশতাক-কিসিঞ্জারের করমর্দনের এ দৃশ্যমান অভিব্যক্তি হয়তো ইঙ্গিত দিচ্ছিলো আসন্ন সময়ের। উত্তরকালের। সেই উত্তরকাল এমনই ঘটন অঘটন, রোমাঞ্চ আর বিশ্বাসঘাতকতায় পূর্ণ, রোলার কোস্টারও হার মেনে যায় তার উত্থান পতনে।

মোশতাকের দিনকাল

পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান নুরুল ইসলাম বাইরে বেরিয়ে আকাশের দিকে চাইলেন। চোখ বন্ধ করে লম্বা একটা শ্বাস নিলেন এরপর। নিজেকে অনেকটা ভারমুক্ত মনে হচ্ছে তার। কমিশনের কোনো কিছুই পরিকল্পনা মতো হচ্ছিলো না, কাজেই নুরুল ইসলাম সিদ্ধান্ত নিয়েছেন অধ্যাপনা আর গবেষণার

কাজে ফেরত যাবার। ইদানীং তিনি কাজে আর আগ্রহ পাচ্ছিলেন না, কেবল মানুষের সমালোচনাই সহ্য করতে হচ্ছিলো। আর সংবিধানে যেমন পরিবর্তনের কথা শোনা যাচ্ছে, তাতে সামনে যে অবস্থার উন্নতি হবে এমন সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছে না। তবে এই কথা তো আর ছুটির অজুহাত হিসেবে প্রধানমন্ত্রীকে বলা যায় না। শেখ মুজিবকে তাই নুরুল ইসলাম বলেছিলেন, তিনি খুব ক্লান্ত। বিশ্রাম আর চিকিৎসার জন্যে বাইরে যেতে চান।

শেখ মুজিব যথেষ্ট বুদ্ধিমান। নুরুল ইসলামের অসন্তুষ্টি বুঝে নিয়ে তাকে নয় মাসের ছুটি দিয়ে দিয়েছেন তিনি। আর সে ছুটির কথাই আজকের ক্যাবিনেট সভায় প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেন শেখ মুজিব। আশা করেছেন, ছুটি শেষে আবার কমিশনে যোগ দেবেন নুরুল ইসলাম। আপাতত নুরুল ইসলামের কিন্তু সেরকম কোনো ইচ্ছে নেই, অক্সফোর্ডের ওদিকেও সবকিছু ঠিকঠাক। আগামী মাসের শেষ দিকে দেশ ছাড়ছেন তিনি। এ মুহূর্তে মনে তাই স্বস্তির ভাবটাই প্রবল নুরুল ইসলামের। ঠিক করেছেন, আগামী কয়েকদিন ঘরে বসে কমপিট রেস্ট নেবেন।

বেশ শীত পড়ে গেছে এ মাসে। দুপুরের মরা রোদে যখন অফিসে কী করে ফিরবেন, তাই ভাবছিলেন নুরুল ইসলাম, তখন হঠাৎ করেই কেউ যেন তার পাশে এসে দাঁড়ায়। 'কী প্রফেসর সাহেব, অফিসে যাবেন নাকি? চলেন চলেন, এই অধমের সঙ্গে চলেন। হে হে, আপনাদের মতো জ্ঞানীগুণী মানুষের সাথে চলাফেরা করাও সৌভাগ্যের ব্যাপার। হে হে...'

খন্দকার মোশতাকের এই হাসিটা কেন যেন একদমই পছন্দ হয় না নুরুল ইসলামের। এমন হাসি সহ্য করতে হবে ভেবেই মোশতাকের গাড়িতে চাপতে চান না তিনি। কিন্তু মোশতাক নাছোড়বান্দা। 'আরে চলেন প্রফেসর সাহেব, চলেন। নতুন গাড়ি, দশ মিনিটে অফিসে নিয়া যাবো আপনেরে। হে হে...'

অগত্য মোশতাকের সহযাত্রী হতেই হয় নুরুল ইসলামকে।

মূল সড়কে উঠতে গাড়ির মিনিট দুয়েক সময় লাগে। সে সময়টুকু মোশতাক নিশ্চুপই থাকেন। এরপর হঠাৎ করে আলাপী হয়ে উঠেন তিনি। 'ঠিক কাজ করতেছেন প্রফেসর সাহেব। খুব ভালো কাজ করতেছেন। আপনের জায়গায় আমি থাকলেও দেশ ছেড়ে চলে যাইতাম। আরে এইভাবে কাজ করা যায়...'

নুরুল ইসলাম অবাক হয়ে মোশতাকের দিকে তাকান। মানুষটা কী বলতে চাইছে, ঠিক বোধগম্য হয় না তার। কাজেই দৃষ্টি ছাড়া তিনি মোশতাকের বক্তব্যে কোনো সাড়া দেন না। মোশতাক কিন্তু বলে যেতে থাকেন অনর্গল।

'দেশটা তো মনে হয় উনার বাপের। উনি ইচ্ছা মতো যা খুশি তাই করে যাইতেছেন। আপনার মতো জ্ঞানীগুণী মানুষদের কোনো কদর নাই, আপনাদের পরামর্শও নেয় না। আপনারা থাইকে কী করবেন? এর চেয়ে বরং চইলে যান গা।

আপনাদের মতন রেস্পনিসবল লোকের জন্যে শেখ মুজিবের গভমেন্টে আসলেই কোনো জায়গা নাই। আপনার হতাশা প্রফেসর সাহেব– আমি বুঝি।'

প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে মোশতাকের এরকম তীর্যক বক্তব্যে নুরুল ইসলাম বিস্মিত না হয়ে পারেন না। কিছু একটা বলা দরকার মনে করে তিনি বলেন, 'না না স্যার, কী বলেন এইগুলা। হতাশা টতাশা কিছু না, আমি আসলেই খুব টায়ার্ড। রেস্ট দরকার ছিল বলেই ছুটি নিছি। ভাবলাম কয়েকদিন একটু চেঞ্জ দরকার।'

এই উত্তরে মোশতাককে খুব একটা খুশি মনে হয় না। তিনি সম্ভবত আশা করেছিলেন নুরুল ইসলাম তার সাথে গলা মিলিয়ে ক্ষোভ ঝাড়বেন শেখ মুজিবের প্রতি। 'না, রেস্টে তো যাওয়ার প্রয়োজন আছেই। খালি কাজ করলে চলে?...' মোশতাক বলেন। 'তবে আপনি না হইলেও অনেকেই তো আজকাল চলে যাইতেছে, টিকতে না পাইরা। এইরকম অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে কোনো কাজ করা যায়!'

ড্রাইভার আর সিকিউরিটির লোকের সামনে প্রকাশ্যেই প্রধানমন্ত্রীর নামে এরকম বিষোদ্গার দেখে ভেতরে গভীর চিন্তায় পড়ে যান নুরুল ইসলাম। মোশতাককে কুরবানি করতে চান, শেখ মুজিবের সেই উদ্ভট রসিকতা আবারো মনে পড়ে তার। তবে কি শেখ মুজিব কোনো রকম আশঙ্কা করছেন মোশতাককে নিয়ে? কিন্তু তাই যদি হয়, তবে মোশতাক কী করে বঙ্গবন্ধুর এত নিকটে ঘোরাফেরা করছেন?...

নুরুল ইসলামকে অফিসে নামিয়ে দিয়ে বাণিজ্যমন্ত্রী বাড়ির দিকে গাড়ি ঘোরাতে বললেন। আজ আর অফিস করবেন না তিনি। মেজাজটা গরম, বাসায় গিয়ে একটু ঠান্ডা হওয়া দরকার।

শেখ মুজিবের ওপর এই মুহূর্তে প্রচণ্ড রেগে আছেন মোশতাক। মুক্তিযুদ্ধের সময় ঠাকুর আর চাষিকে নিয়ে মার্কিনদের সাথে আঁতাত পাতানোটা বিফলে গিয়েছিল মোশতাকের। তবে মাঝের ক'বছরে সেসব তিনি বেশ গুছিয়ে এনেছিলেন। প্রায় প্রতি মুহূর্তেই শেখ মুজিবের সাথে ছায়ার মতো সেঁটে থেকে থেকে সুকৌশলে অনেকটাই এগিয়ে গেছেন তিনি। তাজউদ্দীন নামের আপদটাকেও সুযোগ বুঝে কিসিঞ্জার আসার আগেই সরিয়ে দেয়া গেছে। খন্দকার মোশতাক মনে মনে হাসেন, তাজউদ্দীনের মতো ঘাড়ত্যাড়া লোকগুলা পলিটিক্স শিখল না এখনো! আরে ক্ষমতার কাছে ব্যক্তিত্বের আবার দাম আছে নাকি!

তাজউদ্দীন নিজের ব্যক্তিত্বের কারণেই হয়তো মুক্তিযুদ্ধের সময়ে মোশতাকের অন্তর্ঘাতমূলক কাজকর্মের কথা রাষ্ট্র করে বেড়ায়নি, কিন্তু মোশতাক তো আর এরকম বোকা নন! সুযোগ বুঝে নানা জায়গায় তাজউদ্দীনের নামে গুজব রটিয়ে ঠিকই তার অবস্থানটা দুর্বল করে দিয়েছেন মোশতাক, আর শেখ মুজিবকে সময়ে অসময়ে চালিত করেছেন ভুল রাস্তায়। কিন্তু এখন হঠাৎ করে মুজিবের মাথায়

আবার ভূত চেপেছে সমাজতন্ত্র করার, কিসিঞ্জারের আর আমেরিকার সেটাতে খুব খুশি হবার কারণ নাই। মনে মনে শেখ মুজিবকে একটা শক্ত গালি দিয়ে বসলেন মোশতাক।

আগামসি লেনের বাড়িতে এসেও মোশতাকের মন আচ্ছন্ন হয়ে রইল শেখ মুজিবের প্রতি বিদ্বেষে। অতিরিক্ত বাড় বেড়েছে ব্যাটার। যখন তখন এক একজনের সামনে যা খুশি তাই বলে যাচ্ছে লোকটা মোশতাককে নিয়ে। ইন্দিরা গান্ধীর সামনে কেমন অপমানটা করল তাকে!

তাতেই তো শেষ না। মোশতাকের চোখে ভাসে ঐ ভারত সফরেই ব্যক্তিগত চিকিৎসকের সামনেও মুজিব কেমন খোঁচা দিয়েছিল তাকে। হাসতে হাসতে ডাক্তার নুরুল ইসলামের সামনে মুজিব বলেছিল, 'এই লোকটারে চেনো ডাক্তার? এর পা থেইক্যা মাথা পর্যন্ত কিন্তু হাড়ে হাড়ে শয়তানি।... এরে আমি খুব ভালো মতো চিনি!'

'ব-ঙ্গবন্ধু!' মোশতাক মুখ বিকৃত করে স্বগোতক্তি করলেন নিচু স্বরে। 'খালি ওই ব্যাটাই য্যান দেশের জন্যে সব কাজ করছে, আর আমরা বইসা বইসা আঙুল চুষছি।' যতই ভাবেন, মাথা ততই তপ্ত হতে থাকে মোশতাকের। মেজাজ যেন আর কিছুতেই ঠান্ডা হয় না।

গোসলের পানি দেয়ার পরে মোশতাক ঢুকে যান টয়লেটে। ঝরঝরিয়ে গোসল করে একটা ঘুম দেয়া দরকার ভালো মতো, তবেই একটু ভালো লাগবে আশা করা যায়।

গোসলের পর স্যান্ডো গেঞ্জি আর নতুন লুঙ্গি পরে মোশতাক খেতে বসলেন। কিন্তু খাবার টেবিলে বসা মাত্র ফোন বাজে। হাসিনার জামাই, ওয়াজেদ মিয়া ফোন করেছেন। মোশতাক তা শুনে তিন লাফে টেবিল থেকে পৌঁছে যান ফোনের কাছে। গলায় মধু ঢেলে বলেন, 'বাবা ওয়াজেদ? ভালো আছো তো? তবিয়ত সব ঠিকঠাক?...আছি বাবা কোনো রকম। তোমরা তো আজকাল কাকার কোনোরকম খবরই নাও না ...

তা কী মনে করে ফোন করলা বাবা?... ও। ও, আচ্ছা। এই বিষয়ে তো বাবা আমারে একটু খোঁজ নেয়া লাগবে। তুমি তাইলে সামনের বিষ্যুদবার আসো? ...আচ্ছা, একবারে রবিবারেই আসো। আমি ভালো মতো খবর নিয়া রাখবো নে।'

ফোন রেখে মোশতাক আবারো বিরক্ত মুখে খেতে বসেন। ওয়াজেদ মিয়া বিদেশে তার বেতন দিয়ে একটা গাড়ি কিনেছিল, সেটার আমদানি নিয়ে কী একটা ঝামেলা হয়েছে। তাই নিয়ে তার সাথে কথা বলতে চায়। মোশতাক তাকে সামনের সপ্তায় আসতে বলে দিলেন। সব দিকে ম্যানেজ করে চলা দরকার, দিনকাল খারাপ...

রবিবার বিকালের দিকে মোশতাক অপেক্ষা করতে লাগলেন ওয়াজেদ মিয়ার জন্যে। বিকালের ওই সময়টা কোনো অতিথি আসলে মোশতাক তাদের নিয়ে ছাদের লবিতেই বসেন। দিনের শেষ সময়ের রোদ পোহাতে মোশতাকের ভালো লাগে।

আজকেও যথারীতি ছাদের লবিতে বসে অতিথির জন্যে অপেক্ষা করছেন মোশতাক। বাতাস ঠান্ডা, বেশ শীত শীত লাগছে। মোশতাক ভাবছেন নিচে নেমে চট করে গিয়ে চাদরটা নিয়ে আসবেন কি না, এমন সময় কেউ এসে খবর দেয়, একজন গেস্ট এসেছে। মেহমানকে দ্রুত উপরে নিয়ে আসতে আদেশ দেন মোশতাক, কিন্তু আগত মানুষটি ছাদে উঠলে তিনি আশাহত হন। ওয়াজেদ মিয়া না, অপরিচিত একজন।

আগন্তুক সালাম বিনিময়ের পর মোশতাকের ইশারায় সামনের বেতের চেয়ারে বসে পড়ে। খানিক ইতস্তত করে সে বলে, 'স্যার, যদিও আগে আপনার সাথে আমার কয়েকবার দেখা হইছে, আপনি আমাকে মনে হয় চিনবেন না। আমার নাম মেজর রশিদ। আমার বাড়ি স্যার আপনার গ্রামের বাড়ির পাশেই...'

খন্দকার মোশতাক ঘড়ির দিকে একপলক তাকান। ওয়াজেদ মিয়া যেকোনো সময় চলে আসতে পারে, এই আলাপ তার আগেই সেরে ফেলা দরকার। বিরক্তি গোপন করে মেজর রশিদের দিকে তাকিয়ে মোশতাক তাই হাসেন। বলেন, 'ও ও, দেশি মানুষ! বলেন, আপনার জন্যে কী করতে পারি বলেন...'

নতুন করে মেরামত

সোহেলকে নিয়ে তাজউদ্দীন যখন বাসায় ঢুকলেন, শীতের দুপুরেও বেশ ঘেমে গেছেন তিনি। কপাল থেকে স্বেদবিন্দু মুছে ফেলতে ফেলতেই তাজউদ্দীন জোরে চেঁচিয়ে উঠলেন। 'লিলি, লিলি! কই গেলা! আরে এদিকে আসো, খবর আছে।'

হেঁসেল থেকে হাত মুছতে মুছতে বেরিয়ে এসে জোহরা বলেন, 'কী খবর? এত চিল্লাইতেছো ক্যান? ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই...'

তাজউদ্দীন উত্তেজিত, তাকে থামানোই যায় না। 'চিল্লাবো না? আরে সোহেলকে স্কুলে ভর্তি করায়া আসলাম। ওই গ্রিন হেরাল্ডেই! চিন্তা করতে পারো, আমাদের সোহেল, ঐ তো সেদিনও বিছানায় শুয়ে শুয়ে দিনরাত কান্না করত, সেও টুকটুক করে স্কুলে যাবে কয়দিন পর!'

স্বামীর উত্তেজনা দেখে জোহরা মিটমিট করে হাসতে থাকেন। ডাইনিং টেবিল থেকে একটা জগ আর গ্লাস নিয়ে ঘর্মাক্ত তাজউদ্দীনের পাশে গিয়ে বসেন তিনি। 'নিল ওরা তোমার ছেলেকে? প্রথমে না বলছিল বিদেশি ছাড়া কাউকে নেয় না ওরা?'

'আব্বু ঝগড়া করছে ওদের সাথে!' সোহেল নতুন কেনা স্কুল ব্যাগ মাথার উপরে তুলে একটা গোপন তথ্য ফাঁস করে দেয় সজোরে। 'আব্বু নিতে বলছে ওদেরকে। আব্বু বলছে সোহেলকে নাও, ও এই স্কুলে পড়বে!'

জোহরা ছেলের দিকে তাকান। পিচ্চি সোহেলকে স্কুলে ভর্তি করাতে হবে, তাজউদ্দীন গতকালই তাই বেরিয়েছিলেন ছেলেকে নিয়ে। বাসার সামনে কাকলী স্কুলে সোহেল পড়তে রাজি হয়নি। বরং আরেকটু এগিয়ে যে গ্রিন হেরাল্ড স্কুল, সেই স্কুলের সামনে দোলনায় আর স্লাইডে বাচ্চাদের ঝাঁপাঝাঁপি দেখে সেখানেই পড়তে চেয়েছে সোহেল। কিন্তু স্কুল কর্তৃপক্ষের আইন, শুধু বিদেশিরাই নাকি ভর্তি হতে পারবে সেখানে। এখন সোহেলের কথা শুনে মনে হচ্ছে, তাজউদ্দীন সেখানে গিয়েও কথা শুনিয়ে এসেছে ওদের।

'না, ঝগড়া কই করলাম!' তাজউদ্দীন এক গ্লাস পানি খেয়ে সলজ্জ স্বরে বলেন। 'ওদেরকে কালকে বোঝালাম যে স্কুলটা বাংলাদেশে, কাজেই খালি বিদেশিদের পড়ার সুযোগ দেয়া হবে কেন! ... তো ওরা মনে হয় আমার কথা শুনে স্কুল পলিসি চেঞ্জ করছে। এই তো, আজকে সকালে ফোন করে সোহেলকে নিয়ে যাইতে বলছিল।'

তাজউদ্দীন ছেলেকে কাছে টেনে নেন। মাথায় হাত রেখে জিজ্ঞেস করেন, 'কী সোহেল, তুমি খুশি তো? নতুন স্কুলে যেতে পারবা একা একা? ভয় লাগবে না?'

'নাহ, ভয় নাই। স্কুলে যেতে পারবো। ঐখানে খেলবো।' সাহসী সোহেল হাত নেড়ে নেড়ে বলে।

'হইছে। এত আদর সোহাগ লাগবে না। ... সোহেল, আব্বু যাও তো। ব্যাগ রেখে আসো তোমার রুমে। ...আর তুমিও যাও। পুরা তো ঘেমে আসছো।' জোহরা শাসন করেন পিতা পুত্র দুজনকেই। 'গোসল করো গিয়ে। আমি ভাত বাড়তেছি।'

রান্নাঘরে গিয়ে বাবা-ছেলের অদ্ভুত রসায়ন মনে করে জোহরা মনে মনে হাসেন। মানুষটা যে কী! ঐটুকু পিচ্চিকেও সব শিখিয়ে দেয়ার অদ্ভুত তাড়না তার। যখন তখন সোহেলকে ধমক খেতে হয়। সেদিন যখন সোহেল মাছ খেতে চাচ্ছিলো না রাতে, বাবা হাত ধরে তাকে নিয়ে গেল গেটের বাইরে। খাবারের জন্যে ঘুরতে থাকা ভিক্ষুকদের দেখিয়ে সোহেলকে বলল, ওই দেখো। দেশের মানুষ খেতে পায় না। লাখ লাখ লোক ভিক্ষা করে। আর তুমি মাছ খেতে চাও না!

আবার উদ্ভট আদরেও সোহেলের বাবা পিছিয়ে নেই। রাতে খাবার পরে বালিশে হেলান দিয়ে মানুষটা সোহেলকে বুড়ি আর দুই কুকুর রঙ্গা-ভঙ্গার গল্প শোনায়। রাতে টেলিভিশনের অনুষ্ঠান শেষ হবার পরে যখন জাতীয় সংগীত

বাজে, তাজউদ্দীন তখন টিভির সামনে অ্যাটেনশনের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে ছেলেকেও শেখায় পতাকাকে কী করে সম্মান করতে হয়। বাপ-ব্যাটাকে তখন দেখতে যে কী অদ্ভুত লাগে...

দুপুরের খাবার খেয়ে খানিক রোদ পোহানোর পর তাজউদ্দীন ধীরে ধীরে নেমে গেলেন নিচে। সকলের অলক্ষে। জোহরার কিন্তু নজর এড়াল না এই প্রস্থান। গত কিছুদিন ধরেই এরকমটা হচ্ছে, খাওয়ার পরে কিছুক্ষণের জন্যে অদৃশ্য হয়ে যান তাজউদ্দীন। কৌতূহলী জোহরা সন্তপর্ণে অনুসরণ করলেন স্বামীকে।

তাজউদ্দীন নিচের লন দিয়ে হেঁটে হেঁটে চলে গেলেন বাড়ির পেছনের গ্যারেজের দিকে। গ্যারেজের দরজা খুলে এক কোনার জাল দিয়ে ঘেরা কাঠের খাঁচাটার সামনে গিয়ে উবু হয়ে বসেন তাজউদ্দীন। সেটার ভেতরে তুষারশুভ্র একজোড়া খরগোশ, শেখ মুজিবের দেয়া উপহার। তাজউদ্দীন আস্তে আস্তে কচি ঘাস ছিঁড়ে ছিঁড়ে মুখে তুলে দেন খরগোশগুলোর।

গ্যারেজের দরজায় এসে দাঁড়ানো জোহরা কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থেকে দেখে যান এই দৃশ্য। তারপর হঠাৎ বলে ওঠেন, 'তোমাকে দিয়ে মনে হয় দেশের কাজ আর হবে না।'

চমকে পেছনে ফিরে তাকান তাজউদ্দীন। জোহরার কথায়, যা অনেকটা ভবিষ্যদ্বাণীর মতোই শোনায়, গ্যারেজের ভেতরে কেমন একটা হতাশার আস্তরণ দেয়া কুয়াশা নামে। তাজউদ্দীন এক মুহূর্ত স্ত্রীর চোখে চোখ রেখে কোনো জবাব দেন না। বরং একটা অদ্ভুত হাসি দেন।

কী যে অপার্থিব বেদনার জন্ম দেয় দৃশ্যটি!

জোহরা সেই হাসি সহ্য করতে পারেন না। একটা কেমন ব্যাখ্যাতীত দুঃখ নিয়ে তিনি বাড়ির দিকে হাঁটা দেন। তাজউদ্দীন নিশ্চুপ বসে থাকেন সেই অর্ধেক আঁধারের মাঝে। মাঝে মাঝে তিনি খরগোশগুলোর মাথায় হাত বোলান।

এই খরগোশ মুজিব ভাইয়ের দেয়া। সোহেল নাকি কবে কোন কালে তার মুজিব কাকুকে বলেছিল যে খরগোশ তার পছন্দ, মুজিব ভাই তাই একজোড়া খরগোশ পাঠিয়ে দিয়েছেন সপ্তাহ দুয়েক আগে। নতুন খেলনা পেয়ে সোহেল তো খুশিই, তাজউদ্দীনের নিজেরও খুব ভালো লাগে এখানে বসে ওদের আদর করতে।

পদত্যাগ করেছেন, কিন্তু মুজিব ভাইয়ের সাথে এখনো ব্যক্তি আর পরিবার পর্যায়ে যোগাযোগ অটুট তাজউদ্দীনের। এত দিনের টান, ভোলা যায় কী করে! মুজিব ভাই যখন তার জায়গায় আজিজুর রহমান মল্লিককে অর্থমন্ত্রী করতে ডাকলেন, এমনকি সেদিনও চায়ের দাওয়াত পেয়েছিলেন তাজউদ্দীন। মল্লিক সাহেব সত্যিকারের ভদ্রলোক, তিনি প্রথমে রাজি হননি অর্থ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব

নিতে। মুজিব ভাইয়ের চাপাচাপিতে রাজি হবার পরে মল্লিক সাহেব অবশ্য তাজউদ্দীনের বাসায়ও এসেছিলেন চা খেতে। তাজউদ্দীন নতুন অর্থমন্ত্রীকে বেশ পছন্দ করেন। মল্লিক সাহেবকে তিনি বলেছিলেন, 'ভাই সাহেব, আপনি দায়িত্ব পাওয়ায় আমি খুব খুশি হইছি। আপনি আওয়ামী লীগের না, কাজেই আপনার কাছে এখন লোকে তদবির করেও পারবে না। অর্থমন্ত্রীকে কারো কথা শুনে কাজ করতে হবে না এখন।'

... খরগোশদের খাঁচার এক কোণে জাল একটু আলগা হয়ে গেছে। সেদিকে চোখ পড়তেই তাজউদ্দীন খানিক চঞ্চল হয়ে ওঠেন। গ্যারেজের এক কোণে রাখা তার ছোট্টো টিনের বাক্সটা খুঁজে বের করেন তিনি। হাতুড়ি, স্ক্রু ড্রাইভারসহ নানা মাপের তারকাঁটায় ভর্তি বাক্সটা। টুকটাক মেরামতির কাজ তাজউদ্দীন নিজের হাতেই করেন। দীর্ঘদিন ঘরের কোণে বসে থেকে অলস হয়ে পড়া বাক্সটা আবার তার হাতে সচল হয়ে উঠেছে সরকারি বাসা ছেড়ে নিজের বাড়িতে ওঠার সময়।

তাজউদ্দীন ধীরে ধীরে ঠুক ঠুক করে জোড়া লাগাতে থাকেন খাঁচার ছিঁড়ে যাওয়া জাল। বাংলাদেশকে ঠিক করে ফেলবেন বলে স্বপ্ন দেখতেন যে মানুষটি, আলো অন্ধকারের গ্যারেজে বসে খরগোশের খাঁচা মেরামতের ফাঁকে মৃদু শব্দের আড়ালে তিনি চেষ্টা করেন দীর্ঘশ্বাসের আওয়াজ গোপন করতে। ঠুক ঠুক শব্দের পর্দা খুব সহজ করে দেয় সেই চেষ্টা।

দিন কয়েক পরেই তাজউদ্দীনের নীরবতা আরেকটু গাঢ় হবার মতো কারণ ঘটে। জরুরি অবস্থা জারি ছিল আগেই, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবার সংবিধানে চতুর্থ সংশোধনী আনলেন। দেশে চালু হলো রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন ব্যবস্থা, শেখ মুজিব হলেন প্রেসিডেন্ট। ছেঁড়া জালের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে গেছে আশারূপী বেশুমার শুভ্র খরগোশ, তবু বঙ্গবন্ধুও নতুন করে জোড়া লাগাতে চান বাংলাদেশটাকে।

কিছু আশা আর অনেকখানি সংশয় নিয়ে বাংলাদেশ প্রবেশ করে নতুন যুগে।

দ্বিতীয় বিপ্লব

অফিস সেরে ধানমণ্ডি ৩২ নম্বরে আসতে আসতে ওয়াজেদ মিয়ার প্রায় সাড়ে পাঁচটা বেজে গেল। দুপুরের খাবারটাও সে এখানেই সেরেছে। তারপর আবার অফিসে চলে গেছে। কাজ শেষ করে অবশ্য আজ একটুও দেরি না বেরিয়ে পড়েছে সে। বঙ্গবন্ধু আজ সংবিধানের সংশোধনী বিল পেশ করেছেন, সংসদে শপথ নিয়েছেন রাষ্ট্রপতি হিসেবে। পত্রিকাগুলো তাই জরুরি ভিত্তিতে দুপুর সংস্করণ বের করেছে, লাঞ্চের সময় সেটাই বেশ খুঁটিয়ে পড়েছে ওয়াজেদ মিয়া।

৩২ নম্বরের দোতলায় উঠেই ওয়াজেদ মিয়া একটা ধাক্কা খেল। তার শাশুড়ি, ফজিলাতুন্নেসা মুজিবকে বেশ রাগান্বিত দেখাচ্ছে। উঁচু গলায় রেহানা আর রাসেলকে বকাবকি করছেন তিনি।

'তোগো মেজাজ তো এখন এই রকম হইবোই। তোরা তো এখন পে-সিডেন্টের পোলা মাইয়া!' বলতে বলতে রাসেলের খেলনা ভর্তি বাক্সটা একদিকে ছুড়েই মারেন বেগম মুজিব। বেচারা রাসেল এমন বকুনি খেয়ে গলা ছেড়ে কান্না শুরু করে দেয়।

কী ঘটেছে, ওয়াজেদ মিয়া তার কিছুই আঁচ করতে পারে না। তবে তার শাশুড়ি প্রেসিডেন্ট শব্দটা যে ভাবে বিকৃত করে বলেছেন, তাতে মনে হচ্ছে বঙ্গবন্ধুর উপরেই যত ক্ষোভ তার। রেহানা আর রাসেলকে সেটাই সামলাতে হচ্ছে এখন! 'আহা, আম্মা, করেন কী! বাদ দেন না। ছোট মানুষ। না বুঝে কী না কী করে ফেলছে...' পরিস্থিতি শান্ত করতে ওয়াজেদ মিয়া সক্রিয় হয়ে ওঠেন।

ফজিলাতুন্নেসা কিন্তু গজগজ করতেই থাকেন। ওয়াজেদ মিয়া এই অবসরে চোখের ইশারায় রেহানাদের সরে যেতে বলেন। বেগম মুজিব শান্ত হন তারও বেশ কিছু সময় পর। অন্তত কিছু সময়ের জন্য।

শেখ মুজিব যখন বাসায় ফিরলেন, তখন সাতটা বেজে গেছে। তার সাথে নবীন ও প্রবীণ বেশ কিছু রাজনীতিক। খানিক আলাপের পর তাদের বিদায় করেন তিনি। এরপর হাতমুখ ধুয়ে দোতলার শোবার ঘরের সামনের লবিতে সোফায় গা এলিয়ে দেন বঙ্গবন্ধু। আয়েশ করে পাইপে টান দিতে দিতে অপেক্ষা করেন টিভির খবর দেখবার জন্যে। শেখ মুজিবকে দেখে ঘরের কোনার সোফায় আরো খানিক জবুথবু হয়ে পড়ে ওয়াজেদ মিয়া। বঙ্গবন্ধু একবার নজর বুলিয়ে ওয়াজেদের সালামের উত্তর দেন, বাড়তি কোনো কথা বলেন না।

ঘরের নীরবতা ভাঙতেই যেন দুপদাপ পা ফেলে আসেন বেগম মুজিব। ওয়াজেদ মিয়ার সামনেই স্বামীকে উদ্দেশ করে ফেটে পড়েন তিনি। 'সংবিধানে এত বড় পরিবর্তন করবা, সেইটা নিয়া তুমি আমারে কিছু বলারই প্রয়োজন বোধ করো নাই, না? আমারে একটু আভাস দিলে কী হইতো? ...আর একদম সাথে সাথেই তোমারে প্রেসিডেন্ট হিসাবে শপথ নিতে হইলো, নাকি? দুইটা দিন সবুর করলে কী হইতো?'

'আরে এই গুলান রাষ্ট্রীয় ব্যাপার! সব কিছু আগে আগে তোমারে কয়্যা ফ্যালামু নাকি!' শেখ মুজিব পাইপ টানতে টানতে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে হাসেন। মিটমিট সে হাসি আরো খেপিয়ে দেয় বেগম মুজিবকে।

'হাসো ক্যান? হাসির কী কইছি? এইবার কি, আমারে এই বাড়ি ফ্যালায়া সরকারি বাড়িতে যাইতে কইবা? ...শুনো, আমার কথা একটাই। এই বাড়ি ছাইড়ে আমি জীবনেও প্রেসিডেন্ট হাউজে যামু না। তুমি যাইতে চাইলে তোমারে একলাই

ঐখানে গিয়া থাকন লাগবো!' যেমন সশব্দে এসেছিলেন, তেমন ঝড়ের মতো চলেও যান বেগম মুজিব। পেছনে রেখে যান হাস্যমুখী বঙ্গবন্ধু আর জড়সড় ওয়াজেদ মিয়াকে।

শেখ মুজিব মনে মনে হাসেন। পুরো বাংলাদেশটাই তার ঘর। কিন্তু সেই ঘরের ভেতরে তার নিজের ঘরের মালিকানা শুধু রেনুর কাছেই। রেনু বাইরের পৃথিবীতে বাঁধনহীন করে দিয়েছে তাকে, নিজে ব্যস্ত থেকেছে শুধু এই বাড়ি আর পান-সুপারি-জর্দা-দোক্তা সমেত পানের বাটা নিয়ে। রেসকোর্সে যেবার ইন্দিরা মঞ্চ হলো, ইন্দিরা গান্ধীর সামনে আটপৌরে শাড়ি ছেড়ে কাতান পড়তে হয়েছিল রেনুকে। কী আশ্চর্য, অমন রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানেও কাতানের আড়ালে পানের বাটা নিয়ে গেছিল রেনু!

টিভিতে খবর শুরু হয়। সংবাদের অনেকটা জুড়েই থাকে সংবিধানের সংশোধনী। খবরের দিকে চোখ থাকলেও শেখ মুজিবের মাথায় কিন্তু ঘুরতে থাকে রেনুর কথা। কেবল ফজিলাতুন্নেসা নয়, একদলীয় শাসন আর সমাজতন্ত্রের দিকে আঙুল তুলে দেখিয়েছে আরো অনেকেই।

লেফটিস্টদের সাথে কথা হয়েছে তার। মেনন, রনো এরা সব এসেছিল তার সাথে কথা বলতে। তাদের বক্তব্য হচ্ছে এইভাবে সমাজতন্ত্র হয় না। তার জন্যে নাকি দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। শেখ মুজিব তাদের কথা মন দিয়ে শুনেছেন। এরপর অটল থেকেছেন নিজের মতেই। যুদ্ধের আগে পাকিস্তানি পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিপক্ষে একের পর এক লড়াই করেছেন তিনি, স্বাধীন বাংলাদেশকে সেই পুঁজিবাদের রাস্তায় নামতে দেয়া যাবে না। অবস্থা আরো খারাপ হবার আগেই তাই প্রয়োজন সমাজতন্ত্র চালু করা। শেখ মুজিবের বিশ্বাস, বাংলাদেশের মানুষকে তিনি বোঝাতে পারবেন।

সবগুলো দলকে শেখ মুজিব একীভূত করেছেন 'বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ' নামের একটি পার্টিতে। সেই দল হবে স্বাধীনতার স্বপক্ষের সব লোকেদের মঞ্চ। সমাজতন্ত্র বিরোধী, ধর্মনিরপেক্ষতা বিরোধী, স্বাধীনতা বিরোধীদের কোনো জায়গা হবে না তার দলে। তর্জনি তুলে একবার শেখ মুজিব এই ভূখণ্ডে নিয়ে এসেছিলেন স্বাধীনতা, আরো একবার তিনি দিক নির্দেশ করতে চান বাংলাদেশের মানুষকে। এবার হবে তার দ্বিতীয় বিপ্লব।

ওয়াজেদ মিয়ার সাথে সচরাচর রাজনীতির আলাপ করেন না শেখ মুজিব, কিন্তু আজকে যেন তার ইচ্ছে হয় কথাবার্তা বলে খানিক হালকা হতে। 'কিসমত খুব নিষ্ঠুর জিনিস বুঝলা বাবা, তার হাত থেইক্যা আমাদের মুক্তি নাই...'

সচকিত হয়ে শেখ মুজিবের দিকে তাকায় ওয়াজেদ মিয়া। এই হঠাৎ স্বগোতক্তির উত্তরে কী বলবে, তা মাথায় আসে না তার। বঙ্গবন্ধু কিন্তু এদিকে দৃকপাত করেন না। টিভির পর্দায় চোখ রেখে তিনি আনমনে কথা বলে চলেন।

'সারাজীবন গণতন্ত্রের জন্যে আন্দোলন করলাম, জেল খাটলাম। আর অহন আমারেই এক পার্টি করন লাগতাছে। এইটা আমি চাই নাই। বাধ্য হয়্যা করন লাগছে। ঈদের দিনের জামাতে মানুষ খুন হয়, শুনছো কোনোদিন? কিন্তু ওরা সেইডাও করছে। আমার তাই কঠোর না হয়্যা উপায় আছিল না। এইবার ইনশাল্লাহ সব ঠিক কইর‍্যা ফ্যালামু, নাইলে অবশ্য আমিই শ্যাষ হয়্যা যামু।...

তয় তুমি লিখ্যা রাখো, এই ব্যবস্থা সাময়িক। দেশরে আবার গণতন্ত্রে নিয়া যামু ইনশাল্লাহ। ক্ষমতা আমি ম্যালা পাইছি, ক্ষমতার জন্যে এই ব্যবস্থা করি নাই। করছি দেশরে বাঁচানোর লাইগ্যা।'

যেমন হঠাৎ শুরু করেছিলেন, তেমনি আচমকাই থেমে যান শেখ মুজিব। কিন্তু মানুষটার মুখের দিকে চেয়ে ওয়াজেদ মিয়ার বড্ড মায়া লাগে।

বাংলাদেশের সবচেয়ে ক্ষমতাবান মানুষটিকেও কেমন অন্তর্দহনে পুড়তে হচ্ছে।

শেখ মুজিবুর রহমান কিন্তু তখনো ভেবে চলেছেন। সংসদে একদলীয় শাসনের বিল পাস করার পক্ষে আজ ভোট দেননি ওসমানী। আমীর-উল ইসলামেরাও একদলীয় শাসনের বিপক্ষে কথা বলেছেন। তাজউদ্দীনও বলেছিল...

তাজউদ্দীনের কথা মনে আসতেই শেখ মুজিবের কেমন একটা অপরাধবোধ হলো। তাজউদ্দীন তাকে সরিয়ে প্রধানমন্ত্রী হতে চায়, মোশতাক বহুবার এই কথা বলেছে তাকে। মোশতাককে তিনি বিশ্বাস করেন, কিন্তু তাজউদ্দীনের বিষয়ে কোথায় যেন কী একটা বাধা দিচ্ছে তাকে। ঠিক নিশ্চিত হতে পারছেন না তিনি। অনিশ্চিত হয়ে কিছু করাটা শেখ মুজিবের ধাঁতে নেই, কাজেই তাজউদ্দীন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়াটা গত কিছুদিন ধরে তাকে খোঁচাচ্ছে কৈ মাছের কাঁটার মতোই...

শেখ মুজিব টিভির সামনে থেকে উঠে পড়লেন। ভালো লাগছে না আজকে, খেয়ে জুত মতন একটা ঘুম দিতে হবে। তার সামনে অনেক কাজ।

সমসাময়িক

এক বছরেরও বেশি সময় পরে হায়দার ভাইয়ের সাথে দেখা হলো তারেকুল আলমের। মেজর হায়দারের চেহারাই পালটে গেছে, মনে হয় তারেকের। ...ও হ্যাঁ, হায়দার ভাই তো আর মেজর নন, উনি এখন লেফটেন্যান্ট কর্নেল! প্রমোশন দেয়ার পরে তাকে পাঠানো হয়েছে চিটাগং ক্যান্টনমেন্টে, অষ্টম বেঙ্গলের কমান্ডিং অফিসার হিসেবে।

প্রমোশন পেয়ে কোথায় একটু ভারিক্কি হবেন, তা না! তারেক খেয়াল করে, হায়দার ভাইয়ের সেই চিরচেনা আন্তরিক রূপটাই বেরিয়ে এসেছে তাকে দেখে। হায়দারের খুশি বাঁধ মানে না শিষ্যকে দেখে। 'বড় আপা! এই দেখো, আজকেও

মেহমান পায়া গেছি তোমার জন্যে! আরে তারেক আইছে। তারেক! ...দুপুরে কিন্তু ও খায়া যাইবো এইখানে!'

হায়দার ঢাকায় এলে বড় বোন আখতার বেগমের বাসাতেই ওঠেন। হায়দার এসেছেন শুনেই তাই তারেকুল আলম সটান চলে এসেছে এখানেই। হাতে সময় নিয়ে এসেছে সে, কাজেই হায়দার ভাইয়ের দুপুরের খাবার আমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করে না তারেক। অসম বয়েসি দুইজন বন্ধুভাবাপন্ন মানুষ সোফায় গা এলিয়ে গল্পে মেতে যায়।

'তারপর, কী খবর তোমাদের বলো।' হায়দার ভাই বলেন। 'হাবিবুল আলম তো পরশু দিন আইসা দেখা কইরা গেল। ওর গায়ে তো খুব গোশত লাগছে। তোমার লগে দেখা সাক্ষাৎ হয় না?'

তারেক মাথা নাড়ে। 'না হায়দার ভাই, আলমরে মাঝে মাঝে ভার্সিটি এলাকার দিকে দেখি। কিন্তু সময় বাইর করে ওর সাথে বসা হয় না অনেক দিন হইছে। আপনের খবর বলেন। কেমন আছেন? চিটাগং কেমন লাগতেছে?'

'আছে, খারাপ না। বুঝোই তো। আর্মি বানানোর কাম। খালি চিল্লাচিল্লি করন লাগে নতুন রিক্রুটদের উপর।' হায়দার হাসে। 'কিন্তু ঢাকার অবস্থা এইরকম ক্যান কও তো? কেমন যেন থমথম করতেছে সবখানে...'

'শহরের অবস্থা আসলেই কেমন যেন।' তারেক সায় দেয়। 'কিছুই বোঝা যাইতেছে না। বঙ্গবন্ধু প্রথমে জরুরি অবস্থা ঘোষণা দিলেন, এরপরে কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ, বাকশাল তৈরি করলেন। তারপর থেকে ঢাকা মোটামুটি এইরকম চুপচাপ হয়া গেছে। মন বলতেছে কিছু একটা হইতেছে আড়ালে আড়ালে।'

-'বাকশালের পর বিরোধী পক্ষের কোনো মুভমেন্ট নাই? তারা এর এগেইন্সটে কিছু কইতাছে না?'

'বিরোধী পক্ষ মানে তো সেই জাসদ। সিরাজ শিকদার মারা যাওয়ার পরে সরকারের সামনে এক জাসদ ছাড়া কোনো প্রকাশ্য প্রতিপক্ষ নাই। ...বাই দা ওয়ে, সিরাজের ঘটনাটা শুনছেন না?' তারেক বলে।

সর্বহারা পার্টির প্রধান সিরাজ শিকদার গ্রামে-গঞ্জে, শহরতলিতে নানা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছিলেন যুদ্ধের পর থেকেই। গুপ্তহত্যা, থানা বা পুলিশফাঁড়ি লুট, পাটের গুদামে আগুন দিয়ে সরকারকে দীর্ঘদিন ধরে বিব্রত করে রেখেছিলেন সিরাজ শিকদার। কিন্তু তবু একটি শ্রেণির কাছে তার গ্রহণযোগ্যতা ছিল। ছদ্মবেশ ধারণে পটু সিরাজ শিকদারকে ধরতে তাই বহুদিন থেকেই প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলো পুলিশ, রক্ষীবাহিনী, সরকারি গোয়েন্দারা। নতুন বছরের প্রথম দিনেই সেই আলোচিত সিরাজ শিকদার সাদা পোশাকের পুলিশের হাতে ধরা পড়ে চট্টগ্রামে। বিমানে করে তাকে উড়িয়ে আনা হয় ঢাকার রাজারবাগের সিআইডি পুলিশের কার্যালয় হোয়াইট হলে। সবাই তখন ধারণা করেছিল, নাশকতামূলক

কর্মকাণ্ডের জন্যে বিচারের মুখে দাঁড় করানো হবে সিরাজ শিকদারকে। অথচ দুদিন পরেই পত্রিকায় খবর আসে, পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছে সিরাজ শিকদার। সিরাজ নাকি মানিকগঞ্জের দিকে তার এক হাইড আউট দেখাতে নিয়ে যাচ্ছিলেন পুলিশকে, কিন্তু পথে পালানোর চেষ্টা করেন সাভারের কাছে।

সম অধিকারের সমাজ প্রতিষ্ঠা করবেন বলে একটি কঠোর রাস্তায় নেমেছিলেন সিরাজ শিকদার। তার পথ ভুল হতে পারে, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ কেন যেন বিশ্বাস করতে চায় না সিরাজ পালানোর চেষ্টা করে গুলি খেয়েছেন। তাদের ধারণা হয় সিরাজকে মেরে ফেলা হয়েছে সচেতনভাবে।

সিরাজ শিকদার বৃত্তান্ত মনে পড়ায় খানিক আনমনা হয়ে যান হায়দার। সম্বিত ফিরে পেয়ে তিনি ফিরে আসেন তারেকের সাথে কথোপকথনে। 'হ্যাঁ, কানে আসছে সিরাজ শিকদারের কথা। তো এখন তাইলে একমাত্র জাসদই অ্যাকটিভ আছে বলতেছো?'

'হ্যাঁ, জাসদ একটু বেশিই অ্যাকটিভ হয়ে উঠছে হঠাৎ।' তারেক বলে। 'বলা ভালো, জাসদের অঙ্গ সংগঠন গণবাহিনীই আসলে অ্যাকটিভ গভমেন্টের এগেইন্সটে। দেয়ালে চিকা মারা, লিফলেট ছড়ানো; গণবাহিনীর এইরকম কাজগুলা ইদানীং বেশ চোখে লাগতেছে। দেয়ালের মাঝে আজকাল লিখা দেখি, 'সংগ্রাম মানেই এখন যুদ্ধ'। আবার সেদিন ২১ ফেব্রুয়ারিতে শহিদ মিনারেও লিফলেট ছড়ানো হইলো, 'ফ্যাসিস্ট খুনি শেখ মুজিব ধ্বংস হোক'। সব মিলায়ে ওরা এক ধরনের জঙ্গি অবস্থান নিছে বলতে পারেন। সাথে মাঝে মাঝে ছুটকা কিছু বোমা হামলা তো আছেই। কয়েক মাস আগে মনে আছে, জাসদকর্মী বুয়েটের এক টিচার যে মারাই গেল বোমা বানানোর সময় বিস্ফোরণে?'

হায়দার ভাইয়ের ভাগ্নি, মিলা নামের পিচ্চিটা এ সময় ঘরে ঢুকে পড়ে। মামার আলোচনার মাঝে বিঘ্ন ঘটিয়ে সে মনোযোগ আকর্ষণ করতে চায় অতিথি তারেকের। হায়দার ভাই তাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে আবার ফেরত পাঠান ভেতর ঘরে।

খানিক তাকিয়ে থেকে ভাগ্নির অন্তর্ধান নিশ্চিত করেন হায়দার। এরপরে বলেন, 'আচ্ছা, গণবাহিনীর কারো সাথে পরিচয় আছে নাকি তোমার? যুদ্ধের সময় আমাদের সেক্টর এগারোর যিনি কমান্ডার ছিলেন, আবু তাহের, উনিই নাকি এই গণবাহিনীর কমান্ডার ইন চিফ?'

'এইরকম একটা কথা আমারো কানে আসছে।' তারেক বলে। 'তবে এখনো পর্যন্ত কিন্তু তারে প্রকাশ্যে দেখা যায় নাই।'

'হুম, বামেরা আসলে সবসময়েই বেশ কনফিউজিং ছিল। কিন্তু শেখ মুজিব নিজেই এখন সমাজতন্ত্র নিয়ে আসতে চাচ্ছেন; ছকটা এখন আসলে বেশ পাল্টে গেছে ওদের জন্যে।' হায়দার বলেন।

'বাকশাল নিয়ে আর্মির ভেতরে কোনো রকম এক্সাইটেশন দেখলেন নাকি হায়দার ভাই?'

'ঠিক বাকশাল নিয়া না, তবে আর্মির ভেতরে কিন্তু সরকার নিয়া বেশ হতাশা আছে।' হায়দার বলেন। 'বিশেষ করে সিপাইদের। অনেকের ইনিউনিফর্ম নাই। ট্রেনিং ঠিকঠাক মতো দেয়া হয় নাই। ছিঁড়া ফাটা ইউনিফর্ম পইরা ডিউটি করতে হয়। আবার যুদ্ধের সময় অফিসার আর সিপাইরা একই সাথে যুদ্ধ করছে, কিন্তু যুদ্ধের পর প্রমোশন শুধু আমরা অফিসাররাই পাইছি। এই নিয়া হয়তো তারা ফ্রাস্ট্রেটেড, সেইটা আমি ফিল করতে পারি। আমার মনে হয়, সরকারের কাছে খুব তাড়াতাড়িই ওরা সুযোগ সুবিধা বাড়ানোর জন্যে আবেদন করবো।'

'আর্মির মাঝে ফ্রাস্টেশান নিয়া আমার ফ্রেন্ড আলাউদ্দীন সেদিন একটা কথা কইলো।' তারেক কথার পিঠে বলে। 'ও তো বিভিন্ন মিটিংয়ে যায়। ইদানীং নাকি আর্মির বেশ কিছু সুবেদার, কর্পোরাল র‍্যাঙ্কের অফিসাররেও দেখা যায় ওইসব পলিটিক্যাল সভায়। ব্যারাকে জায়গা নাই দেইখা নাকি আর্মির অনেকেই নাকি আজকাল থাকতেছে সিভিলিয়ান এলাকায়, সেই সুযোগে পলিটিক্সের সাথে তাদের ইন্টার‍্যাকশানও বাড়তেছে। একটু আগে আপনি যেটা বললেন, আলাউদ্দীনও তাই বলে। আর্মি পার্সনদের মধ্যে সরকার নিয়া অনেকে হতাশ। এদের অনেকেরই জাসদের প্রতি বেশ একটা সফট কর্নার আছে। জাসদে মেজর জলিল আছেন, আবার ইদানীং কর্নেল তাহেরের কথাও অনেকের মুখে আসতেছে। সব মিলায়ে আর্মির সাথে জাসদের একটা লিঙ্ক মতো হয়ে যাইতেছে আস্তে আস্তে।'

পর্দার আড়াল থেকে এইসময় আবার বেরিয়ে আসে ছোট্ট একটা মুখ। মতিঝিল আইডিয়ালে পড়ুয়া পিচ্চি মিলা হাত দিয়ে কী যেন ইশারা করে হায়দার মামাকে। হায়দার ভাই সেটা খেয়াল করে উঠে দাঁড়ান। 'আচ্ছা, দেশ নিয়া ম্যালা কথা হইছে। এখন চলো, খাওয়ার পাত পড়ছে। ডাকতাছে দেখো না?'

'চলেন দেখি। কী পোলাও কোর্মা খাওয়াইবেন দেখতে চাই!' তারেক রসিকতা করে।

'পোলাও কোর্মা প্রতিদিন খাওয়া হয়। আজকে খালি ছোট মাছ। ছোট মাছ দিয়া আপার হাতের রান্না খাইলে পোলাও আর খাইতে চাইবা না!' হায়দারও গম্ভীর মুখ করে রসিকতার জবাব দেন।

মাথায় বড় বড় দুশ্চিন্তা নিয়ে তারেকুল আলম ভাত খেতে বসে ছোট মাছ দিয়ে।

প্রস্তুতি কাল

দারুণ ব্যস্ত সময় কাটছে শেখ মুজিবের। নতুন করে সব কিছু শুরু করতে চাচ্ছেন তিনি, পোহাতে হচ্ছে সেই ঝক্কিটাও। বাংলাদেশের আনাচে কানাচে সফর করে বেড়াচ্ছেন হাতাকাটা কালো কোট পরা মানুষটা, তার সাথে আছেন সফরসঙ্গীরাও। খন্দকার মোশতাককে সর্বদাই দেখা যায় বঙ্গবন্ধুর আশপাশে। নানা বিষয়ে রাষ্ট্রপতিকে নিয়মিত মতামত দিয়ে যান মোশতাক। শেখ মুজিবকেও সেই মতের উপর আস্থা রাখতে দেখা যায়।

সেরকম একটা ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন রাষ্ট্রপতির স্পেশাল অফিসার মাহবুব তালুকদার। মাহবুব সাহেব ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট আবু সাঈদ চৌধুরী, পরে মোহাম্মদ উল্লাহর অধীনেও কাজ করেছেন। কিন্তু নতুন রাষ্ট্রপতির সাথে কাজ করতে এসে প্রথমদিকে নিয়ত বিস্মিত হতে হয়েছে তাকে। দাপ্তরিক কানুনের তোয়াক্কা না করে রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিব নিজেই দাঁড় করিয়েছেন নিজের প্রটোকল। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ দায়িত্বে থাকা গম্ভীর কোনো কেষ্টবিষ্টু নন, শেখ মুজিব বরং এক স্নেহশীল জনক। ধমক দিয়ে, বকুনি দিয়ে অথবা মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করেই রাষ্ট্রীয় কাজ পরিচালনা করে যান মানুষটি।

কক্সবাজার সফরে গিয়ে রাষ্ট্রপতির সাথে পর্যটনের রেস্ট হাউজে ওঠেন মাহবুব সাহেব। তার রুমমেট হন জাপানের খ্যাতনামা আশাহি সিম্বুন পত্রিকার এক সাংবাদিক। তিনি এসেছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একটি বিশেষ সাক্ষাৎকার নিতে।

এদিকে অন্য কোনো ব্যাপার নিয়ে শেখ মুজিবের সাথে মতান্তর ঘটে দুজন মন্ত্রীর। শেখ মুজিব মানতে চান না মন্ত্রীদ্বয়ের অভিমত। বরং সামনে থাকা মাহবুব সাহেবকে বলেন, 'মোশতাক কই? অরে ডাক দ্যাও।' তারপর মন্ত্রীদের দিকে ফিরে বলেন, 'তোমাগো কথা আমি মানি না। এই বিষয়ে মোশতাক যেইটা কয়, ওইডাই হইবো।'

মাহবুব সাহেব খন্দকার মোশতাককে ডেকে নিয়ে আসেন বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে। মোশতাক কী পরামর্শ দেন, সেটা অবশ্য শোনা হয় না তার। তিনি শুধু বুঝতে পারেন, দিনে দিনে খন্দকার মোশতাক প্রভাবিত করছেন শেখ মুজিবকে।

কক্সবাজারে আর তেমন কিছু ঘটে না। বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির সাক্ষাৎকার নিয়ে ফিরে যান জাপানি সাংবাদিকটি। যাবার আগে বলে যান, জাপানিদের মাঝে অত্যন্ত জনপ্রিয় শেখ মুজিবুর রহমান। সেখানে লোকে খুব শ্রদ্ধা করে এই মানুষটিকে।

কক্সবাজার থেকে শেখ মুজিব যান রাঙ্গামাটিতে, এক দিনের সফরে। কাজ সেরে সবাই বেড়াতে যান লেকের পাড়ে। সেখানে হঠাৎ করেই সবাইকে চমকে দিয়ে একটা স্পিডবোটে উঠে পড়েন শেখ মুজিব। একজন মাত্র সিকিউরিটি

অফিসার নিয়ে সেই স্পিডবোট দেখতে না দেখতে চলে যায় দৃষ্টিসীমার বাইরে। প্রেসিডেন্টের সরফরসঙ্গীরা, বিশেষত তার নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত অফিসারেরা, কী করবেন এই ভাবনায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন। তাদের মিনিট দশেক উদ্বেগে রেখে ফিরে আসেন শেখ মুজিব। হাসতে হাসতে বলেন, 'তোমরা কেউ আমারে ধরবার পারলা না!'

সবার ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থেকে এভাবেই ঝুঁকি নিয়ে সবসময় এগিয়ে থাকতে চেয়েছেন শেখ মুজিব।

দ্বিতীয় বিপ্লব করতে হলে হাতের সবগুলো তাস ঠিকঠাক রাখা দরকার। শেখ মুজিব তাই মাস খানেক পরে রওয়ানা দেন মওলানা ভাসানীর টাঙ্গাইলের দিকে।

টাঙ্গাইল যাওয়া হলো সড়কপথে। ঢাকা থেকে ৬০ মাইল রাস্তা যেতে সময় লেগে গেল ছয় ঘণ্টা। পথের দুইধারে, গাছের ডালে, বাড়ির ছাদে পর্যন্ত ভিড় করে আছে মানুষ শেখ মুজিবকে দেখবে বলে। এক জায়গায় টিনের চালে আশ্রয় নিয়েছিল শতাধিক লোক, বঙ্গবন্ধু পাশ দিয়ে যাবার সময় আগ্রহের আতিশয্যে অনেকে উঠে দাঁড়াতে সে ঘরের চালাই ভেঙে পড়ল! ভাগ্যই বলতে হবে, কেউ আহত হলো না।

রাস্তায় খানিক পর পর তৈরি হয়ে গেল স্বতঃস্ফূর্ত জনসভা। শেখ মুজিব নিজেই বক্তৃতা দিলেন সেসব জায়গায়। তার ভাষণ শুনে শ্রোতারা স্লোগান দেয় 'এক নেতা এক দেশ, বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ!' শেখ মুজিব মিটিমিটি হাসেন। দ্বিতীয় বিপ্লব সফল করা নিয়ে তার প্রত্যাশা আরেকটু বেড়ে যায়।

টাঙ্গাইল পৌঁছে বঙ্গবন্ধু বুকে জড়িয়ে ধরেন মওলানা ভাসানীকে। ক্যামেরাম্যানদের ফ্ল্যাশ ঝিলিক দিয়ে ওঠে তখন। যারা সেই মুহূর্তটি বন্দী করতে পারেননি, তাদের মাঝে দুয়েকজন বলেন, 'স্যার, আরেকবার হুজুরের বুকে মাথা দেন প্লিজ!'

শেখ মুজিব মুহূর্তে ছোট ছেলের মতোন আবার মাথা গুঁজেন ভাসানী মওলানার বুকে। বলেন, 'আমি তো হুজুরের বুকের মধ্যেই আছি!'

মওলানার চোখে আনন্দাশ্রু। তিনি কাঁদতে কাঁদতে বলেন, 'মুজিব আমার পোলা! অয় যে আমার কত প্রিয়, সেইটা তোমরা বুঝবার পারবা না!'

মুক্তিযুদ্ধের সময় পথ না ভোলা এই বুড়োটির দেশপ্রেম নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই। বোধ আর ব্যক্তকরণ ক্ষমতাও বড্ড শক্তিশালী মানুষটির। কিন্তু স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে চরম ডানপন্থি আর পিকিংমুখী বামপন্থিদের স্রোতে দুই বিপরীত দিকে দোলায়মান মওলানার কম্পাসের কাঁটা। আজকাল তাই চরম ডান আর চরম বামের এক বিপজ্জনক মিশ্রণ হয়ে উঠেছেন মওলানা। একই সাথে এ যেন কঠোর বাস্তব আর অপ্রাকৃতের সহাবস্থান। এহেন মওলানা ভাসানীর আশীর্বাদে শেখ

মুজিব তাই হয়তো কিছুটা স্বস্তি পান। সেই স্বস্তি নিয়েই তিনি ফিরে আসেন ঢাকায়।

গণভবনে আজকাল প্রায়ই ভিড় জমায় মানুষ। দেশের নানা জায়গা থেকে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা আসে। বিভিন্ন গণ্যমান্য ব্যক্তিরা আসে, আসেন ব্যবসায়ীরা। অনেকের হাতেই থাকে ফুলের তোড়া। বাকশাল নিয়ে শেখ মুজিবকে অভিনন্দন জানাতে আসে তারা।

এরকম একটা ছোট দলের সাথে আলাউদ্দীনও একদিন যায় গণভবনে। চিন্তা ভাবনা করে কদিন আগে আলাউদ্দীনও মনস্থির করে ফেলেছে। সে বাকশালেই যোগ দেবে। বিবর্তনের পথ ধরে কায়েম হওয়া সহজাত সমাজতন্ত্রের চাইতে এই আরোপিত সমাজতন্ত্র অনেক বেশি ঝুঁকিপূর্ণ, তা আলাউদ্দীন জানে। কিন্তু তবু শেখ মুজিবের পেছনে আরো একবার দাঁড়াতে চায় সে। খাদের কিনারায় চলে যাওয়া বাংলাদেশকে বাঁচাতে শেখ মুজিবের চেয়ে শক্তিশালী কোনো টোট্রাক নেই, এটা খুব ভালোই জানা আছে রাজনীতিমনস্ক আলাউদ্দীনের।

বঙ্গবন্ধু এবারও আলাউদ্দীনকে দেখেই চিনে ফেলেন। 'কী রে আলাউদ্দীন, তুই কেমন আছস?'

আলাউদ্দীন এবার আর অবাক হয় না। মাথা চুলকে বলে, 'ভালো আছি স্যার। এতদিন কোনো দলে যোগ দেই নাই। কিন্তু এইবার ঠিক করছি স্যার আপনার বাকশালে যোগ দিবো। ভালো খারাপ যাই হোক, আপনার সাথেই থাকতে চাই স্যার।'

'গুড, ভেরি গুড!' শেখ মুজিব ছেলে মানুষের মতন খুশি হয়ে ওঠেন। এরপর ব্যস্ত হয়ে ওঠেন অন্য দর্শনার্থীদের সাথে আলোচনায়। খানিক আলাপচারিতার পরে তিনি হঠাৎ উঠে দাঁড়ান। চলে যান ঘরের দেয়ালে ঝুলতে থাকা বিশাল মানচিত্রটির দিকে। বলেন, 'তোমরা কইতে পারো, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সমস্যা কী? ... সবচেয়ে বড় সমস্যা হইলো আমাদের জনসংখ্যা। দুনিয়ায় যে-ই জাতি যত ভালোভাবে নিজেদের জনসংখ্যা কন্ট্রোল করতে পারছে, তারা তত বেশি উন্নত।'

শেখ মুজিব একটা লম্বা লাঠি নিয়ে বলেন, 'আসো, তোমাগো পড়াই।'

এই বলে শেখ মুজিব লাঠি দিয়ে নির্দেশ করতে থাকেন মানচিত্রের এক একটি দেশের দিকে। সাথে সাথে মুখস্থ বলে যেতে থাকেন সেই দেশের জনসংখ্যা আর মাথাপিছু আয়! আলাউদ্দীনসহ সবাই হতবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে এই অদ্ভুত মানুষটির দিকে।

হাসতে হাসতে শেখ মুজিব বলেন, 'আমি মাস্টার হইলে ভালো করতাম বুঝলা!'

অদ্ভুত এই স্মৃতিশক্তি আর জনসম্মোহনী ব্যক্তিত্ব সম্বল করেই বাকশালের দিকে একটু একটু করে এগিয়ে যান শেখ মুজিব। একটু একটু করে প্রস্তুত হতে থাকেন তার দ্বিতীয় বিপ্লবের জন্যে।

৭৫১, সাতমসজিদ রোড

সপ্তাহ কয়েক হলো আম্মা একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছে। আম্মা নাকি দেখেছে, আব্বু আকাশ থেকে দড়ি ধরে ধীরে ধীরে নিচে নামছে। নিচে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে বহু মানুষ, তারা অপেক্ষা করছে আব্বুর জন্যে। আব্বু নামবে, আর মানুষ তাকে বরণ করবে, এমনটাই বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু আব্বু মাটিতে পা রাখার পরের মুহূর্তে যখনই সমবেত মানুষেরা উল্লাস করতে যাচ্ছে, তখনই হঠাৎ কে যেন তাকে টান মেরে নিয়ে গেল আকাশেই। মেঘের ভেতর থেকে আব্বু আর ফিরে আসল না।

এই স্বপ্ন দেখার পর থেকেই আম্মা খুব ভয়ে ভয়ে আছে। তার ধারণা হয়েছে আব্বু আর বেশি দিন বাঁচবে না। স্বপ্নের অর্থ বের করার জন্যে তাই আম্মা অনেকের কাছেই ফোন করছে। চেষ্টা করছে সোলেমানি খাবনামাটা খুঁজে বের করতে। কিন্তু বাসা বদলানোর ফাঁকে সেই মলাট ছেঁড়া বইটা কোনদিকে উড়ে গেছে, কে জানে! রিমি নিজেও বাড়ি বদলানোর সময়টায় তার অনেক প্রিয় বই হারিয়ে ফেলেছে।

৭৫১, সাতমসজিদ রোডের এই বাড়িটা আব্বু বানিয়েছিল রিমি আর সোহেলের জন্মের আগেই। ধানমণ্ডি এলাকা যখন একেবারে বিরান, আব্বু তখনই কাঠা দশেক জমি কিনে রেখেছিলেন এদিকে। এরপর লোন নিয়ে দোতলা এই বাড়িটা করেছিলেন। আম্মা প্রথমে আপত্তি করেছিল, দোতলা করার কী দরকার এই বলে, কিন্তু পরে আব্বু যখন জেলে গেল -তখন আবার এই বাড়ির দোতলা ভাড়া দিয়েই চলতে হয়েছে আম্মাকে।

হেয়ার রোডের সরকারি বাড়িটা রিমিরা ছেড়ে এসেছে নভেম্বরের শেষেই। সেই বাড়ি ছেড়ে আসার আগে আব্বু একদম নিজ হাতে ধরে ধরে লিস্টি করেছেন সরকারি আসবাবপত্রের। সোফা, খাট, খাবার টেবিল। এর মাঝে আবার ধানমণ্ডির ভাড়াটেদের, মানে যারা সাত মসজিদ রোডের এই বাড়িতে থাকত, তাদেরও নোটিশ দেয়া হলো। ভাড়াটেরা নোটিশ পেয়ে বাড়ি ছাড়ার পর থেকে এদিকেও শুরু হলো মিস্ত্রিদের টুকটাক মেরামত।

আব্বু তখন একসাথে কাজ সামলেছেন দুদিকেরই। এদিকে সরকারি বাসায় জিনিসপত্র গোছানো, বাঁধা, প্যাক করার কাজ, ওদিকে প্রতি সন্ধ্যায় নিজের বাড়িতে কিছু কিছু জিনিস নিয়ে যাওয়া। একদিন হয়তো রিমিকে সাথে নিয়ে আলমিরা নেনে, আরেকদিন রিপিকে সঙ্গে করে বয়ে আনেন কাচের যত শোপিস।

সাথে মেরামত বা রং করা তো সমান তালেই চলেছে। পদত্যাগের পর বিভিন্ন জায়গা থেকে আব্বু উড়ো হুমকি পাচ্ছিলেন, নিরাপত্তার খাতিরে সিঁড়িতে তাই বসানো হলো গ্রিল। যেদিন দোতলার দরজার বাইরে আরেকটা লোহার দরজা বসানো হলো, সেদিন আব্বুর মুখের যে কী হতাশ ভাব, 'স্বাধীন দেশে আমায় এরকম হুমকি পেতে হবে, এটা কখনো ভাবি নাই রে মা!'

এই বাড়িতে আসার পরের কিছুদিনও কেটেছে খুব মজায়। ড্রয়িংরুমে রাখা নতুন টেলিফোন সেটটা যেন নতুন ধরনের খেলনার মতো ছিল ওদের ভাইবোনের কাছে। আবার টেবিল ফিট করা হয়নি বলে খাওয়ার সময় প্রথম কিছুদিন প্লেট হাতে করে খেয়েছে রিমি-রিপিরা। টিভি দেখতে দেখতে মাটিতে বসে ওভাবে খাওয়া দাওয়া করাটা একদম পিকনিকের মতোই লেগেছে ওদের।

সে থেকেই আব্বুকে একদম নতুন করে আবিষ্কার করছে ওরা সব ভাইবোন।

জ্ঞান হবার পর থেকে আব্বুকে কাছে পেয়েছে ওরা খুব কমই। অন্য ছেলেমেয়েরা স্কুলে যখন গল্প করেছে বাবার সাথে ছুটির দিনে বেড়াতে যাওয়া নিয়ে, ওদের আব্বু তখন হয়তো জেলে কিংবা রাজপথের মিছিলে। অথবা হয়তো ব্যস্ত রাত জেগে ফাইল দেখায়, অর্থনীতির রিপোর্ট প্রস্তুত করায়। আব্বু কিন্তু এখনো ব্যস্ত, তবে সেটা একদম অন্যভাবে। আব্বু এখন সময় কাটান বাগান করে, মোটা সুঁই-সুতা দিয়ে ওদের জন্যে রাফ খাতা বানিয়ে। মিমি আর সোহেলকে নিয়ে বিকালে বেড়াতে নিয়ে যান হাত ধরে।

মিমি-সোহেলও যেন আব্বুকে কাছে পেয়ে শৈশবের সবচেয়ে আনন্দের সময়টা কাটাচ্ছে। এই বাসায় আসার পরে একদিন খুব মজার কাণ্ড করেছে মিমি, রিমির একেবারে চোখে ভাসে সেটা।

মিমি তখন মাত্র লসাগু-গসাগুর অঙ্ক শিখেছে। নতুন বাসার ধবধবে সাদা দেয়াল পেয়ে সেটাকেই মিমি বানিয়ে ফেলল তার অঙ্কের খাতা। দেয়ালজুড়ে এধার থেকে ওধার পর্যন্ত লসাগু কষে গেল সে। মিমির এই গাণিতিক প্রতিভা অবশ্য আম্মাকে খুব খুশি করতে পারল না। আম্মা মিমির কানটা মলে দিয়ে বলল, 'দাঁড়াও, আব্বুকে বলে মজা দেখাচ্ছি তোমায়।'

আব্বু এলেন সরেজমিনে পরিস্থিতি বিচার করতে। কিন্তু দেয়াল জুড়ে মিমির লেখা দেখে রাগ করার বদলে উলটো আব্বু বললেন, 'বাহ! দেখো লিলি, তোমার মেয়ের হাতের লেখা কী সুন্দর!...'

নিচ থেকে শব্দ পেয়ে রিমি গেটের দিকে তাকায়। সিস্টার মেরি ইমেল্ডা বেরিয়ে যাচ্ছেন। উনি সোহেলের স্কুলের হেড মিস্ট্রেস। ওহ, বলাই তো হয়নি সোহেল যে গ্রিন হেরাল্ড স্কুলে ভর্তি হয়েছে, সেই স্কুল কর্তৃপক্ষই ওদের বাড়ির একতলাটা ভাড়া নিয়েছে। নিচতলাটা এখন স্কুল কর্তৃপক্ষ ওদের অফিসের

নানা কাজে ব্যবহার করে। শুধু সামনের দিকের একটা ঘর আব্বু রেখে দিয়েছেন নিজের পড়ালেখার জন্যে, ব্যক্তিগত বইপত্রও আব্বু ওঘরেই রাখে।

আজকে সাপ্তাহিক বন্ধ, সিস্টার মেরি তবু কেন অফিসে এসেছিলেন কে জানে! রিমির নিজেরও আজ স্কুল বন্ধ।

ক্লাস এইটের রিমি আর ক্লাস ফাইভের মিমি, দুজনকেই এখন বেইলি রোডের ভিকারুন্নিসা স্কুলে ছুটতে হয় সকালে। রিপিটা এবার ম্যাট্রিক দিচ্ছে বলে বাসাতেই জোর পড়াশোনা করছে। প্রথম কিছুদিন ওরা স্কুলে গিয়েছে আব্বুর এক বন্ধুর গাড়িতে, তার মেয়েদের সাথে। এরপর রিমিরা নিজেদের গাড়ি পেল। মানে আব্বু তার এক বন্ধুর মাধ্যমে খুব সস্তায় একটা সবুজ ভক্সওয়াগন পেয়ে গেলেন।

সেই গাড়ি নিয়েও কত কাণ্ড, রিমি ভাবে। বাসায় আসতে না আসতেই গ্যারেজের তালা ভেঙে গাড়ির সামনের আর পেছনের কাচ চুরি হয়ে গেল। মাটিতে চোরের পায়ের ছাপ ছিল ঠিকই, কিন্তু রিমির মতো গোয়েন্দাকাহিনি গুলে খাওয়া পাঠিকাও সেই পায়ের ছাপ থেকে চোর ধরতে পারল না! কাচ ছাড়া গাড়ি নিয়েই তাই ঘোরা হলো কয়েকদিন। সে কী বাতাস ঐ গাড়িতে চড়তে! অল্প কদিন পরেই অবশ্য শক্ত আর স্বচ্ছ একরকম মোটা প্লাস্টিক লাগিয়ে নেয়া হলো গাড়িতে।

...ধ্যাত! রিমির আজকে একটুও মন বসছে না পড়ায়। পড়ার টেবিলে বসে সে কীসব আবোল তাবোল ভাবছে দেখো! এমনিতেই আজ ছুটির দিন, তার ওপর রিমির সামনে টোপ হয়ে ঝুলে আছেন শরৎচন্দ্র!

মানে মাত্রই আট খণ্ডের যে শরৎ রচনাবলি বেরিয়েছে, সেটার একটা খণ্ড রিমি স্কুলের এক বান্ধবীর থেকে নিয়ে এসেছে। আজকের মধ্যেই পড়ে শেষ করতে হবে ওটা, রিমি আগামীকাল সেটা ফেরত দেবে বলে কথা দিয়ে এসেছে।

রিমি পড়ার টেবিল ছেড়ে দরজার কাছে গিয়ে এদিক-সেদিক উঁকি মেরে দেখে। মিমি আর সোহেল টিভির সামনে বসে আছে। প্রতি রোববারে Anna & the king বলে যে সিরিয়ালটা দেখায়, ওরা সেটাই দেখছে। আব্বু পাশেই ইজি চেয়ারে বসে আছেন। চোখ বোলাচ্ছেন হাতের বইতে। পরিস্থিতি বিচার করে রিমি তাই শরৎচন্দ্র নিয়ে বসে পড়ে!

তবে পরের দিন গাড়িতে বসে স্কুলে যাবার সময়েও রিমিকে সেই বই নিয়েই ব্যস্ত থাকতে দেখা যায়। সময় মতো শরৎচন্দ্র শেষ করতে পারেনি সে, অতএব গাড়িতেই তাড়াহুড়ো করে পড়া চলতে থাকে। আব্বু গাড়িতে আছে, সাথে মফিজ কাকুও। কাকুর শরীরটা খুব খারাপ আজকাল। তাকে নিয়ে প্রায়ই সেগুনবাগিচায় ডাক্তারের কাছে যান আব্বু। বই নিয়ে চলন্ত গাড়িতেই রিমির পাতা ওলটানো চোখে পড়ে তাজউদ্দীনের।

রিমি যখন গাড়ি থেকে নামছে, আব্বু জিজ্ঞাসা করেন, 'কী বই রে এটা?'

লজ্জিত একটু হেসে রিমি বলে, 'শরৎ রচনাবলি আব্বু।'

আব্বুর মুখে কোনো ভাব দেখা যায় না। শুধু বলেন, 'এইভাবে বই পড়ে কি কিছু বোঝা যায়!'

... ছুটির পরে জুনিয়র সেকশনের গেট থেকে মিমিকে উদ্ধার করে রিমি যখন বাইরে বেরোয়, অবাক হয়ে হয়ে সে দেখে, একা শুধু ড্রাইভার কাকুই নন, আব্বুও আজকে এসেছেন ওদের বাসায় নিয়ে যেতে। রিমি গাড়িতে উঠে বসতেই ঘর্মাক্ত মুখের আব্বু একটা মোটা প্যাকেট এগিয়ে দেন ওর দিকে।

আব্বুর মুখে তৃপ্তির হাসি। বলেন, 'এই নাও, তোমার শরৎচন্দ্র। পুরো আট খণ্ডের সেট আছে এখানে।'

রিমি অবাক হয়ে আব্বুর দিকে তাকায়।

সেই ছয় দফার সময় যখন আব্বুকে আটক করে জেলে রাখা হয়েছিল, সে সময় কারাগার থেকে পাঠানো একটা চিঠিতে আব্বু কোনো এক পত্রিকা থেকে কেটে নেয়া একটা বিস্কুটের বিজ্ঞাপন জুড়ে দিয়েছিলেন। চিঠিতে লিখেছিলেন, বিজ্ঞাপনের ছোট মেয়েটা অনেকটা রিমির মতো দেখতে, তাই কেটে পাঠালাম! সেই চিঠি পড়ে ছোটবেলায় ভীষণ আলোড়িত হয়েছিল রিমি।

আগে পরে টুকটাক আরো কিছু উপহার সে পেয়েছে আব্বুর কাছ থেকে, কিন্তু আব্বু তাকে কতটা ভালোবাসে রিমির কাছে সে বিষয়ে সবসময় প্রামাণ্য হয়ে থেকেছে আব্বুর ঐ চিঠিটাই।

আজকের এই আচমকা শরৎ রচনাবলি পেয়ে যাওয়া মুহূর্তে রিমি কোনো কথাই বলতে পারল না। চিরদিন দূরে দূরে থেকে যাওয়া কর্মব্যস্ত বাবার এই নতুন ঘরোয়া রূপে, সে জানে না কেন, রিমির দুই চোখ দিয়ে হঠাৎ জল বেরিয়ে আসে বরং।

কোণঠাসা কিস্তি

একাত্তরের আগুন ধরানো মার্চে বাংলাদেশের মানুষের আবেগকে তর্জনি দিয়ে একটি অবিশ্বাস্য উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিলেন শেখ মুজিব। এমনকি ভবিষ্যতের গর্ভেও মুজিবের সেই অভূতপূর্ব উচ্চারণটি নিয়ে রচিত হবে কাব্যগাঁথা। আকতার আহমেদরা লিখবেন–

'একটি বিকেল একটি মঞ্চ একটি বিশাল মাঠ
একটি আঙুল একটি স্বপ্ন একটি কবিতা পাঠ...'

এবারো সেই একই ময়দান, মঞ্চে সেই একই মানুষ। সেই মার্চ, সেই একই রকম জনতার ঢল। মাঝখানে শুধু পেরিয়ে গেছে চারটা বছর। উড়ে গেছে স্বপ্নে ভরা বহু গ্যাস বেলুন, অপ্রাপ্তি আর বঞ্চনার মাঞ্জায় কেটে যাওয়া প্রাপ্তির ঘুড়ি

ভোকাট্টা হয়ে ঘুরছে শূন্যে। তবুও রেসকোর্স থেকে পালটে যাওয়া সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে চলে এসেছে বেশুমার মানুষ। স্বাধীনতা দিবসে রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিব ভাষণ দেবেন আজ, হয়তো তিনি ব্যাখ্যা করবেন তার দ্বিতীয় বিপ্লবকে। খানিক যেন ফিকে হয়ে গেছে মানুষের স্বপ্ন, তবুও তারা আশা নিয়ে অপেক্ষা করে মুজিব মিরাকলের জন্যে।

চার বছরের বিগত মার্চের মতো আগুন ঝরে না এবার শেখ মুজিবের গলায়। বরং তার কণ্ঠে মিশে থাকে কিছু হতাশা, কিছু অপরাধবোধ। *'...ভায়েরা-বোনেরা আমার, আমরা চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু একটা ওয়াদা আমি রাখতে পারি নাই। জীবনে যে ওয়াদা আমি করেছি, জীবন দিয়ে হলেও সে ওয়াদা আমি পালন করেছি। ...আমি ওয়াদা করেছিলাম তাদের বিচার করবো। এই ওয়াদা আপনাদের পক্ষ থেকে খেলাফ করেছি, তাদের আমি বিচার করি নাই। আমি ছেড়ে দিয়েছি এই জন্যে যে, এশিয়ায়-দুনিয়ায়, আমি বন্ধুত্ব চেয়েছিলাম। দুঃখের বিষয়, পাকিস্তানিরা আমার সম্পদ এক পয়সাও দিল না, আমার বৈদেশিক মুদ্রার কোনো অংশ আমাকে দিল না। আমার গোল্ড রিজার্ভের কোনো অংশ আমাকে দিল না।...'*

তারেকুল আলম নীরব হয়ে যাওয়া বিকেলে শুনতে থাকে শেখ মুজিবের ভাষণ, আর গলার কাছে কিছু একটা উঠে আসতে চায় তার। তার রুমীর কথা মনে পড়ে, বদি-আজাদ-জুয়েলের কথা মনে পড়ে। স্মরণ হয় মুনীর চৌধুরী, শহীদুল্লাহ কায়সারদের কথা। এত সব স্বর্ণ সন্তানদের সরিয়ে দিয়েও পৃথিবীর বাতাস দূষিত করে যাওয়া ঐ পশুদের কথা ভেবে ফুঁসতে থাকে সে। কিন্তু শেখ মুজিবের অক্ষমতা তার অনুধাবনের বাইরে থাকে না।

ওদিকে শেখ মুজিব বলে চলেন। নিন্দুক আর স্বাধীনতা বিরোধীদের ব্যারিকেড তিনি উড়িয়ে দিতে চান আঙুল দোলায়ে। মনে করিয়ে দেন তার অপরিহার্যতার কথা। *'...শুধু কাগজ নিয়ে আমরা সাড়ে সাত কোটি লোকের সরকার শুরু করলাম। ...যারা শুধু কথা বলেন, তারা বুকে হাত দিয়ে চিন্তা করে বলুন আমরা কী করেছি। এক কোটি লোককে বাড়িঘর দিয়েছি। রাষ্ট্রের লোককে খাওয়ানোর জন্যে বিদেশ থেকে খাবার আনতে হয়েছে। পোর্টগুলোকে অচল থেকে সচল করতে হয়েছে। দুনিয়ার বিভিন্ন জায়গা থেকে ২২ কোটি মণ খাবার এনে বাংলার মানুষকে বাঁচাতে হয়েছে।...'*

শুধু স্বাধীনতা আনলেই সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে, এই স্বপ্ন ভেঙে গেছে আবদুল বাতেনের। কিন্তু বহু রাজনীতি বোদ্ধা, পরিসংখ্যানবোদ্ধা আর অর্থনীতিবোদ্ধা মানুষের মতো শেখ সাহেবকে অকর্মণ্য মনে হয় না তার। জীবনের কিছুই পাল্টায়নি তার, হয়তো বদলাবেও না, কিন্তু শূন্য থেকে রাতারাতি

অভাবহীন হয়ে যাবার দিবাস্বপ্ন বাতেন দেখে না। সে বোঝে, আরো সময় দরকার।

এক জীবনে সার্থক হবার মতো বহু কীর্তি আছে শেখ মুজিবের, কিন্তু সব পেয়ে হারানোর যে ব্যর্থতা সেটার সম্ভাবনাকে যেন পাশ কাটাতে পারেননি তিনি। তাই আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টাও দেখা যায় তার বক্তৃতায়। '*... কেন সিস্টেম পরিবর্তন করলাম? সিস্টেম পরিবর্তন করেছি দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর জন্যে। সিস্টেম পরিবর্তন করেছি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্যে। ...যে আঘাত করেছিলাম পাকিস্তানিদের, সে আঘাত করতে চাই ঘুণে ধরা এই সমাজ ব্যবস্থাকে। আমি আপনাদের সমর্থন চাই।...*'

হাত তুলে আলাউদ্দীনের মতো অনেকেই সমর্থন দেয় শেখ মুজিবকে। তবে অনেকে আবার যেন ঠিক সন্তুষ্ট হতে পারে না। শেখ মুজিব ছাড়া কোনো বিকল্প নেই বাংলাদেশের, এ কথা সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করেন যারা, তাদের অনেকেও ঠিক আস্থা রাখতে পারেন না বাকশালে। আবু জাফর শামসুদ্দীন তেমনই একজন।

সোহরাওয়ার্দী উদ্যান থেকে আট আনার বাদাম কিনে অন্যমনস্কভাবে বাড়ির পথ ধরেন শামসুদ্দীন সাহেব। তার বৃহদাকার উপন্যাস পদ্মা মেঘনা যমুনা প্রকাশিত হয়েছে অল্প কদিন আগে। দীর্ঘদিন তিনি ব্যস্ত ছিলেন সেটা নিয়ে। এখন হাত পা ঝাড়া, সময় কাটাতেই তিনি এসেছিলেন শেখ মুজিবের ভাষণ শুনতে।

মুক্তিযুদ্ধের পর সময় যেন কেবল ছুটেই গেছে পাগলা ঘোড়ার গতিতে। শামসুদ্দীন সাহেবের বয়স হয়েছে, সেই নিয়ত বদলে যাওয়া স্রোতে গা ভাসানো হয়নি তার। মুক্তিযুদ্ধের মতো সংকটের সময় জাতির জীবনে আসে কেবল একবারই। সময়ের প্রয়োজনে তখন তাই কলম ধরেছিলেন আত্মস্মৃতি লিপিবদ্ধ করবেন বলে, ভবিষ্যতের জন্যে লিখে গেছেন সত্যভাষণ। কিন্তু এরপরে নীরব হয়ে গেছেন তিনি। তার মনে হয়, রাজনীতির গতি নিয়ন্ত্রণ করা তার মতো ফুরিয়ে যাওয়া মানুষের জন্যে নয়। দেশকে এগিয়ে নেবে তরুণেরা। শেখ মুজিবে অপার আস্থা আছে তার, কিন্তু বাকশালে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ দিয়ে রাজনীতিমনস্কতার প্রমাণ রাখতে আর ইচ্ছে করে না এই বয়েসে। চলমান সময়ের এই গল্পে তাই, আবু জাফর শামসুদ্দীনকে আর দেখা যাবে না হয়তো।

তবে এই চলমান গল্পে হঠাৎ জড়তার আবরণে ঢেকে যাওয়া মানুষটি তাজউদ্দীন কিন্তু যোগ দিলেন বাকশালে, রইলেন সাধারণ সদস্য হিসেবে। বাকশালে যোগ না দিলে যে ত্যাগ করতে হয় আওয়ামী লীগকেই। সেই আওয়ামী লীগ, দুই যুগ ধরে যার সাথে এক রাস্তায় হেঁটে গেছেন তাজউদ্দীন, যার ব্যানারের ছায়ায় তিনি ফাইল হাতে প্রচার করেছেন ছয় দফার স্বপ্ন; সেই আওয়ামী লীগ তিনি ছেড়ে যান কীভাবে!

তাজউদ্দীন তাই বাগানে নিড়ানি দেন, শারীরিক শ্রমে হয়তো গেঁথে ফেলতে চান বিক্ষিপ্ত মনটাকে। পরিবারের সাথে সময় কাটান, খাবার টেবিলে কথা বলেন ধর্ম দর্শন সাহিত্য নিয়ে। মেয়েদের সাথে আলোচনা করেন নাসির আহমেদের লেবু মামার সপ্তকাণ্ড বা সাজেদুল করিমের চিংড়ি ফড়িঙের জন্মদিনে বই নিয়ে। এসবের ফাঁকে মাঝে মাঝে আশা প্রকাশ করেন, হয়তো সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে অচিরে।

কিন্তু ধীরে ধীরে মনে হয় হতাশা গ্রাস করতে শুরু করে মানুষটিকে। খুব চাপা স্বভাবের মানুষ তিনি, তবু আজকাল প্রায়ই কাছের মানুষদের বলে বেড়ান তার যত আক্ষেপ। রিমিদের বলেন, 'মা রে, আমি স্লো বিল্ডার। ধীর নির্মাতা। ...তাজউদ্দীন ক্ষণিকের হাততালি আর বাহবার জন্যে রাজনীতি করে নাই রে মা। আজকে থেকে পঞ্চাশ বা একশো বছর পরেও যদি দেশের মানুষ বোঝে তাজউদ্দীন শুধু দেশের জন্যেই কাজ করছে, মানুষের ভালোর জন্যেই কাজ করছে; আমার সার্থকতা ওইখানেই।'

চিরদিনের কর্মব্যস্ত মানুষটি এই হঠাৎ অবসরের সাথে মানাতে পারেন না কিছুতেই। তাজউদ্দীনের চিন্তায় শুধু দেশ। একদিন তাই শুরু করেন ডায়েরি লেখার কাজ। সেই ডায়েরিতে তাজউদ্দীন তুলে ধরতে থাকেন মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, তার ইচ্ছা একদিন এই ইতিহাস তিনি পৌঁছে দেবেন বাংলাদেশকে নিয়ে স্বপ্ন দেখা তরুণদের সামনে। সেইসব তরুণদের জন্যে দিক-নির্দেশনাও থাকে ওই কালো বর্ডার দেয়া লাল রঙা ডায়েরিতে। সেই ডায়েরি লিখতে লিখতে তাজউদ্দীন বলেন, 'লিলি, একজন মানুষ জীবনে একটাই বড় কাজ করতে পারে। আমার জন্যে সেরকম একটা কাজ ছিল মুক্তিযুদ্ধের হাল ধরা। আল্লায় দিলে সেই কাজে আমি সফল হইছি। এখন মৃত্যু হইলেও আমার কোনো আক্ষেপ নাই, কিছু পাওয়ার নাই। এখন যতদিন বাঁচি পুরোটাই বাড়তি পাওনা।'

মানুষটার এসব কথায় জোহরা তাজউদ্দীনের কেমন যেন লাগে। উনি মৃদু ধমক দিয়ে যান। 'চুপ করো তো! এইসব কী কুফা কথা বলো!'

তাজউদ্দীন কেবল হাসেন। বাড়তি কিছু পাবার আশা জীবনে আর নেই তার, কিন্তু তবুও ১৭ এপ্রিলের দিনটাতে একটু বেশিই যেন বিচলিত হন তিনি। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শপথ অনুষ্ঠানের চতুর্থ বার্ষিকী সেদিন, কিন্তু আমন্ত্রণ তো দূর, সে অনুষ্ঠানের খবরতক কেউ জানায় না তাজউদ্দীনকে। প্রবাসী সরকারের মন্ত্রিসভার বাকি সদস্যেরা মেহেরপুরে চলে যান তাজউদ্দীনকে ছাড়াই। এমনকি খন্দকার মোশতাকও যান। সেই খন্দকার মোশতাক, যিনি পছন্দের দপ্তর পাওয়ার আগে যোগ দিতে চাননি মুজিবনগরের মন্ত্রিসভায়।

হয়তো ইতিহাসের এই অবাক প্রতিদানটাই ব্যথিত করে তাজউদ্দীনকে। তাজউদ্দীন সেদিন তাই খুব বিষণ্ন হয়ে পড়েন। জানালার পাশে দাঁড়িয়ে সেই

দুপুরে আচমকা জোহরাকে এক অদ্ভুত কথা শোনান তিনি। 'লিলি, তুমি মনে হয় শ্রীমাভো বন্দরনায়েকে হয়ে যাবা!'

কথাটি বলেই তাজউদ্দীন রাস্তায় বেরিয়ে যান সেকেন্ডহ্যান্ড ভক্সওয়াগনটি নিয়ে। ওদিকে জোহরা কিন্তু সে মুহূর্তে পৃথিবীর সমস্ত বাস্তবতা বিচ্যুত ঐ উক্তিটির কোনো তাৎপর্যই খুঁজে পান না। এর আগেও এই কথা অন্যমনস্ক তাজউদ্দীন তাকে বলেছে, তবে তা খতিয়ে দেখার অবসর হয়ে ওঠেনি জোহরার।

কিন্তু এখন জোহরা ভাবেন।

এক যুগ আগে চরমপন্থি এক বৌদ্ধভিক্ষুর গুলিতে প্রাণ হারিয়েছিলেন শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী সলোমন বন্দরনায়েকে। সলোমনের মৃত্যুর পরে তার পথ হারানো দল শ্রীলঙ্কা ফ্রিডম পার্টির নেতৃত্ব দেন তারই স্ত্রী শ্রীমাভো বন্দরনায়েকে। সেই শ্রীমাভো পরে বনে যান বিশ্বের প্রথম নারী প্রাইম মিনিস্টারও। কিন্তু তাজউদ্দীন আজ জোহরার সাথে সেই মহীয়সী রাজনীতিকের তুলনা টানছেন কেন?

টুকটাক রাজনীতিতে তো জোহরাও জড়িত। মুজিব ভাই তাকে অনুরোধ করেছিলেন মহিলা আওয়ামী লীগের সদস্য হতে। সাতপাঁচ ভেবে জোহরা যোগও দিয়েছেন সেখানে, মহিলা আওয়ামী লীগের হয়ে ছোটখাটো সভাও করেছেন কয়েকবার। কিন্তু তবুও শ্রীমাভো বন্দরনায়েকের সাথে এক সমতলে তাকে কেন আনছেন তাজউদ্দীন?

জানার কথা নয় জোহরার, সামনের দিনে ইতিহাস দেখাবে, দৈব যেন বারবারই ভর করেছিল তাজউদ্দীনে। ভবিষ্যতের আওয়ামী লীগের চরম নেতৃত্বশূন্যতার দিনে ঐ জোহরাকেই হয়ে উঠতে হবে দলটির বাতিঘর। সেই আখ্যান পরে হয়তো শোনাবেন অন্য কেউ।

...এদিকে ফাঁকা রাস্তায় তাজউদ্দীন উদ্‌ভ্রান্তভাবে গাড়ি চালান একা একাই। নিজেকে তার মনে হয় বড় একাকী। দাবা বোর্ডের মিডিওকার সৈন্যদের পেছনে কোণঠাসা নৌকার মতো মনে হয় তার নিজেকে। প্রতিপক্ষ আড়াই ঘরের ঘোড়ার চালে বাজিমাত করে দিচ্ছে, কিন্তু কিস্তি এদিকে রাজার কোনো কাজেই আসছে না। সাদা রাজা আর সাদা কিস্তির মাঝে কালো আচকানের ঘোড়া বসে আছে সগৌরবে। এই উদ্ভট দাবা বোর্ডের কোনায় আটকে থাকাটাই কি তবে কিস্তির নিয়তি?

ভাবতে ভাবতে আনমনা তাজউদ্দীন অসতর্ক হয়ে যান। তার কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগে চারপাশ, মাথাও একটু ঘুরে ওঠে বোধহয়। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তাজউদ্দীন গাড়ি উঠিয়ে দেন রাস্তার পাশের আইল্যান্ডে!

অভিমানের গল্প

সেই দুর্ঘটনার পরে কেটে গেছে সপ্তাহ দুয়েক।

ভাগ্য ভালো ছিল তাজউদ্দীনের, তার তেমন কোনো বড় ক্ষতি হয়নি অ্যাক্সিডেন্টে। হাতের কনুইয়ের কাছটা খানিক ছড়ে গেছিল কেবল। আঘাত সহ্য করে নিয়ে গাড়ির ধাতব দেহটা বরং সামনে কিছুটা বেঁকে গেছে।

তাজউদ্দীন এখন সময় কাটাতে কোর্টে যাওয়া শুরু করেছেন। পুরাতন অভ্যাস ঝালিয়ে নেয়া আরকি! সেই কৈশোরে তাজউদ্দীন প্রায়ই আদালতে গিয়ে জজ সাহেব আর উকিলদের আইনি কথোপকথন শুনে মনে মনে যুক্তি শাণাতেন, পরবর্তীতে সেই আইন শাস্ত্রেই স্নাতক হয়েছেন তাজউদ্দীন। মজার ব্যাপার হচ্ছে, আইনের ক্লাসে যোগ দেয়ার আগেই এম.এল.এ. বনে যাওয়ায় নিয়মিত ক্লাস করাই হয়নি তার। স্নাতক পরীক্ষার সময়ে তো জেলে থেকেই পরীক্ষা দিতে হয়েছে তাকে, তাজউদ্দীন সে সব স্মৃতি মনে করে হাসেন এখন। কী সব দিনই না গেছে!

তবে এখন সময় পালটে গেছে। যে রাজনীতির জন্যে সব ছেড়েছিলেন তাজউদ্দীন, সেই রাজনীতিই তাকে একরকম ছেড়ে যাওয়ায় তিনি এখন বেকার। তাজউদ্দীন তাই ইদানীং ভাবছেন, কোর্টে প্র্যাকটিস শুরু করলে কেমন হয়!

যেখানেই হাত দিয়েছেন, নিষ্ঠা আর একাগ্রতা কখনোই ত্যাগ করেননি তাজউদ্দীন। এবারও এর ব্যতিক্রম হয় না। নিয়মিত কোর্টে আসা যাওয়া শুরু করেন তিনি। সকালে বাচ্চাদের স্কুলে নামিয়ে দিয়েই আদালত পাড়ার দিকে ছুটে যায় তাজউদ্দীনের সবুজ রঙের ভক্সওয়াগন। দুপুর বা বিকেলে তাজউদ্দীন ফিরে আসেন বাড়িতে।

এরকম একদিন দুপুরে বাড়ি ফিরে তাজউদ্দীন দেখতে পান ফজলুল হক হলে তার এককালের রুমমেট মুজাফফর আলী বসে আছেন তার সাথে দেখা করবেন বলে। তাকে দেখেই খুশি হয়ে যান তাজউদ্দীন। 'আরে মুজাফফর ভাই, কেমন আছেন?'

কুশল বিনিময় করতে আসা মুজাফফর আলী হেসে বলেন, 'ভালোই আছি। তুমি ভালো আছো তো?'

'হ্যাঁ, ভালোই আছি।' তাজউদ্দীনের মুখ কেমন যেন ছেলেমানুষি আনন্দে ভরা। 'ভাই আজকে একটা দারুণ খবর আছে। আজকেই কোর্টে একটা মামলা নিলাম, আর সেই মামলায় জিতেও গেলাম। অ্যাডভোকেট হিসাবে যে আমি এত ভালো করতে পারবো, এইটা তো আমি নিজেই কল্পনা করি নাই। এখন ভাই আমার একটা আত্মবিশ্বাস চলে আসছে বুঝলেন। আমি রেগুলার প্র্যাকটিস করবো। আর ইনকাম না আসলে সংসার ক্যামনে চলবে বলেন তো...'

অনার্স ফাইনালের সময় রাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত তাজউদ্দীন সারা দিন কাটাতেন বাইরে, আর দিন শেষে হলে ফিরে এই মুজাফফরের নোট কেবল শুনে শুনেই পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতেন তিনি। আইনে স্নাতক করার আগে অর্থনীতিতে অনার্সটা তাজউদ্দীনের সেভাবেই করা! কাজেই এই বন্ধুটির প্রখর মেধা নিয়ে সন্দেহ নেই মুজাফফর সাহেবের। তিনি কেবল হেসে বলেন, 'তাই নাকি! বাহ, ভালো তো সেলিব্রেট করা দরকার না ব্যাপারটা?'

'অবশ্যই সেলিব্রেট করবেন।' তাজউদ্দীনও হেসে দেন। 'গরিবের বাসায় যখন আসছেন, তখন আমি যা খাই সেই ডালভাত হইলেও খায়ে যাইতে হবে আপনাকে। লিলি, এই লিলি, কোথায় গেলা ...'

তাজউদ্দীন চান কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতে, কিন্তু পুরনো দিনের স্মৃতি মনে করিয়ে দিতেই যেন তার কাছে আসেন এ রকম বহু অতিথি। সে সব অতিথিরা হয়তো প্রভাবশালী কোনো রাজনীতিক নন, কিন্তু তাদের অনেকেই জড়িত রাজনীতির সাথে, অনেকেই রাজনীতির অঙ্গনে অভাব বোধ করেন তাজউদ্দীনের। আরো আসেন একেবারেই সাধারণ মানুষেরা।

কফিল উদ্দিন মাহমুদ যেমন। তাজউদ্দীন অর্থ সচিবকে দেখে মনে মনে খুশি হন। কিন্তু খানিক উদ্বেগও থাকে তার সম্ভাষণে। 'কফিল উদ্দিন সাহেব, সরকারি কর্মচারী হয়ে আপনি আমার কাছে আসেন কেন বলেন তো? বিপদে পড়বেন তো!'

উত্তরে কফিল উদ্দিন বলেন, 'স্যার, আমি তো অর্থ সচিব হিসেবে আসি নাই। আপনি তাজউদ্দীন, আমি কফিল উদ্দিন মাহমুদ। আপনাকে ভালো লাগে, আপনারে শ্রদ্ধা করি তাই মানুষ হিসেবেই আসি স্যার।'

তাজউদ্দীনের বিবেচনাবোধ বড় তীক্ষ্ণ। 'আমি সেটা বুঝি কফিল উদ্দিন সাহেব, কিন্তু তারপরেও না আসলেই মনে হয় ভালো। দরজার বাইরে থেকে নানা লোকে আমার উপর নজর রাখে, আমি বুঝি। কে আসে, কে যায়, তারা সমস্ত খোঁজখবর নেয়। আপনি কেন শুধু শুধু ঝামেলায় পড়বেন!'

পুরনো দিনের সাথে আজকালের তুলনা করে তাজউদ্দীন মনে মনে বড় কষ্ট পান। মুজিব ভাইয়ের উপর তার বড় অভিমান হয়। লোকমুখে শুনতে পান, নানা কান কথা শুনে মুজিব ভাই তার সম্পর্কে ভুল সব ধারণা করছেন। সেদিন যেমন রফিকউদ্দিন ভূঞা সাহেব এসে তার সাথে মুজিব ভাইয়ের কথাবার্তা সব শোনালেন।

রফিক উদ্দিনকে নাকি মুজিব ভাই বলেছেন, 'রফিক, তাজউদ্দীন আর আগের সেই তাজউদ্দীন নাই। সব লোকে বলে অর উপর আর বিশ্বাস রাখা যায় না। অয় নাকি অ্যামবিশাস!'

প্রতিবাদ করে রফিক উদ্দিন বলেছেন, 'কী বলেন বঙ্গবন্ধু! তাজউদ্দীন যদি অ্যামবিশাস হয়ও, সেইটা সে হইতেছে আপনার কাছে থাকার জন্যে। আপনার প্রধান প্রতিনিধি হবার জন্যে। আপনার সাথে তার তুলনা তো সে করে না! তারে সরায়ে আপনি ভুল সিদ্ধান্ত নিছেন!'

মুজিব ভাই নাকি তখন রাগ করে বলেছেন, 'আমি কী রকম ঝড় তুফানের মইধ্যে আছি সেইটা তোমরা দেখো না! এর মধ্যে সব কাজ ঠিক করন যায় নাকি!'

...এই কথা শুনে মরমে মরে গিয়েছেন তাজউদ্দীন। মুজিব ভাই তাকে উচ্চাকাঙ্ক্ষী মনে করেন– এই ভাবনাই তো তাকে সংকুচিত করে ফেলতে যথেষ্ট! আর এই নিয়ে মুজিব ভাই তাকে একবার সরাসরি কিছু জিজ্ঞেসও করলেন না, এই চিন্তাটাই মনে একরকম ছেলেমানুষি অভিমানেরও জন্ম দেয় তাজউদ্দীনের। তাজউদ্দীনের খুব ইচ্ছে হয়, মুজিব ভাইয়ের কাছে গিয়ে তার হাত দুটো ধরে সব খুলে বলেন। মুক্তিযুদ্ধের কথা। মুজিব ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তাকে কী করে সরকার চালাতে হয়েছে সে কথা। কারা স্বাধীনতার বিপক্ষে ছিল সে কথা। কিন্তু প্রখর ব্যক্তিত্ববোধ আর অভিমান কোথায় যেন বাধা দেয় তাজউদ্দীনকে।

মাঝে মাঝে আলাউদ্দীনও যায় তাজউদ্দীন সাহেবের বাসায়। শেখ মুজিবুর রহমানের দ্বিতীয় বিপ্লবে সর্বস্ব বাজি রাখছে সে, কিন্তু তাজউদ্দীনের মতো কর্মচঞ্চল মানুষের এই স্থিতি জড়তা ব্যথিত করে তাকেও। 'স্যার, শুধু শুধু এইভাবে ঘরে বসে থাকবেন? লোকে বলতেছে আপনি নাকি নতুন দল গঠন করবেন সামনে?'

তাজউদ্দীন ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন একরকম। 'দেখো, তোমাদের বার বার বলছি যে মুজিব ভাইকে ছেড়ে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব না। মরি বাঁচি যাই হোক, শেষ পর্যন্ত আমাকে আওয়ামী লীগের সাথেই থাকতে হবে। তারপরেও তোমরা এইসব প্রশ্ন কেন করো? ... তোমরা এইসব প্রশ্ন করো আর মুজিব ভাইয়ের কাছে গিয়ে আমার নামে উলটা পালটা কথা লাগাও। মুজিব ভাইয়ের মন তো শিশুর মতো, মাঝখান দিয়ে তোমরা এই করে করে তাঁরে আমার নামে ভুল বুঝাইছো...'

খুব করে আলাউদ্দীনকে বকাঝকা করেন তাজউদ্দীন। কিন্তু মাথা ঠান্ডা হবার পরে নিজেই ক্ষমা চান আলাউদ্দীনের কাছে। '...সরি! তুমি কিছু মনে কইরো না বুঝলা। মনটা আজকাল খুব খারাপ থাকে। যখন তখন রাগ করি মানুষের সাথে...'

সোহেলকে সাথে নিয়ে আবাহনী মাঠের দিকে বিকালে খানিক হেঁটে আসাটা এখন তাজউদ্দীনের প্রতিদিনের রুটিন। আজ তাকে সঙ্গ দেয় আলাউদ্দীনও। নতুন একজনকে সাথে পেয়ে ছোট্ট সোহেলও খুব হর্ষ বোধ করে আজ। মাঠের দিকে যাবার পথে স্কুলের যাবতীয় গল্পই সে শোনাতে চায় আলাউদ্দীনকে।

কাছাকাছি একটা বাড়িতেই থাকেন খান সরওয়ার মুরশিদ, বিকালের ভ্রমণে তাজউদ্দীনদের সাথে আজ যোগ দেন তিনিও।

সরওয়ার মুরশিদের 'কেমন আছেন' প্রশ্নের উত্তরে আজ বড় করুণ হয়ে যায় তাজউদ্দীনের মুখ। কেমন একটা ভাঙা গলায় তিনি প্রশ্ন করেন, 'আচ্ছা মুরশিদ সাহেব, বলেন তো, আমার কি আর কোনো প্রয়োজন নাই? আমি কি একদম ফ্যালনা হয়ে গেছি?...'

মুক্তিযুদ্ধের সময় খন্দকার মোশতাকের যাবতীয় অন্তর্ঘাতী কাজকর্ম সম্পর্কে অবহিত আছেন সরওয়ার মুরশিদ। কালক্রমে সেই মোশতাকই এখন ছায়াসঙ্গী শেখ মুজিবের। সে প্রসঙ্গে তাজউদ্দীন খুব আক্ষেপের সাথে বলেন, 'মুরশিদ সাহেব, আপনি দেখবেন, একদিন মুজিব ভাই এই ভুলের প্রমাণ হাতে নাতে পাবেন। আশা করি সেদিন আমাদের ফেরার সব পথ বন্ধ হয়ে যাবে না...'

হাঁটতে হাঁটতে সরওয়ার মুরশিদ বলেন, 'আপনি এত জানেন, এত বোঝেন, তারপরেও চুপ করে থাকেন কেন ভাই? আপনি কেন মুখ খুলেন না?'

তাজউদ্দীন তিক্ত স্বরে জবাব দেন, 'কাকে বোঝাবো! আমি যতই চেষ্টা করি, ধ্বংস হওয়ার আগ পর্যন্ত তো কেউই কিছু বুঝতে চায় না!'

বলার নেশায় পেয়েছে আজ যেন তাজউদ্দীনকে। সোহেল ব্যস্ত সামনের কোনো কাল্পনিক মাইলফলক ছুঁয়ে আবার দৌড়ে আব্বুর কাছে ফিরে আসতে। আলাউদ্দীন সোহেলকে সামলানোর ফাঁকে নিশ্চুপ হয়ে শুনছে তাজউদ্দীনের হতাশা। আর তাজউদ্দীন সরওয়ার মুরশিদের কাছে উজাড় করে দিচ্ছেন তার যত জমে থাকা অভিমান।

'আমরা মুজিব ভাইয়ের একটা ইমেজ গড়েছি, তাকে কত উঁচু একটা আসন দিয়েছি। ঠিক প্রতিমার মতো। আমরা চাই তার সেই ইমেজটাই থাকুক। কিন্তু মুজিব ভাই নিজেই যেন নিজের চেহারাটা খামচে, আঁচড়ে রক্তাক্ত করে ফেলছেন। আর আমি এদিকে অকর্মণ্য হয়ে বসে আছি, আমার কিচ্ছু করার নাই। ভাই সাহেব, এই অনুভূতিটা কী রকম হতাশার, সেইটা যদি আপনাকে বুঝাইতে পারতাম...'

সরওয়ার মুরশিদ আর আলাউদ্দীন একদম নিঃশব্দ হয়ে যান শেখ মুজিবের প্রতি মানুষটির অনুভূতির গভীরতা দেখে। কী বলে তাকে স্বান্ত্বনা দেবেন বুঝতে পারেন না তারা।

এক সময় আলাউদ্দীন নিচু স্বরে জিজ্ঞাসা করে, 'স্যার, একটা প্রশ্ন করলে, আপনি ঠিক ঠিক জবাব দেবেন? আপনি কাকে বেশি ভালোবাসেন? বাংলাদেশকে না বঙ্গবন্ধুকে?'

১৯৭২ এর জানুয়ারিতে, যখন রুপালি কমেটের মিডাস হয়ে শেখ মুজিব সবে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন স্বাধীন বাংলাদেশে, তখনও তাজউদ্দীন এই প্রশ্ন

শুনেছিলেন মুজিবনগর সরকারের তথ্য বিভাগের অফিসার আলী তারেকের কাছে। সেদিন যা উত্তর দিয়েছিলেন, আজও সোহেলের হাত শক্ত করে হাতের মাঝে নিয়ে, তাজউদ্দীন সেই একই উত্তর দেন। বলেন, 'আমি বঙ্গবন্ধুকেই বেশি ভালোবাসি।'

আলাউদ্দীন আর সরওয়ার মুরশিদ হাঁটতে হাঁটতে আড়চোখে তাকান তাজউদ্দীনের দিকে। তাজউদ্দীনের চোখ গাঢ় হতাশায় আচ্ছন্ন। আর তার সঙ্গীদের চোখ মানুষটির জন্যে গভীর মমতায় আর্দ্র।

কালো কিউমুলাস

বাকশালের সরকারি গেজেট বেরিয়ে গেছে। কার্যনির্বাহী কমিটিতে জায়গা পেয়েছেন ১৫ জন, তাতে শেখ মুজিব চেয়ারম্যান। ডা.নুরুল ইসলাম বিস্মিত হয়ে দেখলেন, সেই লিস্টিতে খন্দকার মোশতাক আছেন চার নম্বরে। জিলুর রহমান-শেখ মনি-আব্দুর রাজ্জাকও আছেন সেক্রেটারি হিসেবে। কিন্তু আরো অবাক করা ব্যাপার, কমিটিতে তাজউদ্দীনের জায়গা হয়নি! এমনকি কেন্দ্রীয় কমিটির ১১৫ জনের মাঝেও তাজউদ্দীনের নাম নেই, কিন্তু সেখানে ডা.নুরুল ইসলামের নিজের নাম শোভা পাচ্ছে।

লিস্টিতে নিজের নাম দেখে ডা.নুরুল ইসলামের কেমন যেন লাগে। রাজনীতিতে জড়ানোর কোনো ইচ্ছা তার নেই, ডাক্তারি নিয়েই ব্যস্ত থাকতে চান তিনি। তার স্ত্রীও জোরের সাথে মানা করে দেন এসব ব্যাপারে নাক গলাতে। কিন্তু শেখ সাহেব তার উপর ভরসা করে লিস্টিতে নাম দিয়েছেন, না করে দিলে তার মনেও কষ্ট দেয়া হয় যে! সাতপাঁচ ভেবে নুরুল ইসলাম তাই চুপ করে থাকেন। যা হওয়ার হবে। আল্লাহ আছেন উপরে, তিনিই দেখবেন সব। অতঃপর কাগজপত্রে সই করে আসেন নুরুল ইসলাম।

বাকশালের প্রথম সম্মেলনে যান ডা.নুরুল ইসলাম। এলাহি ব্যাপার চলছে সেখানে! বেশ জোরেই বৃষ্টি হচ্ছে, কিন্তু তার মাঝেই কী লম্বা মিছিল। অনেকের হাতেই বঙ্গবন্ধুর হাস্যোজ্জ্বল প্রতিকৃতি। বাংলাদেশের পতাকা নিয়ে 'জয় বাংলা' স্লোগান দিচ্ছে মানুষ, রাষ্ট্রপতির ছবি নিয়ে রব তুলছে 'জয় বঙ্গবন্ধু' বলে। শেখ মুজিব মুখে তার পরিচিত স্মিত হাসি ঝুলিয়ে সে অভিবাদন গ্রহণ করছেন। বৃষ্টির ছাঁটে ভিজে যাচ্ছে তার কাঁধ, যে কাঁধে কিছুদিন পর টানতে হবে সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশকে।

কিন্তু যারা বাকশাল নিয়ে জয়োল্লাস করছে, তাদের অনেককেই ব্যক্তিগতভাবে চেনেন ডা.নুরুল ইসলাম। যে কারণে এই মিছিল নিয়ে মনে খটকা

লাগে তার। কদিন পরে সুযোগ পেয়ে বঙ্গবন্ধুকে সরাসরি তিনি বলেও বসেন এই ব্যাপারে।

বঙ্গবন্ধু তাকে ডেকেছিলেন কিছু ওষুধপত্রের জন্যে। ডা.নুরুল ইসলাম প্রেসক্রিপশন লিখে দেন, তারপর নরম স্বরে বলেন, 'স্যার, আপনি অনুমতি দিলে বাকশালের সম্মেলন নিয়ে কিছু কথা বলতে চাই। সেদিন স্যার বৃষ্টির মাঝেও লম্বা একটা মিছিল হইলো...'

শেখ মুজিবের মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। 'হ্যাঁ, দেখলা না কী রকম উৎসাহ ওদের! কী খুশি হইছে অরা...'

ব্যক্তিগত চিকিৎসক বলেন, 'না স্যার, মানে, বলতেছিলাম কী কেমন যেন কৃত্রিম কৃত্রিম লাগল বিষয়টা! এক একটা অঙ্গ সংগঠন একটা করে ছবি আনলেই তো হইতো, সব মানুষকেই কি আপনার ছবি ঝুলাইতে হবে? এরকম লোক দেখানো কাজকর্ম...'

'আহা ডাক্তার সাহেব, 'শেখ মুজিব যেন অবুঝ কাউকে বোঝান। 'সমাজতান্ত্রিক দেশগুলাতে মাইনষে কী করে দেখেন না!'

'তা স্যার দেখছি। চীনে যেমন ওরা মাও সেতুং এর ছবি ঝোলায়...'

'তাইলে?' শেখ মুজিব যেন উপভোগ করেন বাকশালকে ঘিরে সৃষ্টি হওয়া নতুন এই কর্মযজ্ঞ। 'লোকজন যেইখানে এগুলা করতে চায়, সেইখানে আপনি বাধা দিবেন ক্যামনে? অগো সেন্টিমেন্টে লাগবো না বিষয়টা?'

ডা.নুরুল ইসলাম এবার সরাসরিই বলে ফেলেন তার মূল বক্তব্য। 'স্যার, ডাক্তার হিসেবে অনেক ধরনের লোকের সাথে আমার আলাপ হয়। আমার কানে স্যার অনেক কিছুই আসে। আপনার সামনে কিছু না বললেও পিছনে লোকে এইসব নিয়ে অনেক সমালোচনা করে। কেউ কানাকানি করে, কেউ প্রকাশ্যে বলে। তারা বলে এইগুলি করা হইতেছে সরকারি পয়সা দিয়ে, এইগুলা পূর্ব পরিকল্পিত। আবার যারা স্যার এইগুলা বলে, মিছিলে তাদের অনেককেই দেখি। তারা আপনার ছবি গলায় ঝুলায়ে স্লোগান দেয়, আবার পেছনে আপনার সমালোচনা করে।'

শেখ মুজিব ভ্রূকুটি করেন। বলেন, 'যার ইচ্ছা সমালোচনা করুক। সমালোচনায় বাধা দিমু ক্যামনে!'

'সেটা তো স্যার আপনার ব্যাপার।' ডা.নুরুল ইসলাম সাহসে ভর করে কথা বলতেই থাকেন। 'কিন্তু আমার মনে হয় আপনি পেপারে একটা বিবৃতি দেন। দিয়ে বলেন, 'ছবি চাই না কাজ চাই'। তারপর স্যার যার ইচ্ছা ছবি আনুক। লোকে তো বুঝবে আপনি ছবি চান নাই...'

খানিক চুপ করে থাকেন ফেলেন শেখ মুজিব। তারপরে তিক্ত স্বরে বলেন, 'ডাক্তার সাহেব, অন্য দেশে লোকে সোনার খনি পায়, তেলের খনি পায়। আর

আমি কি পাইছি জানেন? ...আমি পাইছি চোরের খনি। বুঝলেন ডাক্তার সাহেব, চুরি আর পরশ্রীকাতরতা, এই দুই আমগোরে শ্যাষ কইরা দিল।'

ডা.নুরুল ইসলাম কোনো কথা বলেন না। শেখ মুজিব নীরবে ভাবেন শুধু। তার মনে হয়তো শঙ্কা জাগে, যাদের সহযাত্রী করে তিনি নামছেন নতুন অভিযানে, সাগরে ঝড় উঠলে কতটুকু তারা কাঁধ দেবেন ক্যাপ্টেনের আদেশে?

মনের আকাশে এই দুর্ভাবনার মেঘ অবশ্য কেবল রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবকে নয়, সেটা তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে বঙ্গভবনে তার স্পেশাল অফিসার মাহবুব তালুকদারকেও। সেই দুর্ভাবনা শেখ মুজিবকে ঘিরে।

কামাল নামে মাহবুব সাহেবের এক দূর সম্পর্কের আত্মীয় কাজ করে সরকারি গোয়েন্দা সংস্থায়। তরুণ কামালের কাজটি গুরুত্বপূর্ণ, যদিও তাতে সুযোগ সুবিধা তেমন নেই। হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে বিদেশি অতিথিদের গতিবিধির উপর নজর রাখতে হয় কামালকে, মাঝে মাঝে টেলিফোন ট্যাপও করতে হয় কাজের খাতিরে। সেই কামাল একদিন এসে হাজির মাহবুব সাহেবের বাসায়। খুব জরুরি একটা খবর নিয়ে এসেছে নাকি সে।

'আপনার ঘরে কোনো আড়িপাতার যন্ত্র ফিট করা নাই তো মাহবুব ভাই?' কামালের চোখমুখ ভয়ানক উত্তেজিত। 'বিষয়টা কিন্তু খুব গোপন রাখতে হবে।'

মাহবুব তালুকদার সতর্ক হয়ে ওঠেন। 'এই কথা কেন! কী হইছে বলো তো!'

কামাল খুব আবেগপ্রবণ হয়ে ওঠে। 'ষড়যন্ত্র হইতেছে! গভীর ষড়যন্ত্র! আপনি যেহেতু বঙ্গবন্ধুর কাছে আছেন, আপনি ওনাকে সরাসরি এই কথা বলবেন। কিন্তু আর কাউকে বলবেন না। আমি অফিসেও রিপোর্ট সাবমিট করছি। কিন্তু সেই রিপোর্ট কোথায় পড়ে থাকে, কে জানে...'

'আহা কামাল, একটু বোঝার চেষ্টা করো।' মাহবুব সাহেব বোঝাতে চান যুবকটিকে। 'আমি তো তার হয়ে চাকরি করি। যেকোনো কিছু কি আমি উনারে বলতে পারি? আর তোমার কথার প্রমাণ কী?'

উদ্বেগ আক্রান্ত কামাল বলে, 'এই মুহূর্তে আমার হাতে কোনো প্রমাণ নাই। কিন্তু আমি জানি বঙ্গবন্ধুকে সরানোর গভীর ষড়যন্ত্র চলতেছে। ব্যবস্থা না নিলে খুব তাড়াতাড়িই কিছু একটা ঘটবে...'

কামালের প্রস্থানের পরেও মাহবুব তালুকদার বিষয়টি প্রথমে পাত্তা দেন না। রাষ্ট্রপতির বিপক্ষে ষড়যন্ত্র তো হবেই, আর গোয়েন্দা-বাহিনীও আছে সেসব বিপদ কাটাতে। এর মাঝে তার কী করার আছে!

কিন্তু খুব অচিরেই দ্বিতীয়বারের মতো এই ষড়যন্ত্রের কথা কানে যায় মাহবুব তালুকদারের। এবার খবর নিয়ে আসে আলাউদ্দীন। দীর্ঘদিন আগেই স্বয়ং শেখ মুজিবকেই তার বিপক্ষে ষড়যন্ত্র হচ্ছে, এই উড়োকথা শুনিয়ে এসেছিল আলাউদ্দীন

এবং এইবার সে শুনেছে আর্মির ভেতরে ভেতরে নাকি গোপনে রাষ্ট্রপতিকে সরানোর মতলব করা হচ্ছে। কিন্তু শেখ মুজিবের কাছে একবার সরাসরি গিয়ে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে বলে আলাউদ্দীন এসেছে মাহবুব সাহেবের কাছে। তার ধারণা স্পেশাল অফিসার কিছু বললে সেই সংবাদ রাষ্ট্রপতি একটু স্পেশালিই যাচাই করবেন।

আলাউদ্দীনের কাছেও একই খবর পেয়ে একটু দোটানায় পড়ে যান মাহবুব তালুকদার। কী করবেন, পরামর্শ নিতে তিনি আলাউদ্দীনকে নিয়ে চলে আসেন অগ্রজপ্রতিম বন্ধু রফিকুল আনোয়ারের কাছে। রফিকুল আনোয়ার এ কথা শুনে প্রথমে মাহবুব সাহেবকে ভর্ৎসনা করেন খবরটি গুরুত্বহীন মনে করার জন্যে। তারপর বলেন, 'এক কাজ করো, চলো দেখি মনির অফিসে যাই। ওরেই আগে সব কথা বলে আসি।'

অতএব রফিকুল আনোয়ার আর মাহবুব তালুকদার রওয়ানা দেন শেখ মনির অফিসে। সাথে থাকে আলাউদ্দীনও।

শেখ মনির সাথে পরিচয় মাহবুব সাহেবের আজ থেকে নয়। দুজনেই বিশ্ববিদ্যালয়ে সমসাময়িক। আরামাবাগে মণিদের টিনের ঘরের বাড়িতে একসময় গল্প করে দুপুর পার করে দিয়েছেন তারা। মুক্তিযুদ্ধের সময় কলকাতাতেও কাটিয়েছেন অনেকটা সময়। কিন্তু ইদানীং মনির প্রতি বড় অভিমান জমে আছে মাহবুব সাহেবের। তার মনে হয়, টাকা আর খ্যাতি পেয়ে এখন তার বন্ধুত্ব অবহেলা করেন মনি। কিছুদিন আগে মনি তার সাথে বেশ রূঢ় ব্যবহারও করেছে।

অন্যদিকে আলাউদ্দীনের সাথে শেখ মনির বেশ সখ্যতা। মনি ভাইয়ের বাংলার বাণীতে প্রায়ই ঢুঁ মারে সে। মনি ভাইয়ের হাতে সময় থাকলে লম্বা আড্ডাও হয়ে যায় রাজনীতি নিয়ে।

তারা তিনজন অফিসে ঢুকতেই শেখ মনি ব্যস্ত হয়ে বিদায় করে দেন তাকে ঘিরে থাকা মানুষদের। আলাউদ্দীনের দিকে চেয়ে খানিক হাসেন মনি, তারপর মাহবুব তালুকদারের দিকে ফিরে বলেন, 'কী খবর মাহবুব? তুমি তো মনে হয় রাগ করছো আমার উপরে!'

হালকা কথায় সময় ব্যয় না করে মাহবুব সাহেব খুলে বলেন তার উদ্বেগের কারণ। মনি মন দিয়ে শোনেন। তারপর বলেন, 'অ্যাবসার্ড! লোকটা মনগড়া একটা ঘটনা দিয়ে আমাদের ঘোরাতে চাইতেছে।'

'তবুও, বঙ্গবন্ধুকে ঘটনাটা বললে মনে হয় ভালো হয়...', রফিকুল আনোয়ার বলার চেষ্টা করেন।

'এইসব কাল্পনিক ঘটনা নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার নাই।' মণি শক্ত মুখে বলেন। 'দেশে এখন বিপ্লব ঘটতেছে। বাকশাল নিয়ে আমরা খুব ব্যস্ত। এর মাঝে এসব আজগুবি খবর নিয়ে বঙ্গবন্ধুকে বিরক্ত করার কোনো মানে নাই।'

অতএব ভগ্ন হৃদয়ে বেরিয়ে আসতে হয় আলাউদ্দীনদের। মাহবুব তালুকদারের মুখে ক্ষোভের চিহ্ন। তাকে বেশ বিরক্ত দেখায়। আর আলাউদ্দীন মনে মনে ভাবে, সত্যিই কি বঙ্গবন্ধুর ওপর কোনো বিপদের আশঙ্কা করছে না কেউ? নাই বা থাকুক শঙ্কা, তবু এই সমস্ত উড়োকথাকে নেহাত গুরুত্বহীন বলে কেন গা করছে না কেউ?

বাংলাদেশের রাজনীতির বহু জটিল প্রশ্নের মতো, এ প্রশ্নটাও উত্তরহীন হয়ে থাকে আলাউদ্দীনের মনে। কালো কিউমুলাস মেঘের দল ভারি করতে থাকে বাংলাদেশের আকাশ।

আসন্ন ঝড়

আব্বুর মন আজকাল অসম্ভব খারাপ। ঠিক মন খারাপ না, রিপির মনে হয়, বলা চলে আব্বু একরকম বাচ্চাদের মতো ছেলেমানুষি অভিমান করে আছেন। সেই অভিমানের অনেকটা মুজিব কাকুর ওপর, বাকিটা কার ওপরে সেটা রিপি বুঝতে পারে না। আব্বু নিজেও মনে হয় সেটা ব্যাখ্যা করতে পারবেন না।

মফিজ কাকুর শরীরটা অনেকটা ধরেই ভালো না। পেটে পানি এসে যাচ্ছে নিয়মিত। সেগুনবাগিচার দিকে এক ডাক্তারও দেখানো হচ্ছিলো মাস কয়েক ধরে। জুন মাসের প্রথম দিকে আব্বু ঠিক করলেন মফিজ কাকুকে নিয়ে মস্কো যাবেন। তা নিয়েই আব্বু যোগাযোগ করেছিলেন সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত আন্দ্রেই পপভের সাথে। পপভ উত্তরে আব্বুকে জানালেন, দেশের বাইরে যাবার ভিসা নিতে হলে তাজউদ্দীনকে অবশ্যই বিশেষ অনুমতি নিতে হবে।

প্রথমে থতমত খেয়ে গিয়েছিলেন আব্বু। এরপরে কেমন রেগে গিয়েছিলেন। বাসায় এসে গরম স্বরে বলেছিলেন, 'বাইরে যাওয়া টাওয়া সব বন্ধ। কোথাও যাবার দরকার নাই। আমি দেশেই থাকবো। মুক্তিযুদ্ধ করার জন্যেই এরকম শাস্তি পাচ্ছি। যুদ্ধ করে আমরা দেশটা স্বাধীন করলাম, অথচ বিদেশ যেতে চাইলে আমাদেরই বিশেষ অনুমতি লাগবে? দরকার নাই আমার যাবার। আমি বিশ্বাসঘাতক না। তাজউদ্দীন বিশ্বাসঘাতক হয়ে বাঁচতে চায় না...'

দুয়েকদিন রিমি-রিপির সামনে খুব রাগ দেখালেন আব্বু। তারপর কেমন যেন একসময় চুপ করে গেলেন। রাগের জায়গা নিল ওই অভিমান, রিপি যেটা গত কিছুদিন ধরে দেখছে। মানুষের সাথে কথাবার্তা বলাও একদম কমিয়ে দিল আব্বু। তাকে দেখলেই রিপির বুকের ভেতর এখন কেমন একটা আশঙ্কা হয়।

মুজিব কাকুর উপর অভিমান অবশ্য দুই বাড়ির লোকেদের মাঝে কোনো ছায়া ফেলছে না, রিপি ভাবে। দুই পরিবারের সবাই তো বলতে গেলে নিয়মিতই আশা যাওয়া করছে এদিক থেকে ওদিকে। হাসিনা আপা যেমন আম্মার রান্নার খুব

ভক্ত। বিশেষ করে আম্মার হাতের শুঁটকি আর মাছের কয়েকটা তরকারি তো হাসিনা আপা খুবই পছন্দ করেন। আম্মাও সেগুলো রান্না হলে টিফিন ক্যারিয়ার ভর্তি করে পাঠিয়ে দেন ওই বাড়িতে। মুজিব কাকিও খালি টিফিন ক্যারিয়ার ফেরত দেন না, কিছু না কিছু তিনিও পাঠান এদিকে। রিপির এখন এস.এস.সি. পরীক্ষা শেষ। রান্না শেখা নিয়ে সে নিজেও আজকাল আম্মার সাথে রান্নাঘরে ভালো সময় দেয়। সে নিজে যখন প্রথম খিচুড়ি-ইলিশ রান্না করল, সেটাও সে পাঠিয়েছিল মুজিব কাকুর বাসায়।

ভার্সিটি এলাকার নামকরা খেলোয়াড় খুকী আপার সাথে কামাল ভাইয়ের বিয়ে হয়ে গেল গত পরশু। সেই বিয়ে নিয়ে রিপিরা কী মজাটাই না করল গত কয়েকটা দিন! ৩২ নম্বরের বাড়ি বিয়ের কদিন আগে থেকেই শোরগোলে ভর্তি হয়ে ছিল। আম্মা মাঝে মাঝেই সন্ধ্যায় রিপিকে নিয়ে চলে যেতেন ওই বাড়িতে, বিয়ের প্রস্তুতি দেখতে। রিমিটার কয়েকদিন ধরে জ্বর থাকায় সে বেচারি ওই সময়টা বিছানায় শুয়েই কাটিয়ে দিয়েছে।

সে সময়ই এক সন্ধ্যায় ৩২ নম্বরের বাড়িতে একটা মজার ঘটনা হয়েছিল। মুজিব কাকি মোড়ায় বসে পান চিবোতে চিবোতে গল্প করছেন আম্মার সাথে, রিপি এদিক ওদিক হাঁটছে হাসিনা আপার সন্ধানে। হাসিনা আপা একটা সুন্দর শাড়ি দেখাবে বলেছিল, সেজন্যে। মুজিব কাকুর ঘরের সামনে যেতেই কাকু ডাক দিলেন, 'কে রে, রিপি নাকি! ভিতরে আয়!'

ঘরে ঢুকে রিপি দেখে বিছানায় হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে থাকা মুজিব কাকুর খাটের পাশে বসে আছেন শেখ মনি। তিনি কোনো কথা বললেন না। মুজিব কাকু কিন্তু সবসময়ের মতোই সপ্রভিত। রিপির সালামের উত্তর দিয়ে নিজেই প্রসন্ন স্বরে বলতে থাকেন, 'ভালো মতো পড়াশোনা কর রে রিপি। তরে আমি লেখাপড়া করতে রাশিয়ায় পাঠামু।' রিমির খুব ইচ্ছে হলো বলে, 'রাশিয়া লাগবে না, আমাকে শান্তিনিকেতনে পাঠান।' কিন্তু লজ্জায় সে তা বলতে পারল না। এরকম শুনলে মুজিব কাকু কী ভাববেন!

কামাল ভাইয়ের গায়ে হলুদের অনুষ্ঠান হলো ক্রিসেন্ট লেকের পাড়ে নতুন গণভবনে। সেদিন এত মজা হলো! রং মারামারি করলেন অনেকে। সেই রং গায়ে নিয়ে অনেক অতিথি তো লেকের পানিতেই নেমে পড়লেন। শুধু অতিথিরা কেন, মুজিব কাকি নিজেই তো নেমে পড়লেন লেকে সাঁতরাতে। কাকি অবশ্য খুব ভালো সাঁতার জানেন।

অসুস্থতার কারণে গায়ে হলুদে যেতে না পারলেও রিমি কিন্তু ঠিকই বিয়েতে গিয়েছে। ওরা সবাই আব্বু আম্মুর সাথে ৩২ নম্বরের বাড়ি থেকে বরযাত্রী হয়ে গিয়েছিল বেইলী রোডের অফিসার্স ক্লাবে। রেহানা আপা তো তার বান্ধবীদের নিয়ে নতুন ভাবির জন্যে গানও গাইল মজা করে!

সব মিলিয়ে রিপির পরীক্ষার পরের ছুটিটা খুব আনন্দেই কাটছে। আজকাল প্রায়ই সকালে দেরি করে ভাঙে। এমন অলসতা লাগে বিছানা ছাড়তে! দুপুরেও খাবার প্রায়ই বিছানায় খানিক গড়িয়ে নেয় রিপি। এই তো, এখনও যেমন সে এপাশ-ওপাশ করছে।

রিপির আরো খানিক গড়াগড়ি করার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু ফোনের আওয়াজে সেটা আর হয়ে উঠল না। বার কয়েক পাশের রুমে ফোন বাজতে রিপি নিজেই চলে গেল সেটা ধরতে। তবে ফোন ধরে সালাম দিয়ে ওপাশের গলাটা শুনতেই কেটে গেল তার যত আলস্য। মুজিব কাকু ফোন করেছেন!

'কে, রিপি? ভালো আছোস? ...শুন, কথা আছে। কাইলক্যা তর জামাল ভাইয়ের বিয়া। কোনো কার্ড ছাপাই নাই, বেশি লোকরে কইও নাই। কাইল তর আব্বা আম্মারে নিয়া চইলা আসিস কিন্তু...', এই বলে যেমন অপ্রত্যাশিতভাবে ফোন করেছিলেন, তেমনই দ্রুত কথা শেষ করেন মুজিব কাকু।

রিপিও খবরটা নিয়ে যায় আব্বু আম্মুর কাছে। জানা যায়, মুজিব কাকুর বোনের মেয়ে রোজী আপাই জামাল ভাইয়ের কনে। বিয়ের সমস্ত আয়োজন খুব তাড়াহুড়ো করেই করা হচ্ছে।

রিমি রিপিকে রেখেই সে ঘরোয়া পরিবেশের বিয়ে খেয়ে এলেন তাজউদ্দীন আর জোহরা।

ঝড়ের পূর্ব মুহূর্তে যেমন হঠাৎ শান্ত হয়ে যায় সব কিছু তেমনই নীরবে হয়ে যাচ্ছিলো সবকিছু। অভিমানী তাজউদ্দীন নিজেকে ব্যস্ত রেখেছেন তাঁর সেই লাল রঙা কালো বর্ডার দেয়া ডায়েরি লেখার কাজে। মুক্তিযুদ্ধের সময় যারা ক্রিয়াশীল ছিল স্বাধীনতার পিঠে ছুরি মারতে, সেই সব পরাজিত কালো হৃদয়ের কথা তাজউদ্দীন তুলে ধরতে চান সে ডায়েরিতে। চান, যুদ্ধে যারা ত্যাগ স্বীকার করেছে সত্যি করে, তাদের কথা জানুক সবাই। তাজউদ্দীন তাই লিখে চলেন ডায়েরি।

জুলাই মাসের শেষ দিকের এক নীরব রাত। বড্ড গরম পড়েছে আজকাল, গেঞ্জি আর লুঙ্গি গায়ে তাজউদ্দীন ডায়েরি লিখতে বসেছেন তার একতলার স্টাডি রুমে। রাতের খাবারের পর এই সময়টা লেখালেখির জন্যে খুব ভালো, কেউ বিরক্ত করতে আসে না। কিন্তু সেদিন ডায়েরি লেখা হয়ে ওঠে না তাজউদ্দীনের, কারণ রাত সোয়া দশটার দিকে আলাউদ্দীন নিয়ে আসে বড় চাঞ্চল্যকর এক খবর।

এমনিতে আজকাল আলাউদ্দীন বড্ড ব্যস্ত। বাকশাল চালু হতে যাওয়ার আগে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি চলছে। মহকুমা সব হয়ে যাচ্ছে জেলা, সরকারি আদেশে একষট্টি জেলার জন্যে নিয়োগ পাওয়া গভর্নরদের নাম প্রকাশ করা হয়েছে কয়েকদিন আগে, পহেলা সেপ্টেম্বর থেকে তারা কাজ শুরু করবেন। এই বিশাল যজ্ঞের তদারকি কাজের কিছুটা আলাউদ্দীনকেও করতে হচ্ছে।

কিন্তু আলাউদ্দীন আজ সে জন্যে আসেনি। শেখ মুজিবকে সতর্ক করার শেষ চেষ্টা হিসেবে সে আজ এসেছে তাজউদ্দীন সাহেবকে অনুরোধ করতে, তিনি যেন গিয়ে বঙ্গবন্ধুকে বোঝান। এই মাত্র ভার্সিটি এলাকা থেকে আলাউদ্দীন শুনে এসেছে, আর্মির ভেতরে শেখ মুজিব সরকারকে উৎখাত করবার একটা পরিকল্পনা বলতে গেলে অন্তিম পর্যায়ে আছে। আরো ভয়ের কারণ এই যে, এখন দুয়েকটা নামও সরাসরি শোনা যাচ্ছে এ প্রসঙ্গে। কোনো এক মেজরের নামও কানে এসেছে আলাউদ্দীনের। এত রাতে কার কাছে যাবে বুঝতে না পেরে আলাউদ্দীন চলে এসেছে তাজউদ্দীনের কাছেই।

এই খবর পেয়ে লেখা মাথায় ওঠে তাজউদ্দীনের। লুঙ্গি আর গেঞ্জি পরেই তিনি বেরিয়ে যান ৩২ নম্বরের দিকে। জোহরার ডাকেও ফিরে তাকান না পেছনে। বলতে গেলে ছুটতে ছুটতেই চলে আসেন মুজিব ভাইয়ের বাসায়।

শেখ মুজিব তখন বসার ঘরে বসে পাইপ টানছেন, আর কী যেন আলাপ করছেন ফজিলাতুন্নেসার সাথে। এত রাতে তাজউদ্দীনকে দেখে তিনিও বেশ অবাক হন। পাইপ সরিয়ে উদ্বিগ্ন স্বরে বলেন, 'কী ব্যাপার তাজউদ্দীন? কী হইলো তোমার? কোনো খারাপ খবর আছে নাকি?'

তাজউদ্দীন ধার ধারেন না কোনো কিছুর। সময় নষ্ট না করে বলেন, 'মুজিব ভাই, প্লিজ, আপনি কথা দেন আমি এখন যা বলবো, তা মন দিয়ে শুনবেন। একদম হালকাভাবে নিবেন না।...' এই বলে তাজউদ্দীন হাঁপাতে হাঁপাতে মুজিব ভাইকে বলেন এইমাত্র শুনে আসা খবরটি। বলেন দ্রুত কোনো ব্যবস্থা নিতে।

শেখ মুজিব কিন্তু মুচকি মুচকি হাসেন তাজউদ্দীনের কথায়। মানুষটির সবচেয়ে বড় দুর্বলতা, তিনি বাংলাদেশের মানুষকে বিশ্বাস করেন বারবার। সব কথা শুনে শেখ মুজিব বলেন, 'তাজউদ্দীন, তুমি বড় টেনশন করো! এত টেনশন কইরো না, যাও, গিয়া ঘুমাও! ...আরে আর্মির অফিসার অরা তো সব আমার ঘরের পোলার মতো, অরা আমারে মারবো ক্যান?'

হাসতে হাসতে শেখ মুজিব এরপর পিতৃসুলভ অহঙ্কারে বলেন, 'বাংলাদেশের মানুষ আমারে মারতে পারবো না!'

৩২ নম্বর থেকে তাজউদ্দীন বেরিয়ে আসেন গভীর হতাশা নিয়ে। তিনি শেখ মুজিবের মতো অতটা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন না। তার বড় ভয় হয়। মুক্তিযুদ্ধের সময় রাজনীতির কদর্য বহু দিকেরই দেখা হয়ে গেছে তার, মুজিব ভাই হয়তো সেগুলো দেখেননি বলেই এতটা নির্ভয় থাকতে পারছেন। কিন্তু মুজিব ভাই জানেন না যে সংকটের সময়ে তার আশপাশের অনেক চেহারাই উলটো রূপে দেখা দেবে, তাজউদ্দীন ঠেকে শিখেছেন ওদের কাছ থেকে।

বাড়ির দিকে হাঁটতে থাকেন তাজউদ্দীন। ধানমণ্ডি লেকের পাড়ে এসময় প্রতিদিনই কিছু অন্ত্যজ মানুষ থাকে, সারাদিন খাটুনির পর লেকের পাড়ে রাতের

ঠান্ডা বাতাস গায়ে লাগায় তারা। ভাবনায় ডুবে থাকা তাজউদ্দীন তাদের দিকে একবার তাকিয়েই চোখ সরিয়ে নিলেন। বুশ শার্ট, লুঙ্গি আর চপ্পল পরে থাকা জ্বলজ্বলে চোখের যুবকটিকে তিনি তাই খেয়াল করলেন না।

তাজউদ্দীন চলে যাবার পরেও মিনিট পনেরো ধরে যুবকটি খুঁটিয়ে দেখে ৩২ নম্বরের বাড়িটা। মনে মনে কিছু হিসেব করে যুবকটি এরপর হাঁটতে হাঁটতে চলে যায় ময়মনসিং রোডের দিকে। তার পদক্ষেপ মাপা, ছন্দোবদ্ধ। মানুষের ব্যক্তিত্ব ওজনের অন্যতম উপায় তার হাঁটার ভঙ্গি যাচাই। যুবকের প্রতিটি পদক্ষেপ বুঝিয়ে দিচ্ছে, সে সাধারণ কেউ নয়।

অবশ্য, ফারুক নামের যুবকটি সাধারণ কেউ ছিল না। বাংলাদেশের আকাশের সবচেয়ে উজ্জ্বল সূর্যটিকে অন্ধকার করে দেয়ার লালরঙা পরিকল্পনা আঁটছে এই ফারুক। মাপা মাপা পদক্ষেপে তার সাথে হেঁটে চলেছে তিমির বর্ণের ইতিহাস।

সুঁই সুতোর জুডাসেরা

দেওয়ান ইশরাতুল্লাহ সৈয়দ ফারুক রহমান পদবিতে মেজর। সেনাবাহিনীর একমাত্র ট্যাঙ্ক ইউনিট ফার্স্ট বেঙ্গল ল্যান্সার্সের উপ-অধিনায়ক ফারুকের বাবাও ছিলেন আর্মি ডাক্তার। কোনো বিশেষ রাজনৈতিক বিশ্বাস সামনে নেই ফারুকের, তবু শেখ মুজিবের প্রতি তার তীব্র ক্ষোভ প্রস্তুত করে দিচ্ছে বাংলাদেশের ইতিহাসের সবচেয়ে অন্ধকার সময়ের পট।

এ ক্ষোভের জন্ম প্রায় বছরখানেক পূর্বে, ডেমরা টঙ্গী নারায়ণগঞ্জে সেনাবাহিনীর হয়ে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার কালে। বহু দুর্নীতির পেছনেই হাত আছে আওয়ামী লীগের সদস্যদের, অবৈধ অস্ত্রের একটা অংশের মালিকানাও তাদের হাতে। কাজেই পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালাতে গিয়ে তাদের সাথে দ্বন্দ্ব তৈরি হয় ফারুকের। দিনে দিনে ফারুকের ক্ষোভ কেবল বেড়েই চলে, কারণ গ্রেফতার করা অপরাধীদের অনেকেই ছাড়া পেয়ে যায় উপর থেকে আসা টেলিফোন নির্দেশে। এ সকল টুকরো টুকরো ঘটনা বিদ্রোহী করে তোলে মেজর ফারুককে, প্রমোশন আর ক্যারিয়ারের চিন্তার বদলে তার মস্তিষ্কে ঘুরপাক খায় কেবল প্রতিশোধের নেশা।

নেশায় মাতাল ফারুকের সমস্ত আক্রোশ অকারণে পুঞ্জীভূত হয় মুজিবের ওপরে। দড়ির ওপরে হেঁটে চলা শেখ মুজিবের কাঁধেই ভর করে আছে বাংলাদেশ, কিন্তু ফারুকের অপরিণত ক্ষোভ তাকে ইন্ধন দেয় মুজিবের পায়ের তলার দড়িটিকেই কেটে দিতে। রাষ্ট্রের অন্তর্ঘাতকেরা অথবা দুর্নীতিবাজেরা নয়, আশ্চর্যজনকভাবে রাষ্ট্রপতিই হয়ে ওঠেন ফারুকের লক্ষ্যবস্তু। কী করে শেখ মুজিব সরকারের পতন ঘটানো যায়, দাঁতে দাঁতে চেপে তা ভাবতে থাকে এই মেজর।

রাজনীতিতে কাঁচা ফারুক শুরু করে পড়াশোনা দিয়ে। চে গুয়েভারার ডায়েরি বা মাও সেতুং থিসিস পড়ে বাংলাদেশের রাজনীতির কোনো সামঞ্জস্য পায় না সে। বালখিল্য চিন্তায় প্রথমে ফারুক ভাবে শেখ মুজিবকে বন্দী করে কোথাও আটকে রাখা গেলেই হয়, কিন্তু বাংলাদেশের মানুষের কাছে বঙ্গবন্ধুর প্রবল গ্রহণযোগ্যতা ভেবে সে অনুধাবন করে এতে কোনো পরিবর্তন ঘটবে না আদৌ। কাজেই ফারুক সিদ্ধান্তে আসে, শেখ মুজিবকে চিরতরে সরিয়ে ফেলা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই তার সামনে।

শুরু হয় ফারুকের প্রস্তুতির পালা। ছদ্মবেশে ৩২ নম্বরের আশপাশে নিয়মিত ঘোরাফেরা করে সে, স্পাই থ্রিলারে পড়া অ্যাসাসিনদের মতোই সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করে নেয় শেখ মুজিবের গতিবিধি, অভ্যাস। বাংলাদেশ পর্যটন ব্যুরো থেকে কেনা একটা গাইড বইয়ের মানচিত্রের সাহায্যে নিজ পায়ে হেঁটে হেঁটে ফারুক নির্ধারণ করে লক্ষ্যবস্তুর চারপাশে তার আর্টিলারির সম্ভাব্য অবস্থান। শেখ মুজিব ছাড়াও তার ডায়েরির পাতায় উঠে আসে শেখ মনি আর আবদুর রব সেরনিয়াবাতের নাম। এই দুই রাজনীতিক অত্যন্ত প্রভাবশালী, আবার তারা শেখ মুজিবের আত্মীয়ও বটে। ফারুক স্থির করে, মেরে ফেলতে হবে এদের তিনজনকেই।

প্রস্তুতির এ পর্যায়ে মেজর ফারুক সাহায্য চেয়ে বসে মেজর রশিদের। রশিদ দ্বিতীয় ফিল্ড আর্টিলারির কমান্ডিং অফিসার। ধীর স্থির রশিদ সম্পর্কে অস্থিরমতি ফারুকের ভায়রা ভাই। দুজনের ব্যক্তিত্ব দুই মেরুর, কিন্তু এক জায়গায় দুজনের মাঝে রয়েছে আশ্চর্য সাদৃশ্য। মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হয়ে আবুধাবীর আর্মড রেজিমেন্টে স্কোয়াড্রন কমান্ডার ছিল ফারুক, সেখান থেকে পালিয়ে সে যুদ্ধে যোগ দেয় বিজয় লাভের দিন তিনেক আগে। আর মেজর রশিদ যুদ্ধকালে তার আর্টিলারির সাথে ছিল কাশ্মিরে, সেনাবাহিনী থেকে ছুটি নিয়ে সে যুদ্ধে যোগ দেয় নভেম্বরে। দুই অপরিপূর্ণ মুক্তিযোদ্ধা, তারা পরিকল্পনা আঁটতে থাকে একটি হত্যাকাণ্ড দিয়ে দেশকে পরিপূর্ণভাবে বদলের।

ফারুকের প্রস্তুতির প্রাথমিক পর্বে একটি ট্রেনিঙের কারণে ভারতে অবস্থান করছিল রশিদ। দেশে ফিরে ফারুকের ডাকে সাড়া দিয়ে সেও যোগ দেয় এই পরিকল্পনায়। বিভিন্ন মহলে যোগাযোগের দায়িত্বটা চাপে মূলত রশিদের ওপরেই। দুজনে ভেবে দেখে, শেখ মুজিবকে যদি সামরিক পন্থায় সরিয়ে দেয়া যায়ও, তবু পরের তাৎক্ষণিক পরিস্থিতি সামাল দিতে দরকার একজন রাজনীতিক। ভাবতে গিয়ে প্রথমেই মেজরদ্বয়ের মাথায় আসে খন্দকার মোশতাকের নাম। রশিদ শুরু করে তার পূর্ব পরিচিত এ মানুষটির সাথে যোগাযোগ ঝালাই করা।

রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে অ্যামেচার দুই মেজর ভেবে দেখে সেনাবাহিনীর সিনিয়র অফিসারদের মাঝ থেকেও কিছু সমর্থন দরকার, নইলে তাদের মতো

দুজন জুনিয়র অফিসার পার পাবে না প্রতিবিপ্লব হতে। সেনাবাহিনীর উপপ্রধান জেনারেল জিয়াউর রহমান যথেষ্ট পছন্দসই মুখ তাদের কাছে। আবার সেনাবাহিনীর প্রধান হিসেবে নিয়োগ না পাওয়ায় শেখ মুজিবের ওপর জেনারেল জিয়ারও ক্ষোভ থাকা স্বাভাবিক। হিসেব কষে ফারুক তাই গিয়ে হাজির হয় জেনারেল জিয়ার কাছে। বলে, 'স্যার, দেশের এখানে ওখানে কী রকম দুর্নীতি-খুন-রাহাজানি চলছে দেখছেন তো! পুরা সিস্টেম স্যার একদম করাপ্টেড হয়ে যাচ্ছে। আমাদের স্যার একটা পরিবর্তন দরকার।'

ডেপুটি চিফ অব আর্মি স্টাফ বলেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, চলো আমরা বাইরে লনে গিয়ে কথা বলি।'

বাইরের লনে গিয়ে ফারুক ইনিয়ে বিনিয়ে বলে, 'স্যার, পেশাদার সৈন্য হিসেবে আমাদের কাজ দেশ রক্ষা। কিন্তু সামরিক-বেসামরিক সব দিকেই আমরা গোল্লায় যাচ্ছি। আমরা স্যার একটা চেঞ্জ চাই। এমন অবস্থায় আপনি যদি সাথে থাকেন...'

জেনারেল জিয়ার মুখ ভাবলেশহীন দেখায়। তিনি বলেন, 'আমি দুঃখিত, এ ধরনের কোনো কিছুতে আমি নিজেকে জড়াতে চাই না। তোমরা জুনিয়র অফিসারেরা যদি কিছু করতে চাও, তাহলে তোমাদের নিজেদেরই তা করা উচিত। এ সবের মাঝে আমাকে টেনো না।'

অদ্ভুত এই প্রত্যুত্তর স্টেশনমাস্টারের সবুজ পতাকা দেখানোর কথা মনে করিয়ে দেয় ফারুককে। সে বুঝে নেয়, তার প্রতিহিংসার রেলগাড়িটির অশুভ যাত্রায় জেনারেল জিয়া যদি কোনো রকম সাহায্য নাও করেন, অন্তত কোনো বাধা তিনি দিচ্ছেন না।

ইতোমধ্যে ভাগ্যও সবকিছুই নিয়ে আসতে থাকে মেজরদ্বয়ের অনুকূলে। রশিদ ভারত থেকে ট্রেনিং নিয়ে ফিরে আসার পর যশোরে বদলি করে দেয়া হয়েছিল তাকে, কিন্তু পরবর্তীতে বাতিল হয়ে যায় সে বদলির আদেশ।

দ্বিতীয় ফিল্ড আর্টিলারির কমান্ডিং অফিসার রশিদের রয়েছে আঠারোটি কামান, ফার্স্ট বেঙ্গল ল্যান্সার্সের সেকেন্ড ইন কমান্ড ফারুকের রয়েছে ত্রিশটি ট্যাঙ্ক। এই দুই দিয়ে রক্ষীবাহিনীসহ যে কাউকে ঠেকিয়ে দেয়া সম্ভব, কিন্তু কারো মনে সন্দেহ না জাগিয়ে সেই কাজটি করা যায় কীভাবে?

রশিদ নিয়ে আসে এর সমাধান। মাসে দুইবার ট্রেনিং এক্সারসাইজ করতে হয় বেঙ্গল ল্যান্সার্সকে। রাতের অন্ধকারে অস্ত্র বেছে নিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে শত্রুর মোকাবেলা করতে শেখাই এই ট্রেনিং-এর উদ্দেশ্য। উপরওয়ালাদের কাছে রশিদ প্রস্তাব করে, তার আর্টিলারিকেও ফারুকের বেঙ্গল ল্যান্সারদের সাথে ট্রেনিং করতে দেয়া হোক। সেনাসদর এই যুক্তিযুক্ত প্রস্তাব মেনে নিলে একত্রিত হয়ে যায় তাদের সামরিক শক্তি। এরপরে মার্চ থেকে প্রতি মাসেই বার দুয়েক রাতের

আঁধারে ট্রেনিং চালিয়ে ইউনিটের চলাচলের সাথে অভ্যস্তও করে ফেলা হয় সকলকে।

সবই ঠিকঠাক চলছিল, কিন্তু গুঞ্জন আর ফিসফাস ঠেকানো গেল না। খবর ছড়িয়ে গেল, সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরে অচিরেই একটি অভ্যুত্থান হতে যাচ্ছে আর এর সাথে মেজর রশিদ বলে একজন জড়িত। বিভিন্ন সময় নানা সিনিয়র-জুনিয়র অফিসারের সাথে দেশের অভ্যন্তরীণ নৈরাজ্য নিয়ে আলাপ করেছে রশিদ। সন্দেহ থাকে না, কথা ফাঁস হয়েছে সেখান থেকেই। রশিদ স্থির করে ফেলে, আর সময় নষ্ট করা যায় না। দেরি করলে গোয়েন্দা বিভাগ সবকিছুই বের করে ফেলতে পারে।

খন্দকার মোশতাকের সাথে এতদিনের ঝালাই করা যোগাযোগের আসল উদ্দেশ্যটা আগস্ট মাসের শুরুতে বাণিজ্যমন্ত্রীর কাছে খোলাসা করে মেজর রশিদ। মোশতাকের আগামসি লেনের বাড়িতে তখন সদ্য সন্ধ্যা নামা অন্ধকার, রশিদের হাতে মন্ত্রীর সাথে দেখা করার অজুহাত হিসেবে ধরা একটি স্কুটার কেনার পারমিটের দরখাস্ত।

সুকৌশলে সেনা সদস্যটি আলোচনার মোড় ঘুরায় রাজনীতির দিকেই। বলে, 'দেশের এখনকার পরিস্থিতি তো স্যার দেখতেই পারতেছেন। অবস্থা স্যার খুবই খারাপ।'

'খুবই সত্যি কথা।' মোশতাক মাথা নাড়েন।

'আপনি স্যার সিনিয়র একজন নেতা, আপনার কি মনে হয় শেখ মুজিবের সরকার দিয়ে দেশের কোনো উন্নতি হবে?'

সতর্ক হয়ে ওঠেন মোশতাক। 'আমার মনে হয় না। তাঁর নেতৃত্বে জাতি কিছুই আশা করতে পারে না।'

মেজর রশিদ এবার স্পষ্টতম ইঙ্গিত দিয়ে বলে মোশতাককে, 'দেশের স্বার্থে স্যার শেখ মুজিবকে সরিয়ে দিলে কেমন হয়?'

মোশতাকের দুই চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। 'খুবই ভালো হয়, কিন্তু কাজটা যথেষ্টই কঠিন।'

'কিন্তু কেউ যদি সেই কঠিন কাজটাই করে ফেলে, আপনি কি তাদের সাথে থাকবেন?'

খন্দকার মোশতাক নড়ে চড়ে বসেন। 'সেইটা না হয় থাকলাম।' এই বলে নিজের সুপ্ত ইচ্ছেটাও মেজরকে জানান দিয়ে দেন বাণিজ্যমন্ত্রী। 'মুজিবের একজন বিকল্পও তো থাকা লাগবে, তাই না?'

... মেজর রশিদ ফিরে যায় ঘটনার চূড়ান্ত পরিকল্পনা সাজাতে। আর মোশতাক, সেই মোশতাক যিনি সময়ে অসময়ে বিষোদ্গার করে বেড়ান শেখ মুজিবের নামে অথচ নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছেন মুজিবের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে,

সেই মোশতাক যিনি যুদ্ধদিনের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীনকে সরিয়ে দিয়ে নিয়েছেন একাত্তরে হেরে যাবার নির্মম প্রতিশোধ, সেই মোশতাক যাকে নিয়ে বঙ্গবন্ধু রসিকতা করেন কাছের মানুষ ভেবে; তিনি প্রস্তুত হতে লাগলেন একটি ভিন্ন দিক দিয়ে। ঢাকার মার্কিন দূতাবাসের মাধ্যমে তার পরিচিত আমেরিকান লবিকে আসন্ন পরিস্থিতির ইঙ্গিত দিয়ে রাখেন খন্দকার মোশতাক।

তিনি একা নন, সাথে থাকে তার দুই নন্দী ভৃঙ্গী। একজন সেই মাহবুবুল আলম, মার্কিন আঁতাত প্রকাশ পেয়ে যাওয়ায় মুজিবনগর সরকার যাকে বরখাস্ত করেছিল– চট্টগ্রামে চাষবাসে ব্যস্ত হয়ে যিনি যুদ্ধের আগেই নামের সাথে লাগিয়েছিলেন 'চাষি' শব্দটি। অন্যজন সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ে কর্মরত তাহেরউদ্দীন ঠাকুর, যাকে একদা আবদুল গাফফার চৌধুরী 'সরাইলের সারমেয়' বলে পত্রিকায় সমালোচনা করার পর শেখ মুজিব রসিকতা করে বলেছিলেন, 'কারো চেহারা-সুরত নিয়া ঠাট্টা করবা না গাফফার!'

ইতিহাস সুঁই হিসেবে খুঁজে নিল দুইজন প্রতিশোধ পরায়ণ মেজরকে, তাদের সাথে সময়ের কালো সুতোয় বাঁধা একদল জুডাসও জুটে গেল। তারা প্রস্তুত হতে লাগল অসময়ের ফোঁড় দিতে। বাংলাদেশের বাতাস তখন অমঙ্গলের আশঙ্কায় ভারী, বাংলাদেশের নদীর জল অস্বচ্ছ করে নিচে হাঙ্গরের দাপাদাপি।

আর আকাশের অজানা নিকট ভবিতব্য, নক্ষত্র শেখ মুজিবের আয়ু ফুরিয়ে আসে ক্রমশ।

মাকড়সার দল

মেজর রশিদ যখন ঘামতে ঘামতে আগামসি লেনের বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়াল, বেলা তখন প্রায় আড়াইটা। আগস্ট মাসের গুমোট গরমে তার অবস্থা কাহিল। খন্দকার মোশতাক বাসাতেই আছেন, গেটে থাকা চাকরটার কাছে এ খবর জেনে রশিদ কিছুটা আশ্বস্ত হয়। অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়াই আজকে মোশতাক সাহেবের বাড়ি এসেছে রশিদ, সামনে এগোবার পূর্বে সে শেষবারের মতো যাচাই করতে এসেছে বাণিজ্যমন্ত্রীর অবস্থান।

বসার ঘরে রশিদকে খুব বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় না। মোশতাক এসে হাজির হন মুখে একটা হাসি ঝুলিয়ে। 'বসেন, বসেন মেজর সাহেব, কী অবস্থা আপনাদের?'

হাতে সময় নেই, রশিদ তাই সরাসরি চলে যায় কাজের কথায়। 'স্যার, সামনের উইকে কি আপনার ঢাকা বা দেশের বাইরে কোথাও যাওয়ার প্রোগ্রাম আছে নাকি?'

মাথার টুপিটা হাত দিয়ে টেনে ঠিক করতে করতে মোশতাক বলেন, 'না তো মেজর সাহেব! আমি তো ঢাকাতেই আছি।'

'মানে স্যার, দরকারে যেকোনো সময়েই তাহলে আপনাকে পাওয়া যাবে, তাই তো?' রশিদ প্রশ্ন করে।

খন্দকার মোশতাক এক মুহূর্ত রশিদের চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে থাকেন। মেজরের প্রশ্নের তাৎপর্য বুঝে নিতে ধূর্ত বাণিজ্যমন্ত্রীর এতটুকু অসুবিধা হয় না। মোশতাক অতএব মিটমিট করে হাসা শুরু করেন।

... মিনিট কয়েক পরেই মেজর রশিদকে দেখা যায় মোশতাকের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে। একটা রিকশা নেয় রশিদ। নির্জন রাস্তা, তবু হুড দিয়ে নিজেকে খানিক আড়াল করে নেয় সে। এখনো দুপুরের খাবার খাওয়া হয়নি, ক্ষুধা লেগেছে তার খুব। কিন্তু গতরাতের পার্টিটার কথা মনে হতেই মাথা থেকে খাবারের চিন্তা উবে যায় মেজর রশিদের।

ফারুকের তৃতীয় বিবাহ বার্ষিকী ছিল গতকাল। ঢাকা গলফ ক্লাবের আলোকোজ্জ্বল নিয়ন বাতি, লনের সবার হাতে পানীয়ের গ্লাস, মুখে হাসি অতিথিদের মাঝে ঘর আলো করে ছুটে বেড়াচ্ছে ফারুকের সুন্দরী স্ত্রী ফরিদা। এসবেরই ফাঁকে ফারুক ফিসফিসিয়ে হঠাৎ রশিদের কানে কানে বলেছে, '১৫ তারিখেই আমি কাজ সারবো, বুঝলা! ঐদিন শুক্রবার, দিনটা আমার জন্যে লাকি। কাজেই শেখ মুজিবকে আমি ঐদিনই সরাবো...'

কথা বলবার সময় ফারুকের চোখে যে দৃঢ় সংকল্প দেখেছে রশিদ, তাতে সে বুঝে নিয়েছে ফারুক এবার বদ্ধপরিকর, আর দেরি করতে একদম রাজি নয় সে। কাজেই রশিদের দেরি করলে চলবে না, আজকের মাঝেই সারতে হবে বেশ কিছু কাজ। মোশতাকের তরফ থেকে নিশ্চিত হয়ে এরই মাঝে একটা কাজ সেরে ফেলেছে রশিদ।

রশিদ জানে, শেখ মুজিবকে সরিয়ে দেয়ার মতো বড়সড় অপারেশন কেবল তাকে আর ফারুককে দিয়ে সম্ভব নয়। আরো লোক লাগবে তার। কিন্তু মন খুলে এখন আর আলাপ করা যাবে না কারো সাথেই, ভয় আছে কথা ছড়িয়ে যাবার। ধুরন্ধর রশিদ তাই দল ভারী করতে এমন কিছু মানুষকে গোনায় ধরে রাখছে, যারা তাকে কিছুতেই প্রত্যাখ্যান করবে না- সে নিশ্চিত! এরা আর কেউ নয়, এরা সেই মেজর ডালিমের সাথে পদচ্যুত সামরিক অফিসারের দল। শেখ মুজিবের প্রতি এদের ঘৃণা আর ক্ষোভ পুঞ্জীভূত অনেক দিন ধরেই। সকালে রশিদ আবছাভাবে ডালিমকে জানিয়েছে কী করতে চায় তারা, কিন্তু গোপন রেখেছে অপারেশনের বিস্তারিত। আজ রাতে নিজের বাসাতেই ডালিমকে সব খুলে বলবে, এমনটাই ইচ্ছা তার।

সে রাতে ডালিমের সাথে সাথে চাকরিচ্যুত মেজর নূরকেও দেখা গেল রশিদের বাসায়। রশিদ তাদের জানিয়ে দিল, শেখ মুজিবকে সরিয়ে দেয়ার পরে আপাতত মোশতাককে তার জায়গায় বসিয়ে দেয়ার প্ল্যান আছে তাদের।

মোশতাকের সাথে নিজের সংশ্লিষ্টতা প্রমাণে পরদিন বিকালে মেজর নূরকে নিয়েই বাণিজ্যমন্ত্রীর বাড়িতে আবারো মুখ দেখিয়ে আসল রশিদ। এই যাত্রায় মেজর শাহরিয়ারও যোগ দিল তাদের দুজনের সাথে।

১৪ই আগস্টের দিন জুড়ে এভাবে যখন শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত মেজর রশিদেরা, সেই বিশেষ দিনটির দুপুর বেলায় চট্টগ্রামের হালিশহরে আন্ধা হাফিজ নামের এক স্থানীয় পীরের সাথে দোয়া চাইতে দেখা গেল এক মহিলাকে। এই মহিলা আর কেউ নয়, মেজর ফারুকের স্ত্রী ফরিদা। অতীন্দ্রিয়তে বিশ্বাসী ফারুক মাস তিনেক আগে নিজেই একবার দেখা করে গেছে এই আন্ধা হাফিজের সাথে, তবু চূড়ান্ত কাজে নামার আগে সে আরো একবার আশীর্বাদ চায় জন্মান্ধ এই ভবিষ্যদ্বক্তার কাছ থেকে।

আন্ধা হাফিজের ঘরের এক কোনায় বাঁধা রশির উপর ঝুলছে কিছু ভেজা পোশাক। দৃষ্টিহীন মানুষটির গায় লুঙ্গি আর সুতি গেঞ্জি। ফরিদা এমন পরিবেশেই নিচুস্বরে তার স্বামীর পাঠানো বার্তাটি শুনায় দরবেশকে।

ফরিদার বক্তব্য শুনে আন্ধা হাফিজ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। উর্দু বাংলা মেশানো ভাষায় উদাস স্বরে বলেন, 'মানুষের একটা বড় দুর্বলতা কী জানেন আম্মা? মানুষ তার লক্ষ্য ঠিক করার সময়ে তকদিরের কথা খেয়াল রাখে না। শুধু কাজে নামার সময় আর কাজের মাঝে বিপদ হইলেই সে কপালরে স্মরণ করে। অথচ বাকি পুরাটা সময় মানুষ ভাবে, সে নিজেই নিজের ভাগ্যনিয়ন্তা...'

আন্ধা হাফিজ ফরিদার কপালে হাত ছুঁইয়ে বলেন, 'চিন্তা কইরেন না আম্মা। সবই আল্লাহর ইচ্ছা। উনিই সকল জানমালের মালিক।'

দরবেশের চিন্তা না করা সংক্রান্ত উক্তিটি ফরিদার আশঙ্কা প্রশমিত করে অনেকটা। ফোন মারফত ফরিদা আন্ধা হাফিজের নির্দেশ বিকেল নাগাদ পৌঁছে দেয় ফারুকের কাছে।

তার কিছু পরেই ঢাকা শহরে নেমে আসে ১৪ই আগস্টের সন্ধ্যা।

শেখ মুজিবুর রহমান সেদিন তার ৩২ নম্বরের বাসায় ফিরে আসেন সাড়ে আটটার দিকেই। আগামীকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রোগ্রাম আছে তার, অফিসে তিনি নির্দেশ দিয়ে এসেছেন তা নিয়ে একটা ভাষণ তৈরি করে দিতে। রেনু আর রাসেল বাসাতেই আছে। আছে তার দুই নতুন পুত্রবধূ সুলতানা আর রোজী। খুলনা থেকে ছোট ভাই শেখ নাসেরও এসেছে আজ। কামাল আর জামাল কোথায় যেন বেরিয়ে গেছে। দুই মেয়ে হাসিনা আর রেহানা অবশ্য দেশেই নেই। নাতি জয়ের সাথে সময় কাটানোটা অবসর যাপনের বড় চমৎকার রাস্তা ছিল শেখ মুজিবের, হাসিনারা চলে যাবার পর থেকে সেটার খুব অভাব বোধ করছেন তিনি।

খাবার টেবিলেও সেদিন শেখ মুজিব অন্যমনস্ক হয়ে থাকেন। কে জানে, হয়তো নাতির কথা ভেবেই বারবার মন বিষণ্ন হয়ে যায় তার। কিংবা হয়তো

সামনের দিনের দেশ পরিচালনা সংক্রান্ত কঠিন কোনো প্রশ্ন নাড়া দেয় তাকে। অথবা হয়তো তার মনে ভিড় করে কোনো অজানা আশঙ্কা।

কামাল সেদিন বাসায় ফেরে রাত করে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা থেকে নিরাপত্তা বিষয়ক খবরাখবর নিয়ে আসে সে। জামাল ক্যারাম খেলে আশপাশের বাড়ি থেকে। সবার সাথেই টুকটাক কথা বলেন শেখ মুজিব। শুতে যাবার আগে মাঝ রাত পেরিয়ে যায়।

সাতমসজিদ রোডের তাজউদ্দীনের বাড়িতেও সেই সন্ধ্যায় অন্যান্য দিনের চাইতে মানুষের সংখ্যা বেশি। রিমি রিপির এক খালাতো বোন বেড়াতে এসেছে। জোহরার মামাতো ভাই আবু তালেব রাজশাহীর এসপি, সরকারি কাজে ঢাকায় এসে সে গতকালই উঠেছে এখানে। সন্ধ্যায় তাজউদ্দীন ডায়েরি লিখতে বসেছিলেন, কিন্তু অর্থ মন্ত্রণালয়ের আনোয়ার নামের এক পিয়ন দেখা করতে আসায় সে কাজ বেশি এগোয়নি। রাত হয়ে যাওয়ায় তাজউদ্দীন আনোয়ারকেও আজ এখানেই থেকে যেতে বলেছেন। আগামীকাল ভোরে কাপাসিয়া যাবার কথা তাজউদ্দীনের। একটু আগেভাগেই তাই বিছানায় যান তিনি।

অথচ এই দুটি বাড়ির নিরুদ্বেগ পরিবেশের সাথে মেলানো যায় না শহরের অন্য প্রান্তকে। সেখানে ক্যান্টনমেন্টের পেছনে অবস্থিত নির্মীয়মাণ কুর্মিটোলা বিমানবন্দরে তখন শুরু হয়ে গেছে ফার্স্ট বেঙ্গল ল্যান্সার আর সেকেন্ড ফিল্ড আর্টিলারির এমন এক 'মহড়া', ধানমণ্ডির ৩২ নম্বর রোডের বাড়িটি যার চূড়ান্ত গন্তব্য।

ভবিষ্যতের এয়ারপোর্টে ইট সুড়কি ইতস্তত ছড়িয়ে আছে এদিক সেদিক। এগুলোর মাঝেই রশিদ প্রস্তুত করে ফেলেছে তার আঠারোটি কামান, সাথে এক ডজন ট্রাক বোঝাই সৈন্যও নিয়ে আসে সে। ফারুক নিয়ে আসে আটাশটি ট্যাঙ্ক। একে একে চলে আসে মেজর ডালিম, মেজর বজলুল হুদা, মেজর পাশা। মেজর নূর, মেজর মহিউদ্দীন, মেজর শাহরিয়ারও উপস্থিত হয়। কয়েকশো সৈন্যও সাথে আছে এই অফিসারদের।

অপারেশনের সর্বময় কর্তৃত্বে আছে মেজর ফারুক। এই পর্যায়ে এসে অপারেশনের মূল পরিকল্পনা সে খোলাসা করে সব অফিসার আর অল্প কজন বিশ্বস্ত এনসিও'দের। প্রায় সমস্ত সৈনিক তখনো নির্মীয়মাণ এয়ারপোর্টের মতোই নিমজ্জিত আঁধারে, অদূর ভবিষ্যতের কিছু আঁচ কেউ কেউ পেলেও সে মুহূর্তে তাদের নিজস্ব ইচ্ছার মূল্য থাকে না কোনো। সৈনিকেরা তো দাবার ঘুঁটি কেবল, সামরিক বাহিনীতে তাদের নিজস্ব বোধ-বিবেচনা-অহং-এর অস্তিত্ব নেই। তাদের একমাত্র দায়িত্ব কন্ট্রোলিং কমান্ডারের হুকুম তামিল করা।

আলো আলো ছায়ার মাঝে এয়ারপোর্ট রোড ধরে যখন যাত্রা শুরু করল ফারুকের ট্যাঙ্ক কাফেলা, তখন ফজরের আজান হচ্ছে ঢাকায়। খেয়াল করে

দেখেনি কেউ, করলে হয়তো মনে হতো তার– রাজধানী শহরটির বুকে যেন পা টিপে টিপে এগোচ্ছে একদল ধাতব মাকড়সা। ভোরের ওই ছায়া ছায়া আলো সময়ে তাদের ঊর্ণনাভ জাল বড় অস্পষ্ট, ইতিহাস ছাড়া সেই মুহূর্তে তা প্রত্যক্ষ করার কেউ নেই।

খুনি কাঠঠোকরা, নিরুদ্বিগ্ন জেনারেল আর তৎপর রাজনীতিবিদের সকাল

ঢাকার বুকে এক অদ্ভুত সকাল হচ্ছে আজ। ক্রমশ স্পষ্ট হতে থাকা দিনের আলোতে দানবীয় কিছু মাকড়সা ট্রুপ এগিয়ে যাচ্ছে পিচ ঢালা রাস্তার ওপর।

অপারেশনের সাফল্য নিশ্চিত করতে ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে আছে অফিসারেরা। শেখ মুজিবের বাসভবনের দিকে যাচ্ছে মেজর মহিউদ্দিন, মেজর নূর, মেজর হুদা। শেখ মুজিবের ভগ্নিপতি আবদুর রব সেরনিয়াবাতের বাড়ি মিন্টু রোডে, মেজর ডালিম কমান্ড দিচ্ছে এই বাড়ি আক্রমণ করতে যাওয়া দলটির। ফারুকের একান্ত বিশ্বাসভাজন রিসালদার মোসলেমউদ্দীনকে দেয়া হয়েছে শেখ মনির ধানমণ্ডির বাড়ি আক্রমণের।

রেডিও স্টেশন, বিশ্ববিদ্যালয়, নিউমার্কেট এলাকার দিকেও রাখা হয়েছে সৈন্য। এদের কাজ বিডিআরের সম্ভাব্য আক্রমণ ঠেকানো। শেখ মুজিবকে সরিয়ে দেয়া গেলে পরবর্তীতে যে রাজনৈতিক সমন্বয় দরকার হবে, সেটা সামলানো হচ্ছে রশিদের দায়িত্ব। রশিদের কামানগুলো ইতোমধ্যে এয়ারপোর্টেই গোলা ভর্তি অবস্থায় তাক করে রাখা হয়েছে রক্ষীবাহিনী হেডকোয়ার্টার আর ধানমণ্ডিতে শেখ মুজিবের বাড়ির দিকে, দূরপাল্লার কামানগুলোর রেঞ্জের মাঝে রয়েছে উভয় টার্গেটই। শুধুমাত্র একটা কামান সঙ্গে দেয়া হয়েছে শেখ মুজিবের বাড়ি আক্রমণ করতে যাওয়া দলটির, ঠিক করা হয়েছে সেটাকে লেকের এপাশে বসিয়ে গোলা ছোড়া হবে বাড়িটিতে।

মেজর ফারুক নিজে নিয়েছে একটি কঠিন দায়িত্ব। শেখ মুজিবকে হত্যা করা হলে প্রতি আক্রমণের সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি রক্ষীবাহিনীর দিক থেকে। ট্যাঙ্ক কাফেলা দিয়ে সেই রক্ষীবাহিনীকে ঠেকানোর কাজ নিয়েছে ফারুক। কিন্তু যে বিষয়টা অনবরত খোঁচাচ্ছে ফারুককে, তা হলো– তার ট্যাঙ্কগুলো একদম খালি। কোনো গোলাবারুদ বা মেশিনগানের গুলি ট্যাঙ্কে নেই। উপায়ান্তর না দেখে মেজর ফারুক ঠিক করেছে খালি ট্যাঙ্কগুলোই তাক করে রাখা হবে রক্ষীবাহিনীর দিকে। চতুর ফারুক জানে, ফাঁকা অবস্থায়ও ট্যাঙ্ক দারুণ রকমের মনস্তাত্ত্বিক অস্ত্র। সত্যিই তাতে গোলা আছে কি না, তা পরীক্ষা করার ঝুঁকি আদৌ কজন নিতে যাবে?

...চিন্তায় বুঁদ হয়ে থাকা মেজর ফারুক যখন এগোচ্ছে রক্ষীবাহিনীকে সামলাতে, বাংলাদেশের সবচেয়ে বিখ্যাত বাসভবনটির সামনে ততক্ষণে ভিড় করেছে সৈন্য বোঝাই বেশ কিছু ট্রাক, জিপ, কামান। একজন রাষ্ট্রপতির বাড়ি হিসেবে বিস্ময়কর রকমের দুর্বল নিরাপত্তা বেষ্টনী বাড়িটিকে ঘিরে, কেউ কখনো যেন ভাবতেই পারেনি– একদিন এ বাড়িটিকেও পরীক্ষা দিতে হবে রক্ষা আবরণের স্থায়িত্বের। বিপজ্জনক রকমের খোলামেলা এক পিতৃসুলভ ভালোবাসায় এ বাড়ির একজন মানুষ সারাজীবন ভিজিয়েছেন বাংলাদেশকে, তার ধারণা ছিল, বাড়িটির রক্ষাকবচ হয়ে থাকবে সেই ভালোবাসার কুণ্ডলিই।

টুঙ্গিপাড়ার ধানখেত থেকে নেত্রকোনার হাওড় হয়ে কর্ণফুলী নদী পর্যন্ত ছড়িয়ে আছেন সেই মানুষটি। ইতোমধ্যেই তিনি জায়গা নিয়েছেন এ দেশের কতশত গল্পে, তার তর্জনির ছায়ায় যুদ্ধ করেই স্বাধীন একটি দেশ নিয়ে এসেছে বাংলাদেশের মানুষ। সেই তর্জনির মানুষ, সেই শেখ মুজিব কখনো ভাবতেই পারেননি বাংলাদেশের মানুষ বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে তার সাথে।

এই মুহূর্তে প্রতিশোধপরায়ণ আর্মি অফিসারেরা গুলিবর্ষণে উন্মুক্ত করে দিচ্ছে ৩২ নম্বরের রক্ষা আবরণ। শেখ মুজিব একটু আগেই দোতলা থেকে নিচে নেমে এসেছেন, পিএ মহিতুল ইসলামকে তিনি বলতে এসেছিলেন, 'মহিতুল, সেরনিয়াবাতের বাড়িত কারা য্যান অ্যাটাক করছে– জলদি পুলিশ কন্ট্রোল রুমে লাইন লাগা!'

কিন্তু ঘাতক দল ইতোমধ্যে ঢুকে পড়ে স্বয়ং শেখ মুজিবেরই বাড়ির সীমানায়। নিচতলার জানালা সশব্দে ভেঙে পড়ে গুলিতে। শেখ মুজিব বুঝে যান পরিকল্পিত কোনো আক্রমণের স্বীকার হয়েছেন তিনি। আবার দোতলায় উঠে যান শেখ মুজিব, নানা নম্বরে ফোন ঘোরাতে থাকেন সাহায্যের জন্যে।

বঙ্গবন্ধু ফোনে পেয়ে যান তার নিরাপত্তার দায়িত্ব নিয়োজিত মিলিটারি সেক্রেটারি কর্নেল জামিলকে। 'জামিল? ...তুই তাড়াতাড়ি এইখানে আয়! কিছু লোকে আমার বাড়ি অ্যাটাক করছে! শফিউল্লাহরে ক তাড়াতাড়ি ফোর্স পাঠাইতে!'

কর্নেল জামিল রাষ্ট্রপতির নির্দেশ পেয়েই বেরিয়ে পড়েন, ট্রাউজারের ওপর ড্রেসিংগাউন চাপিয়ে সাথে সাথেই নিচে নেমে আসেন তিনি। নিজের লালরঙা ভোক্সওয়াগনে করে ড্রাইভার আয়েনউদ্দীনকে নিয়ে কর্নেল জামিল রওয়ানা দেন ধানমণ্ডি ৩২ এর দিকে। সোবহানবাগের কাছাকাছি এসে দেখা যায়, সামনে রোড ব্লক। কর্নেল জামিল ড্রাইভারকে নির্দেশ দেন পায়ে হেঁটে যতদূর পারা যায় সামনে গিয়ে পরিস্থিতি দেখে আসতে, আর চালকের আসনে এবার গিয়ে বসেন তিনি নিজে। এগোতে থাকেন ব্যারিয়ারের দিকে।

রোড ব্লকের সামনে গাড়ি থেকে কর্নেল জামিল নেমে আসেন দুই হাত উপরে তুলে। পাহারায় থাকা গার্ডদের নিজের পরিচয় দিয়ে বলেন, 'কী করতোছো

তোমরা? রাস্তা ছাড়ো। ভেতরে যাইতে দাও! আমাকে প্রেসিডেন্টের কাছে যাইতে হবে।'

সৈন্যেরা উত্তর দেয়, 'স্যার, এখন ওদিকে যাওয়া যাবে না। গভর্মেন্ট চেঞ্জ হয়ে গেছে স্যার, শেখ সাহেব এখন হাউস অ্যারেস্ট। আপনি ফিরে যান।'

কর্নেল জামিল হুঙ্কার দেন, 'কিসের হাউজ অ্যারেস্ট! রাস্তা ছাড়ো, আমি দেখে আসতে চাই তোমরা কী করতেছো!'

এই বিতণ্ডার মাঝেই দৃশ্যপটে হঠাৎ উদয় হয় আরো একজন মানুষ। আবদুল বাতেন।

কাকতালীয়ই বলতে হবে, একদল তাবলিগের সাথে ১৪ আগস্টের রাতে সোবহানবাগ মসজিদে রাত কাটিয়েছে আবদুল বাতেন। ভোর না হতেই প্রচুর গোলাগুলির শব্দে সে এদিক সেদিক তাকিয়ে চেষ্টা করেছে পরিস্থিতি বুঝবার। খানিক আগে কর্নেল জামিলকে হাত তুলে সামনে এগোতে দেখেই সাহস করে মসজিদ থেকে বেরিয়ে এসেছে সে।

সৈনিকদের সাথে কর্নেল জামিলের কথোপকথন শুনে ভোর থেকে শোনা গুলির শব্দগুলো অনুবাদ করতে এ মুহূর্তে বাতেনের কষ্ট হয় না। কর্নেল জামিলের পেছনে থেকে সে তাই চিৎকার করে বলে, 'মিথ্যা কথা বলতেছে স্যার! হাউজ অ্যারেস্ট না, শেখ সাহেবরে ওরা গুলি করছে!'

কর্নেল জামিল পেছনে তাকিয়ে বাতেনকে একবার লক্ষ করেন, তারপর আবার দৃষ্টি দেন গার্ডদের প্রতি। 'সত্যি বলতেছে এই লোকটা?... দেখি, সরো। আমাকে ভিতরে যাইতে দাও।'

কিন্তু এই বচসা আর সহ্য হয় না সৈনিকদের। কর্নেল জামিল আর আবদুল বাতেনের মাথা বরাবর গুলি চালিয়ে দেয় তারা। অশুভ ভোরের এই হত্যাপর্বটিও সম্পন্ন হয় অমানুষিক নিষ্ঠুরতায়। শেখ মুজিবের ডাকে কর্তব্য পালন করতে গিয়ে জীবন দিয়ে দিলেন কর্নেল জামিল, তার মৃতদেহ ঢোকানো হয় তারই লাল রঙা ভক্সওয়াগনে। ইতিহাস হয়তো কখনোসখনো স্মরণ করবে তাকে। শেখ মুজিবের প্রতি নিখাদ ভালোবাসা থাকায় মরতে হলো আবদুল বাতেনকেও, তার লাশ আশপাশেই কোথাও সরিয়ে ফেলল পাহারায় থাকা সৈনিকেরা। কিন্তু তাকে মনে করবে না কেউই। ইতিহাস বাতেনদের মনে রাখে না।

ইতিহাস সে সকালে বড় ব্যস্ত শেখ মুজিবকে নিয়ে।

বুলেট ততক্ষণে কেড়ে নিয়েছে শেখ কামালকে। চেষ্টার পর চেষ্টা করে শেখ মুজিব অবশেষে ফোনে লাইন পান সেনাপ্রধানের। 'শফিউল্লাহ, আমার বাসায় অ্যাটাক হইছে! কামালরে তো মনে হয় মাইরাই ফ্যালাইলো! তুমি ফোর্স পাঠাও জলদি।'

শফিউল্লাহ নিজে খানিক আগে খবর পেয়েছেন যে সেনাবাহিনীর ট্যাঙ্ক আর আর্টিলারি ঘুরে বেড়াচ্ছে শহরের রাস্তায়। নানা জায়গায় ফোন করেও এর কারণ

সম্পর্কে কোনো সদুত্তর পাচ্ছেন না তিনি। শেখ মুজিবকে তিনি কেবল বলেন, 'স্যার ক্যান ইউ গেট আউট? আই অ্যাম ডুয়িং সামথিং...'

কিন্তু এইটুকু বলার পরেই গুলির শব্দের সাথে লাইন ছিন্ন হয়ে যায় অপর প্রান্তে। স্থিতিজড়তা কাটিয়ে উঠে কোনো ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হন সেনাপ্রধান।

শেখ মুজিব ওদিকে ফোন ছেড়ে চলে যান সিঁড়ির কাছে, সেখানেই নিচতলা থেকে উপরে উঠতে থাকা ঘাতকদলের মুখোমুখি হন তিনি। 'কী চাস তোরা? আমারে মাইরা ফেলাইতে চাস? পাকিস্তানের আর্মি আমারে মারতে পারে নাই, আর তোরা আমারে মারবি?...'

কিন্তু পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর পক্ষে অসম্ভব কাজটিই করে ফেলে বাংলাদেশের কিছু রক্তপিপাসু মেজর। বুলেটের ব্রাশফায়ারে তারা কাঠঠোকরার মতো বিদ্ধ করে দেয় শেখ মুজিবের দীর্ঘদেহকে। সিঁড়ির উপরে লুটিয়ে পড়েন শেখ মুজিব, হাতে থাকে তার পাইপটিও।

তর্জনি দিয়ে বাংলাদেশের অভিধানে স্বাধীনতা লিখে দেয়া মানুষটা, স্বাধীনতার পরে সোনার বাংলার প্রতিটা মানুষের মুখ দেখে আসতে চেয়েছিলেন যিনি, বাংলাদেশকে বাড়ির উঠোনের মতো আপন করে নেয়া সেই মানুষটা সিঁড়িতে পড়ে থাকেন সারা গায় বুলেটের কাঠঠোকরা চিহ্ন নিয়ে।

বাড়ির মাঝে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে তার পরিবারের অন্য সদস্যদের মৃতদেহগুলো। বেগম ফজিলাতুন্নেসা, সস্ত্রীক শেখ কামাল ও শেখ জামাল, শেখ নাসের, ছোট্টো শেখ রাসেল।

মাকড়সা ট্রুপগুলোর জালে আটকা পড়ে ঢাকা শহরের অন্য দুটি বাড়ির সদস্যরাও। সস্ত্রীক নিহত হন শেখ মনি। মারা পড়েন আবদুর রব সেরনিয়াবাত আর তার দুই ছেলে-মেয়ে।

রক্তাক্ত ভোরের অমানবিক হত্যাযজ্ঞটি সম্পন্ন করে তার প্রধান কুশীলব কাঠঠোকরাগুলো এবার ব্যস্ত হয়ে ওঠে পরবর্তী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে।

আর্টিলারির সঙ্গে থাকা ওয়ারলেস সেটে শেখ মুজিবের মৃত্যু সংবাদটি পেয়েই মেজর রশিদ নেমে পড়ে তার কাজে। সে চলে আসে ৪৬তম ব্রিগেডের কমান্ডার শাফায়াত জামিলের কাছে। ঘুম ঘুম চোখের শাফায়াত জামিলকে এসে রশিদ বলে, 'উই হ্যাভ কিল্ড শেখ মুজিব। আমরা এখন খন্দকার মোশতাকের নতুন গভর্মেন্টের অধীন। আপনি কিন্তু খবরদার কোনো অ্যাকশানে যাবেন না, গৃহযুদ্ধ লেগে গেলে তাহলে আপনিই দায়ী থাকবেন!'

বিমূঢ় ব্রিগেড কমান্ডারকে পেছনে রেখে অধস্তন রশিদ চলে যায় ধানমণ্ডির দিকে, দাঁড়াবার এতটুকু অবসর নেই তার। শাফায়াত জামিল সাথে সাথেই ফোন পায় সেনাপ্রধান শফিউল্লাহর থেকেও। কিন্তু ফোনের অন্যপাশের ভেঙে পড়া সেনাপ্রধানের কাছ থেকে কোনো স্পষ্ট নির্দেশ বুঝে নেয়া হয় না তার। বিহ্বল

ব্রিগেড কমান্ডার তাই পায়ে হেঁটেই রওয়ানা দেন তার বাসার কাছেই অবস্থিত ডেপুটি চিফ জিয়াউর রহমানের বাসভবনের দিকে।

খানিক দরজা ধাক্কানোর পরে একগালে শেভিং ক্রিম নিয়ে বেরিয়ে আসেন মেজর জেনারেল জিয়া। জিয়ার পরনে ঘুমানোর পায়জামা আর স্যান্ডো গেঞ্জি। উত্তেজিত গলায় শাফায়াত তাকে বলেন, 'প্রেসিডেন্ট ইজ কিল্ড!'

সেনাবাহিনীর উপপ্রধানকে মোটেও বিচলিত দেখায় না যেন। শান্ত কণ্ঠে জেনারেল জিয়া বরং বলেন, 'সো হোয়াট? দ্য প্রেসিডেন্ট ইজ ডেড? ভাইস প্রেসিডেন্ট ইজ দেয়ার, গো গেট ইউর ট্রুপস রেডি। আপহোল্ড দ্য কনস্টিটিউশন।'

পরিস্থিতির সাথে বেমানান রকম সংযত শোনায় জেনারেল জিয়াউর রহমানের উত্তর। শেখ মুজিবের মৃত্যু সংবাদ এই নিরুদ্বিগ্ন জেনারেল যেন গ্রহণ করেন দৈনন্দিন বেড টি'র মতোই আয়াসে।

ওদিকে মেজর ডালিমের কণ্ঠ তখন বেতারে প্রতিধ্বনিত হয়ে পৌঁছে যাচ্ছে ছাপ্পান্নো হাজার বর্গমাইলের মানুষের কাছে। 'স্বৈরাচারী শেখ মুজিবকে হত্যা করা হয়েছে। খন্দকার মোশতাকের নেতৃত্বে দেশের ক্ষমতা দখল করেছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। দেশে সামরিক শাসন চালু করা হয়েছে...'

ফাঁপা ট্যাঙ্ক দিয়ে কেবল ভয় দেখিয়েই ততক্ষণে রক্ষীবাহিনীকে আটকে ফেলেছে মেজর ফারুকও। তাদেরকে আত্মসমর্পণ করিয়ে, সেনাবাহিনীর নির্দেশমতো চলবার আদেশও দিয়ে এসেছে সে। পরিকল্পনার প্রতিটি অংশ খাপে খাপে মিলে গেছে বলে আনন্দে উৎফুল্ল এই মেজর। কেবল একটা অদ্ভুত ঘটনা বেশ সন্দেহজনক লেগেছে তার কাছে। ঢাকা শহরের নির্জন রাস্তায় আজ তার মাকড়সা ট্যাঙ্কগুলো একেবারে নিঃসঙ্গ নয়, আমেরিকার পতাকা ওড়ানো মার্কিন দূতাবাসের বেশ কিছু গাড়িকেও দেখা যাচ্ছে খানিক পর পর প্রবল গতিতে ছুটে যেতে। মার্কিনদের কিসের এত ব্যস্ততা আজ?

ফারুকের মনে উদয় হওয়া এই প্রশ্নটির উত্তর যিনি জানেন, মেজর রশিদ ইতোমধ্যে পৌঁছে গেছে সেই মানুষটির বাড়ির দোরগোড়ায়। ট্যাঙ্ক নিয়ে সশস্ত্র সেনা প্রহরায় আগামসি লেনে খন্দকার মোশতাকের কাছে এসে উপস্থিত হয় মেজর রশিদ। বলে, 'স্যার, শেখ মুজিবকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে। আপনাকেই এখন প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নিতে হবে। আপনি আমাদের সাথে রেডিও স্টেশনে চলেন, সেখানে গিয়ে নতুন রাষ্ট্রপতি হিসাবে আপনি ভাষণ দিবেন।'

বাড়ির দরজায় ট্যাঙ্ক দেখে খন্দকার মোশতাক ভেতরে খানিক ভড়কে গেছেন। কিন্তু রশিদের কথায় পরিস্থিতি বুঝে নিয়ে একগাল চওড়া হাসি দিয়ে তিনি বলেন, 'তা তো বটেই, তা তো বটেই! প্রেসিডেন্ট হইতে হইলে ভাষণ তো দিতেই হবে, নাকি! আপনারা আমাকে একটু সময় দেন তাহলে, আমি একটু রেডি হয়ে আসি? হে হে...'

হাসতে হাসতেই খন্দকার মোশতাক ভেতর বাড়িতে যান, গায় চড়িয়ে আসেন তার সেই আচকান আর টুপি। যে পোশাক মোশতাকের সঙ্গী ছিল মুজিবনগরের স্বাধীন সরকার ঘোষণার মঞ্চে, যে পোশাকে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পরে শেখ মুজিবকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে ভেসে যাচ্ছিলেন মোশতাক; সেই আচকান আর টুপি নিয়ে তিনি সহাস্যে তৈরি হন শেখ মুজিবের স্থলাভিষিক্ত হতে। পুরনো পোশাকের আবরণে নতুন করে প্রস্তুত হতে থাকেন একাত্তরে সফল না হওয়া মোশতাক।

মুক্তিযুদ্ধের সময় মোশতাক অখণ্ড পাকিস্তান রক্ষার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়েছেন তাজউদ্দীনের কারণে, মুজিবের সেই শিরস্ত্রাণকে দৃশ্যপট থেকে সরিয়ে দিয়ে এবার কাজ আগেই অনেকটা সেরে রেখেছেন মোশতাক। তিনি আজ তৎপর হয়ে ওঠেন প্রেসিডেন্টের গদিতে বসার মধ্য দিয়ে তার বহুদিনের আরাধ্যকে ছুঁয়ে ফেলতে।

রাজধানীর এক অপ্রাকৃত ভোরে ইতিহাসের পৃষ্ঠাগুলো এভাবেই সরগরম করে তুলতে থাকে খুনে কাঠঠোকরা, নিরুদ্বিগ্ন জেনারেল আর তৎপর রাজনীতিকের দল। শেখ মুজিবের লাশ তখনো পড়ে থাকে তার সেই ধানমণ্ডির বাড়ির সিঁড়িতে।

অথচ ইতিহাসের কী আশ্চর্য হাতসাফাই, রাজনীতিক অথবা কাঠঠোকরাদের সহসা সে আশ্রয় দেয় না নিজ পকেটে। বরং আকতার আহমেদরা সিঁড়িতে পড়ে থাকা সেই প্রাণহীন দেহটিকে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে লিখে যান–

...একটি পতাকা একটি স্বদেশ একটি পিতার লাশ
একটি মানুষ একটি জাতির রক্তের ইতিহাস...

রাজনীতির অঙ্ক

তাজউদ্দীনের ঘুম ভেঙে গেল গোলাগুলির আওয়াজে। সকালের আলো তখনো ঠিক স্পষ্ট নয়, রাত বিদায় নেয়নি পুরোপুরি– তাজউদ্দীন এমন একটা সময়ে জেগে উঠলেন বুলেটের শব্দে। চোখ খুলে প্রথমে কিছুক্ষণ তাজউদ্দীন বুঝতেই পারলেন না শব্দটা কিসের, তারপর ধড়ফড় করে উঠে বসেই তিনি চলে গেলেন বারান্দায়। উদগ্রীব হয়ে বুঝতে চাইলেন শব্দের উৎস।

অল্প কিছু সময়ের মাঝে পুরো বাসাই জড়ো হয়ে গেল ঐ বারান্দায়। বাচ্চারা, জোহরা, বেড়াতে আসা জোহরার মামাতো ভাই আবু তালেব, কাজের ছেলে ইলিয়াস। সবাই একে অন্যের মুখে দিকে চায়, কিন্তু কোনো ব্যাখ্যাই আসে না কারো মাথায়। জোহরা চিন্তাগ্রস্ত স্বরে বলেন, 'হঠাৎ এতো গোলাগুলি! আল্লাহই জানে কী হচ্ছে!'

তাজউদ্দীন অস্ফুটে বলে ওঠেন, 'মুজিব ভাইয়ের কিছু হইলো না তো! ওনার বাসার দিক থেকেই তো আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে।'

একছুটে বারান্দা থেকে বেরিয়ে ছাদে উঠে যান তাজউদ্দীন, রিমি-রিপিও ছুটে যায় তার পিছনে। তারা ছাদে ওঠার কিছুক্ষণ পরেও ইতস্তত গুলির শব্দ আসে কিছু। এরপর সব চুপচাপ, শব্দশূন্য।

ছাদ থেকে নিচে নেমে এসে তাজউদ্দীন ভাবতে থাকেন। তাড়াতাড়ি জানা দরকার কী হয়েছে। প্রথমেই দেখতে হবে মুজিব ভাই ঠিক আছেন কি না, বাকি কাজ তারপরে। তাজউদ্দীন বারান্দায় চলে যান আবার, সেখানে ইস্ত্রি করার টেবিলের পাশেই রাখা আছে ফোনটা। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই তাজউদ্দীন একে একে নাম্বার ঘোরান কয়েকজনের কাছে, আর ব্যর্থ হন বারবার। আশ্চর্য, ঢাকা শহরের সব নাম্বারই আজকে ব্যস্ত নাকি!

তাজউদ্দীন রিমিকে ডাকেন। 'রিমি, এই যে-এই এই নাম্বারগুলাতে ফোন করে যাও তো। দেখো কাউকে পাও কি না।'

রিমি চেষ্টা করে যায় অনেকক্ষণ। একবার কেবল প্রফেসর ইউসুফ আলির মিন্টু রোডের বাসায় লাইন পাওয়া যায়, তার মেয়ে ফোন ধরে বলে যে বাবা নামাজে গেছেন। আর তাদের বাসার বাইরেও প্রচুর গোলাগুলির শব্দ শোনা গেছে সকালের দিকে।

রাতের অতিথি অর্থ মন্ত্রণালয়ের পিয়ন আনোয়ার বিদায় নেয় এই সময়, তাজউদ্দীন তার বাসার কেয়ারটেকার বারেক মিয়া আর কাজের ছেলে ইলিয়াসকে পাঠান বাড়ির বাইরে, কেউ কিছু জানে কি না সেই খোঁজ নিয়ে আসতে। ছুটতে ছুটতে খানিক পরেই ফিরে আসেন বারেক মিয়া, হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, 'রেডিও ছাড়েন আম্মা, রেডিও ছাড়েন। ভাষণ হইতেছে!'

তাড়াহুড়ো করে রেডিও ছাড়া হয়।

মেজর ডালিমের উদ্ধত গলা সেখানে বারবার বলে যায়, 'আমি মেজর ডালিম বলছি। স্বৈরাচারী শেখ মুজিবকে হত্যা করা হয়েছে। খন্দকার মোশতাকের নেতৃত্বে দেশের ক্ষমতা দখল করেছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী...'

সাতমসজিদ রোডের বাড়িটিতে যেন মরণশেল পড়ে সেই মুহূর্তে। আবেগে তছনছ হয়ে পড়ে তাজউদ্দীনের পরিবার। সবচেয়ে বেশি নিরাবেগ মানুষটিই যেন সবচাইতে অথর্ব হয়ে পড়েন সেই আঘাতে।

রক্তশূন্য মুখে সোফার একপ্রান্ত শক্ত করে ধরে থাকেন তাজউদ্দীন। বলেন, 'মুজিব ভাই জেনেও গেলেন না কে তার আসল বন্ধু, আর কে তার শত্রু। আমি যদি উনার কাছে থাকতে পারতাম, আল্লার কসম কারো সাধ্য ছিল না মুজিব ভাইয়ের গায়ে হাত ছোঁয়ায়। উনি বন্ধু চিনলেন না ...'

তাজউদ্দীনকে এর আগে চিন্তিত দেখা গেছে, দেখা গেছে তার অভিমান, দেখা গেছে তার উৎকণ্ঠিত রূপ। কিন্তু এমন অদ্ভুত বিষণ্ন রূপে তাকে কোনোদিনই দেখেনি তার পরিবারের কেউ। তাজউদ্দীন বিড়বিড় করে ছাদের দিকে তাকিয়ে বলতে থাকেন, 'মুজিব ভাই, আমাকে মাফ করে দিয়েন। বিপদের সময় আমি আপনার কোনো কাজে লাগলাম না...'

জোহরা তাজউদ্দীনও কম বিচলিত নন, কিন্তু তাই বলে নারীর সহজাত বোধশক্তি হারাননি তিনি। অজানা এক আশঙ্কা বুকে নিয়ে তিনি বলেন, 'এই, তুমি বাসায় থাইকো না। বের হয়ে অন্য কোথাও যাও। পরিস্থিতি কী হয়, সেটা একটু দেখো আগে।'

তাজউদ্দীন কোনো উত্তর দেন না। তিনি যেন পুরাণের মেডুসার চোখে চোখ রাখা পাথর ততক্ষণে। জোহরা বারংবার বলে যান, 'কথা শুনো না কেন! তুমি বাসায় থাইকো না প্লিজ, বাইরে যাও। অন্তত পাশের বাসায় যাও...। সামনে কী হবে কেউ তো জানে না!'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তাজউদ্দীন বলেন, 'দেখা যাক কী হয়। আরো সময় যাক, আমি বাসাতেই থাকি।'

খানিক পরেই একের পর এক ফোন আসতে থাকে তাজউদ্দীনের বাসায়। সাবেক একান্ত সচিব আবু সাইদ চৌধুরীসহ অনেকেই ফোন করেন। কাছাকাছি বাড়ি থেকে কিছু প্রতিবেশীও আসেন। তাজউদ্দীনকে নিয়ে আশঙ্কা করেন সবাই, উপদেশ দেন বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে। কেউ কেউ বলেন ভারতে গিয়ে রাজনৈতিক আশ্রয় নিতে।

তাজউদ্দীন এইসব ফোনে, অনুরোধে গা করেন না। গলা ভারী করে বলেন, 'যেই পথে একবার গেছি, সেই পথে আর না। একাত্তরে মুজিব ভাই আমাদের সামনে ছিলেন। তার প্রতিনিধি হিসেবেই মুক্তিযুদ্ধে সাহায্য নিতে ভারতে গেছিলাম। ...মুজিব ভাই এখন নাই। আজ যদি তাজউদ্দীন বাসা ছেড়ে আত্মগোপনে যায়, তাহলে ষড়যন্ত্রকারীরা বলবে তাজউদ্দীনই বঙ্গবন্ধুকে মাইরে পালায়ে গেছে। সেইটা করা যাবে না। বিশ্বাসঘাতক অপবাদ নিয়ে বাঁইচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়া হাজারগুণ ভালো।'

বেলা সাড়ে নয়টার দিকে তাজউদ্দীনের বাসার সামনের রাস্তাজুড়ে জড়ো হয় অনেকগুলো বিশালাকার সামরিক ট্রাক। তাজউদ্দীন বাচ্চাদের নিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে বোঝার চেষ্টা করেন কী হচ্ছে। চটপটে এক অফিসার দ্রুত দোতলার বারান্দায় উঠে আসেন সাবেক অর্থমন্ত্রীকে দেখে।

সশব্দ স্যালুট মেরে সেই অফিসার বলে, 'স্যার, আমি ক্যাপ্টেন শহীদ। আমার উপর অর্ডার আছে, এই মুহূর্ত থেকে আপনারা কেউ এই বাসার বাইরে যেতে পারবেন না, আর কেউ বাসাতেও আসতে পারবে না।'

তাজউদ্দীন ক্যাপ্টেন শহীদের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'হুম, বুঝলাম। বলেন, হাউস অ্যারেস্ট করলেন আমাকে।'

তরুণ অফিসার শ্রাগ করে, 'যা বলতে চান স্যার।' এরপরে টেলিফোনের তারটা কেটে দিয়ে ফোনসেট হাতে নিয়ে শহীদ বলে, 'এটা নিচে নিয়ে গেলাম। কাজে লাগবে।'

একতলার যে ঘরে পড়াশোনা আর লেখালেখি করতেন তাজউদ্দীন, সেই ঘরটিতে এরপর আস্তানা গেড়ে বসে বাসা ঘেরাও করা সৈনিকেরা। ঐ ফোন দিয়েই কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল রুমের সাথে যোগাযোগের ব্যবস্থা করে নেয় তারা, ছাদের উপর বসায় অ্যান্টি এয়ারক্রাফট গান। আয়োজনের বিশালতা দেখে মনে হয় তাজউদ্দীন নামের চশমা পড়া ছোটখাটো একজন মানুষ নয়, অস্ত্রশস্ত্রে বলীয়ান কোনো বৃহৎ সামরিক শক্তির সাথে লড়তে যাচ্ছে এই অবরোধকারীরা।

বন্দী হলেন তাজউদ্দীন।

বাসার সকলে কাটাতে থাকে উৎকণ্ঠিত এক একটি মুহূর্ত। অজানা কিছুর জন্যে অপেক্ষা করা বড় ক্লান্তিদায়ক। তাজউদ্দীন মাথার মাঝে চিন্তার ঝড় চলে, আর পরিবারের বাকি সকলে উদ্বিগ্ন থাকে ভবিতব্যের কথা ভেবে। শুধু ছোট্ট সোহেলকে খুব নিশ্চিন্ত দেখায়। রিপির কোলে চড়ে দোতলার জানালা দিয়ে নিচে সমবেত ট্রাক দেখে সে বারবার বলে, 'ব'পা, মিলিটারি! বন্দুক!'

বাংলাদেশের রাজধানীতে সে দিনটিতে অবশ্য কেবল ওই বন্দুক আর মিলিটারির রাজত্ব।

আর্মি হেডকোয়ার্টার থেকে স্টেনগান উঁচিয়ে সেনাপ্রধান শফিউল্লাহকে ততক্ষণে রেডিও স্টেশনে নিয়ে এসেছে মেজর ডালিম, সেনাবাহিনী প্রধানের সাথে রিয়ার অ্যাডমিরাল এম এইচ খান আর বিমানবাহিনী প্রধান এয়ার মার্শাল এ কে খন্দকারও উপস্থিত হন শাহবাগের ওই বেতারকেন্দ্রে। তিন বাহিনী প্রধান একত্রে হয়তো বিদ্রোহী দুই ইউনিটকে দমন করতে পারতেন, কিন্তু আরো রক্তপাতের আশঙ্কায় এবং হতবিহবল পরিস্থিতির ঘোর তখনো কাটিয়ে উঠতে না পারায় সে কাজটি সম্ভব হয় না তাদের পক্ষে।

মেজর রশিদের ট্যাঙ্ক প্রহরায় ইতোমধ্যেই সেই রেডিও স্টেশনে উপস্থিত হয়েছেন খন্দকার মোশতাক। তিন প্রধান বেতারকেন্দ্রে পৌঁছতেই মোশতাক হাত বাড়িয়ে স্বাগত জানান তাদের। ঝানু পলিটিশিয়ান ঐ মোশতাক, প্রেসিডেন্টের গদিতে বসবার আগে তিনি চাইলেন ঐ তিন বাহিনী প্রধানের আনুগত্য। পরিস্থিতির বিপরীত স্রোতে গা ভাসাতে রাজি হন না তিনজনের কেউই। অতএব খানিক পরেই তাদের আনুগত্য প্রকাশের বক্তব্য রেকর্ড করে বারবার বাজানো হতে থাকে রেডিওতে। বাংলাদেশের মানুষ নিশ্চিত হয়, দেশের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব রয়েছে এই মুহূর্তে মোশতাকের।

ধূর্ত খন্দকার মোশতাক এখানে আরো একবার পরিচয় দিলেন তার কূটবুদ্ধির। গুটিকয় অদূরদর্শী মেজরদের কারণে ইতিহাস তার সামনে যে ফাঁকা পোস্ট এনে দিয়েছে– এই আনুগত্য আদায়ের মাধ্যমে মোশতাক তাতে প্রথম গোলটি দিলেন কেবল। গ্যালারির বাংলাদেশকে বুঝিয়ে দিলেন, তিনি কারো হাতের পুতুল নন।

রেডিও স্টেশন থেকে ট্যাঙ্ক পাহারায় এরপর মোশতাক গেলেন বঙ্গভবনে। প্রেসিডেন্ট হিসেবে সেখানেই শপথ নিলেন তিনি, জুম্মার নামাজটাও সারলেন। শুরু হলো খন্দকার মোশতাক আহমেদের একাশি দিনের রাজত্ব।

সেই বিকেলেই মোশতাক প্রস্তুত হলেন ফাঁকা জালে আরো একবার বল জড়ানোর জন্যে। ঘোষণা করলেন তার নয়া মন্ত্রিসভার নাম। নতুন মন্ত্রীরাও তখনো ঘটনাক্রম অনুসরণ করছেন স্রোতের বিরুদ্ধে না গিয়ে। কিন্তু এ. আর. মল্লিকের মতো কেউ কেউ হয়তো দোটানায় পড়েন শেখ মুজিবকে নৃশংসভাবে হত্যা করার পর মন্ত্রিসভার সদস্য হওয়া নৈতিক কাজ হবে কি না, তা ঠিক করতে গিয়ে।

মোশতাক তাকে বলেন, 'ভাই, আপনি কি আর্মির শাসন চান?... শেখ সাহেবকে কে মেরেছে সেইটা তো জানা যাবে তদন্ত কমিটি হইলে, কিন্তু এই মুহূর্তে সিভিল গভমেন্ট না হইলে দেশের তো সর্বনাশ হয়ে যাবে ভাই! আপনারা কো-অপারেট না করলে তো দেশ আর্মিদের হাতেই যাবে। তখন কী অবস্থা হবে বুঝতেই পারতেছেন!'

অদ্ভুত এই দিনে খন্দকার মোশতাক এভাবেই বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ ইতিহাস পাঠকদের বারবার মনে করিয়ে দেন, স্টেটসম্যান না হলেও, তিনি জাত পলিটিশিয়ান।

ঢাকার ফাঁকা রাস্তায় সেদিন আর্মির গাড়ি ছাড়া কাকপক্ষী নেই। নীরব শহরে থেকে থেকে বাজতে থাকে রেডিওর বিভিন্ন ঘোষণা, সাথে দেশাত্মবোধক গান আর গজল।

সন্ধ্যায় নতুন প্রেসিডেন্ট ভাষণ দেন জাতির উদ্দেশে। বলেন, ঐতিহাসিক প্রয়োজনে এগিয়ে এসেছে সেনাবাহিনী। বলেন, অভ্যুত্থানকারী মেজরেরা জাতির সূর্য সন্তান। ভাষণের শেষে দেশবাসী এবার আর 'জয় বাংলা' শোনে না, প্রেসিডেন্ট সেটিকে প্রতিস্থাপিত করে দেন 'বাংলাদেশ জিন্দাবাদ' শব্দদ্বয় দিয়ে।

এদিকে মোশতাকের সেই রেডিও ভাষণ শুনে সাতমসজিদ রোডে আরো ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন অস্থির তাজউদ্দীন। জোরে জোরে পায়চারি করতে করতে বলেন, '...বলছিলাম না, আমি বলছিলাম না! এই লোকটা একটা সাপের চেয়েও বিষাক্ত, আমি মুজিব ভাইকে বারবার বলছিলাম!' এরপরে নিজের অজ্ঞাতেই আর্তনাদ করে মানুষটি বলে ওঠেন, 'মুজিব ভাই, আপনি যদি বুঝতেন কে আপনার আসল শত্রু!'

সন্ধ্যা কেটে গেলে নেমে আসে রাত।

শেখ মুজিববিহীন বাংলাদেশের প্রথম রাতটিতে তাজউদ্দীন যখন গভীরভাবে চিন্তা করছেন দেশ কোন পথে নেমেছে, তার দরজায় তখন কলিং বেলের শব্দ শোনা যায়। দরজা খুলে দেখা যায় মেজর ডালিমকে। সাথে আরো একজন সেনা অফিসার।

নির্লজ্জের মতো একগাল হেসে ডালিম বলে, 'ভালো আছেন স্যার? আপনার নিরাপত্তার জন্যেই এরকম ব্যবস্থা নিলাম, সব কিছু ঠিক আছে তো স্যার?'

ধমকে ওঠেন তাজউদ্দীন। 'চুপ করো। ফালতু কথা বলে কোনো লাভ নাই। তুমি আসছো আমাকে বন্দী করা হইছে কি না, সেইটা নিজের চোখে দেখতে।...'

তাজউদ্দীনের ধমকে দমে যায় ডালিম। তার সাথের অফিসারটি বলে, 'আচ্ছা, তাহলে আর কথা না বাড়াই। আপনার মিসেস কোথায়?'

জোহরা তাজউদ্দীন মাথা বের করেন ভেতর ঘর থেকে, ডালিম আর তার সঙ্গী একে অপরের চোখের দিকে তাকিয়ে নীরবে নেমে যায় নিচে। বোঝা যায়, তাজউদ্দীনের ধারণাই সত্যি। সপরিবারে তিনি বন্দী আছেন কি না, সেটা দেখতেই ডালিম এসেছিল।

বাংলাদেশকে একরাতেই লোলচর্ম কোনো বৃদ্ধের অমসৃণ মুখের মতো উঁচুনিচু রাস্তায় নামিয়ে দেয়া মেজরেরা হিসেব মিলিয়ে ফেলে আরো একবার। শেখ মুজিবের অনুপস্থিতিতে এই নাগরদোলা দেশের রাজনীতির জন্যে যে অসত্য সমীকরণ তারা দাঁড় করাতে চাইছে, সেটি যারা মিথ্যা প্রমাণ করতে পারে, শেখ মুজিবের পেছনে একদা ফাইল হাতে দাঁড়িয়ে থাকা ঐ তাজউদ্দীন তাদের মাঝে অন্যতম। রাজনীতির তুখোড় গণিতবিদ তাজউদ্দীনকে হাউজ অ্যারেস্ট করার মাধ্যমে তাই সমীকরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধ্রুবককে বোতলবন্দি করে ফেলল অশুভ মেজরের দল।

চতুর্ভুজ

রিমি ক্লাসে ঢুকতেই সবাই কেমন যেন চোখ গোল করে তার দিকে তাকিয়ে রইল। সশরীরের রিমিকে দেখে তাদের যেন ঠিক বিশ্বাস হতে চায় না। ক্লাসমেটেরা এমন জড়ভরত হয়ে গেল, যে রিমি থার্ড বেঞ্চের এক কোনায় গিয়ে বসার আগে তাদের একেবারে নট নড়নচড়ন অবস্থা। প্রাথমিক হতচকিত অবস্থাটা কেটে যাবার পরে সুবর্ণা মুস্তাফা এসে সব বুঝিয়ে বলে রিমিকে। ক্লাসের মেয়েরা জানে, ১৫ তারিখ সকালে নাকি রিমিদের বাসার সবাইকে আর্মি মেরে ফেলেছে!

এই কথা শুনে কিছুটা মজা পায় রিমি, তবে অনেকটা অবাক না হয়ে পারে না। মানুষের মুখে মুখে কথা কী রকম ছড়ায় দেখেছ! অবশ্য ক্লাসমেটদেরই বা আর দোষ কী। দুদিন ধরে রিমিদের বাসার সাথের বাইরের দুনিয়ার সমস্ত যোগাযোগ বন্ধ। ফোনের লাইন কাটা, বাসায় কাউকে ঢুকতেও দেয়া হচ্ছে না।

সকালে রেডিওতে যখন ঘোষণা দিল আজ থেকে স্কুল খুলবে, আব্বু তখন রিমিকে নিয়ে সাথে সাথেই নিচে চলে গেলেন। বাসা ঘেরাও করে রাখা আর্মি অফিসারদের বললেন, রিমি আর মিমিকে স্কুলে যেতে দিতে হবে। আব্বুর চোখের দিকে তাকিয়ে তার উদ্দেশ্য বুঝতে কষ্ট হয়নি রিমির। আব্বু চাচ্ছেন, অন্তত রিমিরা যেন যতটুকু সম্ভব খোঁজ নিয়ে আসে শহরের অবস্থাটা আসলে কীরকম। তবে আর্মি মনে হয় ধারণা করেছিল আব্বু ওদের দিয়ে বাইরের কাউকে খবর দেবার চেষ্টা করবেন। স্কুলে আসার আগে তাই আর্মিরা রিমিদের ব্যাগ, বই, খাতা তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করেছে কিছু পাবার আশায়।

স্কুলে সারাদিন ধরে রিমি যতটা পারে শহরের অবস্থা নিয়ে খোঁজ নেয় বন্ধুদের কাছে। খুব ভয়ে ভয়ে আছে সবাই। কেউই পরিষ্কার করে কিছু বলতে পারে না। মুজিব কাকু ছাড়াও শেখ মনির বাসাতেও হামলা হয়েছে, এরকম বলে অনেকে। জানা যায়, আর্মির পাহারায় নাকি মুজিব কাকুর কবর দেয়া হয়েছে টুঙ্গিপাড়ায়।

বাসায় ফেরার পথে রিমি খেয়াল করে দেখে, শহরের বিভিন্ন জায়গায় আর্মির পাহারা বসানো হয়েছে। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের সামনে তো একটা বড়সড় ট্যাঙ্কও দেখা গেল। বাসায় ঢুকতে অবশ্য রিমিকে আবার সেই ক্লান্তিকর আর্মির তল্লাশির মুখে দাঁড়াতে হয়। প্রতিটা বই ওরা এমনভাবে উলটে পালটে দেখে, যেন রিমি কোনো বিখ্যাত গুপ্তচর। আব্বু অবশ্য পরে রিমির মুখ থেকেই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শোনেন শহরের অবস্থা। কিন্তু কোনো নিশ্চিত খবর না পেয়ে আব্বুর দুশ্চিন্তা যেন আরো বেড়ে যায়। আব্বু খালি আঙুল খুঁটতে থাকেন।

পরের দিনটা রিমির জন্মদিন।

স্কুলে যাবার আগে আর্মির উৎপাত সহ্য করতে হয় বলে রিমির দিনের শুরুটা ভালো হয় না। কিন্তু ক্লাসে গিয়ে নিজের ডেস্কের ঢাকনা খুলতেই রিমি অবাক! জন্মদিনের শুভেচ্ছা লেখা সুন্দর একটা কার্ডের সাথে এক টুকরো ছোট্ট কেক! বান্ধবী মেরিনা পাশ থেকে একগাল হেসে বলে, 'হ্যাপি বার্থডে রিমি! ম্যানি ম্যানি হ্যাপি রিটার্নস!'

রিমির এত ভালো লাগল শুভেচ্ছা পেয়ে! নিরানন্দ স্কুলটা খুব মজার জায়গা হয়ে গেল সেদিন, একটু পর পর বন্ধুরা এসে উইশ করে গেল রিমিকে।

বাসায় ফিরেও রিমির খুশি না হয়ে উপায় থাকে না। রিপির জমানো কার্ডের বিশাল সংগ্রহের মাঝে একটা কার্ড অনেকদিন থেকেই খুব মনে ধরেছে রিমির। রিপিটা এতদিন সেই কার্ডে হাতও লাগাতে দিত না, কিন্তু আজ কেন জানি জন্মদিনের উপহার হিসেবে ঐ কার্ডটাই রিমির হয়ে গেল। চারপাশে কেমন একটা গুমোট ভাব, কিন্তু এর মাঝে তার জন্মদিন নিয়ে কাছের মানুষদের কাজকর্ম রিমির বড় ভালো লাগে।

খাবার টেবিলেও সেদিন অদ্ভুত এক ঘটনা ঘটল। খাওয়া শেষ করে আব্বু রিমির পাশে দাঁড়িয়ে তার মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, 'আজকে তাহলে আমার রিমি মামণির জন্মদিন! ...দেখতে দেখতে তুই তো অনেক বড় হয়ে গেলিরে মা!'

আব্বুর দিকে তাকিয়ে রিমির মনে হয় মানুষটার চোখগুলো কী যেন বলতে চাইছে। বিড়বিড় করে আব্বু কী যেন বলছেন বলেও মনে হয় রিমির। এরপর কোনোদিন যা করেন না, তাই করে বসেন আব্বু। নিজ হাতে লোকমা করে ভাত তুলে দেন রিমির মুখে। একবার নয়, বেশ কয়েকবার। রিমি বিস্ময়ে অভিভূত। কিন্তু কেমন যেন ভারী ভারী মনে হয় তার পরিবেশটাকে...

জীবন খুব আশ্চর্য অলৌকিক। আচমকা মন খারাপ কিংবা হঠাৎ প্রাপ্তির আনন্দ মিশে থাকা কৈশোরে রিমি যেমন তাড়িয়ে তাড়িয়ে প্রতিমুহূর্তে স্বাদ নিচ্ছে সময়ের, সেই একই সময়ে কালো আচকান গায়ে চাপানো একজন মানুষ চেষ্টা করছেন ঘটনার গতিকে নিয়ন্ত্রণ করার। ক্ষমতা সুসংহত করার জন্যে মোশতাক তার মাকড়সা জালের সুতোগুলো টেনে ধরছেন একে একে।

দ্রুতই একটি গ্রহণযোগ্য মন্ত্রিসভা তৈরি করার প্রয়োজন মোশতাকের। শাহ মোয়াজ্জেম, তাহেরউদ্দীন ঠাকুর, ওবায়দুর রহমানের মতো উৎসাহী কজনকে সাথে পেয়েও যান তিনি। কিন্তু মোশতাকের সাজানো দাবা খেলার বোর্ডে দরকার আরো ক্ষমতাশালী কিছু ঘুঁটি।

মোশতাক তাই ডেকে নিয়ে যান ক্যাপ্টেন মনসুর আলীকে। আহবান জানান প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণের। মনসুর আলী কোনো কথা না বলে তাকিয়ে থাকেন কালো আচকান পরা মানুষটির দিকে। হতচকিত মোশতাক বলেন, 'কী দেখতেছেন এমনে?'

'তোমারে দেখতেছি। তোমারে দেখতেছি আর বঙ্গবন্ধুরে ভাবতেছি।' জবাব দেন মনসুর আলী। 'মোশতাক, তুমি শেখ মুজিবরে মারতে পারলা! ক্যামনে পারলা!'

এই বলে কান্নায় ভেঙে পড়েন মনসুর আলী। মোশতাক বুঝে যান, ভুল দরজায় কড়া নেড়েছেন তিনি।

মোশতাক এরপর লোক পাঠান শান্ত প্রকৃতির মানুষ সৈয়দ নজরুল ইসলামের কাছে। মোশতাকের মনে হয়, ইনি হয়তো রাজি হতে পারেন ভড়কে গিয়ে। কিন্তু কী আশ্চর্য, সৈয়দ নজরুল পাত্তাই দেন না মোশতাকের আহবানকে। বরং দূত হিসেবে পাঠানো শাহ মোয়াজ্জেম আর তাহের ঠাকুরকে তিনি বলেন, 'আমার আর কোনো সরকারি পদের দরকার নাই। কয়দিন আর বাঁচবো? মোশতাকরে বলো আমারে য্যান ছাইড়া দেয়। আমি ময়মনসিং চইলা যাবো। আমার এখন অবসরের দরকার..'

এখানেই শেষ নয়। মোশতাক প্রত্যাখ্যাত হন কামারুজ্জামানের কাছেও। তিনি মন্ত্রিত্বের ডাকে সাড়া না দিয়ে বলেন, 'পার্টির কোনো লোক গেল না, আমিই বা যাবো ক্যান! থাকি, যে কয়টা দিন আছি, এমনিই থাকি!'

এই তিনজনের প্রত্যাখ্যান আরো ক্ষুব্ধ করে তোলে খন্দকার মোশতাককে। শেখ মুজিবের প্রধান তিন অনুচরকে কেনা যায় না, আর ওদিকে তাজউদ্দীন তো মোশতাকের চিরশত্রু। তার কাছে লোক পাঠিয়ে সময়ের অপচয় করেন না মোশতাক। মোশতাক বরং হজম করে নেন একটি তিক্ত সত্য, এই চতুর্ভুজকে কেনা যাবে না। বাংলাদেশের ইতিহাস একদিন ফিরে ফিরে নিশ্চয় আতশ কাচের তলায় রেখে দেখবে এই চারটি আলোকিত মানুষকে, যারা আলেকজান্দার দ্যুমার সেই ধ্রুপদি উপন্যাসের মাস্কেটিয়ারদের মতোই শেষ পর্যন্ত হাতে হাতে রেখে এক থেকে গেছেন। ওয়ান ফর অল, অ্যান্ড অল ফর ওয়ান– এই মন্ত্র জপে তারা বিচ্যুত হননি শেখ মুজিবের আদর্শ থেকে।

নিরুপায় মোশতাক এবার অন্য পথ ধরে দৃশ্যপট থেকে কিছুটা দূরে সরিয়ে রাখতে চান শেখ মুজিবের এই চার হাতকে। খোঁড়া এক যুক্তি দিয়ে সামরিক আইনের জোর খাটান মোশতাক। দুর্নীতির অভিযোগে চারনেতাসহ আওয়ামী লীগের বেশ কজন নেতাকর্মীকে জেলে ভরবেন বলে সিদ্ধান্ত নেন তিনি।

শেখ মুজিবের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের সপ্তাহখানেক পরের এক সকালে তাই গৃহবন্দি তাজউদ্দীনের বাড়ির সামনে এসে থামে একজোড়া পুলিশ জিপ। দোতলায় উঠে আসা এক পুলিশ অফিসার তাজউদ্দীনকে বলে, 'স্যার, আপনাকে আমাদের সাথে যেতে হবে।'

তাজউদ্দীন বেশি বিচলিত হন না কখনোই। গম্ভীর স্বরে বলেন, 'এই অবস্থায় তো যেতে পারবো না। একটু অপেক্ষা করেন। গোসল করে, নাস্তা খেয়ে তারপরে আপনাদের সাথে যাচ্ছি।'

নীরবে অপেক্ষা করেন পুলিশ সদস্যেরা। একসময় প্রস্তুতি শেষ হয় তাজউদ্দীনের। তিনি প্রশ্ন করেন, 'কাপড়-জামা কিছু সাথে নিতে হবে?'

গম্ভীর স্বরে একজন পুলিশ বলে, 'নিলে ভালো হয়।'

যা বোঝার, বুঝে নেন তাজউদ্দীন। তিনি ছোট একটা স্যুটকেসে কিছু কাপড় গুছিয়ে নেন। সাথে নেন কুরআন শরিফ আর তার কালো বর্ডারের ডায়েরিটা। জেলখানায় বসে হলেও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনা শেষ করতেই হবে, তাজউদ্দীন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ এ বিষয়ে।

রিমি-রিপিরা ভিড় করে থাকে আব্বুর ঘরের সামনে। তাজউদ্দীন তাদের সবার মাথায় হাত বোলান, চুমু খান পিচ্চি সোহেলকে। জোহরা মৃদু স্বরে প্রশ্ন করেন, 'কী মনে হয়, কখন ছাড়বে তোমাকে?'

স্ত্রীর চোখে চোখে রেখে তাজউদ্দীন বলেন, ‘টেইক ইট ফরএভার। ধরে নাও, সারা জীবনের জন্যে যাচ্ছি।’ এই বলে পরিবারের সবার মাঝে ভীষণ এক আশঙ্কা ছড়িয়ে তাজউদ্দীন নেমে যান। মোজাইকের চিরচেনা সিঁড়িটি বেয়ে তার নেমে যাওয়ার গতিটা খানিক শ্লথ দেখায় তখন।

বাচ্চারা দোতলার জলছাদে এসে হাত নাড়তে থাকে বিদায়ী বাবার উদ্দেশে। তাজউদ্দীন সেই হাত নাড়ার জবাব দেন নিঃশব্দে।

কৌতূহল জাগানো একটি ঘটনা ঘটে এসময়। রাস্তার পাশের মুদি দোকান থেকে নীলরঙা জিন্স পরা একজন ভিনদেশি মানুষ দীর্ঘক্ষণ ধরে প্রত্যক্ষ করছিলেন এই পুলিশি অভিযান। তাজউদ্দীন জিপে উঠতেই সে মানুষটি এগিয়ে আসেন। জিপের কাছে এসে তাজউদ্দীনকে প্রশ্ন করেন, ‘কী মনে হয়, আপনাকে মন্ত্রিসভায় যোগদানের জন্যে ধরে নিয়ে যাচ্ছে?’

তাজউদ্দীন চোখ কুঁচকে বলেন, ‘মনে হয় না। তারা এতো বড় নির্বোধ না।’

লরেন্স লিফশুলজ নামের এই মানুষটিকে অবশ্য সে মুহূর্তে তাজউদ্দীন কিংবা অন্যান্য প্রত্যক্ষদর্শীরা চিনতে পারেন না। কেউই তখনো জানেন না, প্রায় এক যুগ পরে বাংলাদেশকে নিয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করা একটি বই লিখে ফেলবেন এই সাংবাদিক।

কোনো এক প্রাচীন সীমান্ত সন্ধ্যায় একটি জিপগাড়িতে চেপেই ইতিহাসকে শেকল পরানোর রাস্তায় নেমে পড়েছিলেন তাজউদ্দীন, এই মুহূর্তে দিনের আলোতে আবারো একটি জিপের আরোহী হয়েই অজানার রাস্তায় নামতে হলো তাকে। কিন্তু কাল ব্যবধানে ভূমিকাটা পালটে গেছে ইতিহাস আর তাজউদ্দীনের মাঝে। এবার তাজউদ্দীনের পায়েই শেকল বেঁধেছে সময়।

পত্রিকার পাতায় খবর আসে, দুর্নীতি-স্বজনপ্রীতি-সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগে জেলে নেয়া হয়েছে তাজউদ্দীনদের।

নতুন সারথি মোশতাক

কুদ্দুস মিয়ার চায়ের দোকানে খোরশেদকে দেখে আলাউদ্দীন কিছুটা আশ্বস্ত হলো। ১৫ তারিখের পর থেকে আওয়ামী লীগের বেশ কিছু নেতাকর্মী সরে পড়েছিল প্রাণের ভয়ে, খোরশেদকেও প্রায় এক সপ্তাহ দেখেনি আলাউদ্দীন। আজ তাই বন্ধুকে দেখে মাথা থেকে হালকা একটা দুশ্চিন্তা সরে যায় তার। সে লক্ষ করে, খোরশেদের সাথে মেসবাহও বসে আছে দোকানে।

‘তোমার জন্যে চিন্তা হইতেছিল।’ আলাউদ্দীন বন্ধুর পাশে বসে নিচু গলায় বলে। ‘কই গেছিলা?’

খোরশেদ উত্তর দেয় নিচের দিকে তাকিয়ে, মাথা তোলে না। ‘শেরেবাংলা নগরের এমপি হোস্টেলে পলায়া আছিলাম। ভাবছিলাম সেইখান থেকে কোনো মুভমেন্ট

হইবো। কিন্তু এখন দেখি সবাই থম মাইরা বইসা আছে। কারো কোনো প্ল্যানিং নাই। মোশতাক বরং পরিস্থিতি নিজের কন্ট্রোলে নিয়া আসতেছে ধীরে ধীরে...'

আলাউদ্দীন আঙুল দেখিয়ে চা দিতে বলে কুনু মিয়াকে। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা এখনো ঠিক জমে ওঠেনি, ইতস্তত কিছু ছেলে ঘুরে বেড়াচ্ছে আশপাশে। তাদের দিকে তাকিয়ে আলাউদ্দীন ভাবে, খোরশেদ ঠিকই বলছে। সৌদি আরব ইতোমধ্যে স্বীকৃতি দিয়েছে বাংলাদেশকে। মোশতাক সুযোগ বুঝে প্রচার করে বেড়াচ্ছে বাংলাদেশের দুর্দিন শেষ। এতদিন সৌদি আরবের স্বীকৃতি ছিল না বলেই বাংলাদেশকে ভিক্ষা করতে হয়েছে, অচিরেই দেশে অভাব বলতে কিছু আর থাকবে না।

'পরিস্থিতি অবশ্য আসলেই মোশতাকের দিকে এখন, অন্তত এই মুহূর্তে।' আলাউদ্দীন চায়ের কাপ হাতে নিয়ে বলে। তারেকুল আলমের মাধ্যমে সেনাবাহিনীর কিছু খবর কানে এসেছে তার, সেগুলোই সে জানাতে চায় মেসবাহদের। 'ক্ষমতার কেন্দ্র এখন বঙ্গভবন, বুঝলা। শুনলাম শেখ মুজিবরে মাইরা ফেলা আর্মি মেজরেরা সব আজকাল ঐখানেই ঘাঁটি করছে। কামান আর ট্যাঙ্ক চারপাশে রাইখা মোশতাক বঙ্গভবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চায়।'

মেসবাহ মাথা নাড়ে। 'আমিও শুনলাম বিষয়টা। শফিউল্লাহ নাকি শাফায়াত জামিলকে নিয়ে চেষ্টা করছিলেন বিদ্রোহী দুটা ইউনিটকে ক্যান্টনমেন্টে ফিরিয়ে আনতে, কিন্তু এরপরে তো শুনলাম শফিউল্লাহকেও সেনাপ্রধানের পদ থেকে সরিয়ে ফরেন মিনিস্ট্রিতে নিয়ে গেছে। জেনারেল জিয়াই এখন নাকি চিফ অব স্টাফ।'

'রাইট।' আলাউদ্দীন বলে। 'তবে মোশতাকের সম্ভবত নতুন সেনাপ্রধানের উপর পুরো আস্থা নাই, সে তাই জিয়ার উপরেও দুইটা নতুন পদ নিয়া আসছে। একটা চিফ অব ডিফেন্স স্টাফ, তিন বাহিনী প্রধানের উপরেই কর্তৃত্ব রাখা হইছে এই পোস্টে। মেজর জেনারেল খলিলুর রহমান বসছে এইখানে। আর জেনারেল ওসমানীকে বানানো হইছে প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা, এদের সবার উপরে।'

'ওসমানীর বিষয়টা ইন্টারেস্টিং।' মেসবাহ বলে। 'উনি নাকি শুনলাম ক্যান্টনমেন্টের সামরিক জেনারেল আর বঙ্গভবনে আস্তানা গেড়ে বসে থাকা অফিসারদের মাঝে লিয়াজোঁ হিসেবে কাজ করতেছেন। একবার ক্যান্টনমেন্ট যান, একবার বঙ্গভবন!'

খোরশেদ ভাঙা স্বরে বলে, 'ফারুক রশিদরেও শুনলাম মেজর থেইক্যা প্রমোশন দেয়া হইবো। ঐদিকে ডালিমরেও নাকি আর্মিতে ফিরায়া আনা হইছে!'

'হুম, মোশতাক খুব সতর্কভাবে নিজের জায়গা পাকা বানাইতেছে।' আলাউদ্দীন বলে। 'কাঁচাবাজারে জিনিসের দাম ঝট কইরা নাইমা গেছিল মোশতাক আসার পর। ইন্ডিয়াও শুনলাম বাংলাদেশের জনগণের সুখ সমৃদ্ধি চাইছে নতুন গভর্মেন্টের আন্ডারে, আমেরিকাও নতুন সরকাররে স্বীকৃতি দিছে।

দেশের ভিতরে বাইরে মোশতাক নিজের একটা ইমেজ বানায়া ফেলছে অলরেডি...'

'মোশতাক মহা ধুরন্ধর।' মেসবাহ একটা সিগারেট ধরিয়ে ফেলে এসময়। 'দেশের মানুষকে সে দেখাতে চাইছে শেখ মুজিবের প্রতিটা পদক্ষেপই ভুল ছিল। দাম কমার হিসাবটা খুবই সহজ, জুলাই থেকেই বাজারে চালের সাপ্লাই বাড়ছিল। সেদিন যেমন রেডিওতে বারবার প্রচার করা হলো চাল বোঝাই জাহাজ এসেছে আমেরিকা থেকে, কিন্তু একবারও বলল না- যে চালানটা আসলে মে মাসে এসেছে। ...মোশতাক মানুষকে বোকা বানাতে চাচ্ছে এবং দুঃখের বিষয়, এখনো পর্যন্ত সে পুরোপুরি সফল।'

খোরশেদকে অন্যদিনের মতো আজ আড্ডায় স্বতঃস্ফূর্ত দেখায় না। কিন্তু মোশতাক প্রসঙ্গে হঠাৎ ক্ষোভ শোনা যায় তার গলায়। 'উপরে উপরে লোক দেখায়া মোশতাক ক্যামনে চলতেছে, এইটাই তো বুঝতে পারতেছি না! শেখ মুজিবের বাকশাল বাতিল করল সে, ৬১ জেলার বদলে আগের ১৯ জেলাই বহাল রাখলো। কিন্তু ইসলামী প্রজাতন্ত্রের মতো একটা মিথ্যা আশ্বাস দিয়াও মোশতাক কিন্তু সংবিধানের চার মূলনীতি একই রাইখা দিল। আমি তো ভাবছিলাম আর যাই থাকুক, শালায় প্রথমেই অন্তত ধর্মনিরপেক্ষতা বাতিল কইরা দিবো!'

আলাউদ্দীন উঠে গিয়া কুনু মিয়ার সামনে রাখা বিস্কুটের একটা বয়ামই তুলে নিয়ে আসে এবার। হাত ঢুকিয়ে একটার পর একটা টোস্ট বিস্কুট বের করে মুখে দিতে থাকে সে। খোরশেদ আর মেসবাহর কৌতূহলী দৃষ্টির মুখে একটু লজ্জিত হাসে সে। বলে, 'সকালে নাস্তা খাই নাই, খুব খিদা লাগছে!'

সারা ঢাকা শহর ঘুরে বেড়ানো ছাড়া আলাউদ্দীন তেমন কিছু করে না আজকাল। আজ সকালে হাটখোলার জয়কালী মন্দিরের পাশে তার হঠাৎ দেখা হয়েছে প্রেসিডেন্টের স্পেশাল অফিসার মাহবুব তালুকদারের সাথে। সরকারি চাকরি ভদ্রলোকের, এখন তাকে চলতে হচ্ছে খন্দকার মোশতাকের নির্দেশে। মাহবুব সাহেবকে বেশ বিমর্ষ দেখাল আজ। বললেন, খন্দকার মোশতাক প্রায়ই প্রকাশ্যে প্রয়াত রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবকে গালাগালি করেন। অতীতে যিনি উঠতে বসতে 'বঙ্গবন্ধু, বঙ্গবন্ধু' করতেন, তার কাছ থেকে এরকম আচরণ দেখতে একরকম মানসিক অত্যাচার মাহবুব সাহেবের জন্যে।

খোরশেদ আবারো কথা বলে ওঠে হঠাৎ। 'মওলানা ভাসানীও দেখলাম খন্দকার মোশতাকরে অভিনন্দন জানাইছেন। বললেন মোশতাকের ক্ষমতা গ্রহণ নাকি একটা ঐতিহাসিক পদক্ষেপ! খুব কষ্ট পাইছি বুঝলা! এইগুলারেই মনে হয় রাজনীতি কয়!'

'বাংলাদেশে এখন রাজনীতি মানে চুপ করে থাকা।' মেসবাহ বলে। 'আওয়ামী লীগারদের কেউ পালিয়ে আছে, কেউ কেউ মিটিং করছে বদ্ধ ঘরে।

মুসলিম লীগ, জামাতে ইসলামীর মতো দলেরা মৌন সমর্থন দিচ্ছে মোশতাককে। সর্বহারা দলগুলো হয়তো পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে। ইন্টারেস্টিং হচ্ছে জাসদের প্রতিক্রিয়া। মোশতাকের কাজকর্মে তাদের এমনকি কোনো মৌন সমর্থনও নাই। ওদের ইন্টেনশনটা ধরা যাচ্ছে না...'

কুন্নু মিয়ার দোকানের বিল বাকি রেখে আলাউদ্দীন বেরিয়ে পড়ে খানিক পর। রাজনীতির মারপ্যাঁচ আর অস্ত্রের ঝনঝনানি একত্র হয়ে অদ্ভুত রকমের এক দ্যোতনা তৈরি করছে আজকাল বাংলাদেশে। নতুন বাংলাদেশের নতুন দিনের সারথি মোশতাক, সেই মোশতাকের মন্ত্রিসভায় দেশের যাবতীয় সমস্যার পরিবর্তে জাতীয় পোশাক নির্ধারিত হয় ইদানীং! মনে মনে আলাউদ্দীন হেসে ফেলে। একটি বিশেষ ডিজাইনের কালো টুপি, প্রিন্স কোটের কায়দায় বানানো গলাবন্ধ একরকমের কোট আর ফুলপ্যান্টকে বানানো হয়েছে ন্যাশনাল ড্রেস। ধুরন্ধর মোশতাক বিদূষকের কায়দায় আসল সমস্যা ভুলিয়ে রাখতে চাইছে মন্ত্রিসভাকে।

প্রেসক্লাবে গিয়ে আলাউদ্দীন আরো এমন একটা খবর পেল, যাতে তার মনে হয় খন্দকার মোশতাক আরো একটা গুরুত্বপূর্ণ তাসকে আস্তিনে ঢুকিয়ে ফেলেছেন। জানা গেল গণচীন স্বীকৃতি দিয়ে দিয়েছে বাংলাদেশকে।

বঙ্গভবন বনাম ক্যান্টনমেন্ট

সপ্তাহখানেকের মাথায় আলাউদ্দীনের স্থান হলো ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে।

বাতাসে অবশ্য গুজব উড়ে বেড়াচ্ছিলো যে এরকমটা হতে পারে। দলের ভেতর শেখ মুজিবের অনুরাগী যারা আছে, নিজের সমর্থকদের বাইরে রেখে সেইসব নেতাকর্মীদের মোশতাক জেলে ভরতে যাচ্ছে। এ মাসের প্রথম সপ্তাহে তাই ব্যাপক ধরপাকড় হলো। স্পেশাল পুলিশের দল ঢাকার বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে আলাউদ্দীনের মতো অনেককেই গ্রেপ্তার করেছে। প্রথমবারের মতো জেলে ঢুকেও পূর্বপরিচিত বেশ কজনকে তাই চোখে পড়েছে আলাউদ্দীনের।

এখানে এসেই আলাউদ্দীন জানতে পেরেছে বেশ কিছু খবর। সিনিয়র নেতাদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়ে মোশতাক নাকি গিয়েছিলেন অপেক্ষাকৃত নবীন নেতাদের কাছে। তোফায়েল ভাই, রাজ্জাক ভাইদের নাকি শত চেষ্টায়ও দলে টানতে পারেননি মোশতাক। দলীয় নেতাদের কাছে এরকম বাধা পেয়ে মোশতাক আপাতত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সবাইকে জেলে ভরেছেন, সামনে কী হয় তা কে জানে!

আলাউদ্দীনের জায়গা হয়েছে ২৬ সেলে, জায়গাটাকে জেলের ভেতরে এই নামেই ডাকা হয়। ২৬ সেলের সাথেই লাগানো জেলের দেয়াল, সে দেয়ালের ওপাশে উর্দু রোড। সকালে কি সন্ধ্যায় উর্দু রোডের জীবনযাত্রার শব্দ পাওয়া যায়

প্রতিনিয়ত, একটু একটু দেখা যায় সেখানকার মসজিদটাও। মাঝে মাঝে খুব একঘেয়ে লাগলে আলাউদ্দীন ঐ মসজিদটাই খুঁটিয়ে লক্ষ করে বারবার। আর কিছু তো করার নেই এখানে! সামান্য একটা ইটের দালানের দৈনন্দিনতার মাঝেই কী অসাধারণ গতি লুকিয়ে থাকে, বন্দী না হলে আলাউদ্দীন সেটা কখনোই বুঝত না।

২৬ সেলের ভেতরের জায়গাটা বেশ বড়। মোট ১৩টি কামরা, প্রতিটিতে দুজন করে, ২৬ সেল নামকরণ করা হয়েছে এ থেকেই। নিজেদের রান্নাঘর, গোসলখানা আছে ২৬ সেলে। খোলা জায়গা আছে, বিকালে হাঁটা চলা করা যায় বেশ।

আলাউদ্দীনের মতো রাজনৈতিক বন্দীসহ নানা রকমের বন্দী আছে ভেতরে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেভেন মার্ডার মামলার আসামি রঞ্জু বা বিটু যেমন আছে, আছে শহীদুল্লাহ কায়সার হত্যা মামলার আসামি রাজাকার মওলানা খালেকও। ২৬ সেলের ভেতরে আলাউদ্দীনের পরিচিত মানুষ পাওয়া গেছে দুইজন। একজন এইচ টি ইমাম, অন্যজন একরাম নামের এক ছেলে– সে জাসদের সদস্য।

এইচ টি ইমাম সাহেব মন্ত্রিপরিষদের সচিব ছিলেন বলে জেলের আইজি, ডিআইজি, জেলার– সবার সাথেই বেশ পরিচয় আছে তার। ভদ্রলোককে তাই বেশ খাতির করে জেলের লোকেরা, প্রায় প্রতিদিনই তার জন্যে বাড়ি থেকে খাবার আসে, দেখাও করতে আসে পরিচিতরা। কাজেই সিপাইটাকে আসতে দেখে আজও আলাউদ্দীন মনে করেছিল ইমাম সাহেবের কাছে কোনো দর্শনার্থী এসেছে। কিন্তু তারই ডাক পড়েছে, সিপাইয়ের মুখে এই কথা শুনে আলাউদ্দীন বেশ অবাকই হয়ে গেল।

জেলগেটে গিয়ে তারেকুল আলমকে দেখে অবশ্য আলাউদ্দীনের মুখে একটা চওড়া হাসি চলে আসে।

'কী ব্যাপার, খায়া দায়া খালি ফুলতেছিস মনে হয় জেলের ভেতর?' তারেক বলে।

আলাউদ্দীনও উত্তর দেয় রসিকতা করে, 'তোমরা তো আর দেশের জন্যে কিছু করলা না! জেলের ভাত খাইলে দেশের যে কী বরকত হয়, সেইটা বুঝার সাধ্য কি আর তোমাদের আছে!'

দুই বন্ধু হেসে ওঠে একসঙ্গে। জেল জীবনে এতটা উদার হয়ে হাসা, আলাউদ্দীনের এই প্রথম।

'হঠাৎ করে ধরা পইড়া গেছি বুঝলি, ' খানিক পরে তারেককে বলে সে। 'জরুরি আইনে গ্রেপ্তার করছে আমারে, কাজেই কতদিন আটকায়া রাখা কে জানে! তুই একটু আমার চাচারে কিছু একটা বুঝ দিয়া খবর দিস। উনি দুশ্চিন্তা করবো নাইলে।'

তারেকুল আলম মাথা নাড়ে। আলাউদ্দীনের বাবা মা নেই, সে বড় হয়েছে চাচার কাছে। একমাত্র অভিভাবককে সে আশ্বস্ত করতে চাইবে, এমনটাই

স্বাভাবিক। 'আমি খবর দিবো, টেনশন করিস না।' আলাউদ্দীনের হাত চাপড়ে দেয় সে।

নিচু স্বরে বন্দী বলে, 'সিগারেট আনছোস? মনে হইতেছে একবছর ধইরা সিগারেট না খায়া আছি!'

তারেক সিগারেট বের করে এক প্যাকেট। প্রহরায় থাকা সিপাই চোখ কটমট করে তাকালে তারেক লজ্জিত হাসি হেসে তার পকেটে দুটো সিগারেট গুঁজে দেয়। এরপর, আলাউদ্দীনকেও গোটা পাঁচেক সিগারেট এগিয়ে দেয় সে। সিপাইটা একটা সিগারেট ধরায় নিজে, আলাউদ্দীনেরটাও ধরিয়ে দেয়।

সিগারেট ধরিয়ে লম্বা একটা টান দেয় আলাউদ্দীন। বলে, 'বাঁচলাম! ... হ, এইবার খবরটবর সব শুনাও তারেক মিয়া! ভিতরে থাইকে তো তেমন কিছু জানা যায় না। কী অবস্থা শহরের?'

তারেক বলে, 'খবর তো তেমন কিছুই না। বাইরে বাইরে কিছুই বুঝা যাইতেছে না। খালেদ মোশাররফরে দেখলাম খুব টেনশনে আছেন। জিয়াকে সেনাপ্রধান বানানোর পরে উনি সম্ভবত একটু নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতেছেন। আবার ওইদিকে ফারুক-রশিদের সাথে যারা বঙ্গবন্ধুর অ্যাসাসিনেশন অপারেশনে ছিল, তারা এখনো বঙ্গভবনের ঐ মেজরদের আন্ডারেই আছে। ব্রিগেড কমান্ডার শাফায়াত জামিল এখনো তাদের উপর কোনো নিয়ন্ত্রণ আনতে পারে নাই।'

'আর্মির ভিতরে তাইলে শৃঙ্খলা বলতে কিছু নাই এখন।' আলাউদ্দীন মন্তব্য করে।

'একদমই নাই।' তারেক বলে। 'মোশতাক নিজেও বুঝতেছেন উনি জুনিয়র কিছু আর্মি অফিসারের উপর ভর করে দাঁড়ায়ে আছেন, সিনিয়রদের প্রত্যক্ষ সমর্থন তার পেছনে নাই। সেদিন নাকি আর্মির সিনিয়র অফিসারদের মোশতাক চা খাইতে দাওয়াত দিছিলেন বঙ্গভবনে। পরে জানলাম সিনিয়র অফিসারেরা নাকি বলছেন, ফারুক-রশিদের মতো জুনিয়র অফিসারদের উপস্থিতিতে তারা বঙ্গভবনে যাবেন না। শেষে মোশতাক জুনিয়র অফিসাররা টি-পার্টিতে থাকবে না, এই রকম কথা দেয়ার পরেই নাকি সিনিয়র কিছু অফিসার গেছিলেন পার্টিতে। তবে সেই পার্টিও বেশি জমে নাই। থমথম পরিবেশ দেখে লোকজনে আগে আগেই ফিরত আসছে।'

'ইন্টারেস্টিং ব্যাপার!' আলাউদ্দীন বলে। 'তোর তো খালেদ মোশাররফের সাথে বেশ খাতির আছে। উনার অবস্থা কী রকম দেখলি?'

'উনার সাথেও কথা বলে আসলাম সেদিন।' তারেক উত্তর দেয়। 'কী বলবেন আর। যা শুনলাম, শাফায়াত জামিল আর উনার চিন্তা-ভাবনা একই রকম। মানে বিদ্রোহ করা মেজরদের ক্যান্টনমেন্টে নিয়া আইসা শৃঙ্খলা ফিরায়ে আনা। শাফায়াত নাকি প্রায়ই জেনারেল জিয়ার কাছে ইনায়ে বিনায়ে বলতেছেন

মেজরদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে, কিন্তু জিয়া নাকি শুধু অপেক্ষা করতে বলেন। ক্যান্টনমেন্টের মাঝে একরকম প্রকাশ্যেই এইসব নিয়ে আলোচনা হইতেছে।'

আলাউদ্দীন মনে মনে ভাবে, মোশতাক ছাড়া শেখ মুজিবের হত্যাকাণ্ডে লাভবান হয়েছেন জেনারেল জিয়াও। তবে সেনাপ্রধান হয়েও জিয়া এখনো মোশতাক-ওসমানীদের অধীনেই থেকে গেছেন। আর সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলা অমান্য করা ফারুক বা রশিদের মতো মেজরেরাও জিয়ার আওতায় নেই। জিয়া একরকম মধ্যপন্থা অবলম্বন করছেন তাই।

ইতিহাস যখন ভবিষ্যতে পর্যালোচনা করতে চাইবে জেনারেল জিয়াকে, তখন সে দেখবে একদম অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত মধ্যপন্থা আশ্রয় করে যাওয়াই স্বভাব ছিল তার। উনিশশো পঁচাত্তরের এই বারুদ পরিস্থিতিতেও জেনারেল জিয়া যথারীতি নিরুদ্বিগ্ন, অপেক্ষা করে যাচ্ছেন কেবল।

একজন পেশাদার সেনা কর্মকর্তার মতোই তিনি শেখ মুজিবের হত্যাকাণ্ডের পরে কনস্টিটিউশন আপহোল্ড করবার নির্দেশ দিয়েছিলেন শাফায়াত জামিলকে, কিন্তু সেনাপ্রধানের অন্যতম দায়িত্ব চেইন অব কমান্ড প্রতিষ্ঠায় সরাসরি কোনো আগ্রহ দেখা যায় না জিয়ার। সর্পিল এই সময়ের পটভূমিতে টেনিস কোর্টে বিকেল কাটানোর পাশাপাশি চিফ অব স্টাফ জিয়া আরো একটি কাজ করছেন তলে তলে, জাসদের অন্যতম নেতা অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল আবু তাহেরের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন তিনি।

আর জাসদের কর্মকাণ্ডকেও সময়ের ছুটন্ত ঘোড়া ইদানীং দেখছে খুব কৌতূহলী চোখে। স্বাভাবিক স্রোতের বিপরীতে গিয়ে রক্তপাতের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করেছেন মোশতাক আর মেজরেরা, জাসদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি তা। অঙ্গ সংগঠন গণবাহিনী নিয়ে জাসদও তাই প্রস্তুত হচ্ছে আরেকটি প্রতিবিপ্লবের জন্যে। তাদের লক্ষ্য সেনা বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে শাসনব্যবস্থায় দেশজ একরকম সমাজতন্ত্র চালু করা। সময়ের বহু সমীকরণের মাঝে এই গুরুত্বপূর্ণ চলকটিকেও গোনায় ধরে রেখেছেন জিয়া, তাহেরের সাথে তা নিয়েই নিয়মিত কথাবার্তা হচ্ছে তার। আলাউদ্দীন বা তারেকুল আলমদের অবশ্য সেটি জানার উপায় নেই।

এই মুহূর্তে, আরো কিছু কথার পর জেলগেট থেকে তারেকুল আলম বিদায় নিলে আলাউদ্দীন ফিরে চলে ২৬ সেলের দিকে। তার ভাবনায় অবশ্য তখন কেবল জেনারেল জিয়া নয়, বরং বিদ্যমান আরো বৃহত্তর প্রেক্ষাপটের একটি সম্ভাব্য দ্বন্দ্ব। মোশতাক আর খুনি মেজরেরা বঙ্গভবন আর ক্যান্টনমেন্টকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে মুখোমুখি। বাংলাদেশের ইতিহাস থেকে এখনো মুছে যায়নি শেখ মুজিবের রক্তের চিহ্ন, তার আগেই এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেশকে আবারো কোনো রক্তগঙ্গার উৎসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে কি না, কে জানে!

শেফালি ফুলের বন্দী

স্কুল থেকে ফেরার পরে প্রতিদিন যে অফিসারটি নিয়ম করে বইখাতা তল্লাশি করে, রিমি আজ সরাসরি তার কাছে গিয়ে বলল, 'আজকে আর চেক করা লাগবে না। এই যে, আপনাকে আগেই দিয়ে দিলাম কাগজটা।'

কাগজটা আসলে আব্বুর সাথে জেলখানায় দেখা করার অনুমতিপত্র। অবাক হয়ে সেটায় একবার চোখ বুলিয়েই অফিসারটি বেশ রেগে যায়। স্বর উঁচু করে বলে, 'আচ্ছা, এই ব্যাপার! আপনি আসেন আমার সাথে।'

অফিসারটি ফোন ঘোরায় কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল রুমের নাম্বারে। অপর প্রান্তের মানুষটিকে এপাশ থেকে বিস্তারিত জানানো হয়। রিমি কীভাবে স্কুল থেকে ফেরার পথে জেলে যাবার অনুমতিপত্র নিয়ে এসেছে সেটাই বারবার বলতে থাকে অফিসারটি।

আব্বুকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাবার পরে প্রায় একমাস কেটে গেছে, কিন্তু রিমিদের বাসার চারদিকে এখনো পাহারা বসানো। এখনো ওরা গৃহবন্দি, কেবল মিমি আর রিমিকেই স্কুলে যাবার জন্যে ছাড়া হয়। আর বাসায় যাওয়া আসার সময় দুইবেলা ঐ চেকিং নামের বিশ্রী জিনিসটা তো থাকেই। আব্বুর কোনো খোঁজই পাচ্ছিলো না তাই রিমিরা।

এ কারণেই রিমি ঠিক করেছিল, তাকেই কিছু একটা করতে হবে। আর কেউই যেহেতু বাসার বাইরে যেতে পারছে না, রিমি ছাড়া অন্য কারো পক্ষে কিছু করা আসলে সম্ভবও ছিল না। কিন্তু কাজটা খুব কঠিন হবে সেটা সে জানত। স্কুলে যাওয়া আসার সময়েও ওদের গাড়ির পেছনে লেজের মতো আরো একটা গাড়ি জুড়ে থাকে, রিমিদের তারা চোখের আড়াল করতে চায় না।

তবু রিমি একটা সাহসের কাজ করে ফেলেছে কদিন আগে। সকালে স্কুলের সামনে বেশ ভিড় জমে থাকে। অনুসরণকারীদের চোখ ফাঁকি দিয়ে সেই জটলার মাঝ থেকেই রিমি একটা রিকশা নিয়ে চলে গেছে মগবাজারে আনার আপার বাসায়। সেখান থেকেই কয়েক জায়গায় ফোন করে জানা গেছে, আব্বু আছেন ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে।

পরেরদিনও ক্লাস পালাল রিমি, এবার সে ট্যাক্সি নিয়ে চলে গেল লক্ষ্মীবাজারে ছোট কাকুর বাসায়। আব্বুর সাথে জেলে দেখা করার অনুমতি যোগাড় বিষয়ে কাকুর সাহায্য চাইল রিমি। বলে আসল, অনুমতি যোগাড় হলে যেন বাসার বদলে ছোট কাকু সরাসরি স্কুলেই চলে আসে। ছোট কাকু এদিক সেদিক দৌড়াদৌড়ি করে অনুমতিপত্র পেয়েছেন, সেটা নিয়ে আজ রিমিদের জন্যে তিনি অপেক্ষা করছিলেন স্কুলের গেটে। কাকুকে গাড়িতে নিয়েই রিমিরা আজ স্কুল থেকে বাসায় ফিরেছে। কাকু অপেক্ষা করছেন গাড়িতে, আর রিমি চলে এসেছে বাড়ি পাহারায় থাকা অফিসারটির কাছে।

অফিসারটি এতক্ষণে ফোনে কথা বলা শেষ করেছে। ফোন রেখে সে রিমিকে বলে, 'খালি আপনারা যাবেন। আপনাদের আম্মাকে যেতে দেয়া হবে না।'

রিমি আজ নাছোড়বান্দা। 'না, আম্মুকে ছাড়া আমরা আজকে যাবোই না। আপনি আবার ফোন করেন!'

অগত্য আবার ফোন ঘোরানো হয়। দীর্ঘক্ষণ ওপ্রান্তের সাথে আলোচনা করে লোকটি একসময় বিরক্ত মুখে বলে, 'আচ্ছা যান। আপনার আম্মাকেও যাবার পারমিশান দেয়া হইছে।'

প্রায় এক মাস পরে অবশেষে বাসা থেকে বের হলেন জোহরা। রিমিরা সবাই ছোট কাকুকে সাথে নিয়ে চলল নাজিমউদ্দীন রোডের সেন্ট্রাল জেলে।

জেল ফটক দিয়ে ঢুকে ডান দিকে ওয়েটিংরুম। সেখানেই বসে রিমিরা, কেউ একজন আব্বুকে খবর দেবার জন্যে চলে যায় ভেতরে। জানালা দিয়ে সবাই সাগ্রহে তাকিয়ে থাকে বাইরে। খানিক পরে দেখা যায় বহু দূরের প্রাচীন গাছপালার মোড়কে সবুজাভ হয়ে থাকা আলোর মাঝে যে রাস্তা, তার মাঝ দিয়ে হেঁটে আসছেন তাজউদ্দীন। কাছে এলে তার মুখের স্মিত হাসিটিও দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়।

ওয়েটিংরুমের বাইরে এসে রিমিরা সবাই একসাথে অভ্যর্থনা জানায় আব্বুকে। আব্বুও জড়িয়ে ধরেন ওদের সবাইকে, আদর করে দেন একে একে।

খানিক সুস্থির হয়েই তাজউদ্দীন প্রশ্ন করেন, 'কী ব্যাপার, তোমরা এতদিন আসো নাই ক্যান?'

জোহরা ব্যাখ্যা করেন পুরো ব্যাপার। পরিবারের সবাই এখনো গৃহবন্দি আর অনুমতিপত্র দেখাবার পরেও আসতে বাধা দেয়া হচ্ছিলো রিমিদের, এসব কথা শুনেই কেমন রেগে যান তাজউদ্দীন। বলেন, 'কিন্তু আমাকে তো বলা হইছে আমাকে ধরে আনার সাথে সাথেই বাসা থেকে আর্মি তুলে নেয়া হইছে!'

পাশেই জেলের অফিস রুম। তাজউদ্দীন সাথে সাথেই চলে যান সেখানে, কোথায় যেন ফোন করেন। রিমিরা শুনতে পায় আব্বু উত্তেজিত গলায় বলছেন, 'না না, আপনারা আমাকে মিথ্যা কথা বলছেন। আপনারা বলছিলেন যে আর্মিরা সরে গেছে...'

ফোনালাপ শেষ হলে তাজউদ্দীন আবার ওয়েটিংরুমে আসেন। কথা বলতে থাকেন রিমিদের সাথে। সেখানে তখন মনসুর আলীও ছিলেন, একমাত্র মেয়ে শিরিনকে ধরে কাঁদছিলেন তিনি। জোহরার দিকে তাকিয়ে মনসুর আলী বলেন, 'ভাবি, কী যে আছে কপালে কে জানে! আমাদের যে কী হবে...'

জোহরা আর কী বলবেন, নিষ্প্রাণ সান্ত্বনা ছাড়া তার তো দেয়ার কিছু নেই। বলেন, 'সব ঠিক হয়ে যাবে ভাই। ইনশাল্লাহ, সব ঠিক হয়ে যাবে...'

তাজউদ্দীন এদিকে প্রশ্ন করেন জোহরাকে, জানতে চান শহরের হালচাল। গৃহবন্দি থাকায় জোহরা তেমন কিছু জানেন না, রিমি যা শুনেছে স্কুলের বন্ধুদের

মুখে সেটুকুই জানায় আব্বুকে। জেলখানায় রাজবন্দি হয়ে থাকা অন্য নেতাকর্মীদের কাছে বিভিন্ন দর্শনার্থী আসে প্রতিদিন। তাদের মাধ্যমে জেলে বসেও অনেক কিছুই কানে আসে তাজউদ্দীনের। তিনি মনে হয় বেশ হতাশ হয়ে পড়েন পরিস্থিতি বিচার করে। আনমনে বলেন, 'লিলি, মনে হচ্ছে ধরা দিয়ে ভুল করে ফেললাম বুঝলা! যা শুনতেছি, তাতে মনে হচ্ছে পরিস্থিতি আরো খারাপের দিকে যাচ্ছে।'

আলাপ শেষে রিমিরা বাসায় ফেরে আব্বুর আশঙ্কা সঙ্গী করে। আর তাজউদ্দীন চলে যান নতুন জেল বিল্ডিং-এর দিকে। আইজি অফিসের একটা ভবনের তিনটা রুমে বন্দী আছেন তারা সবাই, লোকে আজকাল এটাকেই নিউ জেল বলে। তিন রুমের মাঝে প্রথমটা, এক নম্বর রুমটাই তার ঠিকানা।

জেলখানায় সাধারণ কয়েদিদের সিপাইরা ডাকে ফালতু বলে। তাজউদ্দীনের মতো রাজনৈতিক বন্দীরা অবশ্য ভালোই খাতির পান, তাদের সাথে বেশ সম্ভ্রমের সাথেই কথা বলে সবাই। কিন্তু যতবার অন্য কয়েদিদের ফালতু বলে ডাক দেয়া হয়, কোথায় যেন একটু দুঃখ লাগে তাজউদ্দীনের।

তাজউদ্দীন জেলে বসে বসে পড়ালেখা করেন। লাইব্রেরির ক্যাটালগ দাগিয়ে বই পছন্দ করেন তিনি, জেলের লাইব্রেরিয়ান তাকে বই এনে দেয়। অন্য বন্দীদের মতো অলস সময় কাটাতে ভালোবাসেন না তাজউদ্দীন, আজেবাজে কথায়ও সময় ব্যয় হয় না তার। তাজউদ্দীন বই পড়েন, সময়ে সময়ে তার ডায়েরিটা নিয়ে বসেন। লিখতে থাকেন মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস।

আর বাগান করেন।

মুক্তিযুদ্ধের সময় ফাইল দেখার ফাঁকে ফাঁকে কাপড়ে জমে থাকা ময়লা পরিষ্কার করা মানুষটি সরাতে থাকেন জেলের মাটিতে জমে থাকা জঞ্জাল। খুন্তি-কোদাল হাতে মাটি কুপিয়ে কুপিয়ে আগাছা পরিষ্কার করেন তাজউদ্দীন। পচা পানির কিছু নর্দমা ছিল একপাশে, সেগুলোকে বুজিয়ে দিয়ে পরিবেশটা আরো পরিচ্ছন্ন করতে ইদানীং ব্যস্ত সময় কাটে তার। সারাটা জীবন সুন্দরের প্রতিষ্ঠার জন্যে লড়েছেন তিনি, বাগান তৈরি করে তাজউদ্দীন যেন ফোটাতে চান সেই সুন্দর।

তুচ্ছ এক রাজবন্দি তিনি নিষ্প্রাণ ধূসর জেলের মাঝে আয়োজন করেন শেফালি ডালিয়া রক্তজবার সমারোহের। হয়তো বাংলাদেশের তছনছ হয়ে যাওয়া বাগানটিকেও গুছিয়ে দেয়ার জন্যে প্রস্তুত হন তিনি মনে মনে। সামনের দিনে সময় সেই কাজের ভার এ মানুষটিকেই দেবে কি না, কে জানে!

জেলের মধ্যেও আজ ঈদের দিনের আমেজটা পাওয়া যাচ্ছে।

সকালে ভেতরের প্রাঙ্গনেই সব বন্দীরা একত্রে ঈদের নামাজ পড়ল। নামাজের পরে সবার সাথে একত্রে দেখা হলো আজ অনেকদিন পর। তাজউদ্দীন মোটামুটি সামনের দিকেই বসেছিলেন। নামাজ শেষে সবার সাথে হাসিমুখে কোলাকুলি সারলেন তিনি।

কারাগারের ভেতরে আজ কয়েদিদের চলাচলে কোনো বাধা নিষেধ নেই। সব কয়েদিই এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে, হাসি ঠাট্টা করছে, ঈদ উপলক্ষে রান্না হওয়া ফিরনি পায়েস খাচ্ছে। কারাগারের নিয়ত জীবনযাত্রার চেয়ে একদম স্বতন্ত্রই বলতে হবে আজকের দিনটাকে।

তাজউদ্দীন নিউ জেলের দিকে রওয়ানা দিলেন। নিজের কামরায়, এক নম্বর রুমে, ঢুকতেই তাজউদ্দীন খেয়াল করলেন, মনসুর আলী আর কামারুজ্জামান ইতোমধ্যেই আড্ডা দিতে চলে এসেছেন। আর নজরুল ভাই তো কারাগারে তাজউদ্দীনের রুমমেটই। সবাই মিলে আজ তা হলে ভালোই জমে গেল, ভেবে কিছুটা উৎফুল্ল হন তাজউদ্দীন।

জেলে আসার পর থেকে মনসুর ভাই আজকাল দিনরাত দুশ্চিন্তা করেন, কিন্তু আজকে তাকেও পুরনো দিনের মতো প্রফুল্ল দেখাচ্ছে। তাজউদ্দীনকে দেখেই তিনি বলেন, 'আরে তাজউদ্দীন ভাই, দেরি কইরা ফালাইলেন তো! জর্দা ফিরনি নিয়া বইসা আছি মিয়া আপনেগো লাইগা!'

বাসা থেকে টিফিন ক্যারিয়ার ভর্তি করে জর্দা ফিরনি পাঠানো হয়েছে মনসুর আলীকে, একটা বাটি নিয়ে তিনি তারই খানিক তুলে দেন তাজউদ্দীনের হাতে। স্মিত হেসে চৌকির উপরে উঠে তাজউদ্দীন ফিরনি খাওয়া শুরু করেন।

সৈয়দ নজরুল হাসিমুখে বলেন, 'মনসুর ভাই চিকন মানুষ হলে কী হবে, ভাবি কিন্তু ভালো রান্না করেন!'

হাসির একটা হুল্লোড় ওঠে ঘরজুড়ে, আবহাওয়ায় অন্য দিনের চেয়ে ভিন্ন হয়ে উঠতে থাকে নিউ জেলের এক নম্বর কক্ষটি। খানিক পরে সেখানে এইচ টি ইমামকে নিয়ে আলাউদ্দীনও এসে পড়ে চারনেতার সাথে কুশল বিনিময় করতে।

এইচ টি ইমামের সাথে বেশ চমৎকার সম্পর্ক চারনেতার সবার। মনসুর আলী রসিক মানুষ, হেসে বলেন, 'কী খবর ইমাম, খুব লম্বা হাসি দেখা যাইতাছে? ঈদে কি সালামি অনেক পাইলা নাকি?'

হাসতে হাসতে ইমাম সাহেব জবাব দেন, 'না স্যার, মোশতাকের নতুন নাম শুইনে হাসতেছি। লোকজন আজকাল উনাকে মুষিক বলে ডাকতেছে স্যার! ... ভালো হইছে না স্যার নামটা?'

আলোচনার মোড়টা এরপরে চলে যায় মোশতাকের দিকেই।

আলাউদ্দীন একটা চৌকির কোনার দিকে বসে বলে, 'স্যার, রক্ষীবাহিনীর খবরটা পাইছেন? ঈদের ঠিক আগে আগে ওদের সেনাবাহিনীতে নিয়ে নেয়ার আদেশ দিছে শুনলাম...'

কামারুজ্জামান মাথা নাড়েন। 'শুনেছি। এর মানে হচ্ছে, রক্ষীবাহিনীর উপরে মোশতাক ঠিক ভরসা পাচ্ছিলো না। একদিক দিয়ে অবশ্য বিষয়টা ভালোই হলো, সেনাবাহিনীতে মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যা বাড়লো...'

এইচ টি ইমাম খানিক পরে গলার স্বর গাঢ় করে বলেন, 'বিশেষ অর্ডিন্যান্সটার কথা আপনারা ভুলে গেলেন স্যার? ঐ যে, মোশতাক ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ দিলেন যে ১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ডের কোনো বিচার করা চলবে না, তার জন্যে কোনো শাস্তি দেয়াও চলবে না?'

একটু চুপ হয়ে যান সবাই এ প্রশ্ন শুনে। সৈয়দ নজরুল ফিরনির বাটি ফিরিয়ে দিতে দিতে বলেন, 'মোশতাক কী ভাবছে এভাবে ও বেঁচে যাবে? ঐ ফারুক রশিদ ডালিমেরা বেঁচে যাবে? ... ইতিহাস কাউকে ক্ষমা করে না, বুঝলা। আজ হোক, কাল হোক, মোশতাকের গায়ে সবাই থুতু মারবেই। ইনডেমনিটি, ট্যাঙ্ক আর আর্টিলারি দিয়ে মোশতাক আর কতদিন নিজেকে আড়াল রাখবে?'

'একজ্যাক্টলি।' তাজউদ্দীন মৃদু স্বরে বলেন। 'আশা হারালে তো চলবে না ইমাম সাহেব, মোশতাক এখন প্রেসিডেন্টের চেয়ারে আছে সম্পূর্ণ অস্ত্রের জোরে। খুব বেশি দিন মানুষের চোখে ধুলা দিয়ে এভাবে দেশ চালানো সম্ভব না।'

'মোশতাক কিন্তু বেআইনি অস্ত্র উদ্ধারের নামে তো স্যার প্রতিদিন ম্যালা মানুষরে গ্রেপ্তার করতেছে!' আলাউদ্দীন বলে। 'বেশিরভাগই স্যার আওয়ামী লীগের লোকজন। কত অস্ত্র উদ্ধার করল, সেটার কিন্তু স্যার কোনো হিসাব দিতেছে না।'

সৈয়দ নজরুল বলেন, 'মোশতাক খুব সম্ভব চাইতেছে গা থেকে আওয়ামী লীগের লেবাসটা খুলে ফেলতে। অলরেডি চীন, আমেরিকা, সৌদি আরবের স্বীকৃতি চলে আসছে। কাজেই মোশতাকের ভোল পাল্টাতে আর বেশিদিন লাগাবে বলে মনে হয় না...'

'শুধু মওলানা ভাসানীর কাজকর্ম দেখে বড় খারাপ লাগে বুঝলেন!' মনসুর আলী দুটো বাটি ধুয়ে আলাউদ্দীন আর এইচ টি ইমামের দিকেও জর্দা এগিয়ে দেয়ার ফাঁকে বলেন। 'হুজুর কয়েক মাসেই আগেই মুজিব ভাইরে 'আমার পোলা' বলে সম্বোধন করলেন, আবার এখন উনিই মোশতাককে অভিনন্দন দিতেছেন। শুনলাম, প্রায় প্রতিদিনই নাকি দুইজনের মাঝে যোগাযোগ হয়...'

আলোচনা চলতে থাকে, তাজউদ্দীন কেবল নীরবে শুনে যান। আর চিন্তা করেন। রাজনীতিতে শেষ কথা বলে কিছু নেই।

তাজউদ্দীন মোশতাককে যতটা চেনেন, মুজিব ভাইকে ছোট করতে– মুজিব ভাইকে দুর্নীতিবাজ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে, মোশতাক বহু নিচে নামতে পারে। একাত্তরে পাকিস্তানের সাথে কনফেডারেট রক্ষার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়েছিল মোশতাক, দরকারে এখন সে মৃত পাকিস্তানের ভূতকেই ডেকে নামাবে আবার।

জেলে বন্দী থাকলেও, বাইরে থেকে প্রতিদিনই কিছু কিছু খবর কানে আসে তাজউদ্দীনের। তাজউদ্দীন শুনতে পান, তার ধারণা সত্য করে বাংলাদেশের লাল সবুজে পাকিস্তানের চাঁদ তারা বসানোর পথে অল্পস্বল্প করে এগিয়ে যাচ্ছে মোশতাক।

রাজধানীর রাস্তা আজকাল মাহফিলে সরগরম করে তুলেছে জামায়াতে ইসলাম। বলে বেড়াচ্ছে, ভারতের রাহু থেকে মুক্ত হয়েছে দেশ। দেশ গড়ার কাজে নতুন সরকারকে সাহায্য করাটা এখন নাকি দায়িত্ব সকলের। মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকায় একটি ভবন বেছে নেয়া হয়েছে পাকিস্তান দূতাবাসের জন্যে। আকাশপথে পাকিস্তান থেকে এসেছেন জনাকয় প্রভাবশালী ব্যবসায়ী শিল্পপতি প্রতিনিধি, ঘুরে ফিরে দেখছেন তাদের ফেলে যাওয়া কারখানাগুলোকে। ঈদের শুভেচ্ছা নিয়ে চট্টগ্রাম বন্দরে এসেছে চাল আর গজ কাপড়ে ভর্তি পাকিস্তানি জাহাজ সফিনা-ই-ইসলাম। মোশতাকের তৈরি করা জালে এভাবেই পায়ে পায়ে আবার এগিয়ে আসছে পাকিস্তানের মাকড়সা।

তাজউদ্দীন আরো খবর পেয়েছেন, অক্টোবরের ১৬ তারিখ নাকি আওয়ামী লীগের দলীয় সাংসদদের এক সভায় ডেকেছে মোশতাক। সন্দেহ নেই, আওয়ামী লীগের সমর্থনও তার সাথে আছে -দেশের মানুষকে এটাই বোঝানোর প্রয়াস নিয়েছে মোশতাক এ সভা দিয়ে। তাজউদ্দীনের হিসাব বলছে, এই সভা আটকানো উচিত। জেলে থেকে বেশি কিছু করা সম্ভব নয়, বড়জোর বাইরে থাকা নেতাকর্মীদের খবর পাঠানো যায় যাতে তারা সে মিটিঙে যোগ না দেয়। তাজউদ্দীন সেটাই করবেন বলে ঠিক করলেন, স্থির করলেন, যত ভাবে পারেন বাইরে খবর দেবেন।

চিন্তার জাল ছিঁড়ে তাজউদ্দীন তাই আলাপরত সৈয়দ নজরুলদের হঠাৎ বলে ওঠেন, 'নজরুল ভাই, মনসুর ভাই, যেভাবে পারেন– পারলে বাইরে খবর পাঠান। কেউ যেন মোশতাকের ১৬ তারিখের মিটিঙে না যায়। মোশতাক যদি কোনোভাবে দলের একটা বড় অংশের সমর্থন পায়, তখন কিন্তু পরিস্থিতি খুব খারাপ হয়ে যাবে।'

হালকা আলাপচারিতার মাঝে তাজউদ্দীনের কথা শুনে কিছুটা যেন দুশ্চিন্তা ফিরে আসে সবার মাঝেই। সৈয়দ নজরুল, কামারুজ্জামান, মনসুর আলীরাও ভাবিত হয়ে পড়েন– মোশতাকের পরবর্তী চাল নিয়ে। এরপর নানা রকম আশঙ্কা সঙ্গী করে ঈদের দিনটাও কেটে যায় রাজবন্দীদের।

টালি খাতা

কারাগারের রাজবন্দীরা যখন হিসাব করে প্রস্তুত করতে চাইছেন সম্ভাব্য সমীকরণগুলো, অঙ্ক কষায় পিছিয়ে নেই তখন খন্দকার মোশতাকও।

রাষ্ট্রপতির আসনে কিছুটা গুছিয়ে বসেই মোশতাক নামেন তার পুরনো সহকর্মীদের একহাত দেখে নেয়ার কাজে। একটি বুলেটেই দ্বৈত উদ্দেশ্য হাসিলের সুযোগ এখন মোশতাকের সামনে। মেধায় আর কর্মদক্ষতায় প্রাক্তন যে সহকর্মীরা এতদিন প্রতিক্রিয়াশীল মোশতাককে পেছনে ফেলে সামনে এগিয়েছেন প্রগতির হাত ধরে, এখন সুযোগ সেই সব হারের প্রতিশোধ নেয়ার। আবার শেখ মুজিবের একান্ত অনুচর এই নেতাদের নীতিভ্রষ্ট প্রমাণ করা গেলে দুর্নীতিবাজদের দল হিসেবে একটা ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করা যায় আওয়ামী লীগের, সে ক্ষেত্রে কালো আচকানে 'শুভ্রতম' চরিত্রের মোশতাক হয়তো আরো একটু সমর্থন পাবেন জনমানুষের।

জানে সকলেই, মোশতাকের চিরশত্রু ঐ তাজউদ্দীন। তাজউদ্দীনের সম্পর্কে একটু তাই বেশিই আগ্রহ থাকে মোশতাকের। তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়েন তাজউদ্দীনের বিপক্ষে দুর্নীতির প্রমাণ সংগ্রহে। জনৈক মেজর তাই এক অলস দুপুরে কিছু সেনা সদস্য নিয়ে টোকা দেয় রিমিদের বাড়ির দরজায়। জানা যায়, তারা তদন্ত করতে এসেছে।

তাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসার পরও আর্মিরা বাড়ি ঘিরে রেখেছে শুনে রেগে গিয়ে তাজউদ্দীন যে টেলিফোন করেছিলেন, তার পরদিন থেকেই সশস্ত্র পাহারা উঠে গেছে রিমিদের বাড়ি থেকে। তবে ফোনের লাইন পেতে সময় লেগেছে আরো কয়েকদিন।

তদন্তে আগত মেজর এদিকে সাথে নিয়ে এসেছে একজন ক্যামেরাম্যানও। নানা দিক থেকে ছবি তোলা হতে থাকে তাজউদ্দীনের বাড়ির। রিমিরা শোনে, মেজরটি নির্দেশ দিচ্ছে, 'এমন ভাবে ফটো নিবা, যেন বাড়িটারে দেখতে খুব বড় দেখায়!'

ছবি তোলা পর্ব শেষ হয় একসময়। একজন আর্মি অফিসার এরপর রিমিদের আম্মুকে জিজ্ঞাসাবাদ করা শুরু করেন।

বলেন, 'দেখি, আপনার বড় ছেলেকে ডাকেন। ঐ যে, যে বিদেশে লেখাপড়া করে।'

রিমির পাশে বসা সোহেলকে দাঁড় করিয়ে জোহরা তাজউদ্দীন বলেন, 'এইটাই আমার একমাত্র ছেলে। ছোট, বড় আর কোনো ছেলেই নাই।'

ঢাকা শহরে তাজউদ্দীন নামের যত মানুষ রয়েছে, সকলের সমস্ত সম্পত্তির মালিকানা যেন রিমির আব্বুর, এই ভঙ্গিতে এরপর জিজ্ঞাসাবাদ চালাতে চান অফিসারটি। তাজউদ্দীন কয়টা পেট্রোল পাম্পের মালিক, লঞ্চ কোম্পানিতে কত শেয়ার আছে তাজউদ্দীনের– জানতে চাওয়া হয় এসব।

খানিক রেগে গিয়ে জোহরা বলেন, 'একটু খোঁজখবর নিয়ে আসলেই তো আপনাদের এতো কষ্ট করতে হইতো না!... শুনেন, এই বাড়ি ছাড়া ঢাকা শহরে তাজউদ্দীন সাহেবের কোনো বিষয় সম্পত্তি নাই। স্বনামে বা বেনামে কোনো ব্যবসার সাথেও তাজউদ্দীন জড়িত না!'

অফিসারটি এবার প্রশ্ন করেন বাড়ি নিয়েই। বলেন, 'এই বাড়ি কখন বানানো হইছে?'

জোহরা উত্তর দেন, 'একষট্টি সালেই এই বাড়ি তৈরি হইছে। হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশনে খোঁজ নেন, ওদের কাছে দলিল আছে। ওদের লোন নিয়েই এই বাড়ি বানানো। অর্থমন্ত্রী হবার পরে তাজউদ্দীন এই বাড়ি বানান নাই।'

জোহরার মুখে কাটা কাটা স্পষ্ট উত্তরে বিব্রত হয়ে যান প্রশ্নকর্তা অফিসারটি। কিছুটা হয়তো অপরাধবোধেও ভোগেন। দীর্ঘশ্বাস ফেলে দুই হাতে কপাল চেপে ধরে বসে থাকেন তিনি। খানিক পর ধীরে ধীরে বলেন, 'ম্যাডাম রাগ করবেন না প্লিজ। সত্যি কথা হচ্ছে, উপর থেকে আমাদের উপর চাপ আসতেছে তাজউদ্দীন সাহেবের বিপক্ষে দুর্নীতির প্রমাণ বের করতে। কিন্তু গত কয়েকদিনের তদন্তে উনার বিরুদ্ধের কোনো অভিযোগই টিকে নাই।'

অফিসারটি রিমিদের একটি ঢাউস আকৃতির লাল রঙা ফাইল দেখান। জানান, এই ফাইলটি আলোচিত ম্যানসেরু মিয়া মামলার। আবদুল লতিফ সিকদার নামের একজন সহকারী কালেক্টরের ওপর সামরিক প্রশাসন থেকে চাপ দেয়া হয়, যাতে তিনি সাক্ষ্য দেন যে তাজউদ্দীন চট্টগ্রাম বন্দরে গিয়ে ক্ষমতার অপব্যবহার করে আটক পণ্য ছেড়ে দেবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু লতিফ সিকদার এর প্রতিবাদ করে তদন্তকারী অফিসারকে বলেছেন, শত জরুরি কাজের মাঝেও তাজউদ্দীন ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম গেছিলেন শুধুমাত্র তাকে অনুরোধ করা হয়েছিল বলে। চাপ দিতে চাইলে তাজউদ্দীনের জন্যে শুধু একটা ফোন করাই যথেষ্ট ছিল। এমন সাক্ষ্যের পর এখানেও কর্তৃপক্ষ তাজউদ্দীনের বিপক্ষে কিছু দাঁড় করাতে পারেনি।

এইসব বলার পর, ক্ষমা প্রার্থনা করে জোহরাদের কাছ থেকে বিদায় নেন অফিসারটি। পরবর্তীতে তিনি জিজ্ঞাসাবাদ করেন মফিজউদ্দিনসহ তাজউদ্দীনের পরিচিত আরো অনেককেই, কিন্তু ব্যর্থ হন বারবার।

বঙ্গভবন থেকে এক গোয়েন্দা ইনস্পেক্টর হাজির হন তাজউদ্দীনের প্রাক্তন একান্ত সচিব আবু সাইদ চৌধুরীর কাছেও। বলেন, তিনি এসেছেন তাজউদ্দীন সাহেবের সম্পর্কে কিছু তথ্যর জন্যে।

সাইদ সাহেব বঙ্গভবন নাম শুনেই সতর্ক হয়ে গেছেন। বলেন, 'কী জানতে চান আপনি?'

ইন্সপেক্টর ভদ্রলোক পুরনো একটি চিঠি বের করেন। ঢাকা পৌরসভার চেয়ারম্যানকে লেখা আবু সাইদের চিঠি। চিঠিতে পৌরসভার একটি আইন উল্লেখ করে আবু সাইদ লিখেছেন, '৭১ এর মার্চ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত তাজউদ্দীন সাহেব তার সাত মসজিদ রোডের বাড়িতে বাস করেননি, এ তথ্য ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত। এজন্যে এই বাড়ির ট্যাক্স কিছু কম হবে।

আবু সাইদের পুরো ঘটনাটা মনে পড়ে গেল। তিনি নিজেই আইনের এই ধারাটি নির্দেশ করে তাজউদ্দীনকে বলেছিলেন, 'স্যার, আইন যেহেতু আছে, আপনি শুধু শুধু বেশি ট্যাক্স দিবেন কেন? আপনি তো বাড়িতে থাকেন নাই!'

তাজউদ্দীন চিন্তিতভাবে বলেছিলেন, 'কিন্তু সেইটার প্রমাণ ক্যামনে দিবো!'

আবু সাইদ বলেছিলেন, 'স্যার, এই জন্যেই তো লিখেছি যে ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত!'

এই মুহূর্তে চিঠিটি দেখে আবু সাইদ হেসে ফেলেন। বলেন, 'এই চিঠির মধ্যে তদন্ত করার কী পাইলেন আবার? আমি তো লিখেই দিছি আইনের কোন ধারায় ট্যাক্স কম ধরা হবে!'

ইনস্পেক্টর ভদ্রলোক এবার কাঁদো কাঁদো হয়ে যান। বলেন, 'স্যার– প্রতিদিন এইরকম খোঁজ করতেছি। তাজউদ্দীন সাহেবের বিপক্ষে কিছু পাইতেছি না। কিন্তু বঙ্গভবন থেকে কয়েকজন প্রতিদিন হুমকি দিতেছে, যদি তাজউদ্দীন সাহেবের বিপক্ষে কিছু বাইর করতে না পারি– তাহলে নাকি আমারে গুলিই করে দিবে!'

গলা শক্ত করে এবার আবু সাইদ বলেন, 'দেখেন, আপনিও একজন মুসলমান, আমিও মুসলমান। আল্লাহর নামে শুনে রাখেন, তাজউদ্দীন সাহেব কোনো দুর্নীতি করেন নাই। তিনি এইসব জিনিসের অনেক উপরে ছিলেন। উনি যদি দুর্নীতি করতেনও, আমি আপনাকে সেটা বলতাম না।'

অতঃপর ব্যর্থ হয়ে ফিরে যেতে হয় এই ইন্সপেক্টরকেও। খন্দকার মোশতাকের প্রাণান্ত প্রচেষ্টার পরেও তাই কোনোভাবে দুর্নীতির অভিযোগ আনা যায় না তাজউদ্দীনের দিকে। তাজউদ্দীনের খালি খাতা তার হাতের লেখার মতোই স্বচ্ছ, চকচকে।

রিমিরা যখন দেখা করতে গিয়ে এই খবরগুলো পৌঁছে দিল তাজউদ্দীনের কাছে, মৃদু হেসে তিনি তাই বলেন, 'আনরা কে হিসাব পাক আস্ত, আয মোসাহেবে চেহ বাক আস্ত!'

নানার কাছে বহুবার শোনা, বিধায় এই ফার্সি প্রবাদটি বেশ সুপরিচিত রিমি রিপির কাছে। প্রবাদটি বলে, হিসাব যার পরিষ্কার– সে হিসাব রক্ষকের ধার ধারে না।

তবে হিসাব নিয়ে মাথা না ঘামালেও তাজউদ্দীন কিন্তু দিনরাত চিন্তা করছেন দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে। ১৬ তারিখে বঙ্গভবনে মোশতাক বৈঠক ডেকেছিলেন। সেটা ঠেকাতে তাজউদ্দীনের অনুরোধ পৌঁছে দিতে রিমি আর আবদুল আজিজ

বাগমার এমনকি এমপি হোস্টেলেও গিয়েছিলেন, বলে এসেছিলেন দলীয় সদস্যেরা যেন সে বৈঠকে যোগ না দেয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে সভায় যোগ দিয়েছে অনেকেই।

সভায় মোশতাক আগতদের মাঝে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নিজের সাফল্য বলে বর্ণনা করে গেছেন নির্লজ্জের মতো। কিন্তু অনেকে আবার ঘোর বিরোধিতাও করেছেন মোশতাকের। মোশতাক বুঝে গেছেন, পরিস্থিতি অনেকটাই এখনো অনুকূলে নেই তার। সব হিসেব মিলিয়ে তাজউদ্দীনও যেন তাই মুষড়ে পড়েছেন অনেকটা।

হতাশ স্বরে তাজউদ্দীন বলেন, 'লিলি, এই জীবনে সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে আগে কখনো এতো বড় ভুল করি নাই। তুমিই ঠিক বলছিলা, ১৫ আগস্টে বাসা থেকে সরে না গিয়ে আমি মারাত্মক ভুল করছি। যা অবস্থা দেখতেছি, আমাদেরকে মনে হয় না আর বাঁচায়ে রাখবে।'

জোহরা তাজউদ্দীন বলেন, 'এইসব অলুক্ষুণে চিন্তা মাথায় আইনো না তো! তোমার আটকাদেশ চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট পিটিশন করা হইছে। আমি ল-ইয়ারদের সাথেও কথাবার্তা বলতেছি। দেখবা, হাইকোর্টে পিটিশন যাইতে আর বেশিদিন লাগবে না।'

তাজউদ্দীন কিন্তু স্ত্রীর মতো আশাবাদী হতে পারে না। পরিস্থিতি ক্রমশ খন্দকার মোশতাকের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে আর ক্যান্টনমেন্টের সিনিয়র অফিসারেরাও কিছু একটা করার জন্যে ফুঁসছে। সব খবরই কানে আসে তাজউদ্দীনের। তাজউদ্দীন ভেবে দেখেন, পরিস্থিতি প্রতিকূলে চলে গেলে খন্দকার মোশতাকের জন্যে সবচেয়ে স্বাভাবিক কাজটি হবে, শেখ মুজিবের অনুসারীদের সরিয়ে দেয়া।

গভীর চিন্তায় পড়ে যান তাজউদ্দীন।

ত্রৈরাশিক

তারেকুল আলম গতবার ভুনা গরুর মাংস এনেছিল আলাউদ্দীনের জন্যে, ২৬ সেলের পরিচিতদের ভাগ দিতে হয়েছে সেটার। শূন্য টিফিন ক্যারিয়ার ফিরিয়ে দিতে দিতে আজ আলাউদ্দীন রসিকতা করে তারেককে শোনায়, 'তুই ব্যাটা বরাবরের মতো কিপ্টাই থাকলি! পুইড়া যাওয়া মাংস খাওয়াইলি, সেইটাও দিলি এইটুক মাত্র!'

কৃত্রিম গলা করে তারেকও জবাব দিতে ছাড়ে না, 'তাইলে আজকে সিগারেটের প্যাকেটটাও না দেই আর, সেইটারও তো দুইটা অলরেডি পুড়ায়া ফেলছি!'

এ কথার পর না হেসে পারা যায় না। কিছুক্ষণ হেসে নিয়ে দুই বন্ধুই একসাথে সিগারেট ধরায় এরপর। অবশ্য পাশে দাঁড়িয়ে থাকা পাহারাদার সিপাইটাকেও যথারীতি বখশিশ দিতে হয় একশলা।

তারেক নিয়মিত আলাউদ্দীনের কাছে আসে আজকাল। সপ্তাহে অন্তত বার দুয়েক তো আসেই। আলাউদ্দীন বলতে গেলে ঘড়ি ধরে অপেক্ষা করে বসে থাকে তারেকের জন্যে। কলেজ আর আধেক ভার্সিটি জীবন আড্ডা দিয়ে দিয়েই কেটেছে তার, বন্ধু ছাড়া সময় কাটানো তাই তার জন্যে বড় কঠিন। এই বন্দী জীবনে আড্ডা দেয়ার সময়টা তার কাছে হয়ে উঠেছে পরম আরাধ্য। তারেক সেটা বুঝেই সম্ভবত নিয়মিত আলাউদ্দীনকে দেখে যাওয়ার চেষ্টা করে। একদিন তো মেসবাহ, মাসুদদেরও ধরেবেঁধে এদিকে নিয়ে এসেছিল তারেক।

'বাইরের খবর টবর কিছু দে।' আলাউদ্দীন জিজ্ঞাসা করে ধোঁয়া উড়িয়ে।

'খবর আর কী...' , তারেক শ্রাগ করে। 'ও আচ্ছা, ভার্সিটি যে খুলছে এই খবর কি তোরে আগে দিছি?'

'বলছিলি।' সংক্ষেপে জানায় আলাউদ্দীন।

'মোশতাক খুব সম্ভব বাইরের দুনিয়ারে দেখাইতে চাইছিল যে সব ঠিকঠাক চলতেছে, বিশ্ববিদ্যালয়েও রেগুলার ক্লাস হচ্ছে। প্রথম কয়েকদিন সবাই মোটামুটি চুপচাপই ছিল বুঝলি। কিন্তু এখন আস্তে আস্তে ভয় কাটায়ে উঠে কথা বলতেছে পোলাপান।

হলে হলে মিটিং হইতেছে, এগুলা মেইনলি করতেছে ছাত্রলীগ আর ছাত্র ইউনিয়নের স্টুডেন্টরা। জাসদ ছাত্রলীগের পোলাপান অবশ্য চুপ। শুনতেছি ক্যাম্পাস এলাকায় নাকি প্রচুর সাদা ড্রেসের পুলিশ ঘোরাফেরা করতেছে।'

'অবস্থা তো দারুণ গরম মনে হইতেছে!' আলাউদ্দীন মন্তব্য করে।

'হু, মোশতাক মনে হয়ে এতোটা আশা করে নাই।' তারেক বলে। 'আড়ালে আড়ালে নাকি শালায় ছাত্রদের সাথেও মিটিং করার চেষ্টা করতেছে শুনতেছি, সত্য মিথ্যা বলতে পারি না।'

আলাউদ্দীন মনে মনে একবার বিশ্ববিদ্যালয়ের তপ্ত ক্যাম্পাসে নিজেকে কল্পনা করে শিহরিত হয়। শালার জেলে আটকা না পড়লে সেও আজকে থাকত পারত ঐসব গোপন সভায়। সূর্যসেন হলে নিশ্চয় মিটিং বসে গেছে এতক্ষণে...

'তোরে আরেকটা ইন্টারেস্টিং খবর দিই।' তারেকের হঠাৎ স্বরে ভাবনা ভেঙে যায় আলাউদ্দীনের। 'সেদিন ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি গিয়া এই অদ্ভুত ঘটনাটা জানলাম বুঝছোস!

...হাসানুল হক ইনু নাকি পলাশীতে হোস্টেলের ভিতরে কিছু আর্মির লোকের গোপন ক্লাস নিতেছে অনেক দিন ধইরা। আমি তো শুইনে মনে কর অবাক। পরে খোঁজ নিয়া জানলাম, ঢাকা শহরের আরো অনেক জায়গায় নাকি এইরকম আরো

গোপন মিটিং হয়। ইনু আর কর্নেল তাহের– ঐ যে, মুক্তিযুদ্ধের সময়ে সেক্টর কমান্ডার ছিলেন যিনি– এনারা নাকি প্রায়ই রাজনীতি নিয়া ক্লাস নেন আর্মি পার্সনদের।'

'বুঝলাম না কথাটা।' বিমূঢ় আলাউদ্দীন বলে। 'ইনু আর তাহের সাহেব, এনারা তো জাসদের সাথে জড়িত, রাইট? আবার তুই বললি আর্মির লোকজনে ক্লাস করে? মানে কী?'

'ঠিক এই কথাটাই তো আমারো মনে হইছিল বন্ধু!' তারেকুল আলম মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে বলে। 'তোর মনে আছে, তুই আর্মির লোকজনরে ক্যান্টনমেন্টের বাইরে বিভিন্ন রকম পলিটিকাল মিটিঙে আসতে দেখতি?

যা শুনলাম, ঐখান থেকেই আর্মির কিছু লোকের সাথে সিরাজুল আলম খান আর কর্নেল তাহেরের যোগাযোগ হইছে। এরা যোগ দিছে জাসদে। যারা যোগ দিছে, তারা ম্যাক্সিমামই নন কমিশনড অফিসার আর নাইলে একদম সাধারণ সোলজার। এদের নাকি ক্ষোভ আছে, যে অফিসার আর তাদের মধ্যে বৈষম্য অনেক বেশি। ম্যালাদিন ধরেই এরা আর্মির ভিতরে আস্তে আস্তে সংগঠিত হইতেছিল বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা নাম নিয়ে। জাসদ নাকি অনেকদিন ধরেই রাজনীতি বিষয়ে এদের ক্লাস নিতেছে।

এখন আর্মির ভেতরে চেইন অব কমান্ড নাই বললেই চলে, কাজেই এই সৈনিকদের নিয়ে জাসদের পলিটিকাল অ্যাকটিভিটি একরকম ওপেন হয়ে গেছে। খন্দকার মোশতাকের এগেইন্সটে ক্যান্টনমেন্টের ভিতরে নাকি লিফলেটও ছড়াইসে এই সোলজাররা।'

'এদের উদ্দেশ্যটা কী?' প্রশ্ন করে চিন্তিত আলাউদ্দীন। 'আর, এরা মোশতাকের বিপক্ষে বলতেছিস, সেই ক্ষেত্রে ক্যান্টনমেন্টের সিনিয়র আর্মি অফিসারদের সাথে এদের কোনো রকম যোগাযোগ আছে কি না জানোস?'

'না মনে হয়, অন্তত বাইরে থেকে সেরকম কোনো কিছু শোনা যাইতেছে না।' তারেক বলে।

'আচ্ছা।' আলাউদ্দীন নীরব থেকে ভাবে কী যেন। খানিক পর আবার বলে, 'আর ক্যান্টনমেন্টের অন্যান্য খবর কী রকম? জিয়াউর রহমান, শাফায়াত জামিল, খালেদ মোশাররফ– এদের অবস্থা কী?'

'জেনারেল জিয়া তো সবসময়ই চুপচাপ!' তারেক বলে। 'শাফায়াত জামিল নাকি ফারুক-রশিদদের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকবার ব্যবস্থা নেয়ার জন্যে জিয়াকে অনুরোধ করেছেন। জিয়ার কথা শুধু একটাই। ওয়েইট অ্যান্ড সি।...

তবে শাফায়াত জামিল ইদানীং খালেদ মোশাররফের সাথে বেশ মেলামেশা করতেছেন। ক্যান্টনমেন্টের লোকের মুখে শোনা যাইতেছে এরা নাকি খুব শিগগিরই কিছু একটা করতে যাচ্ছেন শেখ মুজিবের হত্যাকারীদের বিপক্ষে।

খালেদের সাথে সাথে নাকি রক্ষীবাহিনীর নুরুজ্জামানও আছেন। ক্যান্টনমেন্টে একরকম খোলাখুলিই আলোচনা হইতেছে এইসব।

ফারুক রশিদ বা মোশতাকের কানেও এইসব খবর একটু আধটু তো যাবার কথাই! কিন্তু তারা আদৌ এইসব নিয়া ভাবে কি না, বা ভাবলেও এদিকে কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে বা নিবে কি না, সেইসব কিছুই বোঝা যাইতেছে না কিন্তু!...'

সেনানিবাসের পরিস্থিতি নিয়ে আরো কিছুক্ষণ আলাউদ্দীনের সাথে কথা হয় তারেকের। অচিরেই আবার আসবে, এমন প্রতিশ্রুতি দিয়ে একসময় তারেক বিদায় নেয় ওয়েটিং রুম থেকে। নিয়ে যায় ভুনা মাংসের গন্ধযুক্ত খালি টিফিন ক্যারিয়ার, আর রেখে যায় চিন্তাগ্রস্ত আলাউদ্দীনকে।

আলাউদ্দীনের ভাবনা কেবল জট পাকাতে থাকে বটগাছের ঝুড়ির মতো।

জনমানুষের মনোযোগ অন্যদিকে ঘুরিয়ে রাখতে ঢাকার মাঠে আগা খান গোল্ড কাপ নামের এক ফুটবল টুর্নামেন্ট ছেড়েছেন চতুর খন্দকার মোশতাক। বাহারি রঙের জার্সি গায় চড়িয়ে দেশ বিদেশের নামীদামি ফুটবল টিম যখন মাতিয়ে বেড়াচ্ছে স্টেডিয়ামের ঘাস, বাংলাদেশের রাজনীতির ময়দানেও তখন একটি মাত্র গোলপোস্টকে ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে পৃথক তিনটি দল। সেই গোলপোস্টের নাম ক্ষমতা।

একদিকে রক্তের স্বাদ নেওয়া জুনিয়র কিছু মেজরকে সম্বল করে খন্দকার মোশতাক পায়ে পায়ে দেশকে ফিরিয়ে নিচ্ছেন চাঁদ তারার পাকিস্তানের পথে, অন্যদিকে শাফায়াত জামিল বা খালেদ মোশাররফের মতো কয়েকজন সিনিয়র অফিসার চেষ্টা করছেন চেইন অব কমান্ড প্রতিষ্ঠার জন্যে। আর বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার মাধ্যমে জাসদ নামের বাংলাদেশের রাজনীতির আরো এক গুরুত্বপূর্ণ কুশীলবও প্রস্তুত হচ্ছে নিজেদের মতো করে, তাদের উদ্দেশ্য এখনো অস্পষ্ট।

তিনটি রাশি, তারা প্রত্যেকে চেষ্টা করছে সিংহাসনের সমীকরণে একে অপরকে প্রতিস্থাপন করবার। জন্ম হচ্ছে এক দুর্বোধ্য ত্রৈরাশিকের।

শেষ সূর্যাস্ত

গতকাল রাতে জোহরা তাজউদ্দীন একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছেন।

স্বপ্নে জোহরা দেখলেন, বাঁশের চারটি সাদা তাঁবু পাশাপাশি রাখা। তিনি সেই তাঁবুগুলোর সামনে এসে দাঁড়াতেই কে যেন বলল, 'এই তাঁবুগুলা তাজউদ্দীন, নজরুল ইসলাম, মনসুর আলী আর কামারুজ্জামানের জন্যেই রাখা। ওরা এখন থেকে এখানেই থাকবে।'

অজানা আতঙ্কে ঘুম ভেঙে জোহরা বিছানায় উঠে বসে দেখেন, ঘামে তার সারা গা ভিজে গেছে। গলার ভেতরটা যেন বালুতে ভর্তি। অক্টোবরের শেষ রাত,

শীত বাড়তে শুরু করেছে আজকাল, তারপরেও জোহরা স্বপ্নটা দেখে খাবার ঘরে গিয়ে ঢকঢক করে দুই গ্লাস পানি খেয়ে নিলেন।

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে রিমি-রিপিকে স্বপ্নের কথাটা বলার পরে ওরাও কেমন যেন থম মেরে গেল। অবস্থা দেখে জোহরার পরে মনে হলো, বাচ্চাদের স্বপ্নের কথাটা বলা উচিত হয়নি। এমনিতেই মেয়ে দুটা সারাদিন ভয়ে ভয়ে থাকে, এর মাঝে এই স্বপ্নের কথা বলে বাবাকে নিয়ে ওদের চিন্তা মনে হয় জোহরা আরো বাড়িয়েই দিলেন।

রান্না করতে বসে কিন্তু জোহরার স্বপ্নের কথাটা ভুলেই গেলেন। আজকে বেশ গুরুত্বপূর্ণ একটা দিন। তাজউদ্দীনের সাথে আজ দেখা করতে যাবেন তিনি, সাথে কয়েকজন আইনজীবীও থাকবে। পাঁচ তারিখে হাইকোর্টে রিট উঠবে মানুষটার, এর আগেই বেশ কিছু কাগজপত্রের কাজ সারতে হবে।

সেই দুপুরে কয়েকজন আইনজীবী সাথে নিয়ে কেন্দ্রীয় কারাগারের ওয়েটিংরুমে তাই অপেক্ষা করতে দেখা যায় জোহরাকে। জোহরার হাতে টিফিন ক্যারিয়ার, তার ভেতরে খিচুড়ি আর বেগুনভাজা। তাজউদ্দীন চলে আসেন মিনিট পনেরো পর। তার মাথায় টুপি, হাতে কুরআন শরিফ। সকলের চোখে প্রশ্ন দেখেই যেন তাজউদ্দীন লজ্জিত হাসি হেসে বলেন, 'কুরআন পড়তেছিলাম। আজকাল দুপুরের রোদটা খুব সুন্দর, বাইরে বসে কুরআন পড়লে খুব শান্তি শান্তি লাগে।'

তাজউদ্দীন আগত আইনজীবীদের সাথে কথাবার্তায় ব্যস্ত হয়ে পড়লে জোহরা অপলকে মানুষটাকে দেখতে থাকেন। অসম্ভব শান্ত হয়ে থাকা তাজউদ্দীনকে দেখে কেন জানি জোহরার বুকের অশান্তির কয়েকটা ঈগল চক্কর কাটে দ্রুত গতিতে। ঠিক এই সময়েই গতরাতের স্বপ্নের কথা আবারো মনে পড়ে জোহরার। আচ্ছা, মানুষটাকে কি স্বপ্নের কথাটা বলা উচিত হবে? মেয়েদের প্রতিক্রিয়া স্মরণ করে জোহরা স্থির করেন, না, বলাটা ঠিক হবে না।

কাগজের কাজ শেষ হলে একলা হয়ে যান তারা দুজন। বড় মগ্ন দেখায় তাজউদ্দীনকে আজ, স্বাভাবিকের চাইতে কিছুটা বেশিই যেন।

'লিলি, তোমাদের বলছিলাম না, ডায়েরিতে আমি মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস লিখে রাখতেছি?' উদাসী স্বরে বলেন তাজউদ্দীন। 'আমার কাজ প্রায় শেষ হয়ে আসছে, বুঝছো। আজকে রাতে, না হইলে কালকে সকালে আমার ডায়েরি লেখা শেষ হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ। যুদ্ধের ইতিহাসের শেষ পাতা লিখে ফেলবো।'

'ভালো তো!' জোহরা উৎসাহ দিতে চান স্বামীকে। 'শেষ করে ফেলো তাড়াতাড়ি। শিগগিরই তুমি বের হয়ে যাবা, দেইখো! তারপর তোমার ঐ লেখা দিয়ে মানুষকে ইতিহাস জানাইতে পারবা।'

‘মানুষকে জানানো?’ জোহরার কথায় কেমন যেন আরো বিষণ্ন হয়ে পড়েন মানুষটি। বলেন, ‘কী জানি! কেন যেন মনে হচ্ছে আর বেশি দিন বাঁচবো না, বুঝলা। মনে হচ্ছে, এই ইতিহাস লিখেই আমার কাজ শেষ। আমার আর কোনো প্রয়োজন নাই। সেদিন স্বপ্নে মুজিব ভাইরেও দেখলাম...’

‘ধ্যাৎ, কী বলো এইসব!’ জোহরার বুকের ভেতর আবারো গতি পায় ঈগলেরা, মুখের কথায় সেটা চাপা দেয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করেন তিনি। বলেন, ‘আজেবাজে চিন্তা কইরো না তো। রেস্ট নাও। এই তো কয়েকদিন পরেই কোর্টে মামলা উঠবে...’

হাত দিয়ে একবার আলতো করে জোহরাকে স্পর্শ করেন তাজউদ্দীন। আশপাশে বসে থাকা ইন্টিলেজেন্সের লোকেদের দিকে একবার ইঙ্গিত করে গলার স্বর নামিয়ে তিনি বলেন, ‘অনেক খবর পাই। আর্মির লোকেরা নাকি রাতে প্রায়ই জেলের আশপাশে ঘোরাফেরা করে। মনে হয় আমাদের নিয়ে কোনো প্ল্যান আছে আর্মিদের। জেলখানাটা রেডক্রসের আন্ডারে নিতে পারলে ভালো হইতো...’

এইসব টুকরো কথায় জোহরাকে উদ্‌ভ্রান্ত করে তোলেন তাজউদ্দীন। অন্যদিনের চেয়ে আজ যেন একটু কমই সময় পান জোহরা, মিনিট বিশেক কথা বলার পরেই বিদায় নিতে হয় তাজউদ্দীনকে। যতক্ষণ তার অপস্রিয়মান অবয়বটি দৃশ্যমান হয়, জোহরা চেয়ে থাকেন নির্নিমেষে। জেল থেকে বেরিয়েও মন কিছুতেই শান্ত হয় না জোহরার। ভেতরে একদল অশান্ত ঈগল বয়ে নিয়ে উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে ঢাকা-টঙ্গী রোডে বহুক্ষণ ঘোরাফেরা করেন তিনি। সন্ধ্যা ঘনালে একসময় ফিরে যান বাসায়।

কেউ জানে না, এর মাঝেই স্বপ্ন নিয়ে অদ্ভুত এক লুকোচুরি হয়ে গেছে তাজউদ্দীন আর জোহরার মাঝে। আজকের কথোপকথনে তাজউদ্দীনও নিজের দেখা একটি স্বপ্ন গোপন করে গেছেন স্ত্রীর থেকে।

বাংলাদেশের যত জঞ্জাল দূর করা হয়ে ওঠেনি তার, কিন্তু এই সীমিত কারাগারের এক প্রান্তে জমে থাকা নর্দমা ভরাট করে বাগান বানিয়েছেন তাজউদ্দীন। আজ বিকেলে হাঁটতে হাঁটতে তাজউদ্দীন সেই পরিচ্ছন্ন বাগিচাপ্রান্তটি এসে দাঁড়ান, এই জায়গাটা তার বড় প্রিয়। একটি ডালিয়া গাছের চারায় তিনি হাত বোলান বারবার। জেলখানার সুবেদার আবদুল ওয়াহেদ মৃধাকে অনুরোধ করে বেশ কিছু ফুল গাছের চারা এনেছেন তিনি, সেগুলোই গত কদিনে লাগিয়েছেন এদিকে।

কিন্তু ফুলের গাছের পরিচর্যায়ও মনের বিক্ষিপ্ততা কাটে না তাজউদ্দীনের। স্বপ্নের কথাটা কাউকে না বলে শান্তি পাচ্ছেন না তিনি। তাজউদ্দীন ইতস্তত হাঁটেন এদিক ওদিক। শ্রমিক লীগের সহ-সভাপতি সাইদুর রহমান প্যাটেলের সাথে সাথে

হাসিমুদ্দিন পাহাড়িকেও আসতে দেখা যায় এদিক। তাজউদ্দীনকে দেখে তারা দুজনেই দাঁড়িয়ে পড়েন সালাম দিয়ে।

'একটা অদ্ভুত ব্যপার ঘটছে বুঝলেন।' সালামের জবাব দিয়ে তাজউদ্দীন যেন আনমনেই কথা বলতে থাকেন দুজনের সামনে। 'পরপর দুইদিন স্বপ্নে মুজিব ভাইরে দেখলাম!...

প্রথমদিন স্বপ্নে দেখি মুজিব ভাই ডাকতেছেন আমাকে। আর গত রাতে দেখলাম, আমি ৩২ নম্বরে গেছি, মুজিব ভাই তার গাড়িতে আমাকে ডেকে বলতেছেন, তাজউদ্দীন, চলো টুঙ্গিপাড়ায় যাই।'

স্বল্পভাষী তাজউদ্দীনের মুখে হঠাৎ এতো কথা শুনে শ্রোতা দুজন কিছুটা অবাক হয়েই একে অপরের দিকে দেখেন। তাজউদ্দীন সেটা লক্ষ করে বলেন, 'স্বপ্নটপ্ন নিয়া আমি খুব বেশি ভাবি না বুঝলেন। কিন্তু পরপর দুইদিন এরকম একই জিনিস দেখলাম, কেমন যেন লাগতেছে আসলে। এইসব স্বপ্ন খুব ভালো ইঙ্গিত দেয় না বলে শুনছি...'

বিকাল ফুরিয়ে আসে একসময়, মাগরিবের নামাজ পড়ে তাজউদ্দীন ফিরতে থাকেন তার এক নম্বর কামরার দিকে। আসবার পথে তার সাথে দেখা হয় আব্দুস সামাদ আজাদের। তাজউদ্দীন দ্রুত তার পাশে গিয়ে বলেন, 'সামাদ সাহেব, আপনি কোনোভাবে পারলে বাইরে খবর পাঠান। এই জেলটাকে রেডক্রসের আন্ডারে নিতে হবে। না হলে কিন্তু আমরা কেউই সেইফ না। প্রায়ই রাতে আর্মির লোকজন নিউ জেলে আসে বলে শুনতে পাই।'

কথাগুলো বলেই সরে যান তাজউদ্দীন। আব্দুস সামাদ আজাদ একই অনুরোধ আজ মনসুর আলীর কাছ থেকেও শুনেছেন। তিনি ভাবতে থাকেন কী করে বাইরে খবর পাঠানো যায়। রেডক্রসের ভাইস চেয়ারম্যান ময়েজউদ্দিনের সাথে বেশ ঘনিষ্ঠতা তার, কিন্তু এই পরিস্থিতিতে খবর পাঠানোটাই তো বিশাল ঝামেলার ব্যাপার।...

তাজউদ্দীন ওদিকে ফিরে যান নিজের চৌকিতে। খানিক চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকেন তিনি। তারপর মন শক্ত করে উঠে বসেন আবার। নাহ, অলস সময় কাটালে এসব চিন্তা আরো দুর্বল করে দিতে পারে। এর চেয়ে বরং ডায়েরি লেখাটাই শেষ করে ফেলা যাক।

কালো বর্ডার দেয়া লাল মলাটের ডায়েরিটা নিয়ে বসেন এরপর তাজউদ্দীন। এই ডায়েরি লেখায় একবার মন ডুবিয়ে দিলেই তাজউদ্দীন ভুলে যান বাকি সব। লেখা যতই এগিয়েছে, তাজউদ্দীনের উৎসাহও ততই বেড়েছে এই দিনলিপি নিয়ে। আজ এ কাজটা শেষ করে ফেলবেন মনস্থির করেছেন তিনি।

একমনে ডায়েরি লিখতে থাকেন তাজউদ্দীন।

তাজউদ্দীনের ডায়েরি লেখা যখন শেষ হলো, তখন এশার আজান দিচ্ছে পাশের উর্দু রোডের মসজিদে। মনে পরিতৃপ্তি নিয়ে তাজউদ্দীন এশার নামাজ পড়তে যান। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস লেখা শেষ হয়েছে, এজন্যে মোনাজাতে বসে সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ দেন মানুষটি। রাতের বেলা বাসা থেকে আনা খিচুড়ি ভাগাভাগি করে খান সবার সাথে। হালকা হাসি ঠাট্টাও করেন।

নির্বিঘ্ন একটা ঘুমের পর ভোরের বেলা তাজউদ্দীনের নিজেকে খুব সতেজ মনে হয়।

সকালে নাস্তার পরেই তাজউদ্দীন নেমে পড়েন তার বাগানের পরিচর্যায়। ছোট ছোট চারাগাছে নিড়ানি দিতে থাকেন তিনি। মুন্সিগঞ্জের মহিউদ্দিন আশপাশেই ঘোরাফেরা করছিল, তার মুখ বড় হতাশ দেখায়। তাজউদ্দীনের সাথে চোখে চোখ পড়তেই মহিউদ্দিন বলেন, 'স্যার, আমাদের কী হবে বলেন তো! নানা জায়গায় শুনতেছি সামনে কিছু একটা হবে। আমার তো স্যার আর মাথা কাজ করে না...'

গত বিকেলের দুর্বলতার ছিটেফোঁটাও দেখা যায় না তাজউদ্দীনের মাঝে। বলেন, 'না, ভেঙে পড়লে তো হবে না! মনের বলই সবচেয়ে বড় শক্তি এই সময়। মানসিকভাবে ঠিক না থাকলে ক্যামনে চলবেন! সাহস রাখেন। দেশকে ঠিক করতে হইলে সামনে আপনাদের অনেক পরিশ্রম করতে হবে।'

সেদিন শেষ দুপুরেই তাজউদ্দীন রুম থেকে বেরিয়ে যান। পাঁচিলের আগে শেষ যে বড় গাছটা আছে জেল চত্বরে, সেটায় হেলান দিয়েই আনমনে বসে বসে কী যেন ভাবেন মানুষটি। বিকেল নামে খানিক পরে। সেলগুলোর চারপাশে বিছানো পাকা রাস্তায় তখন হাঁটতে বেরোন অনেক রাজবন্দিই। কেউ কেউ সামনে ব্যাডমিন্টনও খেলেন।

তাজউদ্দীন নিশ্চুপ বসে থাকেন গাছতলায়। তাঁর মনে পড়ে একটি সীমান্ত সন্ধ্যার কথা। আমীর-উল ইসলামকে নিয়ে সেই সন্ধ্যায় তিনি পা বাড়িয়েছিলেন একটি অস্পষ্ট পথে। কিন্তু সেই গ্রীষ্মকালের সন্ধ্যা আর আজকের শীতগোধূলির মাঝের তফাৎটা যেন কয়েকটা ঋতুর চাইতে অনেক অনেক বেশি।

এখনো সামনে একটি অস্পষ্ট সময় তাদের, কিন্তু তাজউদ্দীন এবার আর নির্দিষ্ট কোনো বোধে তাড়িত হতে পারেন না। মুজিব ভাই নেই, ঝড়ের সাগরে তাই সামনে কোনো বাতিঘর দেখছেন না তাজউদ্দীনের মতো অভিজ্ঞ নাবিকও।

নভেম্বরের দ্বিতীয় সন্ধ্যার ডুবু ডুবু সূর্যটির দিকে তাকিয়ে তাজউদ্দীন ভেসে যান যত বাস্তব আর অবাস্তব প্রশ্নের স্রোতে। ভাবেন, আচ্ছা, যদি মানুষ কখনো সূর্য না দেখে, তবে তার দিনযাপন কী রকম হবে? একজন অন্ধ মানুষের জীবনে সূর্য কী প্রভাব ফেলে?

হঠাৎ তাজউদ্দীনের মনে হয়, যদি তিনি নিজেই আজকের পরে কখনো সূর্য না দেখেন, তবে কি তার বেঁচে থাকার আদৌ কোনো অর্থ থাকবে? অন্ধ তাজউদ্দীন কি বাংলাদেশের কোনো উপকারে আসবেন কোনোভাবে?

অস্তায়মান সূর্য আর অস্তায়মান দেশ, উদ্ভট সব ভাবনায় নিমগ্ন রাখে একজন চিন্তাশীল মানুষকে।

প্রতি-অভ্যুত্থান

জোহরা তাজউদ্দীন যখন পহেলা নভেম্বরের সন্ধ্যায় অশুভ কোনো ইঙ্গিত তাড়িত হয়ে ছুটে বেড়িয়েছেন এদিক ওদিক, সেই একই দিনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কজন সিনিয়র আর্মি অফিসার স্থির করেছেন উল্টোরথে চেপে বসা দেশ আর সেই রথরূপী বিশৃঙ্খল সেনাবাহিনীকে আবারো নিয়মতান্ত্রিক করে তোলার জন্যে একটি প্রতি-অভ্যুত্থান করতে হবে তাদের। চিফ অব জেনারেল স্টাফ খালেদ মোশাররফ, ৪৬ ব্রিগেডের কমান্ডার শাফায়াত জামিলেরা একমত হয়েছেন, দোসরা নভেম্বরের মধ্যরাত পেরিয়ে গেলেই তারা শুরু করবেন একটি নীরব অভ্যুত্থান। যার মূল লক্ষ্য, সেনাবাহিনীর চেইন অব কমান্ড পুনঃপ্রতিষ্ঠা।

সেই দোসরা নভেম্বরে, শীতার্ত এক রাত নেমেছে ঢাকার বুকে। বঙ্গভবন থেকে খানিক আগে বিদায় নিয়েছেন জেনারেল ওসমানী। খন্দকার মোশতাক আর সদ্য পদোন্নতি প্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট কর্নেল রশিদের সাথে এতক্ষণ নানা বিষয়ে আলোচনা করছিলেন ওসমানী, জেনারেল খলিলও উপস্থিত ছিলেন সেখানে। আশপাশেই কোথাও ঘুমিয়ে আছে ফারুক।

জেনারেল ওসমানী আলোচনায় প্রস্তাব রেখে গেছেন, জেনারেল জিয়াকে অবসরে পাঠানো হোক। জিয়া আর ওসমানীর পারস্পরিক অপ্রসন্নতা সম্পর্কে সকলেই কমবেশি জানেন, আর খন্দকার মোশতাক নিজেও ঠিক আস্থা রাখতে পারছেন না জিয়ার প্রতি। কিন্তু রশিদের ধারণা, জিয়ার চাইতেও বড় হুমকি খালেদ মোশাররফ। ওসমানী চলে যাবার পরেও রশিদ আর মোশতাক আলোচনা করছিল এসব নিয়েই। কাকে চিফ অব স্টাফ করা যায়, কাকে কোথায় বদলি করা গেলে পরিস্থিতি আরেকটু বেশি নিয়ন্ত্রণে আসে– দুজনের এমন সব কথাবার্তার ফাঁকতালেই মধ্যরাত পেরিয়ে যায় সময়ের কাঁটা।

রশিদ যখন আলোচনা শেষ করে প্রস্তুতি নিচ্ছিলো নিচতলায় শুতে যাবার, পাহারায় থাকা এক ত্রস্তব্যস্ত পুলিশ অফিসার ছুটে আসে তখন তার কাছে। হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, 'স্যার, আর্মির যত লোক বঙ্গভবন পাহারায় ছিল, সবটি সইরা গেছে! বইলে গেছে, আমাদেরও সইরা যাওয়া উচিত।'

অপ্রস্তুত রশিদ বাইরে ছুটে এসে দেখে, সত্যিই তাই। মেজর ইকবালের অধীন যে সেনাদলটি পাহারায় ছিল, পূর্ব পরিকল্পনা মোতাবেক মধ্যরাতের খানিক পরেই তারা বঙ্গভবন অরক্ষিত রেখে চলে গেছে ক্যান্টনমেন্টে।

শুরু হয়ে গেছে পালটা অভ্যুত্থান।

কারা শুরু করেছে এই প্রতিবিপ্লব, রশিদ এখনো তা জানে না। তবে সে অনুধাবন করে, ক্ষমতার দাঁড়িপাল্লার হেলান বঙ্গভবন থেকে হয়তো সরে যাচ্ছে সেনানিবাসের দিকে। ঘুমন্ত ফারুককে ডেকে তোলে রশিদ। শেখ মুজিব হত্যার পুরস্কার হিসেবে পদোন্নতি পাওয়া দুই লেফটেন্যান্ট কর্নেল চটজলদি আলোচনায় বসে যায় খন্দকার মোশতাককে নিয়ে। কী করণীয় তাদের, ঠিক করার চেষ্টা করে তারা।

ফারুকের অধীনস্ত ট্যাঙ্কগুলো তখন ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বঙ্গভবন, ক্যান্টনমেন্ট আর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে। সেগুলোকে প্রস্তুত করে ফেলে ফারুক। রশিদও নিজের অধীন কামানগুলোকে আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে প্রস্তুত করে রাখে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান আর ক্যান্টনমেন্টে। একই সাথে, মোশতাক আর রশিদ ফোন ঘোরাতে থাকে বিভিন্ন জায়গায়। তারা হদিস পেতে চায় বিপরীত অভ্যুত্থানটির ব্যাপ্তি আর উদ্দেশ্য সম্পর্কে, প্রস্তুত করতে চায় হাতের সকল তাসকে, পেতে চায় সাহায্য।

তাদের মনে ভাবনা আসে, এ অভ্যুত্থান কি আওয়ামী লীগের স্বপক্ষের কারো? সেনাবাহিনীর কারো সাথে আঁতাত করে কি পুনরায় ক্ষমতায় চলে আসতে চাইছে শেখ মুজিবের কোনো অনুসারী? মুজিবের মৃত্যুর পর কাদের সিদ্দিকী চেয়েছিলেন হত্যাকারীদের বিপক্ষে সশস্ত্র বিদ্রোহ করতে, কিন্তু সেনাবাহিনী দিয়ে বল প্রয়োগ করে তাকে তো ইতোমধ্যেই দমন করা হয়েছে!

... ভাবতে থাকেন মোশতাক, ভাবতে থাকে রশিদ এবং তারা অনুধাবন করে, শেখ মুজিবের অনুসারী কেউ ক্ষমতায় পুনরায় আসীন হতে চাইলে প্রথমেই চাইবে জাতীয় চার নেতাকে জেল থেকে মুক্ত করতে। অতএব কারাগারের সেই চার রাজবন্দি অতীব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেন সে মুহূর্তে। রশিদ ফোন করে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলের আইজি নুরুজ্জামানকে।

আইজি প্রিজন গভীর রাতে ফোন পেয়ে রশিদের কণ্ঠে শোনেন, 'এই মুহূর্তে আপনার জেলে কোনো সমস্যা আছে নাকি?'

'না, স্যার!... মানে এই মুহূর্তের কোনো খবর স্যার আমার জানা নাই।' হতচকিত নুরুজ্জামান বলেন।

'আপনি এখুনি জেল গেটের গার্ডদের অ্যালার্ট করে দেন।' আদেশ দেয় রশিদ। 'আর্মির কিছু লোক জেল গেটে যাইতে পারে। আপনারা সতর্ক থাকেন।'

ওদিকে খন্দকার মোশতাক ততক্ষণে ঘেমে নেয়ে গেছেন। তিনি ফোন করে বসেন ওসমানীকে, তাকে অনুরোধ করেন দ্রুত বঙ্গভবনে চলে আসতে। মোশতাকের ফোন পাবার পরে সচল হয়ে ওঠে জেনারেল ওসমানীর টেলিফোনের ডায়ালিং ডিস্কটিও। ওসমানী নিজেও নানা জায়গায় ফোন ঘোরান। জানতে পারেন, চিফ অব জেনারেল স্টাফ খালেদ মোশাররফের হাতেই রয়েছে চলমান ঘটনাবলির নাটাই।

চতুর্থ বেঙ্গলের কমান্ডিং অফিসারের দপ্তর ততক্ষণে পরিণত হয়েছে খালেদ মোশাররফের প্রতি-বিপ্লবের হেডকোয়ার্টারে। শাফায়াত জামিল, নুরুজ্জামানসহ আরো কিছু অফিসার সাথে আছেন তার।

অভ্যুত্থানের অংশ হিসেবে ঘণ্টা দুয়েক আগেই তরুণ ক্যাপ্টেন হাফিজউল্লাহ একদল সৈন্যকে সাথে করে চলে গেছেন সেনাপ্রধান জিয়াউর রহমানের বাড়ি। রাতের পোশাকে জিয়াকে দেখা যায় অপ্রস্তুত অবস্থায়, হাফিজউল্লাহ তাকে বলে, 'স্যার, আপনি এখন গৃহবন্দি।'

কোনো আপত্তি না করে চুপচাপ এই আদেশ মেনে নেন জিয়াউর রহমান। ফারুক-রশিদ আর মোশতাকের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করার জন্যে কেটে দেয়া হয় জিয়ার ফোনের লাইন। তবে, অক্ষত থেকে যায় জিয়ার বেডরুমের এক্সটেনশন লাইনটি। ভবিষ্যতের বহু নাটকের জন্ম হবে সেই এক্সটেনশন লাইন দিয়েই।

আপাতত সেনাপ্রধানকে অচল করে দেয়া হয়েছে নির্বিঘ্নে, খালেদ এবার প্রস্তুত হন বঙ্গভবনের বিদ্রোহীদের সম্ভাব্য আক্রমণ প্রতিহত করার কাজে। কারওয়ান বাজারের ক্রসিং, সায়েন্স ল্যাবরেটরির মোড়ে পাঠানো হয় দুই কোম্পানি সেনা। বিমানবন্দরের রানওয়ে, টিভি আর রেডিও স্টেশনেও সেনা পাঠানো হয়।

বঙ্গভবনে অবস্থান করা খন্দকার মোশতাক আর রশিদেরা ততক্ষণে জেনে গেছেন রাতের এই অভ্যুত্থানের পেছনে কারা আছেন। খালেদ মোশাররফ আপাতত মঞ্চের প্রধান নট, এটা জেনে স্বস্তিতে থাকতে পারেন না মোশতাক। আর যাই হোক, আওয়ামী লীগের পুনরুত্থান ঘটতে দেয়া যাবে না। বাংলাদেশকে পাকিস্তানিকরণের পথে হাঁটতে থাকা মোশতাক হিসেব কষে দেখেন, শেখ মুজিবের অনুসারী চার নেতাকে সরিয়ে দিলেই আওয়ামী লীগের মূল উৎপাটন হয়ে যায় অনেকটা।

চার নেতা যখন একটি নড়বড়ে মঞ্চের ওপরে দাঁড়িয়ে ভিত গেড়েছিলেন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের, সেই মুহূর্তে তাদের সঙ্গী ছিলেন মোশতাক। শেখ মুজিবের প্রত্যাবর্তনে ঐ চারজন আলোকিত মানুষ যখন আবেগমথিত হয়ে কাঁদছিলেন অঝোরে, সেখানেও তাদের সঙ্গী ছিলেন ঐ মোশতাক। সেই মোশতাক এই

মুহূর্তে রশিদকে সাথে করে পুরনো সাথিদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেন আরো একটি বার এবং এইবার কোনো ক্ষমতাপ্রাপ্তি বা কোনো অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করা নয়, পলিটিশিয়ান মোশতাকের লক্ষ্য থাকে ঐ চার নেতার প্রাণ।

নির্দেশ পেয়ে কেন্দ্রীয় কারাগারের দিকে রওয়ানা হয়ে যায় ক্যাপ্টেন রিসালদার মোসলেমউদ্দীন, তার সাথে থাকে সশস্ত্র একদল সৈন্য।

শীতের মধ্যরাতের ঢাকা প্রত্যক্ষ করতে থাকে আরো একটি নাটক। রক্তপাতহীন এক প্রতি-অভ্যুত্থান করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ খালেদ মোশাররফ যে আখ্যান শুরু করেছেন, নিচতম কূটবুদ্ধিতে সেটির পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠায় রক্তের দাগের আয়োজন করেন মোশতাক। বাংলাদেশ প্রস্তুত হতে থাকে কালো আচকানের একটি মানুষের ঢেলে দেয়া লাল কালির স্রোতে চারটি শুদ্ধতম নাম মুছে দেবার জন্যে।

পাগলা ঘণ্টি

ঢাকা সেন্ট্রাল জেলের ইট-কাঠ-পাথর আর গরাদের আড়ালে আড়ালে তখন উড়ে বেড়াচ্ছে প্রশ্নবোধক চিহ্নের দল। অনেকটা সংশয়ের সাথে অনেকটা শঙ্কার মিশ্রণ ঘুরে বেড়াচ্ছে বাতাসে।

রশিদের কাছ থেকে ফোন পেয়েই যথাসম্ভব দ্রুত প্রস্তুত হয়েছেন আইজি প্রিজনস নুরুজ্জামান। প্রথমেই জেলার আমিনুর রহমানকে ফোন করেছেন তিনি, এরপর নিজে চলে এসেছেন জেল গেটে। ফোন করে ডিআইজি প্রিজন আবদুল আউয়ালকেও হাজির হবার নির্দেশ দিয়েছেন নুরুজ্জামান। বঙ্গভবন থেকে পাওয়া ফোনবার্তাকে গুরুত্ব দিতেই হয়। জেল গার্ডদের সতর্ক করবার সাথে সাথে তাই বেজে উঠে পাগলা ঘণ্টি।

আবদুস সামাদ আজাদের মতো গভীর রাতে তাহাজ্জতের নামাজ পড়তে প্রস্তুত হতে থাকা বন্দীরা, কিংবা আলাউদ্দীনের মতো ঘুমিয়ে পড়া কয়েদিরা– সকলেই হয়ে পড়ে অতন্দ্র। আতঙ্কিত হয়ে কয়েদিরা লক্ষ করে জেলের ভেতরে শুরু হয়েছে কেমন অনিশ্চিত ছোটাছুটি, কর্মকর্তা আর সিপাইরা কেমন যেন তটস্থ।

জেলখানার রেওয়াজ– কোনো কয়েদি পালিয়ে গেলে কিংবা কারাগারের অভ্যন্তরে গুরুতর কোনো কিছু ঘটলেই কেবল বেজে উঠবে পাগলা ঘণ্টি। ঘণ্টাধ্বনি শুনেই বিডিআর বা পুলিশ সাহায্য নিয়ে পৌঁছে যাবে কারাগারে, নিয়ম এমনটাই। কিন্তু শীতের রাতের আঁধারে জট পাকিয়ে যাওয়া সব ঘটনার তোড়ে এই পাগলা ঘণ্টিও কোনো সাহায্য নিয়ে আসে না আজ রাতে। এই রাত দুর্যোগের রাত।

এর মাঝেই আবারো বঙ্গভবন থেকে ফোন করে রশিদ। রুঢ় কণ্ঠে আইজি নুরুজ্জামানকে সে জানায়, অচিরেই ক্যাপ্টেন মোসলেম নামের একজন পৌঁছে যাবে জেলগেটে। আদেশ করে, মোসলেমকে জেল অফিসে নিতে হবে আর চিনিয়ে দিতে হবে চারজন বন্দীকে। এই চারজন আর কেউ নন। সৈয়দ নজরুল ইসলাম, মনসুর আলী, কামারুজ্জামান আর তাজউদ্দীন।

আইজি প্রিজন এই অদ্ভুত আদেশ সম্পর্কে নিশ্চিত হবার জন্যে প্রেসিডেন্টের সাথে কথা বলতে চাইলে ফোনের অপর প্রান্তে শোনা যায় খন্দকার মোশতাকের গলা। মোশতাক বলেন, 'আইজি সাহেব, আপনি কি রশিদের ইনস্ট্রাকশন বুঝতে পারছেন?'

হতচকিত আইজি প্রিজনস ইতিবাচক জবাব দিলে মোশতাক বলেন, 'গুড। তাহলে সেই মোতাবেক কাজ করেন।'

ডিআইজি প্রিজনের অফিসে বসা এই কর্মকর্তারা তখনো অবহিত নন যে ক্ষমতার পালা বদলের নাটকের এক মধ্যবর্তী পর্যায় চলছে ইতিহাসের বুকে। তারা অনুমান করেন যে হয়তো কোনো রাজনৈতিক পট পরিবর্তন চলছে, সে কারণেই মাঝরাতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে এই রাজবন্দীরা। হয়তো তাদের সাথে জরুরি কোনো আলোচনায় বসবেন আগত সেনা সদস্যেরা। এমন ঘটনা অস্বাভাবিক হলেও একেবারে বিরল নয়, মশিউর রহমান যাদু মিয়ার সাথে জুলফি ভুট্টো একবার এমনভাবেই শেষরাতে দেখা করেছিল জেলের মাঝে।

এমন সব অনুমানের মাঝেই খবর আসে, জলপাইরঙা সামরিক জিপে করে জেলগেটে উপস্থিত হয়েছে সশস্ত্র চারজন কালো পোশাকধারী। এই চারজনের নেতৃত্বে আছে রিসালদার মোসলেমউদ্দীন, আগস্টের রক্তাক্ত সেই রাতে শেখ মনিকে হত্যা করেছিল ফারুকের অতি বিশ্বস্ত এই ক্যাপ্টেনই।

এ যেন অদ্ভুত প্রহসন ইতিহাসের! জীবদ্দশায় শেখ মনি আর তাজউদ্দীনকে ঐক্যমতের সুতোয় প্রায় সময়েই গাঁথা হয়নি তার, অথচ জীবন সায়াহ্নে ভিন্ন মেরুর এ দুই মানুষকে সে ঠেলে দিয়েছে একই ঘাতকের সম্মুখে।

কালো পোশাকধারীরা প্রথমে অস্বীকৃতি জানায় খাতায় নাম স্বাক্ষর করে জেলে ঢুকতে। জেলে প্রবেশ করতে হলে খাতায় নাম স্বাক্ষর করতেই হবে, এই কথা তখন তাদের বারংবার বুঝিয়ে বলতে হয় ডিআইজি প্রিজনকে। অগত্য খাতায় নাম স্বাক্ষর করে অভ্যাগতরা। তাদের রক্তাক্ত চোখ আর হাতের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রগুলো ইতোমধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে জেল কর্মকর্তাদের মাঝে। চার নেতার নাম উল্লেখ করে উদ্ধত স্বরে মোসলেমউদ্দীন বলে, 'এদের সবাইরে এক ঘরে আনেন। আমাদের কিছু কাজ আছে।'

আইজি নুরুজ্জামান বলেন, 'বঙ্গভবন থেকে ফোনে আমরা চারজনের নাম পাইছি, কিন্তু আপনারা কী করবেন সেই সম্পর্কে আমাদের কোনো নির্দেশ দেয়া হয় নাই। বলছে, কী করবেন আপনাদের কাছ থেকেই শুনতে।'

রিসালদার মোসলেমউদ্দীন মুখে একটা অদ্ভুত ভঙ্গি করে। বলে, 'কী করবো বোঝেন না? গুলি করবো, গুলি! ...আমরা আসছি এদের শেষ কইরা ফেলতে।'

বিস্ময় আর আতঙ্কের যৌথ আক্রমণে কিছুক্ষণের জন্যে পাথর বনে যান নুরুজ্জামান আর আবদুল আউয়াল। সেই ঘোর কাটিয়ে উঠে তারা প্রতিবাদ করে বলেন, 'সেইটা কী করে হয়! এরকম কোনো কিছুর কথা তো আমাদের বলা হয় নাই!... আর জেলের ভেতরে এইভাবে আপনারা অস্ত্র নিয়ে আইসে বন্দীদের খুন করে চলে যাবেন, সেইটা ক্যামনে সম্ভব!'

খানিকক্ষণ তর্ক চলে এরপর। ডিআইজি প্রিজনের অফিস থেকে বারবার চেষ্টা করা হয় রাষ্ট্রপতির সাথে ফোন যোগাযোগের, কিন্তু সফল হন না তারা। তবে সংযোগ স্থাপিত হয় অপর দিক থেকেই। জেলারের অফিসের ফোনে যোগাযোগ করে স্বয়ং রশিদ। আইজি ফোন ধরতেই রশিদ বলে, 'কী, মোসলেম এখনো পৌঁছায় নাই?'

নুরুজ্জামান বলেন, 'জি পৌঁছাইছে। কিন্তু এরা কী বলতেছেন আমি তো কিছুই বুঝতেছি না।'

'এত বুঝার দরকার নাই। আপনি প্রেসিডেন্টের সাথে কথা বলেন।' রশিদ অপর প্রান্ত থেকে বলে।

খানিক পরে ওপাশে রাষ্ট্রপতি খন্দকার মোশতাকের গলা শুনে আইজি প্রিজনস বলেন, 'স্যার, উনারা তো বন্দীদের গুলি করতে চাচ্ছেন!'

মোশতাক জবাব দেন শান্ত স্বরে, 'সে যা বলতেছে তাই হবে। ওদের কাজ ওদেরকেই করতে দেন।'

বিমূঢ় নুরুজ্জামান ফোন নামিয়ে রাখতেই তার বিবর্ণ মুখ দেখে সবটুকুই যেন বুঝে নেয় আগত সৈনিকেরা। ক্যাপ্টেন মোসলেম শুরু করে উন্মাদের মতো আচরণ। বন্দুকের নল বের করে সে শাসায় জেল কর্তাদের। আদেশ দেয়, বন্দীরা যেখানে আছে সেখানে তাকে নিয়ে যেতে।

সব প্রত্যক্ষ করে ততক্ষণে নিজস্ব ইচ্ছাশক্তি হারিয়ে ফেলেছেন নুরুজ্জামান। তিনি নীরবে ডিআইজি, জেলার আর অন্যদের সাথে করে এগিয়ে যেতে থাকেন জেলের ভেতরের দিকে। তাদের অনুসরণ করে এগোতে থাকে মোসলেমউদ্দীন ও তার দল। জেলের ভেতরের গেটে পৌঁছে ডিআইজি আবদুল আউয়াল আবারো বলেন, 'আপনারা জেলের ভেতরে অস্ত্র নিয়ে যাইতেছেন– এইটা ঠিক হইতেছে না।'

মোসলেমউদ্দীন যেন সে মুহূর্তে মাতাল রক্তের নেশায়। সে রক্তলাল চোখে বলে, 'ভয় পাইছেন, না? ভয় পাইছেন? ... আপনি চইলে যান। আপনার আসার দরকার নাই।'

বর্ষীয়ান আবদুল আউয়াল বলেন, 'ভয়ের প্রশ্ন না! আমি বত্রিশ বছরের চাকরি জীবনে এইরকম কিছু দেখি নাই। এইটা জেলখানা, এইখানে মানুষ আইনের আশ্রয়ে থাকে। আপনারা এইখানে এইসব কী করতেছেন...'

রিসালদার মোসলেমউদ্দীন হাতের ধাক্কায় তখন মাটিতে ফেলে দেয় ডিআইজি আবদুল আউয়ালকে। বিড় বিড় করে বলে, 'ব্লাডি বাগার!'

নিউ জেল ভবনের সামনের এক জায়গায় এসে দাঁড়ায় সকলে। সামনের একটি বৃহদাকার গাছের ছায়া এখানে বাধা দিয়ে যাচ্ছে বিজলি বাতিকে, দুর্যোগের রাতের সাথে মানিয়েই যেন এই আলোছায়া সৃষ্টি করছে অদ্ভুত এক প্রহেলিকা। এই কুহক পরিবেশেই সবাইকে নিয়ে অপেক্ষা করেন আইজি নুরুজ্জামান, জেলার আমিনুর রহমানকে নির্দেশ দেয়া হয় চার নেতাকে একটি রুমে একত্রিত করবার জন্যে।

সুবেদার ওয়াহেদ মৃধাকে নিয়ে আমিনুর রহমান চলে যান ভেতরে, মহাকাল জানে তারা ফিরবেন পনেরো থেকে বিশ মিনিট পর। এই আলো অন্ধকারের মাঝে সেই সময়টুকু যেন স্থির হয়ে থাকে উপস্থিত মানুষগুলোর জন্যে।

কিছুক্ষণ পর পরই উষ্মা প্রকাশ করতে থাকে রিসালদার মোসলেমউদ্দীন। জেলারের বিলম্ব তার সহ্য হয় না। জড়ানো স্বরে সে বারবার বলে, 'শেখ মুজিবরেই মারতে মাত্র তিন মিনিট সময় লাগছিল, আর এই চাইরটারে নিয়া আপনারা কী এত সময় নষ্ট করতাছেন!'

কারাগারের ভেতরের অন্যান্য বন্দীরাও তখন যে যার মতো নিশ্চুপ হয়ে আছে, আসন্ন ঝড়ের ইঙ্গিতে সন্ত্রস্ত সকলে। ইন্দ্রিয় বহির্ভূত কোনো উপায়ে তারাও জেনে গেছে অশুভ কিছু ঘটতে চলেছে অচিরেই। চাপা স্বরে চলছে বন্দীদের গুঞ্জন আর ফিসফাস, আশঙ্কার পর্দা জেলের গরাদের চেয়েও ভারী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তাদের সামনে।

মিনিট বিশেক পরেই ফিরে আসেন জেলার আমিনুর রহমান। জানান, চার বন্দীকে আনা হয়েছে একই কক্ষে। রিসালদার মোসলেমউদ্দীন তখন তার সাথের অস্ত্রধারীদের নিয়ে রওয়ানা হয়ে যায় নিউ জেলের দিকে, পথ দেখাতে তাদের সঙ্গী হন আমিনুর রহমান। আইজি আর ডিআইজি দাঁড়িয়ে থাকেন সেখানেই।

বন্দীদের গুঞ্জন আর ফিসফাস তখনো চলছে চাপা স্বরে, কারাগারের বাতাসে কিসের যেন অমঙ্গলের জল্পনা।

সুবেদার ওয়াহেদ মৃধাকে এক নম্বর কক্ষের সামনে রেখেই পা চালিয়ে ফিরে গেছেন জেলার আমিনুর রহমান। দ্রুত গতিতে অপস্রিয়মাণ সে অবয়বটির দিকে তাকিয়ে তাজউদ্দীন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন।

এই কামরায়, এক নম্বর কক্ষে, তিনি নিজে ছাড়াও সৈয়দ নজরুল ইসলাম, আছাবুল হক, কোরবান আলী– সব মিলিয়ে জনা আটেক মানুষের বাস। মিনিট বিশেক আগে সুবেদার ওয়াহেদ এসে তালা খুলেছে দরজার। চাপা গলায় আদেশ দিয়েছে, 'আপনারা তাড়াতাড়ি তিন নম্বর রুমে চইলে যান।'

তারা সবাই বের হয়েছিলেন দরজা দিয়ে, কিন্তু পেছন থেকে জেলার সাহেবের গলার আওয়াজ শোনা গিয়েছিল তারপর, 'এই, নজরুল সাহেব আর তাজউদ্দীন সাহেবরে ঘরে নাও। ওনাদের তিন নম্বরে যাওয়ার দরকার নাই।'

তাজউদ্দীনদের ফিরে আসতে হয় তাই এ ঘরেই। অল্প পরেই দুই নম্বর থেকে কামারুজ্জামান হেনা ভাই আর তিন নম্বর থেকে মনসুর ভাইকেও ঢোকানো হলো এই রুমে।

কক্ষ স্থানান্তরের ফাঁকে তাজউদ্দীন মৃদু গলায় একবার প্রশ্ন করলেন, 'কিছু হইছে জেলার সাহেব?'

আমিনুর রহমান অন্যমনস্ক স্বরে জবাব দেন, 'হ্যাঁ, আর্মিরা আসছে।'

যা বোঝার বুঝে নেন তাজউদ্দীন। তিনি ধীরে ধীরে লাগোয়া বাথরুমে চলে যান। সময় নিয়ে অজু করেন, মাথাটা কলের নিচে দিয়ে রাখেন অনেকক্ষণ। তারপরে পানি খেয়ে নামাজে বসে যান।

নজরুল ভাই কুরআন পড়ছিলেন, তাজউদ্দীনের দেখা দেখি তিনিও নামাজ পড়ে নেন এক ফাঁকে। হেনা ভাইও নামাজ পড়েন। টুপি মাথায় তছবি জপছিলেন মনসুর ভাই, পরনের গেঞ্জি পালটে তিনি পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে এসেছেন। অজু করতেও তার খানিক বেশিই সময় লেগেছে। আমিনুর রহমান তাই থেকে থেকে তাগাদা দিয়েছেন, 'স্যার, তাড়াতাড়ি করেন। একটু তাড়াতাড়ি করেন।'

এরপরে ঘরের আসবাবেও কিছু পরিবর্তন আনা হয়। দুটো কাঠের চৌকি সাজানো হলো মুখোমুখি, পেতে দেয়া হলো কয়েকটা টুল। হেনা ভাই জিজ্ঞাসা করলেন, 'এইসব কেন করতেছেন, কারা আসবে? কী হবে?'

চিন্তিত মুখে আমিনুর রহমান বলেন, 'আর্মি আসছে। কথাবার্তা বলবে মনে হয় আপনাদের সাথে।'

এরপর এক পাশের চৌকিতে চারজনকে বসার নির্দেশ দিয়ে জেলার বেরিয়ে যান রুম থেকে, আর সুবেদার ওয়াহেদ মৃধা দাঁড়িয়ে থাকে একপাশে। নজরুল ভাই একটু কাত হয়ে শুয়ে থাকেন একটি চৌকিতে, অন্য চৌকিতে বসে পড়েন

হেনা ভাই আর মনসুর ভাই। তাজউদ্দীন নিজে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ান। যতটা সম্ভব, জেলারের অপস্রিয়মাণ অবয়বটি লক্ষ করার চেষ্টা করেন।

'রাত খুব অদ্ভুত সময়, তাই না হেনা ভাই?' গাঢ় স্বরে তাজউদ্দীন কথা বলে ওঠেন হঠাৎ।

কামারুজ্জামান ভাবুক মানুষ। হাসনাহেনার মতো সুবাস ছড়াবেন ভেবে চাচা তার নাম রেখেছিলেন হেনা। রাজনীতির ময়দানে চাচার সেই ইচ্ছা পূরণের পাশাপাশি কামারুজ্জামান সুবাস ছড়িয়েছেন কবিতার খাতায়ও। সময়ে সময়ে কবিতা লেখেন কামারুজ্জামান।

তবে এই আশঙ্কার রাতে তাজউদ্দীনের প্রশ্নটার উত্তর দেন না কামারুজ্জামান। বরং চেয়ে থাকেন প্রশ্নকর্তার দিকে।

তাজউদ্দীন এদিক ফিরে বলেন, 'দিনের আলোয় মানুষ যা করতে পারে না, রাতের নরম আলো তাকে সেই সাহস দেয়। রাতের বেলায় মানুষ ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে, আবার রাতেই সে অতীতের ভুল স্মরণ করে কাঁদে। আমার কী মনে হয় জানেন? পৃথিবীর সবচেয়ে বড় কাজগুলা, মানুষের সেরা সৃষ্টিগুলা, সবকিছুরই পরিকল্পনা করা হয়েছে এই রাতে।'

সৈয়দ নজরুল চৌকিতে সোজা হয়ে বসেন। বলেন, 'তাজউদ্দীন ভাই কি কিছু বলতে চাচ্ছেন?'

টেবিলের কাছে এসে তাজউদ্দীন ধীর স্বরে বলেন, 'আমার মনে হচ্ছে এই রাতই আমাদের শেষ নজরুল ভাই। আমাদের ওরা বাঁচিয়ে রাখবে না।'

'শুনছি, মেজর ডালিম নাকি কয়দিন আগে এসে জেলখানা ঘুরে গেছে।' কামারুজ্জামান ধীরে ধীরে বলেন। 'তখন পাত্তা দেই নাই, এখন মনে হচ্ছে খবরটারে গুরুত্ব দেয়া দরকার ছিল।'

'গুরুত্ব দিয়েই বা কী করতেন?' তসবি জপে জপে বলেন মনসুর আলী। 'আমরা তো এইখানে বন্দী। ...আর মোশতাক খুব ভেবেচিন্তেই কাজ করে। আমাদের মারতে আর্মি পাঠানোর মানে হচ্ছে তার সব রাস্তা এখন বন্ধ।'

তাজউদ্দীন একবার চোখ বুলিয়ে নেন সাথিদের মুখের ওপর।

মনসুর ভাই তসবি জপছেন, একদম পাট করা পাঞ্জাবির সাথে মুখে পাউডারও দিয়ে এসেছেন তিনি। তার মুখের কিছুটা জায়গা সাদা ছোপ ছোপ হয়ে আছে পাউডারে। নজরুল ভাই কী যেন ভাবছেন আনমনে, কাপড়ে ঘষে ঘষে চশমা পরিষ্কার করছেন বারবার। আর হেনা ভাই পেটের কাছটায় হাত বোলাচ্ছেন। মনে হচ্ছে কিছু একটা দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছে তাকে।

তবে তাজউদ্দীন খেয়াল করেন, কারো মুখেই ভয়ের চিহ্ন নেই। আদর্শের সাথে আপস না করায় এ পরিস্থিতিতে পড়েছেন বলে কেউ আক্ষেপ করছেন

বলেও মনে হলো না। এই তিনজন নির্ভীক মানুষ তার সহকর্মী ছিল ভেবে বুকের ভেতর একটা গর্বের অনুভূতি হয় তার।

শব্দ করে একটা শ্বাস ফেলে সৈয়দ নজরুল বলেন, 'দেখা যাক, এরা তো বলতেছে আর্মির লোকেরা কথা বলতে আসতেছে। হয়তো আসলেই কোনো রকম আলোচনা হবে। আর সেইটা যদি না হয়...'

কথা সম্পূর্ণ করেন না মানুষটা, চুপ করে যান হঠাৎ। অল্প নীরবতার পরে বরং কামারুজ্জামান স্মিত হেসে বলেন, 'তাইলে আর কী করা। ... অনেকদিনই তো একসাথে ছিলাম। লিডার এখন নাই, আমরাও তাইলে একসাথেই যাই!'

হেনা ভাই কথাটা হালকা স্বরেই বলেন, কিন্তু চট করে ঘরে একটা ভারী বাতাস নেমে আসে যেন।

চারজন মানুষ, তারা কোনো কথা না বলে একে অপরের চোখের দিকে তাকান। ভাবনা অনূদিত হয় দৃষ্টিতে। মুজিব ভাইয়ের স্মৃতি তারা পেছনে ফেলে আসেননি, রুমালে বেঁধে নিয়ে এসেছেন সাথে করে। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তারা সে রুমাল আগলে রেখেছেন, বিশ্বাসঘাতকতার ধুলায় ময়লা করেননি।

রক্তাক্ত একটি আবহ এ মুহূর্তে ঘিরে ধরেছে এই চারজন মানুষকে। তাদের অপরাধ, তারা বাংলাদেশকে ভালোবেসে ছিলেন।

শৈশব থেকে একদিন ঠিক যৌবনে পৌঁছবে বাংলাদেশ, এগিয়ে যাবে বহু বহু দূর। কিন্তু তার ইতিহাস নিশ্চয়ই ফিরে ফিরে তাকাবে পেছনে। সে ইতিহাস খুব আশ্চর্য অবাক হয়ে দেখবে বিগত আকাশে কেমন জ্বলজ্বলে ছিল এই চারটি নক্ষত্র।

ইতিহাস তখন চোখ মুছবে বারে বারে।

নীরবতা চুরমার করে দিয়ে কক্ষে উপস্থিত সুবেদার ওয়াহেদ হঠাৎ বলে ওঠে, 'স্যার, উনারা আসতেছে। আপনারা জায়গায় গিয়া বসেন।'

অতএব সাজিয়ে রাখা চৌকিতে গিয়ে বসেন তারা চারজন। প্রথমে নজরুল ইসলাম, তারপরে তাজউদ্দীন, তারপরে কামারুজ্জামান। সবার শেষে বসেন মনসুর আলী, তিনিই ঘরের দরজার সবচেয়ে নিকটে থাকেন। বাইরে স্পষ্ট হয়ে ওঠে পদশব্দ।

জেলার আমিনুর রহমান ঘরে ঢোকেন চারজন অস্ত্রধারীসহ। তার ধারণা এখন আলোচনা হবে এই ঘরে, তাই পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যে তিনি হাত দেখিয়ে বলে ওঠেন, 'হি ইজ মিস্টার মনসু...'

পরিচয়ের পালা শুরু না হতেই অস্ত্র তোলে অভ্যাগতরা। আমিনুর রহমানের অসম্পূর্ণ বাক্যের মাঝেই সেই অস্ত্র তাগ করা দেখে লাফিয়ে ওঠেন তাজউদ্দীন। তার সেই উচ্চস্বরের সাক্ষী হয়ে থাকেন আশপাশের কক্ষগুলোর সমস্ত কয়েদিরা। 'হোয়াট আর ইউ ডুয়িং?'

তাজউদ্দীনের চিৎকার ঢেকে যায় অটোম্যাটিক ফায়ারের আওয়াজে। পঞ্চাশ বা ষাট রাউন্ড এলোপাতাড়ি গুলি চলে। জানালার শিক বহন করে সেই সাক্ষ্য, টেবিলে দাগ পড়ে বুলেটের, ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় কুরআন শরিফ।

ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের দিনে রাজপথে দুর্বার আন্দোলন চালিয়ে নিয়েছিলেন যে মানুষটি, সেই সৈয়দ নজরুল ইসলাম লুটিয়ে পড়েন চৌকির ওপরে।

প্রখর ধীশক্তির যে মানুষটি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিরোধী আন্দোলনে ছিলেন অগ্রগামী, সেই কামারুজ্জামানের মৃতদেহটি স্থান পায় চৌকিতে।

খন্দকার মোশতাকের মুখের ওপর তাকে তিরষ্কার করে যে মানুষটি আঁকড়ে ছিলেন শেখ মুজিবের দেখানো পথ, সেই মনসুর আলী বুলেটের ধাক্কায় ছিটকে যান নিচে।

আর একাত্তরের যুদ্ধদিনের যত দুর্যোগ আর বাধা ঠেলে নিয়েও শেখ মুজিবের আলোতে নিজেকে আড়াল করে রাখা মানুষটি, সেই তাজউদ্দীন পড়ে যান মাটিতে।

কারাগারের মেঝেতে নেমে আসে বাংলাদেশ নামের আকাশের চারটি আশ্চর্য নক্ষত্র।

শিরস্ত্রাণের সাক্ষ্য

একসাথে অনেক কিছুই ভিড় করে আসে তাজউদ্দীনের মনে। কোনো অবিরত দৃশ্য নয়, বরং ছেঁড়া ছেঁড়া কাটা কাটা ছবি অনেকগুলো। যেন বা সিনেমার মন্তাজ দৃশ্যের আদলে স্মৃতি কিছু দেখাতে চায় তাজউদ্দীনকে।

বয়ে যাওয়া শীতলক্ষ্যা নদী, তার মাঝে গজারি বন। নিজে কখনো দেখেননি তিনি, কিন্তু তাজউদ্দীন শুনেছেন প্রায়ই নাকি বাঘ এসে পড়ত উঠানে, ছাগল ধরে নিয়ে যেত। কিন্তু আম্মা এমন সাহসী ছিলেন। শুনেছেন, একবার নাকি কেবল হাতে দা নিয়ে চিৎকার করেই বাঘ তাড়িয়ে দিয়েছিলেন আম্মা।

আম্মা মারা গেছেন আগস্টের আঠারো তারিখ, তাজউদ্দীন এই তারিখ ভোলেন না। ভীষণ বাদলা ছিল দিনটা, শ্রীপুর রেলস্টেশনে নামতেই সে কী বাতাস আর ঝড়ো হাওয়া। কোনো গরুর গাড়িও পাওয়া গেল না, লালমাটির পিচ্ছিল পথ ছিল কাদায় ভর্তি, সে সব পেরিয়েই বাড়ি পৌঁছতে হয়েছিল তাদের। ছোট্ট রিপিকে আগলে রেখে দুর্গম রাস্তা পেরোতে রুদ্রপ্রয়াগের চিতার মতো সতর্ক ছিলেন যে তাজউদ্দীন, আম্মাকে জড়িয়ে ধরে সে মানুষটাই কেমন যেন কেঁদে ফেলেছিলেন শিশুর মতো। শরীরের কোথাও প্রচণ্ড বেদনা, তবু কেন এখন এসব কথা মনে পড়ছে তাজউদ্দীনের! ব্যথা পেলে বোধহয় মানুষ প্রথমেই মা'র কথা মনে করে।

তাজউদ্দীনের মনে পড়ে যায়, ক্লাস টুতে প্রথম হওয়ায় তাকে প্রাইজ দেয়া হয়েছিল একজোড়া বই। একটার মলাট ছিল হলুদ, সে বইতে লেখা ছিল আল্লাহর নিরানব্বই নাম। আর অন্য বইটা ছিল ছবিওয়ালা। আলীবাবা চল্লিশ চোর পড়তে গিয়ে খুব মজা পেয়েছিলেন তাজউদ্দীন!

হঠাৎ করে সে বইজোড়া সরে গিয়ে আরেকটা দৃশ্য চোখে আসে তাজউদ্দীনের। রিপি বসে আছে তার গা ঘেঁষে, তার কোলে বসে দুই পা ঝুলিয়ে মুখ উপরে তুলে তাকে দেখছে ছোট্ট রিমি। তাজউদ্দীন গল্প পড়ে শোনাচ্ছেন, সেই আলীবাবা চল্লিশ চোর থেকেই!

শরীরের কোথাও কিছু নড়ে গেল বোধহয়, তাজউদ্দীন অসম্ভব ব্যথা পাচ্ছেন। দূর থেকে কিছু যেন ভেসে আসছে কানে, শাঁখের শব্দের মতো। গজারির বনের আলোছায়া থেকে বেরিয়ে আসতে আসতেই সময়ের ক্ষুদ্রতম ভগ্নাংশের জন্যে তাজউদ্দীনের মনে পড়ে, তার গ্রামের নাম দরদরিয়া। দরিয়ার দ্বার।

টুকরো ছবির বিরাম নেই, দরদরিয়া থেকে তাজউদ্দীন চলে আসেন ফজলুল হক হলে। ওই তো, মুজাফফর ভাই শব্দ করে করে পড়ছেন।

তাজউদ্দীনের চোখের তারায় মুহূর্তে মুহূর্তে বদলায় পট। আসে মোগলটুলির মুসলিম লীগ অফিস, আসে গণ আজাদী লীগ। লিফলেট লেখা আর ডায়েরিতে নোট করা দিন আসে, আসে পুরান ঢাকার রোজ গার্ডেন। আওয়ামী মুসলিম লীগ হয়ে যায় আওয়ামী লীগ। কিন্তু এইসব সভা সমিতি, বিবৃতি আর লিফলেটের মাঝ দিয়ে হঠাৎ করে তাজউদ্দীন বেলি ফুলের তীব্র সুবাস পান আশপাশে কোথাও।

লিলি!

লিলি বলেছিল, 'সোনার গয়না লাগবে না আমার। আমার পছন্দ বেলি ফুল। বেলি ফুল দিয়েই বিয়ে হোক আমার'। তাজউদ্দীন হাসতে হাসতে উত্তর দিয়েছিলেন, 'আচ্ছা, তাই সই!'

একরাশ বেলি ফুল তাই সেদিন হয়ে উঠেছিল লিলি আর তাজউদ্দীনের সঙ্গী।

মহাকালের মতো দীর্ঘস্থায়ী বিস্তৃত এই মুহূর্তে টিকে থাকে না বেলি ফুলের গন্ধটাও। পিপাসা, তীব্র পানির পিপাসা পেয়ে বসে তাকে। পানির জন্যে হঠাৎ কাতর হয়ে ওঠা তাজউদ্দীন ঠিক সে সময়েই দেখতে পান শেখ মুজিবকে। মুজিব ভাই অবাক হয়ে তাজউদ্দীনকে বলেন, 'এ কী, তাজউদ্দীন! তুমি শুইয়া আছো ক্যান! চলো, চলো– আরে আমাগো কাজ অখনো শ্যাষ হয় নাই তো!'

তৃষ্ণা ভুলে তাজউদ্দীন উঠতে চান শেখ মুজিবের হাত ধরে, কিন্তু মুজিব ভাইকে বড় অস্পষ্ট দেখায়। বরং তাজউদ্দীনের করোটির ভেতর ফুঁসে ওঠে জনসমুদ্র। লাখ লাখ মানুষ! এই জনসভা কোথায় ছিল? এটা কি মুজিব ভাইয়ের সাতই মার্চের ভাষণ, নাকি নারায়ণগঞ্জের ঐ ছয় দফার সমাবেশ?

...মানুষ আর মানুষের মুখ বিভ্রান্ত করে দেয় তাজউদ্দীনকে। আর সব মুছে গিয়ে কিছুক্ষণ তাজউদ্দীন শুধুই দেখতে পান শেখ মুজিবকে। শেখ মুজিবের পেছনে পেছনে ফাইল হাতে ঘুরতে থাকেন তিনি। বহু আলোচনা, কত দলীয় মিটিং, শত জনসভা। রাত জেগে খসড়া করায় ক্লান্তি লাগে না তাজউদ্দীনের।

সবকিছু থেমে যায় একসময়। রক্তলাল চোখে তখন মুজিব ভাই বলেন, 'ডিসিশন ফাইনাল!'

তাজউদ্দীন দেখতে পান সেই হুঙ্কার শুনে সৈয়দ নজরুল ইসলাম, কামারুজ্জামান আর মনসুর আলী মুখ চাওয়া চাওয়ি করেন একে অন্যের। কী করবেন ঠিক যেন বুঝে উঠতে পারেন না কেউই।

...আচ্ছা, মনসুর ভাইয়ের গলা না ওটা? বিড় বিড় করে উনি মনে হয় কী যেন বলছেন।

শরীরের নিচের অংশে অসহ্য বেদনা নিয়ে তাজউদ্দীন স্মৃতির খেলা থেকে বেরিয়ে আসেন অবশেষে। কান পেতে তিনি শুনতে পান, বিভ্রম নয় কোনো। তার পাশ থেকে সত্যিই মনসুর আলী বলছেন, 'পানি! পানি!'

রক্তাক্ত কারাগারের মেঝেতে শুয়ে থাকা তাজউদ্দীনের নিজের উপর কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই যেন। মনসুর ভাইয়ের সাথে গলা মিলিয়ে তিনিও বলতে থাকেন, 'পানি! একটু পানি দ্যান!'

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে তখনো হতবুদ্ধি হয়ে থাকা কয়েদিদের সামনে আবারো পুনরাবৃত্তি হয় নারকীয় নৃশংসতার। চারনেতাকে বুলেটবিদ্ধ করে ফিরে যেতে থাকা ঘাতক দলের কানে যায় এখনো পুরোপুরি মৃত্যু হয়নি নেতাদের, কাজেই মরণ নিশ্চিত করতে আবার ফিরে আসে তারা। এবারে তারা অনায়াসে পৌঁছে যায় ওই এক নম্বর কক্ষে, কারাগারের কোনো কর্মকর্তা তাদের এমনকি বাধাও দেন না। সত্যি বলতে, বাধা দেবার মতো মানসিক অবস্থায় ছিলেনও না কেউ। পানির জন্যে মিনতি করতে থাকা নেতাদের শরীরে বেয়োনেট চার্জের পর ঘাতকের দল ফিরে যায় ডাবল মার্চ করে।

আর সেই বেয়োনেট চার্জের মুহূর্তটি সব কিছু অন্ধকার হয়ে যায়, শেখ মুজিবের আহ্বানে মেঝে থেকে উঠে আসা আর হয়ে ওঠে না তাজউদ্দীনের।

প্রাণের দাবি ছয় দফাকে ফাইলবন্দি করে টেকনাফের নীল জল থেকে তেঁতুলিয়ার তপ্ত মাটি স্পর্শ করে গিয়েছিলেন যে মানুষটি, একাত্তরের উত্তাল মার্চে শেখ মুজিবের তর্জনি উঁচানো ভাষণের বাস্তব দিকনির্দেশ যিনি দিয়েছিলেন অভূতপূর্ব সাংগঠনিক দক্ষতায়, সীমান্ত আকাশে অক্লান্ত ওড়াউড়ি করে নড়বড়ে এক কাঠমঞ্চে যে মানুষটি গঠন করেছিলেন বাংলাদেশের প্রথম স্বাধীন সরকার, মুজিব ভাইয়ের প্রত্যাবর্তনে হাসতে হাসতে তার কাছে সিংহাসন ফিরিয়ে দেয়া সেই তাজউদ্দীন– দুইশত ছেষট্টি দিনের অকথিত এক গল্পের অভিমান বুকে নিয়ে

স্তব্ধ হয়ে গেলেন চিরদিনের জন্যে। বুলেটবিদ্ধ শরীর নিয়ে মুকুট নামের এই নশ্বর মানুষটি, জায়গা করে নিলেন এই অশুভ জনপদের অবিনশ্বর পুরাণে।

কুহকী এ সময়ের নাটাই কখনো হাতে ছিল না মানুষটির, হাহাকার নিয়ে দাহকাল প্রত্যক্ষ করার সাথে সাথে আগুনে পুড়ে যাওয়াটাই যেন ছিল তার নিয়তি।

সিংহাসনের রাজমুকুট হয়ে না ওঠা যেমন, যুদ্ধদিনের শিরস্ত্রাণের নিয়তি।

ইতিহাসের কাটাকুটি

রক্তাক্ত কারাগারের অন্ধকার মেঝেতে যখন নিষ্প্রাণ শুয়ে আছেন সদ্য নিভে যাওয়া চার বাতিঘর, বাংলাদেশের ইতিহাসে তখন চলছে কাটাকুটি খেলার কাল। নির্দিষ্ট কারো দিকেই এই মুহূর্তে পক্ষপাতিত্ব করছে না ইতিহাস, বলা ভালো বাংলাদেশের ওপরে একক নিয়ন্ত্রণ নেই কোনো ব্যক্তি বিশেষের। ঢেউয়ের তোড়ে একবার খন্দকার মোশতাক উঠে যাচ্ছেন উপরে, পরক্ষণেই প্রতিবিপ্লবকারী খালেদ মোশাররফ উঠে আসছেন ঊর্মিচূড়ায়। বঙ্গভবন আর ক্যান্টনমেন্ট, টেবিল টেনিস বলের মতন এই দুই পক্ষের মাঝামাঝি ছোটাছুটি করতেই এখন ইতিহাস ব্যস্ত।

রক্তপাতহীন উপায়েই সেনাবাহিনীর চেইন অব কমান্ড ফিরিয়ে আনতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ খালেদ, গৃহযুদ্ধ এড়াতে তিনি চান আলোচনার মাধ্যমেই সব কিছু মিটিয়ে ফেলতে। সরাসরি আলোচনার পরিবর্তে উদ্ভট এক পন্থা অবলম্বন করেন খালেদ, শুরু করেন টেলিফোন তর্ক। দাবি করেন, বঙ্গভবনে অবস্থান করা অফিসারদের আত্মসমর্পণ করতে হবে। এই দাবি মানতে অস্বীকার করে রশিদ। সময় গড়ায়, বাড়তে থাকে বাদানুবাদও। খালেদের এক প্রতিনিধিদল লিখিত দাবি দাওয়া নিয়ে চলে যায় বঙ্গভবনে, এদিকে ক্যান্টনমেন্টে এসে কথাবার্তা বলতে থাকে ডালিমও।

নভেম্বরের সেই সকালে ঢাকার মাঠগুলো ছেয়ে আছে হালকা শিশিরে, কিন্তু আকাশে তার মিগ বিমান আর হেলিকপ্টারের সশব্দ আনাগোনা। বঙ্গভবনের ওপর যুদ্ধ বিমানের নানা কসরত প্রত্যক্ষ করে বাংলাদেশের মানুষ কিছু একটা আঁচ করার চেষ্টা করে হয়তো। কিন্তু রেডিও স্টেশন কোনো খবর দেয় না, খালেদের সৈন্যেরা সেটি দখল করে নিলেও তাতে কেবল বাজানো হয় সিনেমার গান। সাবিনা ইয়াসমিন আর রুনা লায়লার গলায় কোনো উত্তর খুঁজে না পেয়ে আরেকটু দোটানায় পড়ে যায় বাংলাদেশ।

ওসমানী আর মোশতাকের সাথে টেলিফোনে বাদানুবাদ চলতেই থাকে খালেদের। খালেদ আবারো দাবি করেন, কামান আর ট্যাঙ্ক বহর নিয়ে অচিরেই

ক্যান্টনমেন্টে ফিরতে হবে রশিদ-ফারুকদের। মানতে হবে চেইন অব কমান্ড। বলাই বাহুল্য, সেই দাবি মানতে রাজি হয় না শেখ মুজিবের হত্যাকারীরা।

দ্বিপক্ষীয় এ সমস্ত বাদানুবাদ যখন নির্দিষ্ট কোনো পরিণতি খুঁজে নিতে ব্যর্থ হচ্ছে বারে বারে, তখন আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ ফোন আসে বঙ্গভবনে। পুলিশের আইজি ফোন করেন ডিফেন্স স্টাফ প্রধান জেনারেল খলিলুর রহমানকে। জানান, গত রাতে জেলের ভেতরে ঢুকে চার নেতাকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে সশস্ত্র বাহিনীর কিছু লোক।

চমকে ওঠেন জেনারেল খলিল, ছুটে এসে প্রেসিডেন্ট মোশতাকের সেক্রেটারি মাহবুবুল আলম চাষিকে সংবাদটি দিয়ে প্রেসিডেন্টকে জানাতে বলেন তিনি। সেক্রেটারি চলে যান মোশতাকের ঘরে, খানিক পর ফিরে এসে নিচু গলায় তিনি বলেন, 'প্রেসিডেন্ট সব জানেন।'

জেল হত্যায় মোশতাকের সংশ্লিষ্টতা আর গোপন থাকে না জেনারেল খলিলের কাছে। মোশতাকের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হলেও অজ্ঞাত কারণে ঘটনাটি কাউকেই জানান না জেনারেল খলিল, গোপন করে রাখেন আরো কিছু সময়।

আর ওদিকে, মনোবলে টান পড়ে রশিদের। সে বুঝে যায় বেশিক্ষণ এই ঘটনা চেপে রাখা যাবে না। জারি করা ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্সের সুকঠিন বর্মও তাদের রক্ষা করতে পারবে না এই নারকীয় অপরাধের দায় থেকে। মানুষের বিরাগভাজন তো তারা হবেই, সেই সাথে টানটান উত্তেজনার এ মুহূর্তে খালেদ মোশাররফের কাছে এই সংবাদ প্রকাশ পেয়ে গেলে আত্মরক্ষা করাও অসম্ভব হয়ে পড়বে তাদের জন্যে।

অতএব দ্রুততার সাথে খন্দকার মোশতাকের মাধ্যমে খালেদের কাছে খুনি অফিসারেরা আবেদন করে, ক্যান্টনমেন্টের পরিবর্তে তাদের দেশের বাইরে পাঠিয়ে দেয়া হোক। সম্ভাব্য গৃহযুদ্ধ, আরো রক্তপাত আর বেসামরিক ক্ষয়ক্ষতি এড়াতে খালেদ সাড়া দেন এই প্রস্তাবে। কারাগারের মেঝেতে নক্ষত্র পতনের সংবাদ খালেদের কাছে তখনো অজানা।

পররাষ্ট্র দপ্তরের কর্মকর্তারা এই দেশত্যাগের ব্যাপারে সব কিছু চূড়ান্ত করার পর সেই সন্ধ্যায় বাংলাদেশ বিমানের একটি ফকারে উঠতে দেখা যায় সতেরোজন মানুষকে। মধ্য আগস্টের একটি রক্তাক্ত হত্যাযজ্ঞের খলনায়কেরা বিমানে চাপে স্ত্রী, সন্তানদের নিয়ে। নিরাপত্তার স্বার্থে তারা অস্ত্র রাখতে চায় সাথে, কিন্তু তাদের সে অনুমতি দেয়া হয় না। তেজগাঁ থেকে যাত্রারম্ভের পর বিমানটি একবার চট্টগ্রামে অবতরণ করে তেল নেয়ার জন্যে, এরপর উড়ে যায় ব্যাংককের দিকে। শেখ মুজিবের তর্জনির সাথে সাথে বাংলাদেশের ইতিহাসকেও ছিন্নভিন্ন করে দেয়া মানুষগুলো, নিরাপদে জায়গা করে নেয় পৃথিবীর অন্য কোনো দ্রাঘিমাংশে।

তাজউদ্দীনদের লাশ তখনো পড়ে থাকে নিকষ কারাগারে।

নৃশংস ঐ হত্যাযজ্ঞের ঘোর তখনো কাটাতে পারেননি কারাগারের কর্মচারীরা। গুলিবিদ্ধ লাশগুলোকে প্রায় বিকেল পর্যন্ত ওভাবেই ফেলে রাখা হয় সরকারি আদেশের অপেক্ষায়। এরপরে ধীরে ধীরে ব্যবস্থা নেয়া হয় মৃতদেহ সৎকারের। কারো হাতের আংটি, কারো হাতের ঘড়ি– সব কিছু আলাদা করে নেয়ার পরে গোসল দেয়া হয় মৃতদেহগুলোকে। জেলের ভেতরেই থাকা এক মৌলবি ইসলামি কায়দায় গোসল করায় চার নেতার প্রাণহীন দেহকে। এরপর সে কক্ষের সামনেই চারটি খাটে শুইয়ে চাদরে ঢেকে রাখা হয় মৃতদেহগুলো। পচন ঠেকাতে খাটের নিচে, চাদরের ওপরে বরফ দিয়ে দেয়া হয়।

নানা জায়গা থেকে মানুষ আসতে থাকে অবিরত। মৃতদেহের চাদর সরিয়ে চার নেতার মুখ দেখতে চায় তারা। তিন তারিখের দিনটা কেটে যায় এভাবেই। চার তারিখ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, পোস্টমর্টেম করা হবে লাশের। ওই এক নম্বর ঘরেই সন্ধ্যার দিকে করা হয় পোস্টমর্টেম।

আর সেই চার তারিখ সকালেই খালেদ মোশাররফ প্রথমবারের মতো জানতে পারেন যে তার অভ্যুত্থানের প্রথম পর্যায়েই জাতীয় চার নেতাকে জেলখানায় বন্দী অবস্থায় হত্যা করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে আওয়ামী লীগের সাথে সেনাবাহিনীর আঁতাতের যে সম্ভাবনা বিচার করে মোশতাক সরিয়েছেন এই চার নেতাকে, তার সাথে কোনোই সম্পর্ক নেই খালেদের। চার নেতা বলি হয়েছেন খালেদের প্রতি-অভ্যুত্থানের প্রাথমিক পর্যায়ে মোশতাকের নামানুষী প্রতিহিংসার।

তবু চার নেতার মৃত্যু সংবাদ শুনে প্রচণ্ড আঘাত পান খালেদ, উত্তেজিত হয়ে ওঠেন শাফায়াত জামিলও। নতুন কেউ প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নেবার আগের কদিন মোশতাককেই রাষ্ট্রপতি রাখার পক্ষপাতী ছিলেন খালেদ, কিন্তু জেল হত্যার খবর শুনে শাফায়াত জামিল তাকে বলেন, 'স্যার, অনেক হয়েছে। আপনি এবার জলদি মোশতাককে অপসারণ করেন।'

টেলিফোন টেলিফোন খেলা ছেড়ে খালেদ এবার সশরীরে চলেন বঙ্গভবনে, বিমানবাহিনী প্রধান এম. এ. জি. তোয়াব আর নৌ বাহিনী প্রধান এম. এইচ. খানও আছেন তার সাথে। আর আছে জেনারেল জিয়ার স্বাক্ষরিত পদত্যাগপত্র।

ইতোমধ্যে, তেসরা নভেম্বর দুপুরেই সেনা প্রধানের পদ থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান। পদত্যাগপত্রে স্বাক্ষরের পাশাপাশি পূর্ণ পেনশন সুবিধাদির জন্যে যেমন আবেদন করেছেন জিয়া, সেই সাথে সকলের অগোচরে আরো একটি কাজ করেছেন তিনি। জাসদের কর্নেল তাহেরকে ফোন করে জানিয়েছেন সাহায্যের আবেদন। এই আবেদন প্রস্তুত করে দিয়েছে বাংলাদেশের ইতিহাসের আরো একটিবার নাটকীয়ভাবে মোড় ফেরবার পট, কিন্তু সেটি ভিন্ন আরেক গল্প।

এই মুহূর্তের গল্পে খালেদ মোশাররফ উত্তেজিত হয়ে জেল হত্যাকাণ্ডের ব্যাখ্যা জানতে চান মোশতাকের কাছে। বড় ধুরন্ধর পলিটিশিয়ান ঐ মোশতাক, সজোরে বিলাপ করে তিনি ভান করতে থাকেন, নারকীয় ঘটনাটি ঘটেছে তার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে। মোশতাক দাবি করেন, দেশ থেকে পালিয়ে যাওয়া ঐ রশিদ-ফারুকেরাই জেলহত্যার জন্যে দায়ী।

খালেদের দাবি পেশ করার পালা আসে এরপর। খালেদ বলেন, জিয়া পদত্যাগ করেছেন, অতএব সেনাবাহিনীর চেইন অব কমান্ড ঠিক করতে এবার তাকেই সেনাপ্রধান করা হোক।

মুক্তিযুদ্ধের সময় নিখুঁত অপারেশন প্ল্যানের শিক্ষায় দীক্ষা দিয়ে ক্র্যাক প্লাটুনের দুঃসাহসী সব ছেলের গার্ডিয়ান অ্যাঞ্জেল হয়ে উঠেছিলেন খালেদ মোশাররফ, কিন্তু মোশতাকের কাছে আবেদন করে পরাবাস্তব এই নভেম্বরের প্রতি-অভ্যুত্থানে যেন প্রহসনই প্রসব করে বসেন সেই মানুষটি। যার বিপক্ষে অভ্যুত্থান করেছেন, খালেদ এখন তার কাছেই করছেন আবেদন!

শক্তি প্রয়োগ আর রক্তপাত ঘটিয়ে নয়, আসলে শান্তিপূর্ণভাবে নিয়মতান্ত্রিক উপায়েই সেনাপ্রধান হতে চাইছিলেন খালেদ। সুচতুর মোশতাক খালেদের এই দুর্বল জায়গাটি বুঝে নিয়েই চালেন আরো এক চাল। বলেন, মন্ত্রিসভার বৈঠক ছাড়া খালেদকে সেনাপ্রধান করা যাবে না।

অতএব ডাকা হয় মন্ত্রিসভার বৈঠক। সময় গড়াতে থাকে, সে বৈঠক আর ফুরোয় না।

এদিকে ক্যান্টনমেন্টে খালেদের অপেক্ষায় বসে থেকে থেকে ধৈর্যহারা হয়ে পড়েন শাফায়াত জামিল। আরো কজন অফিসারকে সাথে নিয়ে তিনিও চলে আসেন বঙ্গভবনে।

বঙ্গভবনের করিডোরে ঢুকেই শাফায়াত দেখেন, মোশতাক ওসমানীকে পাশে নিয়ে সভাকক্ষের বাইরে খালেদকে উচ্চস্বরে বলছেন, 'আই হ্যাভ সিন ম্যানি ব্রিগেডিয়ারস অ্যান্ড জেনারেলস অব পাকিস্তান আর্মি, ডোন্ট ট্রাই টু টিচ মি!'

নিরাপত্তার দায়িত্বে বঙ্গভবনে মোতায়েন করা একটি কোম্পানির নেতৃত্বে থাকা মেজর ইকবাল সে মুহূর্তে শ'খানেক সৈন্য নিয়ে অবস্থান করেছিলেন করিডোরেই। মোশতাকের উচ্চ স্বরে হঠাৎ ধৈর্যচ্যুতি ঘটে সেই মেজর ইকবালের। তিনি উত্তেজিত স্বরে বলে ওঠেন, 'ইউ হ্যাভ সিন দ্য জেনারেলস অফ পাকিস্তান আর্মি, নাউ ইউ সি দ্য মেজরস অফ বাংলাদেশ!'

করিডোরের সৈন্যরা সেই মুহূর্তে অস্ত্র তাক করে মোশতাকের দিকে। বড় আকস্মিকভাবেই প্রকট হয়ে ওঠে আরো রক্তপাতের সম্ভাবনা। চিৎকার করে ওসমানী বলেন, 'শাফায়াত, সেইভ দ্য সিচুয়েশন!'

সেই ডাকে সাড়া দিয়ে সিচুয়েশনের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেন শাফায়াত জামিল। মেজর ইকবালকে সরিয়ে দিয়ে মোশতাকসহ সকলকে নিয়েই সভাকক্ষে ঢোকেন তিনি। অস্ত্রধারী শাফায়াত জামিলসহ আরো কজনকে সভাকক্ষে ঢুকতে দেখেই একরকম হুড়োহুড়ি পড়ে যায় ভেতরে।

শাফায়াত জামিল তখন বেশ উত্তেজিত, প্রথমেই তিনি পড়েন জেনারেল খলিলকে নিয়ে। তাকে বলেন, 'আপনি চিফ অব ডিফেন্স স্টাফ, অথচ জেল হত্যাকাণ্ডের কথা আপনি জেনেও চেপে রাখছেন। এইরকম ডিসগ্রেসফুল আচরণের জন্যে আপনাকে আমি অ্যারেস্ট করলাম!'

এরপরে মোশতাকের দিকে আঙুল তোলেন শাফায়াত। বলেন, 'আপনি একজন খুনি! আপনি জাতির পিতাকে খুন করছেন, জেল হত্যাকাণ্ডও আপনার আদেশেই হইছে। আপনার ক্ষমতাদখল অবৈধ, আপনাকে অবিলম্বে পদত্যাগ করতে হবে।'

শাফায়াত জামিলের হস্তক্ষেপে দ্রুততর হয় পরবর্তী কার্যকলাপ। ক্যাবিনেট সভায় সিদ্ধান্ত হয় খালেদ হবেন পরবর্তী সেনাপ্রধান, সৈন্যরা দ্রুতই ফিরে যাবে ক্যান্টনমেন্টে, শেখ মুজিব হত্যাকাণ্ড আর জেল হত্যার বিচার বিভাগীয় তদন্তও হবে। ঐ সভা শেষেই ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফকে উন্নীত করা মেজর জেনারেল পদে, খালেদ হয়ে যান সেনাপ্রধান। বিমান ও নৌ বাহিনী প্রধান দুই দিক থেকে খালেদের কাঁধে পরিয়ে দেন মেজর জেনারেলের র‍্যাঙ্ক। হাস্যোজ্জ্বল খালেদের ছবি বাংলাদেশের অবজারভারের প্রথম পাতায় ঠাঁই পায় পরদিন।

তিনদিনব্যাপী কাটাকুটি খেলার ছেদ টেনে বাংলাদেশের ইতিহাস পরের দিন পাঁচই নভেম্বর নিজের গা থেকে চূড়ান্তভাবে কেটে দেয় খন্দকার মোশতাকের নাম। খালেদ মোশাররফ, শাফায়াত জামিল, বিমানবাহিনী প্রধান তোয়াব, নৌ বাহিনী প্রধান এম. এইচ. খান সকলে মিলে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব নিতে রাজি করান প্রধান বিচারপতি আবু সাদাত সায়েমকে। আর গতকাল থেকে বঙ্গভবনের প্রেসিডেন্সিয়াল স্যুটে আটকে খন্দকার মোশতাক মাঝরাতের দিকে পুলিশ প্রহরায় নীরবে ফিরে আসেন আগামসি লেনে।

বাংলাদেশের অভিধান নিজের গা থেকে 'ষড়যন্ত্রী' শব্দটি রাবারে ঘষে ঘষে সেখানে গুটি গুটি অক্ষরে তুলে রাখে মোশতাকের নাম, আর বাংলাদেশের ইতিহাস একদলা অভিশাপের থুতু চিরদিনের জন্যে মাখিয়ে দেয় খন্দকার মোশতাকের কালো আচকানে।

অনেকটা ঠিক প্রভাতফেরির মতোই। সূর্য আকাশে স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি এখনো, শত বছরের পুরনো চার্চবাড়ির মতোই ঝুরঝুরে নরম আলো অন্ধকার চারপাশে। সামান্য নড়াচড়াতেই যেন স্বপ্নদৃশ্যের মতো ভেঙে যাবে সবকিছু।

অথচ এমন আলোতেই দেখো, সাতমসজিদ সড়কের মাইল খানেক দূর হতেই একুশের প্রভাতফেরির মতো মানুষের কেমন দীর্ঘ সারি। তারা নীরবে ঢুকছেন নিচতলার ঘরটিতে, শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন তাদের প্রিয় একজন মানুষকে, মাথা নিচু করে বেরিয়ে আসছেন টলমল চোখে।

নিচতলার জলছাদ দেয়া গাড়ি বারান্দার পাশের ঘরটিতে শুয়ে আছেন আব্বু। মুজিব কাকুকে মেরে ফেলবার পরে মিলিটারি আস্তানা গেড়েছিল এ ঘরটিতে, এ ঘরেই মার্চের অসহযোগ আন্দোলনের নির্দেশমালা বানিয়েছিলেন আব্বু। নিজের যত লেখা আর পড়া, সমস্তই আব্বু সারতেন এই ঘরে। আর এই পরাবাস্তব ভোরে, চোখে এখনো অবিশ্বাস নিয়ে প্রাণহীন তাজউদ্দীনকে এ ঘরেই শুয়ে থাকতে দেখে অকারণেই রিপির মনে পড়ে যায় সে দিনটির কথা, যে দিন বাবা তাকে তিতির পাখি চিনতে শিখিয়ে ছিলেন।

ওদিকে দোতলার ভেতরের বারান্দায় বসে থাকা আম্মা, পাশে গিয়ে দাঁড়ানো রিমির হাত আঁকড়ে ধরে অদ্ভুত এক গলায় বলেন, 'দেখো, তোমার আব্বুকে বিদায় দেয়ার জন্যে কত মানুষ আসছে দেখো!'

তিতির পাখি চেনার স্মৃতি জড়িয়ে থাকা কক্ষটির দরজায় হেলান দিয়ে, শূন্য দৃষ্টিতে রিপি কেবল দেখে যায় মানুষের ভিড়। আমীর-উল ইসলামের মতো পরিচিত মানুষ যেমন এসেছেন, এসেছে তারেকুল আলমের মতো রিপিদের নিতান্ত অপরিচিত মুখও। কিন্তু এসব ভাষাহীন মুখ হতে বহু বহু দূরে তখন উড়ে বেড়াচ্ছে রিপির স্মৃতি।

তিন তারিখ সকাল থেকেই রেডিওতে কোনো নিশ্চিত খবর নেই, সেখানে সাবিনা ইয়াসমিনের গান আর আকাশে উড়ন্ত যুদ্ধ বিমান নানা রকমের গুজবের জন্ম দেয় শহরজুড়ে। বাসার ফোনের লাইন কেটে গেছে আবারো, তাই এদিক ওদিক খোঁজ নেয়ার চেষ্টা করে বাড়ির কাছেই লালু ফুফুর, মানে পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম বাঙালি মহিলা হিসেবে অ্যাডভোকেট হয়েছিলেন যিনি, সেই মেহেরুন নেসা রহমানের বাসায় গিয়েছিলেন আম্মা। সেখান থেকে নানা দিকে ফোন করেও কোনো নিশ্চিত খবর পাওয়া যায়নি। কেউ বলে আব্বুসহ চারনেতাকে জেল থেকে বের করে বঙ্গভবনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে নতুন মন্ত্রিসভা করা হবে বলে, কারো ধারণা অজ্ঞাত কোনো স্থানে নিয়ে আব্বুদের চাপ দেয়া হচ্ছে সরকার গঠনের জন্যে। সে দিনটা কেটে গেছিল ওভাবেই।

পরের দিন, বহুদিনের মাঝে সতেজতম এক সকালে, রিপি আর আম্মাকে ডেকে নিয়ে আব্বুর বন্ধু ডাক্তার করিম জানান, চার নেতাকে মেরে ফেলেছে আর্মির কিছু লোক।

কিন্তু এ অসম্ভব কথা তো কিছুতেই বিশ্বাস হয়নি রিমি-রিপিদের! আম্মাকে সাথে নিয়ে এবাড়ি থেকে ওবাড়ি ছুটে বেড়ায় তারা, নিশ্চিত খবর মেলে না কোথাও। পরশু রাতে জেলখানায় সত্যিই বেজে উঠেছিল পাগলা ঘণ্টি– এ সংবাদ পেয়ে যায় রিমিরা, অথচ আব্বুর খোঁজ পাওয়া যায় না। আর কে জানে কেন, রিপিদের বাড়ি আর মফিজ কাকুর বাড়িতে নানা জায়গা হতে আসতে থাকে মানুষ।

বিকেলের দিকে মফিজ কাকুর বাসায় আসেন বেশ কিছু মহিলা, তাদের মাঝে একজন নিজেকে পরিচয় দেন খালেদ মোশাররফের মা বলে। ফুপাতো ভাই বাবুলকে আড়ালে ডেকে তিনি জানান, তাজউদ্দীন সাহেবকে জেলখানায় হত্যা করা হয়েছে।

বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের মাঝে সুতোর মতো যে অকিঞ্চিৎ জায়গাটি রয়েছে, সে স্থানটিতে মানুষের মনে জায়গা করে নেয় অলৌকিক। সে সময় 'যদি' নামের শব্দটিই হয়ে ওঠে তার অভিধানে সবচেয়ে স্পষ্ট। কিছু সময়ের জন্যে ওই সুতোটির তৈরি জালেই আশ্রয় নিতে হয় রিমি-রিপিকে।

কিন্তু সেই সুতোও ছিঁড়ে যায় সন্ধ্যায়। আব্বুর বেশ কিছু ঘনিষ্ঠ সহকর্মী আর বন্ধু জেলখানা থেকে নিয়ে আসেন নিশ্চিত খবর, তাজউদ্দীন আহমদসহ চার নেতাকে হত্যা করা হয়েছে কারাগারের ভেতরে।

রোগে পাণ্ডুর মফিজ কাকু খাটের ওপর লুটিয়ে গিয়ে 'ভাই সাহেব! ভাই সাহেব!' বলে উথাল পাতাল করতে লাগলেন। পরনে মলিন একটি সুতি শাড়ি নিয়ে নিস্পন্দ আম্মাও হঠাৎ কেঁদে উঠলেন শব্দ করে। কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগলেন, 'এই সোনার মানুষটাকে ওরা মারতে পারল! সে তো কারো কোনো ক্ষতি করে নাই, কীভাবে পারল ওরা এমন করতে!'

মানুষের ভিড় না কমলে লাশ আনা ঠিক হবে না, এই ভেবে পুলিশ আর জেল কর্তৃপক্ষ জানাল মরদেহ হস্তান্তর করা হবে পরে। আম্মা, মিমি আর সোহেলকে সবাই নিয়ে গেল লালু ফুফুর বাসায়। রিমি-রিপিকে মফিজ কাকু নিয়ে গেলেন তার বাড়ি। আর গভীর রাতে রক্তমাখা ঘড়ি, জামা, জুতো আর গুলিতে ছিদ্র হয়ে যাওয়া টিফিন ক্যারিয়ারের সাথে ফিরে আসলেন মানুষটি। বড় ফুফুর ছেলে সাইদ ভাই জেল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে বুঝে নিলেন আব্বুর মরদেহ।

এই মুহূর্তে, পেছনের গ্যারেজের কাছে আব্বুর নিজ হাতে করা যে বাগান, তার কোণে লাকড়ির চুলায় বড় এক হাঁড়িতে বসানো হচ্ছে গরম পানি। দেশলাই ধরিয়ে আগুন জ্বালাল ওটা কে– রিমি না? ...সব কিছু বড় ঝাপসা ঝাপসা, স্বপ্নের

ভেতর বয়ে চলা দৃশ্যের মতো মনে হচ্ছে রিপির। সোহেল আর মিমি ওপর নিচ করছে একটু পর পর। এতো ভিড়েও একাকী ঘুরে বেড়াচ্ছে তার এই দুই ছোট ভাই বোন। কত শত মানুষ, সোহেল তার মাঝে খানিক জায়গা করে নিয়ে আব্বুর মাথার কাছে বসে থাকল কিছুক্ষণ, তারপর আবার চলে এলো এদিকে। রিপি কাঁদতে কাঁদতে কোলে তুলে নিল তার ছোট ভাইটিকে।

মনসুর আলী কাকুর মরদেহ রাখা হয়েছিল ধানমণ্ডি ১৯ নম্বরে তার এক আত্মীয়ের বাড়ি, রিমি এক ফাঁকে গিয়ে শেষ বিদায় জানিয়ে আসল তাকে।

সারারাত পাথর মূর্তি হয়ে নিষ্প্রাণ তাজউদ্দীনের মাথায় হাত বুলিয়ে গেছেন জোহরা, এই মুহূর্তে দোতলা থেকে তাজউদ্দীনের মৃতদেহ ঘিরে থাকা মানুষদের দেখেন তিনি। উত্তরে আবাহনী মাঠ, দক্ষিণে বিডিআর গেট তক দেখা যায় মানুষের সারি। জোহরা ফিসফিস করে বলেন, 'দেশ আর মানুষ ছাড়া তো তুমি কিছু বোঝো নাই কখনো! আজকে দেখো, কত্ত মানুষ তোমাকে তাই বিদায় দিতে আসছে!'

... একটা ছোটখাটো ঝামেলা হয়ে গেল এরপর।

তাজউদ্দীনকে শ্রদ্ধা জানাতে সমবেত হওয়া মানুষের মাঝে বড় একটা অংশই ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা। তাদের দাবি, সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের পাশে তিন নেতার কবরের দক্ষিণেই এই চারনেতাকে কবর দিতে হবে। সেখানে ইতোমধ্যে কবর খোঁড়াও হয়ে গেছে। কিন্তু তিন তারিখ থেকে মোশতাককে সরিয়ে দিয়ে ক্ষমতায় এসেছেন বলে শোনা যাচ্ছে যে খালেদ মোশাররফের নাম, তিনি নাকি সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে দাফন বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত দেননি। সামরিক কর্তৃপক্ষ বলছে, তাজউদ্দীনসহ চার নেতার দাফন হবে বনানী কবরস্থানে। এ কথা শুনে জোরগলায় প্রতিবাদ জানাল উপস্থিত ছাত্রদের অনেকেই। অগত্যা পুলিশ শুরু করল লাঠি পেটা, সাময়িকভাবে গ্রেপ্তার হলো কয়েকজন, মানুষের ভিড় হয়ে গেল ছত্রভঙ্গ।

বাড়ির সামনের আমগাছটি নিজ হাতেই লাগিয়েছিলেন তাজউদ্দীন। বেলা দেড়টায় মফিজউদ্দীন জানাজা পড়ালেন সেই গাছের নিচেই। পুলিশের লাঠির বাড়ি সহ্য করে খুব অল্প কজনই রয়ে গেছিল জানাজার নামাজে অংশ নিতে। তারেকুল আলম তাদের মাঝে একজন।

অল্প পরেই বাঁড়ির সামনে থেকে তাজউদ্দীনকে বহনকারী ট্রাকটি যখন ধীরে ধীরে চলতে শুরু করল বনানী কবরস্থানের দিকে, তারেক সেখানেও মিশে গেল স্বজন আর পরিচিতদের ভিড়ে। প্রয়াত তাজউদ্দীনের প্রতি শ্রদ্ধা আর বন্ধুর অনুরোধ, এই দুয়ে মিলেই তারেক আজ সঙ্গী হয়েছে এই শবযাত্রার। তাজউদ্দীন সাহেবের সাথে বেশ ঘনিষ্ঠতার সম্পর্ক ছিল আলাউদ্দীনের। সে জন্যেই তাজউদ্দীনের শেষ বিদায়ে সঙ্গী হবার জন্যে তারেককে বারবার অনুরোধ করেছে

জেলে বন্দী আলাউদ্দীন। কেন্দ্রীয় জেলে কিছু একটা হয়েছে শুনে তারেক গতকাল একবার গিয়ে দেখে এসেছে বন্ধুকে।

বনানী গোরস্তানেও সব শেষ হয়ে গেল একসময়।

একটি বকুল গাছের নিচে শায়িত করা হলো তাজউদ্দীনকে। তাজউদ্দীনের কবরে প্রথম মাটি দিল ওই ছোট্টো সোহেল। আত্মীয়দের কজন সোহেলকে বোঝালেন, তার আব্বু বিদেশে চলে গেছেন, ফিরে আসবেন পরে। সোহেল এই ছলনার কতটা বুঝলো কে জানে!

দাফনের কাজ শেষে সবাই চলে যাবার পরেও তারেক একা একা খানিক ঘুরে বেড়াল কবরস্থানের ভেতরে। মৃতদের মাঝে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে এই মুক্তিযোদ্ধা স্মরণ করে একাত্তরের দিনে তার হারানো বন্ধুদের, সহযোদ্ধাদের। বেঁচে থাকার হীনম্মন্যতা তাকে গ্রাস করে নিলে সে ধীরে ধীরে আবার এসে দাঁড়ায় তাজউদ্দীনের কবরের সামনে। তার মনে হয়, অন্য অনেকের মতোই শুধু বাংলাদেশকে ভালোবাসার কারণে ঘাতকের হাতে মৃত্যু হলো এই মানুষটির।

তারেকুল আলমের জানা নেই, মুজিব হত্যাকাণ্ডের পর মোশতাক দেশপ্রেমের যে নয়া পাঠ দিতে চেয়েছেন মানুষকে, সেই পাঠ নানারূপে আরো অনেকদিনই উপস্থাপন করা হবে বাংলাদেশের মানুষের সামনে। ভবিষ্যতে অনেক চক্রই সক্রিয় হয়ে উঠবে ইতিহাস বিস্মৃত একটি প্রজন্ম গড়ে তুলতে, চাইবে অন্ধকারের বিস্মৃতিতে ঢেকে দিতে আলোকের যত অনন্তধারাকে।

মহাদেব সাহা নামের একজন তরুণ কবি এই দেশপ্রেমের উল্টো পাঠ নিয়েই বছর দুয়েক পরে যা লিখবেন, তারেকুল আলমের পক্ষে এ মুহূর্তে জানা সম্ভব হয় না সে কবিতাটিও।

'... কোকিলও কি দেশদ্রোহী যদি সে আপন মনে কারো
নাম ধরে ডাকে
বকুলও দণ্ডিত হবে যদি কিনা সে-ও কোনো নিষিদ্ধ কবরে
একা নিরিবিলি ঝরে
আর এই আকাশও যদি-বা তাকে অকাতরে দেয় স্নিগ্ধ ছায়া,
তাহলে কি আকাশের দেশপ্রেম নিয়ে কেউ
কটাক্ষ করবে অবশেষে!'

ভবিষ্যতের গর্ভে জন্ম নিতে যাওয়া এই কবিতাটি স্মরণ করেই হয়তো, খোলা আকাশের নিচে প্রকৃতি একটি ছোট্ট নাটক করে এ সময়।

কোথাও কোনো বাতাস নেই, শীতের সূর্য দিনের সর্বোচ্চ উত্তাপ নিয়ে হাসছে মাঝ বিকেলে। অথচ তারেকুল আলম দেখে, গাছ থেকে একরাশ ঝরা বকুল হঠাৎ ঢেকে দিয়ে যায় তাজউদ্দীনের সমাধি।

বিপরীত বাতাসে বয়ে আসা আরেক অভ্যুত্থান

লেফটেন্যান্ট কর্নেল হায়দার দিন দুয়েক হলো বাবার উপরে রাগ করে আছেন। রাগের কারণে বাবার সাথে কোনো রকম দুর্ব্যবহার অবশ্য করেননি কর্নেল হায়দার, কিন্তু বোঝা যাচ্ছে– বাবা খুব অপ্রস্তুত হয়ে গেছেন ছেলের আচরণে। ইতোমধ্যেই বাবা তাই শান্তির সাদা পতাকা উড়িয়ে দিয়েছেন তার তরফ থেকে। ছেলে মাছ পছন্দ করে, ফকিরাপুল বাজার থেকে সকালে তাই বড় বড় চিংড়ি নিয়ে এসেছেন বাবা। রান্না ঘরে বড় আপা আখতার বেগম ব্যস্ত হয়ে গেছেন সেই চিংড়ি নিয়ে।

কর্নেল হায়দারের রাগ করার সঙ্গত কারণ আছে অবশ্য।

চটগ্রাম সেনানিবাস থেকে বদলি হয়ে মাত্র কিছুদিন আগে বান্দরবানের রুমা সেনাক্যাম্পে যোগ দিয়েছিলেন কর্নেল হায়দার। নতুন দায়িত্ব বুঝে নিতে ব্যস্ত কয়েকটা দিন কেটেছে তার। বাবা নভেম্বরের এক তারিখে হায়দারকে টেলিগ্রাম করেছিলেন ঢাকা চলে আসতে। বাবার উদ্দেশ্য ছিল, তিনি হায়দারকে নিয়ে নারায়ণগঞ্জ যাবেন, সম্প্রতি সেখানকার একটা জমি নিয়ে খুব ঝামেলা হচ্ছে। নারায়ণগঞ্জের ডিসি আবার হায়দারের বন্ধু, তাকে বলে যদি কোনো সমাধান করা যায়!

ছেলেকে আসবার জন্যে টেলিগ্রাম করে বাবা নিজেও দুই তারিখ কিশোরগঞ্জের বাড়ি থেকে চলে এলেন ঢাকায়, উঠলেন মেয়ের বাড়ি এবং এসেই তিনি আটকে পড়লেন ঢাকায়, কারণ খালেদ মোশাররফ সে রাতেই করে ফেলেছেন একটি প্রতি অভ্যুত্থান। পরদিন সকালে বঙ্গভবনের উপর উড়ন্ত যুদ্ধবিমান দেখার সাথে সাথে নানা রকম গুজব শুনে বাবা সিদ্ধান্ত নিলেন, আপাতত ঢাকা ত্যাগ করা যাবে না।

ওদিকে কর্নেল হায়দার টেলিগ্রাম হাতে পেলেন তিন তারিখ। বাবার জরুরি তলব পেয়ে হায়দার প্রথমেই আঁচ করলেন, কোনো খারাপ খবর আছে হয়তো। হয়তো কেউ অসুস্থ। চটজলদি ঢাকা যাবার জন্যে বিমানের টিকিটের জন্যে চেষ্টা করেও লাভ হলো না। আবার, খালেদ মোশাররফের অভ্যুত্থানের দিনই হায়দারের ঢাকা যাবার ব্যগ্রতা দেখে স্টেশন কমান্ডারও ছুটি দিতে চাইলেন না হায়দারকে। শেষমেশ পদত্যাগের হুমকি দিয়ে ছুটি আদায় করতে হলো কর্নেল হায়দারকে।

বাবার জন্যে উৎকণ্ঠিত ছেলে ওদিক থেকে তেসরা নভেম্বরের দুপুরেই বান্দরবান থেকে যাত্রা করলেন ঢাকার পানে। পায়ে বুট আর মাথায় হেলমেট তার, বাহন একটি মোটরসাইকেল। দেড়দিন বাইক চালিয়ে চার তারিখ রাতে মতিঝিলে বড় আপার বাসায় এসে পৌঁছলেন হায়দার এবং বাবাকে সুস্থ দেখে অবাক হয়ে জানতে চাইলেন টেলিগ্রাম করার কারণ।

বাবার মুখে জরুরি বার্তা পাঠাবার কারণ শুনে মেজাজ বিগড়ে গেল কর্নেল হায়দারের। বাবাকে উষ্ণ গলায় বললেন, 'জমির ব্যাপারে আপনি এই সময়ে টেলিগ্রাম করলেন কেন! আর করলেন যখন, জমির কথাটা কেন লিখলেন না টেলিগ্রামে? ...এদিকে খালেদ মোশাররফ স্যার ক্যু করছেন, অবস্থা খুব খারাপ। এতো কিছুর মাঝে শুধু জমির জন্যে এইভাবে আমি ঝামেলা করে আসলাম!'

আরো কিছুক্ষণ কথা বলেও বাবা সে রাতে শান্ত করতে পারেন না ছেলেকে। পরদিন সকালে অবশ্য কর্নেল হায়দার বাবাকে নিয়ে ঠিকই নারায়ণগঞ্জে যান, বিকালে ফিরেও আসেন। কিন্তু মুখটা ভার করেই রাখেন হায়দার। সে জন্যেই বাবা আজ সকালে চিংড়ি নিয়ে এসেছেন, তাতে যদি রাগ পড়ে ছেলের!

...বড় আপা চিংড়ি রান্না করে অফিসে চলে যাওয়ার খানিক পরে হায়দারের মনে হলো, একটু বাইরে ঘুরে আসা দরকার। ঢাকা এসেছেন দুই দিন হয়ে গেল, এর মাঝে একবারও ক্যান্টনমেন্টে গিয়ে কারো সাথে দেখা করা হলো না। হায়দার চট করে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন, দুপুরের দিকে একবার বেরোবেন তিনি।

দুলাভাই আর বড় আপা, দুজনেই অফিসে। অতএব ক্লাস ফোর পড়ুয়া ভাগ্নি মিলার সাথেই ডাইনিং টেবিলে বসে চিংড়ি দিয়ে লাঞ্চ সারতে হয় লেফটেন্যান্ট কর্নেলকে। এই পিচ্চিটা মামার খুব ন্যাওটা। মামা মাঝে মাঝেই নিজের পিস্তল খালি করে ট্রিগার চাপতে শেখান ভাগ্নিকে, পড়তে দেন শখের দামি রে ব্যান রোদচশমাও।

খাবার টেবিলে বসেও মামা ভাগ্নিকে প্রচুর উপদেশ দেন। 'বেশি করে মাছ খাবি, বুঝলি।... আরে মাছ আর সবজিই হইলো আসল, ঐ সব মাংসে টাংসে কোনো লাভ নাই!'

মধ্যাহ্নভোজন শেষ করার কিছুক্ষণের মাঝেই মোটরসাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়েন কর্নেল হায়দার। ফিরে আসেন বিকালে, আর ফিরেই চায়ের টেবিলে বসে যান বোন আর ভগ্নীপতির সাথে। আরো কিছু সময় পর, সন্ধ্যায় আখতার বেগমের বাসায় ভিড় করে হায়দারের ভক্ত বেশ কিছু মুক্তিযোদ্ধা। জয়নুল আবেদীন, সাত্তার, শাহনেওয়াজ। তারেকুল আলমও আছে এই দলে। হায়দার ভাই ঢাকা এসেছেন, এই খবর পেয়ে রাজধানীর নানা প্রান্ত থেকে এই মুক্তিযোদ্ধারা ছুটে এসেছেন তার কাছে।

জমে ওঠে সান্ধ্য আড্ডা।

কর্নেল হায়দার বলেন, 'দুপুরে ক্যান্টনমেন্টে গেছিলাম বুঝলা। আমার ফ্রেন্ড আমিন আহম্মেদ চোধুরীর বাসা শহীদ বেলায়েত রোডে, ঐ খালেদ মোশাররফের বাসার একটু সামনে আরকি। ওসমানী স্যারের লগেও দেখা কইরা আসলাম খানিক। অবস্থা তো সব মিলায়ে খুব গরম দেখি!'

'ঠিকই বলছেন হায়দার ভাই।' তারেক মৃদুস্বরে বলে। 'পেপারে ছবি আসছে, মেজর জেনারেল হবার পরে খালেদ স্যার খুব হাসতেছেন। কিন্তু এদিকে রেডিও-টিভিতে এখনো পর্যন্ত তিনি কোনো ভাষণ দেন নাই। লোকজনে আস্তে আস্তে মনে করতেছে, মোশতাক মুসলিম দেশগুলার সাথে সম্পর্ক ভালো করার যে নীতি নিছিলেন, তার এগেইন্সটে ভারতের সাথে আঁতাত করে খালেদ মোশাররফ ক্যু করছেন!'

'এইটা একটা পয়েন্ট।' সাত্তার মাথা দোলায়। 'আরেকটা বিষয় হইলো, গত পরশুর মিছিল!'

'কিসের মিছিল?' ভুরু কোঁচকান কর্নেল হায়দার।

'এই ছবিটাও পেপারে আসছে।' খোলাসা করে বলার দায়িত্ব নেয় তারেক, 'শহরে সেদিন মিছিল বাইর হইছিল অনেকদিন পর, স্লোগান ছিল বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার চাই। আওয়ামী লীগের লোক যেমন ছিল, সিপিবি-ছাত্র ইউনিয়নের লোকও তেমন ছিল মিছিলে। কিন্তু মিছিলের সামনে ছিলেন আওয়ামী লীগের রাশেদ মোশাররফ, খালেদ স্যারের ভাই। আবার উনাদের মা'ও ছিলেন মিছিলে। পেপারে খুব প্রচার করে এই ছবিটাই দেয়া হইছে।

...কাজেই পাবলিকও তাদের মতো করে দুয়ে দুয়ে চার বানায়ে নিতেছে। আওয়ামী লীগের মিছিলে নতুন সেনাপ্রধান খালেদের মা আর ভাই, কাজেই খালেদ তো নিশ্চয়ই আওয়ামী লীগের লোক– এমনভাবেই ব্যাপারটাকে দেখতেছে বেশির ভাগ লোক।'

'চিন্তার ব্যাপার তো তাইলে!' এই বলে ঠোঁট কামড়ে ভাবনায় ডুবে যান হায়দার। খালেদ স্যারকে তিনি যা চেনেন, ক্যান্টনমেন্টে গিয়ে আজ যা শুনেছেন– তাতে করে খালেদের সাথে ভারত সম্পৃক্ততার অনুমানের কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই, এটা নিশ্চিত বুঝেছেন তিনি। কিন্তু সাধারণ মানুষের তো আর গণমাধ্যম ছাড়া খালেদের অভ্যুত্থানের প্রকৃত উদ্দেশ্য জানার সুযোগ নেই। এখনো পর্যন্ত সেখানে নিজেকে উপস্থাপন না করে খালেদ সুযোগ করে দিয়েছেন গুজবের ডালপালা ছড়ানোর। আর দেশের এই অদ্ভুত অবস্থায়, শুধু মাত্র গুজবই সম্ভব করে দিতে পারে অনেক দুর্গম লক্ষ্য।

আলাপে আলাপে রাত সাড়ে আটটার দিকে বসবার ঘর খালি হয়ে গেল। শুধু মাত্র তারেকুল আলম ছাড়া চলে গেল অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধা। কর্নেল হায়দার খানিক ইতস্তত করে বলেন, 'তারেক, সবার সামনে বলি নাই তোমারে। ক্যান্টনমেন্টের ভিতরের অবস্থা জানো কিছু?'

তারেক অবাক হয়ে বলে, 'না তো হায়দার ভাই! কেন, কিছু হইছে সেখানে?'

'বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার নাম শুনছো?' চাপা গলায় প্রশ্ন করেন হায়দার।

চমকে ওঠে তারেকুল আলম। কিন্তু সেটা বাইরে প্রকাশ না করে হায়দার ভাইয়ের মুখেই পুরোটা আগে শুনে নিতে চায় সে। বলে, 'কেন, কী করছে এরা?'

'সেনাবাহিনীর মধ্যে বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা নামে জাসদের একটা অর্গানাইজেশন আছে।' হায়দার গম্ভীর হয়ে বলেন। 'আজ দুপুরে ক্যান্টনমেন্টে গিয়া দেখলাম, তারা সমানে লিফলেট ছড়াইছে সবখানে। খাবার মেস, মসজিদ কোনো জায়গা বাদ রাখে নাই। লিফলেটগুলাতে অফিসারদের বিরুদ্ধে সিপাইদের একরকম খেপায়ে দেয়া হইতেছে। সিপাইদের বলা হইতেছে আরো একটা অভ্যুত্থান করার জন্যে। অফিসার আর সিপাইদের মাঝে নাকি সব পার্থক্য ঘুচায়ে দেয়া হবে এই অভ্যুত্থানে।

...আর এই রকম লিফলেট দেখে সিপাইদেরও মাথা গরম হয়ে আছে। তারাও একেবারে ফুটতেছে কিছু একটা করার জন্যে। সব মিলায়ে পরিস্থিতি একদম ঘোলা হয়ে আছে বুঝলা!'

তারেক প্রশ্ন করে, 'খালেদ মোশাররফ এই বিষয়ে কিছু জানেন না? উনি কি করতেছেন?'

'উনি সম্ভবত নিজের ঘর গুছাইতেছেন আগে।' হায়দার বলেন। 'কর্নেল হুদা অলরেডি চলে আসছেন রংপুর থেকে। আর যুদ্ধের সময় যে দশম বেঙ্গল স্যারের আন্ডারে ছিল, তারাও আইসা পড়ছে বগুড়া থেকে। ওরা আপাতত আছে শেরে বাংলা নগরে।

কিন্তু খালেদ স্যারের বিপক্ষেও আসলে বেশ কিছু সৈন্য আছে। ফারুক রশিদরা পালাইছে, কিন্তু বেঙ্গল ল্যান্সার আর আর্টিলারির যে সৈন্যদের নিয়া তারা ক্যু করছিল, সেই সিপাইরা তো আছে। স্বাভাবিকভাবেই তারা খালেদ স্যারের বিপক্ষে। কেউ কেউ আবার জেনারেল জিয়ারে বন্দী করাটা ভালো চোখে দেখতেছে না, এই নিয়াও তারা স্যারের উপরে খ্যাপা। আর জাসদের সদস্যরা তো আছেই। এই অবস্থায় ক্যান্টনমেন্টে কিছু একটা ঘইটা গেলে আসলে খালেদ স্যারের পক্ষে সামাল দেয়া মুশকিল।'

দীর্ঘ বক্তব্যের পরে একটু জিরিয়ে নেন কর্নেল হায়দার। তারপর হঠাৎ করে বলেন, 'তারেক, আমি এখন ক্যান্টনমেন্ট যামু। আমিন আহম্মেদ চৌধুরীর বাসায় রাইতে দাওয়াত আছে আমার, তুমি যাইবা নাকি লগে? ...চলো দেখি, সময় সুযোগ পাইলে একবার খালেদ স্যারের লগেও দেখা কইরা আসমু চলো।'

হঠাৎ পাওয়া দাওয়াত গ্রহণে ইতস্তত করতে থাকে তারেক। সেটি লক্ষ করে হায়দার বলেন, 'আরে চলো, চলো! মোটর বাইক আছে তো, এক টানে চইলা যামু। দেরি হইলে তুমি না হয় চইলা আইসো আগে আগে।'

আরো খানিক জোরাজুরির পর রাজি হয়ে যায় তারেক। হায়দারও তৈরি হয়ে নেন দ্রুত। বাবাকে বলেন, 'আব্বা, টেনশন কইরেন না। দেরি না করে চলে আসবো।' বোনকে বলেন, 'আপা আসি।'

এরপরে নিচে নেমে এসে তারেককে পিছনে বসিয়ে মোটর সাইকেল স্টার্ট দেন কর্নেল হায়দার। বারান্দা থেকে যতক্ষণ দেখা যায়, পিচ্চি মিলা তাকিয়ে দেখে মামার বাইকের পেছনের লাল আলোটা। তারপর কর্নেল হায়দার হয়ে যান আত্মীয়দের চোখের আড়াল।

হায়দার ভাইয়ের বাইকের পেছনে বসে বিপরীত দিক থেকে ধেয়ে আসা বাতাসে শীত শীত বোধ করা তারেকুল আলম জানে না, উত্তুরে হাওয়া সঙ্গে নিয়ে আসছে ইতিহাসের আরো একটি মোচড়।

সেনাবাহিনীতে শৃঙ্খলা নিয়ে আসার লক্ষ্য নিয়ে শেখ মুজিবের খুনিদের বিপক্ষে যে অভ্যুত্থান শুরু করেছিলেন খালেদ, গুজবের ঢেউ আলগা করে দিয়েছে সেই অভ্যুত্থানের পায়ের নিচের মাটি। একটি অবৈধ সরকারের কাছ থেকেও যথাসম্ভব বৈধভাবে ক্ষমতা গ্রহণ করতে চেয়েছেন নমনীয় খালেদ, কিন্তু জনমানুষের সামনে নিজের লক্ষ্য স্পষ্ট করতে ব্যর্থ হয়েছেন তিনি। সময়ের জলাশয়ে সৃষ্ট একটি ঝড়ো তরঙ্গ তাই খানিক পরেই তীব্রভাবে আঘাত করতে যাচ্ছে খালেদকে।

সেই তরঙ্গের নাম বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা।

বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা অভীষ্ট জাসদের, এর জন্যে তারা প্রস্তুত হচ্ছিলো দীর্ঘদিন ধরেই। কিন্তু শেখ মুজিবের নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড আর তার রেশ কাটতে না কাটতেই খালেদ মোশাররফের অভ্যুত্থান -এই দুইয়ে মিলে তোলপাড় করে দিয়েছে জাসদের নিজস্ব প্রস্তুতি। ইতিহাসের জট পাকানো সব সুতো যখন আজকাল ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে ক্যান্টনমেন্টের রাস্তায় আর বঙ্গভবনের বাগানে, জাসদের অঙ্গসংগঠন বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার কমান্ডার ইন চিফ অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল আবু তাহেরের মনে হয়েছে, বিচ্ছিন্ন সব সুতো জোড়া দিয়ে ইতিহাসকে লাগাম পরানোর এক মোক্ষম সময় এটি।

বেশ কৌতূহল জাগানো উদ্দেশ্য নিয়ে বিপ্লবের স্ফুলিঙ্গ জ্বালিয়েছেন ক্রাচে ভর দিয়ে হাঁটা তাহের। অফিসার আর সিপাইদের মাঝে ব্যবধান ঘুচিয়ে প্রথমে একটি শ্রেণিহীন সামরিক বাহিনী প্রতিষ্ঠাই লক্ষ্য তার, পরবর্তীতে সাধারণ মানুষকেও সম্পৃক্ত করা হবে এ জাগরণে। সেই লক্ষ্যেই এ গোলোকধাঁধা সময়ের ফাঁক গলে অনুগত বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার সদস্যদের দিয়ে সেনানিবাসের দখল নিয়ে নেবেন বলে স্থির করেছেন তাহের।

লেফটেন্যান্ট কর্নেল হায়দারের বাইকের পেছনে তারেক উঠে বসবার ঘণ্টা তিনেক পরেই হঠাৎ যেন জেগে ওঠে ক্যান্টনমেন্ট এলাকা। শত শত সিপাইয়ের

হাতের অস্ত্র থেকে হাজার হাজার বুলেট ছুটে যায় আকাশ পানে। 'সিপাই বিপ্লব! লাল সালাম, লাল সালাম!' এমন সব উদ্দীপ্ত স্লোগান যেমন শোনা যায়, 'সিপাই সিপাই ভাই ভাই, অফিসারের রক্ত চাই'– এমন সব অশুভ ইঙ্গিত বয়ে আনা স্লোগানও ছড়িয়ে যায় বাতাসে।

ইতিহাসের পাতায় শুরু হয় আরো একটি অভ্যুত্থানের অধ্যায়।

শীতের রাতের শহর ঢাকার প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে গেল সিপাই বিপ্লবের ধ্বনি। সাতমসজিদ রোডে রিমিদের বাড়িটাও জেনে গেল, কিছু একটা ঘটছে শহরে।

রিমিরা সব ভাইবোন আর আম্মা মিলে একসাথে ঘুমাতে গিয়েছিল মাঝের ঘরে। রাত একটার দিকে হঠাৎ দরজায় শোনা গেল জোরালো ধাক্কা। জোহরা তাজউদ্দীন নিচে নেমে দরজা খুলতেই রিমিদের ছোট কাকুর সাথে সাথে বাড়িতে ঢুকে পড়ল শেল আর কামান দাগার শব্দও! কী ভীষণ গোলাগুলি, যেন যুদ্ধ লেগে গেছে কোথাও।

জোহরা তাজউদ্দীন সময় নষ্ট না করে বলেন, 'তাড়াতাড়ি বাসা থেকে বের হও সবাই! কী হচ্ছে আল্লাহই জানে। একদম সময় নষ্ট করা যাবে না।'

দ্রুতই নিচে নামে ওরা সবাই। দরজা দিয়ে মাথা বাড়িয়ে দেখে, গভীর রাতে কুকুর ছাড়া কোনো প্রাণের অস্তিত্ব নেই ঢাকার রাস্তায়। ইতস্তত কয়েকটা বাড়িতে আলো জ্বলছে। কিন্তু ঐটুকুই, মানুষের কথা বলাও যেন বন্ধ হয়ে আছে এ গভীর রাতে। অথচ দূর থেকে থেকে থেকে ভেসে আসছে কামানের আওয়াজ, আকাশ বিদীর্ণ করে কানে আসছে গুলির শব্দ।

জনশূন্য রাস্তায় খালি পায়ে রিমিরা সবাই ছুটতে থাকে মফিজ কাকুর বাড়ির দিকে।

অপেক্ষা

নির্মলেন্দু গুণ অস্ফুট স্বরে বললেন, 'হাসান আমারে বলছিল, ভোরের সময়টা ওর খুব ভালো লাগে। বিশেষ কইরে শীতের দিনে।...হাসান বলতো, ছোটবেলায় গ্রামের বাড়িতে ও শিউলি কুড়াইতো শীতের দিন সকালে। মরণের টাইম যদি বাইছা নেয়া যায়, তাহলে হাসান নাকি এই শীতের ভোরই ঠিক করত নিজের জন্যে।'

কবি আবুল হাসানকে সদ্য যে কবরে শুইয়ে দিয়েছে ওরা, সেদিকে তাকিয়ে গুণদার কথা শুনে আলাউদ্দীন একটু শিহরিত হয়ে উঠল। কী আশ্চর্য, নভেম্বরের ছাব্বিশ তারিখ আজ, শীত তার তীব্রতা নিয়ে ইতোমধ্যেই বেশ জাঁকিয়ে বসেছে ঢাকায়। আর আজ ভোরেই পিজি হাসপাতালে অন্তিম নিশ্বাস ফেলেছেন আবুল

হাসান। ভালো লাগার শিউলি ঝরা ক্ষণে মৃত্যু, প্রস্থানের মুহূর্তে এমন ভাগ্যই বা কজনের হয়!... আচ্ছা, তারেক কি এমন কিছু পেয়েছিল নিজের শেষ সময়ে?

গুণদা পাশ থেকে কেমন ভেঙে যাওয়া স্বরে কিছু একটা বলেই কাঁদতে শুরু করলেন হঠাৎ। আলাউদ্দীন নিজেরও চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসে সে মুহূর্তে। বনানী কবরস্থানে কবি আবুল হাসানের কবরের পাশেই কর্নেল নাজমুল হুদার কবর, সেদিকে তাকিয়ে তারেকের কথা আরেকবার মনে পড়ে যায় আলাউদ্দীনের। সে এবার কেঁদে ফেলে সশব্দে।

আলাউদ্দীন জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে আজ সকালে। তার চাচার দূরসম্পর্কিত আত্মীয়দের মাঝে নাকি কোন এক কর্নেল আছেন, উপরমহলে সেই কর্নেলের তদবিরের জোরেই ছাড়া পেয়েছে সে। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে আলাউদ্দীন প্রথমেই বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় চলে গেছে তারেকের খোঁজে। আর সবকিছু জানতে পেরে সে ভেঙে পড়েছে হতাশায়।

কর্নেল হায়দারের সাথে ছয় তারিখের রাতে ক্যান্টনমেন্টে গিয়েছিল তারেক। বন্ধুদের সাথে এরপর তার আর দেখা হয়নি। যতটুকু জানা গেছে, কর্নেল হায়দার তার বন্ধু আমীন আহম্মেদ চৌধুরীর বাসায় ডিনার করেছিলেন। এরপর সে বাসার সামনেই খালেদ মোশাররফের বাসায় গিয়েছিলেন হেঁটে হেঁটে, সেখান থেকে পরে তারা বঙ্গভবনে গিয়েছিলেন। তারেক তাদের সাথেই ছিল এসময়, এরপরে তার কোনো খোঁজ আর পাওয়া যায়নি। কিন্তু রক্তাক্ত পরিণতি বরণ করতে হয়েছে মেজর জেনারেল খালেদ মোশাররফ আর লেফটেন্যান্ট কর্নেল হায়দারকে। কর্নেল হুদাকেও বরণ করতে হয়েছে একই ভাগ্য। সে কাহিনি বড় মর্মান্তিক।

সে রাতে বঙ্গভবনের সভায় শাফায়াত জামিল, নাজমুল হুদা আর হায়দারকে নিয়ে যখন খালেদ মোশাররফ ব্যস্ত ছিলেন প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক কে হবেন সে সংক্রান্ত আলোচনায়; সে সময়েই ক্যান্টনমেন্ট থেকে ফোনে খবর এলো, সিপাই বিদ্রোহ শুরু হয়ে গেছে। এ খবর পেয়ে খালেদ বেরিয়ে আসেন হুদা আর হায়দারকে সাথে করে, আর বঙ্গভবনেই থেকে যান শাফায়াত জামিল। বেরিয়ে এসে ব্রিগেডিয়ার নুরুজ্জামানের বাসায় গিয়ে প্রথমে সামরিক বেশ বদলে নেন খালেদ, তারপর এক আত্মীয়ের বাড়ি হয়ে চলে আসেন শেরে বাংলা নগরে। বগুড়া থেকে বিশ্বস্ত যে দশম বেঙ্গলকে ডেকে এনেছিলেন তিনি, খালেদ আশ্রয় নেন সেখানেই। স্থির করেন, পরিস্থিতি বিচার করে পরবর্তী করণীয় ঠিক করবেন সেখান হতেই।

কিন্তু সকাল হতেই সিপাই বিদ্রোহের ঢেউ গিয়ে লাগে দশম বেঙ্গলেও। অফিসারদের সাথে ব্যবধান ঘুচিয়ে ফেলতে উন্মুখ উত্তেজিত সিপাইদের নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় না আর। অফিসারদের মেসে বসে মাত্রই প্রাতরাশ শেষ করেছিলেন

খালেদ, গুলি আর বেয়োনেট চার্জে হত্যা করা হলো তাকে। হত্যা করা হলো হুদা আর হায়দারকেও।

'স্বাধীন দেশ জীবিত গেরিলা চায় না!' বলে হুঙ্কার দিয়ে যুদ্ধদিনে ক্র্যাক প্লাটুনের ছেলেদের ক্রমাগত উদ্দীপ্ত করে যাওয়া মানুষটি, রক্তপাতহীন এক অভ্যুত্থানে যিনি সেনাবাহিনীতে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন শৃঙ্খলা, আরেকটি প্রতি অভ্যুত্থানে সেই খালেদ মোশাররফই লুটিয়ে পড়েন মাটিতে। এমন মৃত্যু প্রাপ্ত ছিল না তার। আর একাত্তরের দিনগুলোতে রুমী, জুয়েল আর হাবিবুল আলমদের নিয়ে অবিরত পাকিস্তানের প্রশিক্ষিত সেনা সদস্যদের আতঙ্কিত করে তোলা মানুষটি, প্রাথমিক কুয়াশাচ্ছন্ন এক দিন শেষে নত মুখের নিয়াজীর পাশে মাথা উঁচু করে হেঁটে বাংলাদেশকে গর্ব করার সুযোগ দিয়েছিলেন যে হায়দার, তিনি হয়ে গেলেন স্বাধীন দেশের আরেক রক্তস্নাত শহীদ।

বিশ্ববিদ্যালয় এসেই এসব খবর জানতে পেরেছে আলাউদ্দীন, তারপর ভার্সিটি মসজিদের সামনে দুপুরে কবি আবুল হাসানের জানাজা হতে দেখে তাতে অংশ নিয়ে সে চলে এসেছে বনানী গোরস্থানে। এখানে এসে তারা সবাই মিলে ঠিক করেছে, সাতই নভেম্বরে প্রাণ হারানো কর্নেল নাজমুল হুদার কবরের পাশের ফাঁকা জায়গাটিতেই দাফন করা হবে হাসান ভাইকে। সেভাবেই হয়েছে সব ব্যবস্থা। অভিমানী এক কবির চির ঠাঁই হয়েছে বীর মুক্তিযোদ্ধা এক কর্নেলের পাশে।

...কাঁদতে কাঁদতে কবি নির্মলেন্দু গুণসহ সবাই একসময় বেরিয়ে যান কবরস্থান থেকে। কিন্তু আলাউদ্দীন স্থির করে, সে আরো কিছু সময় একাকী থাকবে এখানে।

পাশেই আর্মি গ্রেভইয়ার্ডে খালেদ মোশাররফ শায়িত আছেন, হায়দারের দাফন হয়েছে কিশোরগঞ্জে। কর্নেল হুদার কবর আলাউদ্দীনকে বারংবার মনে করিয়ে দেয় কাগজে কলমে নিখোঁজ তারেকের কথা। কোথায় তারেক? সে কী বঙ্গভবনেই ছিল শেষ পর্যন্ত, নাকি বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার লোকেরা যখন বঙ্গভবন ঘিরে ফেলায় পালিয়ে যান শাফায়াত জামিল, সে সময় সরে পড়েছিল সেও? শাফায়াত জামিল প্রাণে বেঁচেছেন তারপর, কিন্তু তারেক কি পেরেছে বাঁচতে? পেরে থাকলে আজ এতদিন পরেও ফিরে আসেনি কেন সে? প্রতিটি প্রশ্নবোধক চিহ্ন আলাউদ্দীনকে তাড়িত করে তারেকের একটি করুণ পরিণতি অনুধাবনে। শোকাহত আলাউদ্দীনের মস্তিষ্কের যুক্তি মেনে চলা অংশটি সেই পরিণতি বারে বারে অগ্রাহ্য করতে চায় অবশ্য।

আলাউদ্দীন বরং নিজেকে ব্যস্ত রাখে টালমাটাল বাংলাদেশ নিয়ে ভাবনায়।

সেনা বিপ্লব দিয়ে একটি বৈষম্যহীন সামরিক বাহিনী হবে প্রথমে, সেটি আশ্রয় করেই সামনে সুখসমৃদ্ধ একটি বাংলাদেশ গড়বেন, এমন একটি স্বপ্ন

হয়তো দেখেছিলেন সাতই নভেম্বরের অভ্যুত্থানের মূল প্রণেতা জাসদের কর্নেল তাহের। কিন্তু তাড়াহুড়ো করে অপরিণত এক অভ্যুত্থানই করে ফেলেছেন তিনি, আর তা থেকে সৃষ্ট শ্যাওলামাখা মার্বেলের মতো অস্বচ্ছ পরিস্থিতির আড়ালে প্রাণ হারিয়েছেন খালেদ আর হায়দাররা। নিখোঁজ হয়েছে তারেকুল আলম। এসব মুক্তিযোদ্ধাদের অকারণ করুণ পরিণতি এগিয়ে এসেছে তাহেরের অপরিণত অভ্যুত্থানের পথ বেয়েই।

এ ছাড়াও হিসাবে আরো একটি গড়মিল করে ফেলেছেন সেনাবাহিনী থেকে পূর্বেই অবসরে যাওয়া তাহের, আলাউদ্দীন ভাবে। সে শুনেছে, সিপাই বিপ্লবের প্রাথমিক পর্যায়েই বন্দী থাকা প্রাক্তন সেনাপ্রধান জিয়াকে উদ্ধার করেছে তাহেরের বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার লোকেরা। জিয়া নাকি সাহায্যের আবেদন করেছিলেন তাহেরের কাছে। সাধারণ মানুষ আর সৈনিকদের মাঝে বেশ পরিচিতি আছে জিয়ার, সেটা কাজে লাগিয়ে জিয়াকে সামনে রেখে কিছুটা কালক্ষেপণ করে শক্তি সঞ্চয় করতে চেয়েছিল জাসদ। তাদের নাকি প্ল্যান ছিল মাঝের সময়টাতে কারাগারে আটক জাসদ নেতাদের মুক্ত করা হবে, তারা নিজ নিজ এলাকায় গিয়ে এগিয়ে নেবেন প্রস্তুতি, পরে সুবিধা মতো সময়ে সরিয়ে দেয়া হবে জিয়াকে।

কিন্তু মুক্তি পেয়ে তাহেরের সাজানো ছকে বাঘবন্দি খেলতে নারাজ হয়ে পড়েন জিয়া। ক্যান্টনমেন্টের বাইরে থাকা তাহেরের সাথে ক্রমশ দূরত্ব বাড়তে থাকে বিপ্লব করে ফেলা সৈনিকদের, আর সেনানিবাসের ভেতরে নিজের বিশ্বস্ত অফিসারদের সাথে করে জিয়া ঘটনার নাটাই নিজের দিকে টেনে নেন সময়ের সাথে সাথে। পেন্ডুলামের মতো দুলতে থাকা সিপাইদের কাছে ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে ওঠে জিয়ার ভিত্তিটাই। অপরিণত বিপ্লবের রোমাঞ্চও যেন দ্রুত ফুরোতে থাকে সৈনিকদের কাছে, অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল তাহেরের ক্রাচের চাইতে সেনাপ্রধান জিয়াউর রহমানের সানগ্লাস হয়ে ওঠে তাদের কাছে অধিকতর গ্রহণযোগ্য প্রতীক। তাহের নিজেও একসময় গ্রেপ্তার হয়ে যান পুলিশের হাতে।

শেষ বিকেলে আবুল হাসানের শবযাত্রায় সঙ্গী হওয়ার পূর্বে আরো একটি খবর কানে এসেছে আলাউদ্দীনের। জাসদের একটি আত্মঘাতী স্কোয়াড নাকি আজ সকালে অপহরণের চেষ্টা করেছে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত সমর সেনকে। রাষ্ট্রদ্রোহী আসামি বানিয়ে কর্নেল তাহের, মেজর জলিল ও অন্যান্য জাসদ সদস্যদের আটক করে যে মৃত্যুদণ্ডযোগ্য মামলাটি করা হয়েছে– সন্দেহ নেই তাদের মুক্ত করার জন্যেই এই পন্থা নিয়েছিল সুইসাইড স্কোয়াডের সদস্যরা। কিন্তু সমর সেনের দেহরক্ষী আর পুলিশের সাথে গুলি বিনিময়ে ঘটনাস্থলেই নাকি নিহত হয়েছে আত্মঘাতী স্কোয়াডের চার সাহসী তরুণ, আহত অবস্থায় গ্রেপ্তার হয়েছে আরো দুজন।

এই ব্যর্থ অপহরণ চেষ্টার পরে পরিস্থিতি আরো ঘোলাটে হয়ে উঠেছে যেন, সব কিছু মিলিয়ে আলাউদ্দীন বা তার মতো নিরাপদ দূরত্ব থেকে ঘটনা প্রত্যক্ষ করে যাওয়া দর্শকেরা তাই বুঝে উঠতে পারছে না চতুর্দিকের আবহ।

কোথায় যাচ্ছে বাংলাদেশ?

শেখ মুজিবের হত্যাকাণ্ড দিয়ে যে রক্তের নদীতে নেমে পড়েছে বাংলাদেশের .নৌকা, আলাউদ্দীন না জানলেও সময় জানে, সহসাই স্বচ্ছ জলের স্রোতে ফিরে আসার কোনো সম্ভাবনা নেই তার। 'রাষ্ট্র বনাম মেজর জলিল গং' নামের এক মামলার বিচারে সাতই নভেম্বরের অভ্যুত্থানের সাথে জড়িত সকলে মুক্তি পেয়ে গেলেও নিস্তার পাবেন না কর্নেল তাহের। মুক্তিযুদ্ধে এক পা হারানো মানুষটি প্রাণ দেবেন ফাঁসিকাঠে ঝুলে। আর সময়ের নাগরদোলায় দুলে ক্ষমতার কেন্দ্রে চলে আসা জেনারেল জিয়ার মৃতদেহও একসময় অগণিত গুলিবিদ্ধ হয়ে লুটিয়ে পড়বে চট্টগ্রামের এক সার্কিট হাউজে। ইতিহাসের এই আশ্চর্য পরিক্রমা, হয়তো আগ্রহী পর্যটকেরা জানবেন অন্য কোথাও।

এখন আলাউদ্দীন, বন্ধু বিয়োগে নিঃসঙ্গ আলাউদ্দীন, ইতিহাসের পালা বদল দেখতে দেখতে ক্লান্ত হয়ে পড়েও তার অংশ না হয়ে ওঠা আলাউদ্দীন, সে হঠাৎ সচকিত হয়ে ওঠে একটি ডায়েরির কথা মনে পড়ায়। লাল মলাটে কালো বর্ডার দেয়া সে ডায়েরি কখনো ছুঁয়ে দেখা হয়নি আলাউদ্দীনের, তবে একজনকে লুকিয়ে লুকিয়ে এই ডায়েরি পড়তে দেখেছে সে।

এই ডায়েরি তাজউদ্দীনের।

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস তুলে রাখার সাথে সাথে সে ডায়েরিতে তাজউদ্দীন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যে দিক দেখিয়েও গেছেন। আগেই এই ডায়েরির কথা অবহিত ছিল আলাউদ্দীন। কারণ জেলে বন্দি থাকাকালে তাজউদ্দীন সাহেব তাকে প্রায়ই বলতেন, ভালোমন্দ কিছু হয়ে গেলে এই ডায়েরিই সামনের দিনে কথা বলবে তার হয়ে। কিন্তু তাজউদ্দীনের নির্মম মৃত্যুর পরে হাতবদল হয়ে গেছে সেই মহামূল্য দিনলিপিটি। জেলখানার এক নম্বর কক্ষে তাজউদ্দীন সাহেবদের রুমমেট আওয়ামী লীগ নেতা কোরবান আলী, তিনিই এখন নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন তাজউদ্দীনের ডায়েরি আর তার গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়া কুরআন শরিফটি।

সকলের অগোচরে কোরবান আলী প্রায়ই পড়তেন ডায়েরিটি, কিন্তু একদিন আলাউদ্দীনের কাছে ধরা পড়ে যান তিনি। আলাউদ্দীন তখনই স্থির করেছিল, ইতিহাস লেখার এই অনন্যসাধারণ উপাদানটি ফিরিয়ে দিয়ে আসতে হবে জোহরা তাজউদ্দীনকে। ঠিক করেছিল, জেল থেকে বেরোবার আগে কোরবান আলী সাহেবের কাছ থেকে সে নিয়ে নেবে ডায়েরিটি। কিন্তু জেল থেকে ছাড়া পাবার তাৎক্ষণিক আনন্দে আজ সকালে তাজউদ্দীনের ডায়েরির কথা মনে ছিল না তার।

কবি আবুল হাসানের কবরের পাশেই নাজমুল হুদার কবর, সেই কাতারেই সার বেঁধে শুয়ে আছেন তেসরা নভেম্বরে প্রাণ হারানো তিন নেতা। নজরুল ইসলাম, মনসুর আলী, তাজউদ্দীন।

আলাউদ্দীন নিঃসাড়ে এসে দাঁড়ায় তাজউদ্দীনের কবরের সামনে। চারদিকে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে ইতোমধ্যে, তার মাঝে একবার হাত ছুঁয়ে সে স্পর্শ করে আসে এই আলোকিত মানুষটির সমাধিকে। তাজউদ্দীনের ডায়েরি সে ফিরিয়ে দেবে তার পরিবারকে, এই প্রতিজ্ঞা করে শীতের সন্ধ্যায় ধীরে ধীরে বনানী কবরস্থান থেকে বেরিয়ে আসে এই যুবক।

আকাশের ঝাপসা আলো আর কনকনে শীত অপেক্ষা করে। প্রহর গোনে, কখন এই যুবক সমর্থ হবে তার প্রতিজ্ঞা রক্ষায়। শক্ত দুই লাল মলাটের ভেতরে ঝকঝকে হাতের লেখায় একজন অনন্য মানুষ ছবি এঁকেছেন একটি ধূসর সময়ের, সেই ছবিটি দেখার জন্যে অপেক্ষা করে তারা।

কনকনে শীতের পরে তপ্ত সন্ধ্যা আসে, ঝাপসা আলোর দায়িত্ব নেয় দিবালোক। তারাও ক্লান্ত হয়ে পড়লে পুনরায় ফিরে আসে অস্পষ্ট আকাশ আর তীব্র শীত। পালাবদল চলতে থাকে প্রকৃতির। কিন্তু তাদের অপেক্ষা আর ফুরোয় না।

বাতাসের বেগ আর আকাশের মেঘের জানা হয় না, কী করে যুদ্ধদিনে বহুমাত্রিক সব বিরুদ্ধ স্রোত ঠেলে একজন মানুষ লড়ে গেছেন স্বাধীনতার পথে। অযতনে গজানো ঘাসফুল আর খেয়ালি গানের পাখিদের জানা হয় না, কী করে সেই মানুষটিকে ক্রমশ করে তোলা হলো কোণঠাসা আর নিঃসঙ্গ। জানা হয় না বাংলাদেশের, কেন তাকে নিয়ে সে মানুষটির স্বপ্ন দেখার দিন ফুরোল এত অনাবশ্যক দ্রুততায়। অগণিত এসব প্রশ্নবোধক চিহ্ন বুকে নিয়ে অপেক্ষা করে যায় এই রক্তমাখা জনপদ।

অপেক্ষা করে যায় ইতিহাস।

পরিশিষ্ট

অন্ধকার ঘরের কোনায় দাঁড়িয়ে থাকা প্রজেক্টরের পর্দায় যখন তথ্যচিত্রটির কলাকুশলীদের নাম ভেসে আসছে, কে যেন উঠে গিয়ে জ্বালিয়ে দেয় আলোটা। দীর্ঘক্ষণ পরে উজ্জ্বল বিজলি আলো চোখে সইয়ে নিতে খানিক সময় লাগে দর্শকদের, তবুও তাদের মুখে মুগ্ধতার রেশ দৃশ্যমান না হয়ে পারে না। রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে সত্যজিৎ রায় নির্মিত চুয়ান্ন মিনিটের এ পুরনো তথ্যচিত্রটি বেশ ছাপ ফেলেছে তার দর্শকদের মনে, সুহান রিজওয়ানের মনে হয়।

ঘরের এখানে সেখানে ছড়িয়ে বসা দর্শকেরা, যারা এতক্ষণ পিঠ ফিরিয়ে রেখেছিল প্রবেশপথের দিকে, তারা এবার নড়েচড়ে বসে খানিক। কিছু গুঞ্জন, কিছু মৃদু আলোচনার পরে তারা একে একে উঠে দাঁড়ায়। এগোয় দরজার খানিক পাশে টেবিলে বসে থাকা সিমিন হোসেন রিমির দিকে।

দর্শকদের প্রায় সকলেই বয়েসে তরুণ, অধিকাংশেরই হাতে ধরা একটি বা দুটি বই। সিমিন হোসেন রিমিকে ঘিরে ধরে তারা হাসিমুখে কথা বলে নানা বিষয়ে, প্রশ্নও করে কিছু।

সুহান রিজওয়ান এই অবসরে চারপাশে চোখ বুলায় আবার। দরজা দিয়ে ঢুকতেই ঘরের ডানপাশে দেয়াল জুড়ে বুকশেলফ, তার ভেতরে বাইরে নানা রকমের বই সাজিয়ে রাখা। দরজার ঠিক উল্টোদিকে, পূর্বপাশে দাঁড় করিয়ে রাখা প্রজেক্টরের পর্দাটি। সেটির আশপাশের মাটিতেও ছড়িয়ে আছে বইগুচ্ছ, কিছু খোলা, কিছু দড়ি দিয়ে বাঁধা প্যাকেটসহ।

পূর্ব আর উত্তরদিকটা অনেকটা খোলামেলা এ ঘরের। সন্ধ্যা হয়েছে মাত্র, গোধূলির আলো পুরো মিলিয়ে যায়নি এখনো। ঘরের দেয়ালের উপরের অর্ধেকটায় আছে স্বচ্ছ কাচ, সে পথে আগত আলোর সাথে ভেতরের বিজলি বাতি মিলে গিয়ে বড় অদ্ভুত লাগছে দেখতে। উত্তরে তাকালে আবাহনী মাঠেরও কিছুটা দৃশ্যমান হয়। সেখানে থেকে টুকটাক শব্দ ভেসে আসছে এখানেও।

সিমিন হোসেন রিমিকে ঘিরে থাকা জমায়েতটা একেবারে হালকা হয়ে গেলে রিজওয়ান এগিয়ে যায় সেদিকে। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসতেই টেবিলের অপর পাশ থেকে রিমি আপা তার মুখে চিরস্থায়ী হাসিটি সঙ্গী করে বলেন, 'এদের

নিয়েই আমি একরকম আছি। এখানেই প্রতি সপ্তাহে আমার পাঠচক্রের ক্লাস বসে। আমরা নানা রকম বিষয়ে আলোচনা করি, একসাথে চমৎকার সব সিনেমা দেখি।

...তরুণ যারা, বাংলাদেশকে জানতে চায় যারা, ইতিহাস জানতে চায় যারা–সেরকম আগ্রহী ছেলেমেয়েদের নিয়ে আমি কাজ করতে চাই। ইতিহাস নিয়ে গবেষণা আর আব্বুর স্মৃতি সংরক্ষণের কাজও চালিয়ে যেতে চাই সাথে সাথে।'

নানা রকমের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয় সিমিন হোসেন রিমিকে। কিন্তু এই পাঠচক্রের কথা বলতে গিয়ে চশমার আড়ালে রিমি আপার চোখ দুটো যেন আরেকটু প্রখর হয়ে ওঠে। প্রত্যয়ী এই চোখজোড়া রিজওয়ানকে ভিডিও ফুটেজে দেখা একজন মানুষের কথা মনে করিয়ে দেয় আবার। এই ঘরের মাঝে ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন বই, নানা আকারের সাদাকালো ফটোগ্রাফের সব কিছুই আসলে থেকে থেকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে সেই মানুষটির কথা। তাজউদ্দীন আহমদ।

প্রসঙ্গ বদল করে একহাতে নোটবই আর অন্য হাতে কলম নিয়ে রিজওয়ান বলে, 'আপনার বাবার ডায়েরিটা শেষ পর্যন্ত তাহলে পাওয়া যায়নি আর?'

সিমিন রিমি মাথা নাড়েন। 'না, পাওয়া যায়নি। আব্বুর সাথে বন্দী ছিলেন এস এম মহসীন বুলবুল। উনি এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন যে আওয়ামী লীগের এক নেতা কোরবান আলী, যিনি পরে যোগ দেন প্রেসিডেন্ট এরশাদের দলে, তিনি নাকি আব্বুর মৃত্যুর পরে ঐ ডায়েরি আর আব্বুর কুরআন শরিফটা রেখে দিয়েছিলেন। বুলবুল সাহেব জেল থেকে ছাড়া পাবার পরে ঐতিহাসিক ডকুমেন্ট হিসেবে কোরবান আলীকে অনুরোধ করেছিলেন সে ডায়েরিটি ফেরত দিতে, তাতে লাভ হয়নি। আর কোরবান আলীর মৃত্যুর পরে ঐ ডায়েরির আর কোনো সন্ধানও পাওয়া যায়নি।'

মাথা নাড়তে নাড়তে নোটবুকের পাতায় দ্রুতগতিতে কলম চালায় রিজওয়ান। ...

মিনিট পনেরো পরে পিঠে ব্যাগ ঝোলানো রিজওয়ানকে দেখা যায় ধানমণ্ডির রাস্তায়। শুক্রবার আজ, হাতির ঝিলের ওদিকটায় আড্ডা শুরু হয়ে গেছে ইতোমধ্যে। বেশি দেরি করা যাবে না আর।

রিকশা আর পদযাত্রায় নিয়মিত আড্ডাস্থলে পৌঁছতে তবু প্রায় মিনিট চল্লি-শেক লেগে যায় রিজওয়ানের। শীত নেমেছে শহরে, সান্ধ্য আড্ডার দৈর্ঘ্য তাই বেড়ে গেছে আজকাল। আড্ডায় উপস্থিত হবার পরে হালকা উত্তুরে বাতাসে ক্লান্তি কেটে যেতে সময় লাগে না তার, বরং ঠান্ডা লাগা শুরু হয় একটু পর।

ফুটপাথের আড্ডা জমে যায় কিছুক্ষণের মাঝেই। ভ্রাম্যমাণ বিক্রেতাদের হাতে চা আসতে থাকে কাপের পর কাপ, হাতির ঝিলের রঙিন আলোর বিকিরণ একটু পর পর ভাসিয়ে দেয় চারপাশ, নিয়মিত বিরতিতে আশপাশ দিয়ে বেরিয়ে

যেতে থাকে দ্রুতগতির সব গাড়ি। ফেসবুক, বাংলাদেশের ওয়ানডে ম্যাচ, জেনিফার লরেন্স আর আসন্ন ফেব্রুয়ারির বইমেলা নিয়ে আলোচনা বারে বারে উচ্চকণ্ঠ হয়ে ওঠে সবার। এসবের মাঝে ধানমণ্ডিতে ফেলে আসা কিছু ছবি, কিছু জীর্ণ হয়ে আসা ইতিহাস বই আর একজন অদ্ভুত দৃঢ়চেতা মানুষের স্মৃতি কেমন যেন অবাস্তব লাগে রিজওয়ানের। পিঠে ঝোলানো ব্যাগের ভারী নোটবইটা তাই বারে বারে খোঁচা দিয়ে গেলেও সে তা উপেক্ষা করে যায়।

আড্ডা শেষে শাহবাগমুখী একটা বাসে উঠে বসার আগে ইতিহাস কোর্সের অ্যাসাইনমেন্টটার কথা মনে পড়ে না তার। ফ্লাইওভারের নির্মাণ কাজ চলছে সামনে, রাস্তার এখানে ওখানে গর্ত। খানিক পর পর থেমে যাওয়া বাস থেকে দুপাশে তাকানো ছাড়া কিছু করার নেই যাত্রীদের। সত্যি বলতে, সড়কের দুপাশের সাইনবোর্ডগুলোর নিচে লেখা রাস্তার নামটাই রিজওয়ানকে স্মরণ করিয়ে দেয় আজকের বিকাল আর সন্ধ্যার স্মৃতি। শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি। পুরো রাস্তাজুড়ে নামটি অসংখ্য বার ভুল বানানে লেখা।

রিজওয়ান ভাবতে থাকে।

দুর্বোধ্য মানুষ ছিলেন তাজউদ্দীন। ইতিহাসের বরপুত্র শেখ মুজিবের অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বের আড়ালে ঢাকা পড়ে গিয়েছিলেন বলে নিজ সময়ে তাকে পাঠ করা হয়ে ওঠেনি মানুষের।

কত সবুজ পাতা ধূসর হয়ে গেছে এরপর, কত অদ্ভুত রূপান্তর আর কত ঘটনাক্রম প্রত্যক্ষ করে গেছে বাংলাদেশ। জেল খাটলেও মোশতাক পেয়েছেন স্বাভাবিক মৃত্যুই। বহু বিদ্রোহ আর অভ্যুত্থান কঠোর হাতে গোপন বলপ্রয়োগে দমন করলেও জেনারেল জিয়া শেষ পর্যন্ত নিজেও হয়েছেন নৃশংস এক হত্যাকাণ্ডের শিকার। একটি অপরিণত বিপ্লবের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে গিয়ে সেই ভুলের মাসুল দীর্ঘদিন দিতে হয়েছে অনেক জাসদ সদস্যকেই। বহু প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে বাংলাদেশে আবারো এসেছে গণতন্ত্র। আর এত কিছুর মাঝ দিয়ে কীভাবে যেন একজন সাধারণ মানুষ ক্রমশ চলে গেছেন অস্পষ্টতার দিকে।

একজন সাধারণ মানুষ, যিনি পৃথিবীর অন্য কোনো দ্রাঘিমাংশেও হাতঘড়িতে বাংলাদেশের সময় ধরে রেখে নিজেকে আড়াল করে ইতিহাস লিখতে চেয়েছিলেন সহকর্মীদের নিয়ে। একজন সাধারণ মানুষ, যিনি সময়ে সময়ে শেখ মুজিবের ছবি নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ভেঙে পড়তেন লাজুক কিশোরীর মতো অথচ বাংলাদেশের শত্রুদের সামনে শুধু ফাইল হাতেই ছিলেন ভীষণ নটোরিয়াস। একজন অতি সাধারণ মানুষ, যাকে পড়া যায়, ধরে আনা যায় ইতিহাসের অ্যাসাইনমেন্ট খাতায়, অথচ পাওয়া যায় না দ্বিতীয়বার। আজ, মৃত্যুর এত বছর পরেও তাজউদ্দীন নামের সে সাধারণ মানুষটি হেঁয়ালির মতোই অস্পষ্ট। কী ব্যাকরণে, কী ইতিহাসে।

সামনের যানজট হালকা হয়ে আসে হঠাৎ। দীর্ঘক্ষণ বসে থাকার সময়টা পুষিয়ে নিতেই যেন জোরে একটা টান দেয় চালক। অসমতল রাস্তার সাথে বেমামান এক গতি তুলে অনায়াসে মগবাজারের চৌরাস্তা পেরিয়ে আসে বাস। রমনা থানার সামনের রাস্তা ফাঁকা পেয়ে গতি বাড়তেই থাকে বাসের।

পেছনে পড়ে থাকা তাজউদ্দীনের নাম লেখা সাইনবোর্ডগুলো সেই গতি পায় না। বরং তাদের উপর জমে থাকা ধুলোর আস্তরণ আরেকটু গাঢ় হয় শুষ্ক বাতাসে। নিয়মিত ধোয়ামোছা হয় না বলে তাদের খুব হতশ্রী দেখায় আজকাল।

সহায়ক গ্রন্থ তালিকা

এই কাহিনিতে ব্যবহৃত সমস্ত ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে বিভিন্ন গ্রন্থ হতে। প্রায় সকল উদ্ধৃতি, এমনকি কিছু কিছু ক্ষেত্রে ঘটনাও, সহায়ক গ্রন্থটি থেকে অবিকল তুলে দেয়া হয়েছে। তাজউদ্দীন আহমদের কন্যা সিমিন হোসেন রিমি স্বউদ্যোগে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছেন বাংলাদেশের ইতিহাস নিয়ে, মুখোমুখি সাক্ষাৎকারে তার কাছ থেকেও কিছু তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই করে নেয়া হয়েছে।

কাহিনিতে স্বনামে ব্যবহৃত ঐতিহাসিক চরিত্রগুলোর অনেকেই এখনো বর্তমান, বাকিরাও বাংলাদেশের ইতিহাসের ঘটনাবহুল এক সময়ের সাক্ষী ছিলেন। তথ্যের যথার্থতা বিষয়ে তাই সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। তবে কাহিনি বর্ণনায় কিছু কাল্পনিক চরিত্রও স্থান পেয়েছে। কিছু গৌণ চরিত্র বাদে কাহিনির প্রধান কাল্পনিক চরিত্রগুলো হলো আলাউদ্দীন, তারেকুল আলম, আবদুল বাতেন। এদের সমস্ত কর্মকাণ্ডই কাল্পনিক। এছাড়া প্রধান ঐতিহাসিক চরিত্র/ঘটনাসমূহ বর্ণনায় কোনো কল্পনার আশ্রয় নেয়া হয়নি। তবে দিন শেষে স্মরণ রাখা বাঞ্ছনীয়, এ কোনো ইতিহাস গ্রন্থ নয়, উপন্যাস কেবল।

ইতিহাসে আগ্রহী পাঠকদের জন্যে নিচে উপন্যাস নির্মাণে ব্যবহৃত গ্রন্থগুলোর নাম দিয়ে দিলাম। এই সব গ্রন্থকারদের কাছে অপরিশোধনীয় ঋণ স্বীকার করি।

- বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র, হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), হাক্কানী পাবলিশার্স।
- আত্মস্মৃতি, আবু জাফর শামসুদ্দীন, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ ।
- একাত্তরের রণাঙ্গন : অকথিত কিছু কথা, নজরুল ইসলাম, অনুপম প্রকাশনী।
- তাজউদ্দীন আহমদের ডায়েরী ১৯৪৭-৪৮, সিমিন হোসেন রিমি (সম্পা.), প্রতিভাস।
- তাজউদ্দীন আহমদের ডায়েরী ১৯৪৯-৫০, সিমিন হোসেন রিমি (সম্পা.), প্রতিভাস।
- নিয়াজির আত্মসমর্পণের দলিল, সিদ্দিক সালিক (অনু) মাসুদুল হক, নভেল পাবলিকেশনস।
- আমি বিজয় দেখেছি, এম আর আখতার মুকুল, সাগর পাবলিশার্স।
- মুজিবের রক্ত লাল, এম আর আখতার মুকুল, সাগর পাবলিশার্স।
- চরমপত্র, এম আর আখতার মুকুল, সাগর পাবলিশার্স।
- তিনটি সেনা অভ্যুত্থান ও কিছু না বলা কথা, লে-কর্নেল এম এ হামিদ, শিখা প্রকাশনী।
- আওয়ামী লীগের ইতিহাস, আবু আল সাইদ, সাহিত্য প্রকাশ ।
- আত্মকথা ১৯৭১, নির্মলেন্দু গুণ, বাংলা প্রকাশ।
- বাংলাদেশের জন্ম, রাও ফরমান আলী খান (অনু) শাহ আহমদ রেজা, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড।
- মুক্তিযুদ্ধের অপ্রকাশিত কথা, আতিকুর রহমান, আগামী প্রকাশনী।
- অসহযোগের দিনগুলি : মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতিপর্ব, আতিউর রহমান, সাহিত্য প্রকাশ .
- মূলধারা '৭১, মইদুল হাসান, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড।
- শেখ ফজলুল হক মণি– এক রাজনীতিবিদের প্রতিকৃতি, ফকীর আবদুর রাজ্জাক, আগামী প্রকাশনী।
- পথে যা পেয়েছি, আনিসুর রহমান, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন।
- বাংলাদেশ : জাতি গঠনকালে এক অর্থনীতিবিদের কিছু কথা, নুরুল ইসলাম, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড।

- আমার একাত্তর, আনিসুজ্জামান, সাহিত্য প্রকাশ।
- বাংলাদেশ– জেনোসাইড অ্যান্ড ওয়ার্ল্ড প্রেস, ফজলুল কাদের কাদেরী (অনু) দাউদ হোসেন, সংঘ প্রকাশন ।
- পাকিস্তানের কারাগারে বঙ্গবন্ধু, রবার্ট পেইন (অনু) ওবায়দুল হক কাদের, শিখা প্রকাশনী।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব– কয়েকটি প্রাসঙ্গিক বিষয়, আবদুল মতিন, যা ডিকেল এশিয়া পাবলিকেশান্স।
- একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ, রক্তাক্ত মধ্য আগস্ট ও ষড়যন্ত্রময় নভেম্বর, কর্নেল শাফায়েত জামিল, সাহিত্য প্রকাশ।
- স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, বেলাল মোহাম্মদ, অনুপম প্রকাশনী।
- মুক্তিযুদ্ধে মেজর হায়দার ও তাঁর বিয়োগান্তক বিদায়, জহিরুল ইসলাম, প্রথমা প্রকাশন।
- রক্ষীবাহিনীর সত্য-মিথ্যা, আনোয়ার উল আলম, প্রথমা প্রকাশন।
- জেল হত্যাকাণ্ড, আবু সাইয়িদ, জ্ঞানকোষ।
- জাতীয় চার নেতা স্মারকগ্রন্থ, ড.মাযহারুল ইসলাম (সম্পা.), জাতীয় চার নেতা পরিষদ।
- একাত্তরের স্মৃতি, বাসন্তী গুহঠাকুরতা, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড।
- শহীদ জননী জাহানারা ইমাম, তাহমীদা সাঈদা, বাঙ্গালিসমগ্র যাদুঘর।
- মুক্তিযুদ্ধঃ আগে ও পরে, পান্না কায়সার, আগামী প্রকাশনী।
- বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রিসভায়, মফিজ চৌধুরী, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড।
- একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে, রফিকুল ইসলাম, সাহিত্য প্রকাশ।
- স্বাধীনতা ভাসানী ভারত, সাইফুল ইসলাম, বর্তমান সময়।
- বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, ড. মোহাম্মদ হান্নান, এ হাকিম অ্যান্ড সন্স।
- বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস বঙ্গবন্ধুর সময়কাল, ড. মোহাম্মদ হাননান, আগামী প্রকাশনী ।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান : জীবন ও রাজনীতি, বাংলা একাডেমি।
- তাজউদ্দীন নিঃসঙ্গ এক মুক্তিনায়ক, ইমতিয়ার শামীম, বাংলাপ্রকাশ।
- আমার জীবন কথা ও বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম, এ আর মল্লিক, আগামী প্রকাশনী।
- স্বাধীনতার স্বপ্ন : উন্মেষ ও অর্জন, আবদুল আজিজ বাগমার, মাওলা ব্রাদার্স।
- ফ্যান্টমস অব চিটাগং, মেজর জেনারেল উবান (অনু), হোসাইন রিদওয়ান আলী খান, ঘাস ফুল নদী।
- ইতিহাসের ধারায় এম মনসুর আলী ও রক্তাক্ত নভেম্বর '৭৫, মির্জা শাখাওয়াৎ হোসেন, পলল প্রকাশনী।
- বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বিদেশীদের ভূমিকা, মাওলা ব্রাদার্স।
- দেশ দেশান্তর, ফারুক চৌধুরী, মীরা প্রকাশন।
- বাংলাদেশঃ ষড়যন্ত্রের রাজনীতি, পরেশ সাহা, র‍্যাডিকেল এশিয়া পাবলিকেশান্স
- বঙ্গভবনে পাঁচ বছর, মাহবুব তালুকদার, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড।
- আন্ডারগ্রাউন্ড জীবন সমগ্র, রইসউদ্দিন আরিফ, পাঠক সমাবেশ।
- যখন ক্রীতদাস : স্মৃতি ৭১, নাজিম মাহমুদ, মুক্তধারা।
- পাকিস্তানের ভূতদর্শন, যতীন সরকার, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ।
- White House Years, Henry Kissinger, Boston: Little Brown and Company.
- Sheikh Mujib: Triumph and Tragedy, S A Karim, University Press Limited.
- Associates of Pakistan Army 1971, A S M Shamsul Arefin, স্বরাজ প্রকাশনী।

- Bangladesh: From Mujib to Ershad, Lawrence Ziring, University Press Limited.
- Brave of Heart, Habibul Alam, Academic Press and Publishers Library.
- ঘুম নেই, নাসিরউদ্দিন ইউসুফ, সেন্টার ফর বাংলাদেশ লিবারেশন ওয়ার স্ট্যাডিজ।
- আলতাফ মাহমুদ, এক ঝড়ের পাখি, মতিউর রহমান (সম্পা.), ঐতিহ্য।
- বাংলাদেশের সামরিক শাসন ও গণতন্ত্রের সংকট, রফিকুল ইসলাম, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড।
- বাংলাদেশের রাজনীতি ১৯৭২-৭৫, হালিমদাদ খান, আগামী প্রকাশনী।
- বাংলাদেশ : রক্তের ঋণ, অ্যানথনি মাসকারেনহাস (অনু), মোহাম্মদ শাহজাহান, হাক্কানী পাবলিশার্স।
- তাজউদ্দীন আহমেদ-ইতিহাসের পাতা থেকে, সিমিন হোসেন রিমি (সম্পা.), প্রতিভাস ।
- বাঙালির মুক্তি সংগ্রাম ও আহমদ ফজলুর রহমান, হাছিনা রহমান, আগামী প্রকাশনী।
- এক জেনারেলের নীরব সাক্ষ্য : স্বাধীনতার প্রথম দশক, মেজর জেনারেল মইনুল হোসেন চৌধুরী, মাওলা ব্রাদার্স।
- একাত্তরের বিজয়, শামসুল হুদা চৌধুরী, বিজয় প্রকাশনী।
- একাত্তরের রণাঙ্গণ, শামসুল হুদা চৌধুরী, আহমদ পাবলিশিং হাউজ।
- ইতিহাসের রক্তপলাশ– ১৫ই আগস্ট, ১৯৭৫, আবদুল গাফফার চৌধুরী, আগামী প্রকাশনী।
- স্বাধীনতা সংগ্রামের নেপথ্য কাহিনী, বদরুদ্দিন আহমদ, আগামী প্রকাশনী।
- মুক্তিযুদ্ধের মহানায়ক তাজউদ্দীন আহমদ, বদরুদ্দিন আহমদ, নওরোজ সাহিত্য সম্ভার।
- '৭১ এর দশমাস, রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী, কাকলী প্রকাশনী।
- ঢাকা ত্রৈমাসিক : মুক্তিযুদ্ধ সংখ্যা।
- যখন পলাতক– মুক্তিযুদ্ধের সময়কাল, গোলাম মুরশিদ, সাহিত্য প্রকাশ।
- রক্তঝরা নভেম্বর ১৯৭৫, নির্মলেন্দু গুণ, বিভাস।
- মুজিব ভাই, এ বি এম মুসা, প্রথমা প্রকাশন।
- মুক্তিযুদ্ধের ১৩ নং সেক্টর, মুনতাসীর মামুন, সুবর্ণ।
- প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি, আবু সাইদ চৌধুরী, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড।
- স্বাধীনতা ১৯৭১, কাদের সিদ্দিকী, অনন্যা।
- একাত্তরের দিনগুলি, জাহানারা ইমাম, সন্ধানী প্রকাশনী।
- তাজউদ্দীন আহমদঃ বাংলাদেশ অভ্যুদয় ও তারপর, কামাল হোসেন, অঙ্কুর প্রকাশনী।
- বাংলাদেশ সরকার ১৯৭১, এইচ টি ইমাম, আগামী প্রকাশনী।
- একাত্তর আমার, নুরুল কাদের, সাহিত্য প্রকাশ।
- তাজউদ্দীন আহমদ নেতা ও পিতা, শারমিন আহমদ, ঐতিহ্য।
- আমার ছোটবেলা, ১৯৭১ এবং বাবা তাজউদ্দীন আহমদ, সিমিন হোসেন রিমি (সম্পা.), প্রতিভাস ।
- তাজউদ্দীন আহমদ আলোকের অনন্তধারা, সিমিন হোসেন রিমি (সম্পা.), প্রতিভাস।
- তাজউদ্দীন আহমদের চিঠি, সিমিন হোসেন রিমি (সম্পা.), প্রতিভাস।
- অশ্লেষার রাক্ষসী বেলায়, সৈয়দ নাজমুদ্দীন হাশেম, সাহিত্য প্রকাশ।
- বাংলাদেশ : রক্তাক্ত অধ্যায় (১৯৭৫-৮১), ব্রিগেডিয়ার সাখাওয়াত হোসেন, পালক পাবলিশার্স।
- লক্ষ প্রানের বিনিময়ে, রফিকুল ইসলাম, অনন্যা।
- বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ র এবং সিআইএ, মাসুদুল হক, ওসমানিয়া লাইব্রেরি

- মুজিবনগর সরকার ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, মোহাম্মদ ফায়েক উজ্জামান, বাংলা একাডেমি।
- আশা ও ভগ্নআশার দিনগুলি ১৯৭২-৭৫, কাজী ফজলুর রহমান, প্যাপিরাস।
- বঙ্গবন্ধু-ব্যক্তিগত চিকিৎসকের দৃষ্টিতে, নুরুল ইসলাম, আনোয়ারা-নুর ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট।
- বীরশ্রেষ্ঠ, জাহানারা ইমাম, চারুলিপি।
- ঢাকা-আগরতলা-মুজিবনগর, মো আবদুল মোহাইমেন, পাইওনিয়ার পাবলিকেশান্স।
- কারা মুজিবের হত্যাকারী, এ এল খতিব (অনু), সোয়াদ করিম ও হাফিজুর রশিদ হীরন, শিখা প্রকাশনী।
- ১৯৭২– ১৯৭৫ কয়েকটি দলিল, ড সাইদ উর রহমান, নয়ন প্রকাশন
- শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মরণে, বাংলা একাডেমি– বিশেষ সংখ্যা ১৯৭৩।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ও বাংলাদেশকে ঘিরে কিছু স্মরণীয় ঘটনা, এম এ ওয়াজেদ আলি মিয়া, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড।
- যা দেখেছি, যা বুঝেছি, যা করেছি, মেজর ডালিম (অব), নবজাগরণ প্রকাশনী
- বঙ্গভবনে মোশতাকের ৮১ দিন, আবু আল সাইদ, আগামী প্রকাশনী।
- আহমদ ছফা, রাজনীতির লেখা, খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি।
- স্বাভাবিক মৃত্যুর গ্যারান্টি চাই, নির্মল সেন, সুরভি প্রকাশনী ।
- বঙ্গবন্ধু তাঁর রাজনীতি ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, আশরাফ হোসেন, উত্তরণ।
- ইনসাইড 'র', ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থার অজানা অধ্যায়, অশোকা রায়না (অনু), আবু রুশদ, বাংলাদেশ ডিফেন্স জার্নাল পাবলিশিং ।

সূত্র হিসেবে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত নিম্নোক্ত প্রবন্ধগুলোও ব্যবহার করেছি।

- কামরুল হাসান ভূঁইয়া, আমাদের শিশু মুক্তিযোদ্ধারা, দৈনিক প্রথম আলো, মার্চ ২৬, ২০১২।
- শনিবারের ক্রোড়পত্র ছুটির দিনে, বিশেষ আয়োজন, দৈনিক প্রথম আলো, ডিসেম্বর ১৪, ২০১৩।
- অমি রহমান পিয়াল, মুজিব বাহিনী : মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে রহস্যময় অধ্যায়, দৈনিক কালের কণ্ঠ, মার্চ ২৩, ২০১১।
- মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া, মানুষের কাঁধে বাড়ি পৌঁছেছি, দৈনিক ইত্তেফাক, ডিসেম্বর ১২, ২০১২।

এছাড়া উপন্যাস নির্মাণে তথ্যসূত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে একজোড়া তথ্যচিত্রও।

- 'দ্য কনসার্ট ফর বাংলাদেশ রিভিজিটেড: উইথ জর্জ হ্যারিসন অ্যান্ড ফ্রেন্ডস'।
- নিঃসঙ্গ সারথী– তাজউদ্দীন আহমদ।